বৈদিক সাহিত্যে রাজা ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ

সংঘশক্তিই মানবজাতির উন্নতির গোড়ার কথা। পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে যে শক্তি মানবজাতির অস্তিত্বের অন্তরায় হইয়াছিল, সংঘশক্তির দ্বারাই মানুষ তাহাদিগকে উৎখাত করিয়া সময়ের সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে। সুনিয়ন্ত্রিত সংঘশক্তির পূর্ণতম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই 'রাষ্ট্র'-সংগঠনে। রাষ্ট্রের সর্বাংগীণতার উপরেই নির্ভর করে জাতির পরিপূর্ণতা। বৈদিক সাহিত্যই পৃথিবীর বুকে মনুষ্যজাতির প্রাচীনতম ইতিহাস। সেই প্রাচীনতম ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন ভারতের রাজ্যপদ্ধতি-সম্বন্ধে আমি বর্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কী ভাবে রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল তাহা জানিতে হইলে প্রথমেই নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে—বিরাড্‌ বা ইদমেক এবাগ্রে আসীদ্‌।··· ···সোদক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ।······ সোদক্রামৎ সা সভায়াং ন্যক্রামৎ।······সোদক্রামৎ সা সমিত্যৌ ন্যক্রামৎ।······সোদক্রামৎ সা আমন্ত্রণে ন্যক্রামৎ। (অথর্ব, ৮।১০)

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে রাজাহীন (বিরাজ্‌) এক বিক্ষিপ্ত প্রজাসত্তা বর্তমান ছিল। সেই প্রজাসত্তা উৎক্রান্ত হইয়া প্রথমে 'গার্হপত্যে', দ্বিতীয়ে 'সভা'য়, তৃতীয়ে 'সমিতি'তে এবং চতুর্থে 'আমন্ত্রণ'-রূপে পর্যবসিত হইল। গার্হপত্য, সভা, সমিতি, আমন্ত্রণ—রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ধারায় এই চারিটি স্তরের কথা মন্ত্রে বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ যে অবস্থায় বাস করিত মনীষী রুশো তাহার নাম দিয়াছেন state of nature' এবং 'nasty, brutish, short' এই তিনটি কথার মধ্যে দিয়াই সেই অবস্থার ভয়াবহতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মন্ত্রে যে 'বিরাজে'র বা রাজাহীন বিক্ষিপ্ত প্রজাসত্তার কথা বলা হইয়াছে ইহা রুশো-কথিত 'state of nature' ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিক্ষিপ্ত প্রজাসত্তা সংঘরূপে প্রথম দানা বাঁধিল 'গার্হপত্যে' অর্থাৎ পরিবার (family)-রূপে। প্রত্যেকটি পরিবার হইল এক একটি ক্ষুদ্র সংঘ, সংঘনেতা হইলেন গৃহপতি। এমনি করিয়া একদিন ভাবী রাষ্ট্রের ভিত্‌ পত্তন হইল। অনেকগুলি পরিবার লইয়া হইল 'গ্রাম' এবং প্রত্যেক পরিবারের প্রতিনিধি লইয়া হইল (গ্রাম)-'সভা'। অনেকগুলি গ্রামসভার প্রতিনিধি লইয়া 'সমিতি' এবং অনেকগুলি সমিতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইল 'আমন্ত্রণ' বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ্‌। এই আমন্ত্রণের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রজীবনে প্রত্যেক মানুষ প্রকাশ করিত তাহার মতামত, শাসকগোষ্ঠীতে প্রতিনিধি-মারফতে বোধ করিত স্বকীয় অস্তিত্ব। ইহাই ছিল 'স্বরাজ'। এই স্বরাজ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য ও শ্রেয়স্কর তাহাদের আর কিছুই ছিল না—

যস্মান্নান্যৎ পরমস্তি ভূতম্‌। (অথর্ব, ১০।৭।৩১)

তাহারা বুঝিয়াছিল যে, প্রজাশক্তির সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এই স্বরাজ অর্জন করা যায় না,

তাহারা বুঝিয়াছিল যে উদার মনোভাব ও মৈত্রীই স্বরাজ-লাভের পথে প্রথম সোপান। তাই ঋষি বলিতেছেন—

আ যদ্ বামীয়চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ।
ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে॥

(ঋক্, ৫।৬৬।৬)

অর্থাৎ, 'হে ব্যাপকদৃষ্টিসম্পন্ন মিত্রগণ! আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্বান্ আমরা বহুজনপরিপাল্য স্বরাজলাভে যত্নবান্ হইব।' ঋষি আবার বলিতেছেন—হে বলবান্ পুরুষগণ! স্বরাজের উপাসনা কর, পৃথিবীর শত্রু ধ্বংস কর—

শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃশশা অহিম্
অর্চন্ননু স্বরাজ্যম্। (ঋক্, ১।৮০।১)

কিন্তু যত দিন সংঘচেতনা না আসে তত দিন মানুষ সংঘবদ্ধ হইতে পারে না। যুগে যুগে জননেতৃগণ অবাঞ্ছিত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন; ফলে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে তাঁহারা শত্রুরূপে বিবেচিত হইয়াছেন, অশেষ প্রকারে নির্যাতিত হইয়াছেন। অনার্য-অধ্যুষিত ভারতখণ্ডে বিক্ষিপ্ত আর্যসন্তানগণ প্রথম পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, নিজেরা সংঘবদ্ধ না হইলে নূতন পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না। তাই আমরা দেখি কয়েক জন ঋষি জনগণের মধ্যে সংঘচেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উগ্র তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জনগণ সংঘবদ্ধ হইল এবং বল ও তেজের অধিকারী হইল—

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপসেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা
উপসংনমন্তু॥ (অথর্ব, ১৯।৪১।১)

উক্ত মন্ত্রের "ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতম্" হইতে বুঝা যায় যে, একরাষ্ট্রীয়তাবোধ জন্মিলেই তবে প্রজাশক্তির বল ও ওজঃ উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ না মানুষ সংঘবদ্ধ হইতে শিখে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বলহীন ও ওজোহীন থাকে। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া যাঁহারা শত্রুহস্তে অশেষপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই পুরোধারূপে মহর্ষি অত্রির নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে, শত্রুগণ তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—

ঋষিং নরাবংহসঃ পাংচজন্যমৃবীসাদত্রিং মুংচথো
গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্বং
বৃষণা চোদয়ন্তা॥
(ঋক্, ১।১১৭।৩)

শত্রুগণ কারাগারে তুষাগ্নিতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং অনাহারে রাখিয়া তাঁহাকে কৃশ করিয়া ফেলিয়াছিল। অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় তিনি সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন—

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং
পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্॥ (ঋক্, ১।১১৬।৮)

এমনি করিয়া জননায়কগণের তিল তিল করিয়া আত্মদানের ফলে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

'রাষ্ট্র'-শব্দ বেদে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শাসনপ্রণালীর দিক দিয়া 'রাজ্য' বা 'রাষ্ট্র'কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইত। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—

সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং স্বারাজ্যং
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং রাজ্যং
মাহারাজ্যমাধিপত্যময়ং সমন্তপর্যায়ী
স্যাৎ সার্বভৌমঃ সার্বায়ুষঃ
আন্তাদাপরার্ধাৎ। পৃথিব্যৈ সমুদ্রপর্যন্তায়া
একরাড়িতি। (ঐ ব্রা, ৮।১৫)

উপরিলিখিত মন্ত্রটিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শব্দ পাওয়া যায়, যথা—ভৌজ্য, রাজ্য, সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, মাহারাজ্য, আধিপত্যময় রাজ্য, সার্বভৌম রাজ্য, সমন্তপর্যায়ী রাজ্য ইত্যাদি। অবশ্য প্রত্যেকটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বাচক। তাহা ছাড়া বিস্তৃতির তারতম্যানুসারে এবং শাসনপ্রণালীর ভিন্নতা-অনুসারে রাষ্ট্রের ইদানীন্তন শ্রেণীবিভাগের তখনকার দিনেও শ্রেণীবিভাগ থাকা অসম্ভব নহে। উল্লিখিত শব্দগুলির বিশেষ অর্থ আমি যতটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ অর্থনিষ্পত্তি নহে—

(১) **ভৌজ্য**—'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নিসর্গনির্মিত সীমানা দ্বারা অবশিষ্ট ভিন্নপ্রকৃতিক ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন রাজ্য।

(২) **রাজ্য**—'রাজ্ঞঃ ইদম্' এই অর্থে। অর্থাৎ রাজা নিজেই যে ভূভাগের মালিক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইংরেজির monarchy বলিতে যাহা বুঝি প্রায় তাহাই।

(৩) **সাম্রাজ্য**—'সম্' অর্থাৎ 'একীভূত এই অর্থে। কতকগুলি রাজ্য একীভূত হইয়া এক শাসনতন্ত্রের অধীনে কতকগুলি বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইলে 'সাম্রাজ্যের' উৎপত্তি। ইহা Federal Government-এর অনুরূপ।

(৪) **মাহারাজ্য**—'মহৎ' শব্দ বোধ হয় বিস্তৃততর পরিধিকে বুঝাইয়াছে। 'সাম্রাজ্যে' কতকগুলি বিষয় একীভূত রাজ্যগুলির পরিচালনাধীনে থাকিত। 'মাহারাজ্যে' রাজ্যগুলি সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা হারাইয়া কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িত। ইহা বোধ হয় Unitary Government-এর অনুরূপ।

(৫) **স্বারাজ্য** (Self-Government)—গণতন্ত্রের পূর্ণতম বিকাশ। ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

(৬) **বৈরাজ্য**—'বি' অর্থাৎ 'বিরুদ্ধ'; অর্থাৎ প্রজাসত্তা যেখানে রাজ-সত্তার বিরোধী। সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা এখানে প্রজাশক্তির করতলগত। ইহা অনেকটা Republican Government-এর মত।

(৭) **আধিপত্যময় রাজ্য**—'পতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'—এই অর্থে 'অধিপতি'। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রে এইরূপ অধিপতির হাতে রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত থাকিত। Dictatorship-এর সহিত বোধ হয় ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

(৮) **সার্বভৌম**—সর্বাধিক আয়তন-বিশিষ্ট রাজ্য।

এই গেল 'রাষ্ট্র'-সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। এখন আমাদের দেখিতে হইবে বৈদিক রাষ্ট্রে রাজার স্থান কোথায় ছিল? রাষ্ট্রের সহিত রাজার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, অসুরদের সহিত যুদ্ধে দেবতারা বার বার পরাজিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা না থাকাই তাঁহাদের এই পরাজয়ের কারণ। তখন তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, তাঁহারা একজনকে রাজা করিবেন। সকলে মিলিয়া তাঁহারা সোমকে রাজপদে বরণ করিলেন এবং তখন হইতে সোমের নেতৃত্বে তাঁহারা অসুরদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। "রাজানো রাজকৃতঃ" (অথর্ব, ৩।১।৫) শব্দ দুইটি অথর্ববেদে পাওয়া যায়। প্রজাকে বলা হইয়াছে 'রাজকৃৎ' (maker of kings)। আর এক স্থানে বলা হইতেছে—

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমমৃতমস্মাকং
তেজোঽস্মাকং ব্রহ্মাস্মাকং স্বরস্মাকং

যজ্ঞোঽস্মাকং পশবোঽস্মাকে প্রজা
অস্মাকং বীরা অস্মাকম্ ॥ তস্মাদমুং
নির্ভজামো····· (অথর্ব, ১৬,৮)

অর্থাৎ 'এই পুরুষকে রাজপদে বরণ করিলে আমাদের জয়, উন্নতি, আরোগ্য, তেজঃ, জ্ঞান, স্বর্গ, যজ্ঞ, পশু এবং সন্তানসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং আমরা ইহাকে রাজপদে বরণ করিব।' এই মন্ত্র হইতেই বুঝা যাইবে যে, সর্ববিষয়ে ঋদ্ধিযুক্ত হইবার কামনা করিয়াই প্রজাগণ রাজা নির্বাচন করিত। রাজাকে বলা হইত—

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়
ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবী
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব
ততো ন উগ্রো বিভজা বসূনি।
(অথর্ব, ৩।১।৪।১)

অর্থাৎ 'হে রাজন্! মনুষ্যগণ রাজ্য-ব্যবস্থার জন্য তোমাকে রাজারূপে বরণ করুক। তুমি রাষ্ট্রের শীর্ষভাগে অবস্থান কর এবং প্রজাবর্গের মধ্যে সমভাবে সম্পদ বণ্টন কর।' এখানে দেখা যায় যে রাষ্ট্রের সম্পদে প্রজাবর্গের সমান অধিকার ছিল এবং যাহাতে সকলে সমানভাবে সেই সম্পদ ভোগ করিতে পারে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও রাজার একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এক কথায়, রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্ববিধ সমৃদ্ধির মূল—

রাজা রাষ্ট্রাণাং পেশঃ—ঋক্, ৭ ৩৪
রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ—ঋক্, ১।১৮।১

রাজ্যাভিষেকের সময় প্রজাগণের প্রতিনিধি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

আ ত্বা হার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাঽবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ॥
(ঋক্, ১০।১৭৩।১)

অর্থাৎ, "হে রাজন্! আমি তোমাকে আনিয়াছি। ভিতরে আগমন কর এবং স্থির ভাবে অবস্থান কর। চঞ্চল হইও না; প্রজাবর্গ তোমার অনুরাগী হউক। তোমার পরিচালনায় রাষ্ট্রের যেন অবনতি না হয়।" রাজাকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইত—

এষামহমায়ুধা সংস্যাম্যেষাং রাষ্ট্রং সুবীরং বর্ধয়ামি।
এষাং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণ্বেষাং চিত্তং বিশ্বেঽবন্তু দেবাঃ॥
(অথর্ব, ৩।১৯।৫)

অর্থাৎ "আমি প্রজাগণের শস্ত্রসমূহ ঠিক রাখিব, রাষ্ট্রকে বীরপুরুষযুক্ত করিব। প্রজাগণের শৌর্য অক্ষীণ হউক এবং বিজয়াভিলাষী চিত্ত সুরক্ষিত থাকুক।"

প্রজাগণের মনোরঞ্জন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল এবং যে রাজা প্রজারঞ্জক হইতেন সভা, সমিতি, সেনা সব কিছুই তাঁহার অনুগামী হইত—

সোঽরজ্যত ততো রাজন্যোঽজায়ত। স বিশো অনুব্যচলৎ। তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চ অনুব্যচলন্॥ (অথর্ব, ১৫।৮।৯)

যে রাজা সহস্রস্তম্ভযুক্ত সভাগৃহে বসিয়া সভার মতানুসারে শাসনকার্য পরিচালন করিতেন তিনি কখনও স্থানভ্রষ্ট হইতেন না—

রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে।
সহস্রস্থূণ আসাথে॥ (ঋক্, ২।৪১।৫)

রাজার অভিষেকের সময় পুরোহিত রাজাকে বলেন—ক্ষত্রস্য যোনিরসি ক্ষত্রস্য নাভিরসি॥ মা ত্বা হিংসীন্মা মা হিংসীঃ॥ নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা॥ সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥ মৃত্যোঃ পাহি বিদ্যোৎ পাহি॥ অশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চসায়াভিষিঞ্চামি॥ সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভিষিঞ্চামি॥ কোঽসি কতমোঽসি, কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা॥ সুশ্লোক, সুমংগল, সত্যরাজন্॥ (যজুঃ অ, ২০)

—হে রাজন্! তুমি শৌর্যের উৎস, শৌর্যের কেন্দ্র। আমরা তোমার হিংসা করিব না, তুমিও আমাদের হিংসা করিও না। নিয়মসমূহের ধারক ও অনিষ্টসমূহের নিবারক রাজা প্রজাবর্গে স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত থাকুন।

হে রাজন্! মৃত্যু ও বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তেজ ও ব্রহ্মবর্চসের জন্য, বীর্য ও অন্নের জন্য, বল, শ্রী ও যশের জন্য তোমার অভিষেক করিতেছি। তুমি আনন্দময়, তুমি মংগলময়। আনন্দ ও মংগলের জন্য তোমার অভিষেক করিতেছি।

উপরোক্ত মন্ত্রে রাজাকে তিনটি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে—'সুশ্লোক' অর্থাৎ যশস্বী, 'সুমংগল' অর্থাৎ কল্যাণকারী এবং 'সত্যরাজন্' অর্থাৎ সত্যে বা ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। পুরোহিতের এই উক্তির পর রাজার প্রতিভাষণও এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য—

শিরো মে শ্রীর্যশো মুখং ত্বিষি কেশাশ্চ শ্মশ্রূনি।
রাজা মে প্রাণো অমৃতং সম্রাট্ চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রং॥
জিহ্বা মে ভদ্রং বাঙ্‌মহো মনো মন্যুঃ স্বরাড্‌ভামঃ॥
মোদঃ প্রমোদা অংগুলিরংগানি মিত্রং মে সহঃ॥
বাহূ মে বলমিন্দ্রিয়ং হস্তৌ মে কর্ম বীর্যম্।
আত্মা ক্ষত্রমুরো মম॥……জংঘাভ্যাং পদ্‌ভ্যাং
ধর্মোঽস্মি বিশি রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ (যজুঃ অ, ২০)

—প্রজার শ্রী আমার মস্তক, যশঃ মুখ, তেজঃ কেশাদি। তেজস্বী প্রজা আমার প্রাণ, মহাতেজস্বী প্রজা আমার চক্ষু, বিশেষরূপে তেজস্বী প্রজা আমার কর্ণ। প্রজার কল্যাণকর বাণী আমার জিহ্বা, প্রজার মহত্ত্বভাষণই আমার বাক্য। প্রজার উৎসাহই আমার কাম্য, প্রজার স্বরাজেই আমার প্রকাশ। প্রজার আনন্দই আমার অংগুলি ও অংগ, প্রজার সহনশীলতাই আমার মিত্র, প্রজার বল আমার বাহু, বীর্য ও কর্ম আমার হস্ত, প্রজার শক্তিই আমার বক্ষপুট।……আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, (বস্তুতঃ) রাজা প্রজাতেই প্রতিষ্ঠিত।

রাজা প্রজাগণের নিকট করগ্রহণ করিতেন—
অথোত ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ।
(ঋক্, ১০।১৭৩)

'সভা' ও 'সমিতি'—এই দুইটি জনসভার সাহায্যে রাজা তাঁহার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। এই 'সভা' ও 'সমিতি'কে 'প্রজাপতির দুহিতা' বলা হইয়াছে। ইহাদের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিতেছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাকে রক্ষা করেন, উপদেশ দেন—

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাম্
প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাৎ
চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥ ১
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ॥ ২
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥ ৩
(অথর্ব, ৭।১২)

অর্থাৎ, "হে সভে! তোমার নাম 'নরিষ্টা'। সভাসদ্‌গণ আমার সহিত ভাষণ করুন। সভাসদ্‌গণের তেজঃ ও জ্ঞান আমি গ্রহণ করিতেছি। ইন্দ্র আমাকে এই সভার অংশভাগী করুন।" গ্রিফিথ্ সাহেব ইহার নিম্নানুরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

1. In concord may Prajapati's two daughters, Gathering and Assembly, both protect me. May every man I meet respect and aid me. Fair be my words, O Fathers, at the meetings.

2. We know thy name, O Conference; Thy name is interchange

of talk. Let all the company who join the Conference agree with me.

3. Of these men seated here I make the splendour and the love mine own. Indra, make me conspicuous in all this gathered company.

(Griffith's Atharva Veda, 7.12.)

এই মন্ত্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়া Dr. Muir বলিয়াছেন—"The hymn breathes a social spirit and a disposition to profit by the improving influences of the company of cultured men." (O. S. T. Vol. V. p. 438)

'সভা' ও 'সমিতি'কে প্রজাপতির 'দুহিতা' বলা হইয়াছে। এ কথার অর্থ কী? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।৩৩) ও শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি ও তদীয় দুহিতার উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটির সারমর্ম এই—প্রজাপতি তাঁহার কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দেবগণের নিকট ইহা অত্যন্ত খারাপ ঠেকিল। তখন দেবগণ একত্র হইয়া নিজেদের সম্মিলিত ভয়ানক রূপ দ্বারা 'ভূতবান্' বা 'রুদ্র' নামক দেবতার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করেন।

ঋগ্বেদে (১০।৬১।৭) বলা হইয়াছে—

> পিতা যৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্
> ক্ষময়া রেতঃ সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ।
> স্বাধ্যোঽজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা
> বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥

অর্থাৎ "পিতা (পালনকর্তা) প্রজাপতির নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ দেখিয়া সৎকর্মপরায়ণ দেবগণ নিয়মানুগ দ্বিতীয় বাস্তপতির সৃষ্টি করিলেন।' এই উপাখ্যানটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে অশ্লীলরূপে পরিগণিত হইয়াছে। Muir বলিয়াছেন—"The legend, though repulsive in its character, is not without interest as illustrating the opinions which Indian mythologists have entertained regarding their deities." (Muir, O. S. T. Vol. 1. p. 107) এখন এই উপাখ্যানের অর্থ কী? প্রজাপতি কে? তাঁহার দুহিতাই বা কে?

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন "দিবমিত্যন্যে উষসমিত্যন্যে"; আবার শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন "দিবং বোষসং বা"। অর্থাৎ প্রজাপতির কন্যা কে —এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে তিনি 'দিব্', কাহারও মতে তিনি 'উষা'। 'প্রজাপতি' শব্দে যদি 'রাজা' এবং 'দুহিতা' শব্দে যদি 'রাষ্ট্রসভা'কে গ্রহণ করা যায় তবে অর্থ মোটেই অসংগত হয় না। তাহা হইলে সমগ্র উপাখ্যানের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, রাজা যদি রাষ্ট্রসভার বিরুদ্ধাচারী হইতেন তবে প্রজাদের সম্মিলিত ক্রোধ রাজাকে পদচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করিত। বস্তুতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ পদচ্যুত রাজার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টার কথা পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও গীতা

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, এম্‌-এস্‌সি, বি-এল্‌

দক্ষিণেশ্বরে জীবন্ত বেদান্তবিগ্রহ। সহজ সুবোধ্য চলিত কথায় যাবতীয় উচ্চতত্ত্বের প্রাঞ্জল মীমাংসা করিবার অদ্ভুত ভঙ্গী সেই অনুপম জগদ্‌গুরুর। গীতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কোন জিজ্ঞাসু ভক্তকে করুণাভরে উপদেশ দিয়াছিলেন "গীতা-জপ করো।" গীতা গীতা গীতা বলিলে ধ্বনিতে "ত্যাগী" এই শব্দটি বাহিরে আসিতে চায়। ইহাই ছিল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। "ত্যাগী হও।" অর্থাৎ মোক্ষসাধনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে 'ত্যাগ'ই অন্তরঙ্গ সাধন। শুধু শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা নিষ্ফল। শাস্ত্রোপদেশ যদি কার্যের দ্বারা জীবনে প্রতিফলিত না করা হয় শাস্ত্রচর্চায় শুধু পাণ্ডিত্যাভিমানই বাড়ে।

গীতা একাধারে ধর্মশাস্ত্র, সাধনশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের যে ভাগে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়া উপনিষদ্‌-নামে শ্রুত হইয়াছে, গীতা তাহারও সারাৎসার। অনন্যসুলভ নিপুণতার সহিত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বও ইহাতে সুকৌশলে শ্রীভগবানের উক্তিরূপে স্মৃত হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব অবশ্য নিত্যসিদ্ধ। ইহা সাধ্যবস্তু নহে। তবু প্রাকৃত মানুষের সাধনা অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী ও অত্যাবশ্যক, তাহা যে পথেই প্রবাহিত হউক না কেন। তবে প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে এই বিরতিহীন বিশৃঙ্খল সামঞ্জস্যহীন কর্মপ্রবাহের মোড় ঘুরাইয়া সুপথে চালিত করিবার একটা প্রেরণা আসে। সেই পূর্বে অনাচরিত কতকটা পূর্ববিরোধী পথে কর্ম পরিচালিত করাকেই সাধারণতঃ সাধনা বলা হইয়া থাকে। এইরূপে প্রেয়ের সাধন পরিত্যাগ করিয়া লোক শ্রেয়ের সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সেই যাত্রারম্ভের প্রথম পাথেয় ত্যাগ।

ঠাকুর 'ত্যাগী' শব্দটি জপ করিতে বলেন নাই। তিনি ত্যাগী হইতে বলিয়াছেন। এই উপদেশ শুধু সন্ন্যাসীকে দেওয়া হয় নাই, গৃহস্থাদি অপরাপর আশ্রমীকেও দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠা উচিত 'কি ত্যাগ করিতে হইবে?' জিজ্ঞাসুর মনে যে গীতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল সাধনাবস্থ ব্যক্তির জন্য তাহাতে কি উত্তর আছে দেখা যাউক। শাস্ত্রাধ্যয়নের সর্ববাদিসম্মত উপায়গুলি চিন্তা করিলে দেখা যায় তাহাই শাস্ত্রের উপদেশ যাহা উপক্রম ও উপসংহারে একভাবেই আছে অর্থাৎ কোন রূপে পরিবর্তিত হয় নাই। তদুপরি অভ্যাস বা পৌনঃপুনিকতাও লক্ষণীয়, অর্থাৎ দেখিতে হইবে প্রকরণের পর প্রকরণে প্রতিতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার বিভিন্নস্থলে সেই একতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায়কে দৃঢ় করিবার জন্য কোন্‌ উপদেশটিকে গুরু প্রপন্ন শিষ্যের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন।

সাধক এখনও দেহভৃৎ অর্থাৎ দেহাভিমানী। অনাত্ম দেহাদিতে আত্মভ্রান্তিজনিত উপাধি তাহার আছে। তাহার জন্যই উপদেশ। আত্মতত্ত্বরূপ দেববিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পথ যাহার ফুরাইয়াছে তাহার পথ-সম্বন্ধে বা অপর কোনো কিছু-সম্বন্ধে কোনো উপদেশের

প্রয়োজন নাই। পথে যে চলিতেছে, এইরূপ চলা ব্যতীত অপর কিছু আছে বা থাকিতে পারে এরূপ ধারণাই যাহার নাই, দ্বারপাল-রূপী যার বুদ্ধি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের পথে চলিতে অনুমতি দিতেছে না তাহাকেই বিপথ পরিত্যাগ-পূর্বক সুপথে আনিবার জন্যই শাস্ত্র ও গুরু। বুদ্ধির সহিত বিদ্রোহ করিয়া নয়, বুদ্ধির পরিপূর্ণ সম্মতি অনুসারে। সেই জন্যই বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রের সহকারী হইতেছে শাস্ত্রোক্ত যুক্তি। অর্থাৎ কোনো কথা অন্ধ বিশ্বাসে (dogmatically) মানিয়া লইতে হইবে না। শাস্ত্র ইহা বুঝিয়াছেন যে বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইয়া শুধু অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লইলে পুরুষার্থলাভে বাধা উপস্থিত হইবেই। সেই জন্যই গুরুমুখে শাস্ত্রোপদেশ পুনঃ পুনঃ শ্রবণের পর পুনঃ পুনঃ মননের ব্যবস্থা। এই মননই বুদ্ধির permit জোগাড় করিয়া যাহা অসহজ ছিল তাহা পুরুষ-নিঃশ্বাসের মত সহজ করিয়া দিবে এবং এক দৃঢ়ভূমিতে পৌছাইয়া বিদায় নিবে। সেখান হইতে প্রত্যাগমনের কোনো কারণ বা ইচ্ছাই থাকিবে না। প্রবাস হইতে স্বগৃহাভিমুখী পথিকের ন্যায় সুখানুভবে পিছু তাকাইবার অভিলাষ বা প্রয়োজনবোধ সমূলে বিনষ্ট হইবে। প্রকৃত পক্ষে সুদীক্ষিতের এই যে যাত্রাশুরু ইহা এক যাত্রা-শেষেরই সূচনা। ইহা কোনো অজ্ঞাত দূরে আরও দূরে যাইবার জন্য নয়। ইহা বাস্তবিক কোথাও গমন অর্থাৎ বহির্গমনই নয়। যদি ইহাকে ঐরূপ কিছু বলিতে হয় গমন না বলিয়া প্রত্যাগমনই বলিব। ইহা প্রত্যাবর্তন-পূর্বক স্বগৃহে অবস্থানের প্রচেষ্টা।

সাধন-অবস্থা পাইতে হইলে চিত্তশুদ্ধির দরকার। সুতরাং আলোচনা করা যাউক সেই অবস্থা পাইতে হইলে চিত্তের যে শুদ্ধ অবস্থা দরকার অর্থাৎ যেরূপ চিত্তশুদ্ধি না হইলে 'শ্রবণ'-রূপ গুরূপদেশ অনুর্বর প্রস্তর-ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের মতই অত্যন্ত বিফল হইবে তাহা লাভের জন্য গীতা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, কি ত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইতে বলিয়াছেন। এটা নিশ্চিত যে গীতা ঐ ভূমির লোককে কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। কেন না প্রপন্ন শিষ্য অর্জুনের শোকনিবৃত্তি করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি আনিবার জন্যই গীতা। কিন্তু ইহাও ঠিক যে কর্ম সর্বদাই সদোষ, কখনই দোষশূন্য নহে এবং একটা বিশিষ্ট কৌশলে না করিলে সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিমর্ষরূপ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সেই কৌশল কি—মুখ্যতঃ তাহাই বলিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। সকলেই জানেন, ফল-কামনাবিরহিত হইয়া ভগবৎপ্রেরিত বোধে ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করাই সেই কৌশল। কর্মফল-ত্যাগই ত্যাগ, সেই ত্যাগেই শান্তি (১২।১২), যে কর্মফলত্যাগী সেই-ই ত্যাগী (১৮।১১)।

তাহারই বহিরঙ্গ সাধন হিসাবে দুই একটি বিষয় গীতায় কি ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা। গীতার আঠারোটি অধ্যায়কে পরম দয়ালু যুগোপদেষ্টারা তিনকাণ্ডে বিভক্ত করিয়া অনুশীলন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সেইজন্য ইহাকে সেই তিন তত্ত্বের (কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের) সমন্বয়-শাস্ত্রও বলা হইয়া থাকে। গীতাতে প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ কর্ম-সম্বন্ধেই বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি-সম্বন্ধে এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানসম্বন্ধে। সাধনার সেই সব বিশ্লেষণ এখানে করা হইতেছে না। শুধু ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, এই বাহ্যতঃ বিবিধরূপ সাধনাবস্থার প্রতি

অবস্থাতেই বহিরঙ্গসাধনরূপে যে ত্যাগের কথাটা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, প্রকরণ-অনুসারে যাহার কোনো তারতম্য করা হয় নাই, সেই 'ত্যাগ' কিসের ত্যাগ। খোলসা করিয়া না দিলে শব্দের লক্ষণাশক্তিতে বা পরিভাষানুযায়ী বিরূপ অর্থের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে শুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষুকে একটা ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভাষ্যকার তাহাকে 'জগদ্‌বুদ্ধি'-ত্যাগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন বা উপপত্তি-অনুসারে বুঝাইতে বাধ্য হইয়াছেন। গীতোক্ত যে ত্যাগের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি উহা অত উচ্চভূমির সাধন নহে। গীতার ত্যাগকে শ্রীঅরবিন্দ জীবের যে তিনটি movement না হইলে সাধন হইতে পারে না বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে "to get clear of the sin of the Vital Ego"-রূপ movement-টিকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। এই ত্যাগ হইতেছে 'কাম'-ত্যাগ। কামই সংসার এবং সংসারের মুখ্য কারণ। এই সব দুরূহ বেদান্ত-তত্ত্ব উপস্থিত করিতেছি না। সাধারণ অর্থে কাম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহারই কথা হইতেছে। এই শব্দটি গীতায় কোথাও লোভের সহিত পৃথগ্‌ভাবে, কোথাও বা লোভকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে প্রকাশ্যভাবে লোভ উক্ত হয় নাই সেখানে লোভ অন্তর্ভুক্ত কেন না উভয় শব্দই তৃষ্ণাবোধক। ধনতৃষ্ণাকে লোভ বলা হয় এবং নরনারীর মিলনতৃষ্ণাকে কাম বলা হয়। ইহা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে, কামশব্দের মধ্যে গৃধ্নুতা, অভিলাষ, তৃষ্ণা ও লোভ অন্তর্নিহিত আছে। টীকাকার শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বিষয়ে সুখ আছে এইরূপ যে কল্পনাজনিত মানসিক ভ্রম তাহাকে শোভনাধ্যাস বলা হইয়াছে। শোভনাধ্যাস-প্রযুক্ত নিজের অনুকূল সুখসমূহ কখনও দৃশ্যমান, কখনও শ্রূয়মাণ ও কখনও স্মর্যমাণ-রূপে অবস্থান করে। পুনঃ পুনঃ তাহার গুণানুসন্ধান করিয়া তাহাতে রতি-স্বরূপ যে মানসিক বৃত্তি—গৃধ্নুতা, অভিলাষ, তৃষ্ণা ও লোভাদিরূপে অভিব্যক্ত হয় ইহাই কাম।

এই কাম-শব্দটি গীতায় কোনো কোনো স্থানে রাগশব্দের বা ইচ্ছা-শব্দের সহিত একার্থক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোথাও বা রাগ-শব্দের সহিত সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথক করিয়া বুঝিতে হইলে—"কারণ থাকিয়া বা না থাকিয়াও কার্য হউক" এই প্রকার চিত্তবৃত্তিকে কাম বলিয়া, "ক্ষয়ের কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও লব্ধ বস্তুর ক্ষয় না হউক" এই প্রকার চিত্তরঞ্জক যে মনোহর চিত্তবৃত্তি-বিশেষ তাহাকে রাগ বলা যাইতে পারে।

গীতা আরও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে কাম-ক্রোধ কি ভাবে পরস্পর আলিঙ্গিত। কাম হইতে ক্রোধ জন্মে—কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। (২।৬২)। কেমন করিয়া তাহা হয় তাহা কাহাকেও বুঝাইবার দরকার নাই। "আমার ইহা হউক" "আমি ইহা চাই" "ইহা না হইলে আমার জীবন বাঁচে না" "যেমন করিয়া হউক আমি ইহা লাভ করিব" ইত্যাদি বৃত্তিগুলিই কাম। চক্ষুকর্ণাদি ও হস্তপদবাগাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির যেটির দিকে যখন যে ইন্দ্রিয় ধাবমান হইয়াছে তখন সেটিকে না পাইতে থাকিলে পারিপার্শ্বিকের উপর ক্রোধ ত হইবেই। ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন টীকাকার যখন দেখিয়াছেন ২।৩৭ শ্লোকে কাম ও ক্রোধ এই

দুইটিকে অতিভোজী ও মহাদুর্দান্ত শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়া সর্বনামের বেলা দ্বিবচন প্রয়োগ না করিয়া এক বচন 'এনং' দেওয়া আছে।

কামজনিত ভোগ আন্তবান্ হইতে বাধ্য। এই জন্য কাম অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই দুঃখেরই জনক হয়। অর্জনকালে দুঃখ, ভোগকালেও দুঃখ উঁকি মারে, পরিণামে ত আছেই। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন—গীতা সে তত্ত্বটি বিশেষ জটিল নহে মনে করিয়া কামোপভোগ সংস্পর্শজ ও আদ্যন্তবান্ এবং পরিণামদুঃখের কারণ শুধু ইহাই সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাক্ এই কাম-সম্বন্ধে গীতায় কি তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দেহবিলক্ষণ বাহ্য জড়াজড় পদার্থে বা দেহাদিতে আত্মভ্রান্তি হইলে স্বরূপ আত্মা অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থান করেন। উহাকে অবিনাশী আত্মার নাশ বলা যায়। ষোড়শ অধ্যায় শেষ করিবার সময় সুদৃঢ়-ভঙ্গিতে বিধি স্থাপিত করিতেছেন লিঙ্ যোগে অর্থাৎ 'ত্যজেৎ' এই প্রয়োগ করিয়া। এখন আর হুকুম নয়। শিষ্যের শ্রেয়প্রেয়-বিবেক দৃঢ় হইয়াছে। শ্রেয় কি দেখাইলেই যথেষ্ট। কেন না সে এখন 'বিমৃশ্য' (বিচার করিয়া) 'যথেচ্ছ' তাহাই করিবার অধিকারী হইয়াছে।

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি আত্মার সকল প্রকার পুরুষার্থ-সাধনের অযোগ্যতা-সম্পাদক ও অত্যন্ত অধোগতির প্রাপক। তাহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত। (১৬।২৯) পরমা গতি লাভ করিতে হইলে নিজের শ্রেয়ঃ বুঝিয়া লও। ঠিক ইহার পরেই ৫।২৩ শ্লোকটি যদি পড়া যায় কি দাঁড়ায় দেখুন। কেন এই সব ত্যাগ করিব তাহার কারণ পাইবেন। মোক্ষ না চাহিলেও আপনি সুখ ত চান। কামাত্মা হইয়া সুখ পাইবেন না।

কামক্রোধের বেগ সহ্য করিলে পরমেশ্বরে যুক্ত হইবার পথ সুগম হয় এবং সুখ হয়। (৫।২৩) ইহা কামত্যাগীর স্বানুভবসিদ্ধ। বেগে শান্তি থাকিতে পারে না; স্থিতিতেই শান্তি। সেই কামত্যাগীর পরিণাম শান্তিকে সূত্র হিসাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ (২।৭২)

অব্যবহিত পূর্বের দুইটি শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয়।

অগাধ সমুদ্রে জল প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার নির্বিকারত্ব নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ কামনা-জনিত বিষয়সকল প্রবেশ করিয়া যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই নিশ্চল শান্তির অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কামকামী অর্থাৎ কাম্য বিষয়সকলের কামনা করা যাহার অভ্যাস, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ শান্তির অধিকারী নহেন। যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগ-পূর্বক মমতা, অহংভাব এবং স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তি লাভ করেন। হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি; ইহাকে পাইলে আর মোহ থাকে না, শেষ বয়সেও ইহাতে স্থিত হইলে ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করা যায়। (২।৭০-৭২)

বিক্ষোভিত ঊর্মির অবসানে নিস্তরঙ্গ মহোদধির যে অবস্থা, রজ্জুর জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান-জাত সর্পভ্রম নিরস্ত হইলে যে স্বরূপ-আনন্দ, সেই প্রপঞ্চোপশমই শান্তি। "স্বরূপাবস্থিত শুদ্ধ চিদাত্মস্বরূপ যে দ্রষ্টা তাহাতে বৃত্তিবিহীন, অর্থাৎ অকাম চিত্তের প্রশান্তবাহিতা-রূপ যে নিশ্চলতা তাহার নাম স্থিতি"—পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মনির্বাণ-শব্দটি অনেক জটিল কুতর্কের সূচনা করিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহা পরম

শূন্যতা, কেহ বা বলিয়াছেন ইহা নিরাস্বাদ। যাক্ এই 'ব্রহ্মনির্বাণ' ব্যাপারটি যে কাম-ত্যাগীকে দেওয়া হইল ইহার পুনরুক্তি না হইলে পাছে ভুলিয়া যাই বা সংশয় তবু উঁকি মারে সেই উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ (৫।২৬)

—যাহাদের কামক্রোধের উৎপত্তি হয় না সেই সংযতচিত্ত যত্নশীল সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবিত ও মৃত উভয় দশাতেই নিত্য মোক্ষ বর্তমান থাকে।

গীতার তিনটি ষট্‌কে এক একটি বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গুরুপ্রসাদরূপে 'তত্ত্বমসি'-বাক্যার্থ-অনুভবলাভেচ্ছু ব্যক্তির প্রথমে 'ত্বম্' (Vital Ego)-এর শুদ্ধি করিতে হয়। পরে বা সঙ্গে সঙ্গে 'তৎ' শুদ্ধ করিতে হয়। পরিশেষে মেঘাপগমে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের মত মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব (হারায় নাই, অথচ হারায় নাই যে বস্তু তৎসম্বন্ধে হারাইয়াছে-রূপ যে অজ্ঞান তাহা তিরোহিত হইলে শুধু 'নাই' এই ভ্রমাত্মক প্রতীতি-লোপে পুনঃপ্রাপ্তির অনুভূতির মত) আপনা হইতেই "তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি"—প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইহাই বিজ্ঞান (Science), এই অনুভবে কোনরূপ জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।

প্রথম ষট্‌কে অনর্থবহুল ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব-সমন্বিত জীবের গুরুমুখে 'ত্বম্' (=নিজ অনুভবে 'অহম্')য়ের শুদ্ধি। সেইজন্য সেখানে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রাধান্য। তার পরাকাষ্ঠা স্থিতপ্রজ্ঞত্বে। এই স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ করিতে হইলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত যে সুখ তাহা যে প্রকৃত সুখ নহে, সুখাভাস-মাত্র এবং তাহা স্থায়ী নহে এই বোধ হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্ররূপে যাহা নির্ণীত হইয়াছে সেই বিষয়গুলিই পরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। স্থিতধী হইতে হইলে বীতরাগভয়ক্রোধ হওয়া দরকার (২।৫৬); ইহারই আক্ষরিক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ৪।১০ শ্লোকে। সেখানে বীতরাগভয়ক্রোধ ব্যক্তির কি লাভ হয় তাহাই বলা হইয়াছে—তাঁহারা পুরুষোত্তম-ভাব প্রাপ্ত হন। মধ্যস্থলে তৃতীয় অধ্যায়ে কামক্রোধের স্বরূপ কি, তাহাদের উদ্ভব কিসে, তাহাদের কার্য কি, তাহাদের অধিষ্ঠান কোথায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে এই অনুজ্ঞা (command) এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা যায় তাহা নিরূপিত হইয়াছে। সেখানে পাওয়া যায়, এই কামক্রোধই মানুষের যত অনিষ্টের মূল, ইহারা অধিকাংশ সময় ভোক্তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পূর্ণ আবরিত করিয়া বিপরীত যুক্তিতে আস্থাবান করিয়া মনকে প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়পথে বিচরণ করিতে দিয়া আত্মনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। নিবিড়তম অবস্থায় ইহার মোহিনী শক্তি বুঝাই যায় না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইহাদের অধিষ্ঠানস্থল। শত্রুর অধিষ্ঠান জানাইবার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানেই শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিপতিত করিতে হইবে এবং বুদ্ধির অতীতে যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সত্তা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এই কামক্রোধকে বিনাশ করিতে হইবে। উপভোগের দ্বারা ইহার নাশ করা যায় না। স্মৃতি বলেন, ঘি দিয়া আগুনকে যেমন নিবান যায় না বরং ঘি দিলে আগুন বাড়িয়াই চলে, সেইরূপ কামকে উপভোগের দ্বারা নিবৃত্ত করা যায় না; উপভোগে কাম বাড়িয়াই চলে এবং নিত্যনূতন উৎসাহে নবনব কৌশল আবিষ্কার করিতে থাকে।

তাই ভগবান বজ্রনির্ঘোষে হুকুম দিতেছেন—
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ (৩।৪৩)

—হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্ম-স্বরূপকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা তুমি মনকে স্থির করিয়া সর্বপ্রকার পুরুষার্থের বিঘ্নস্বরূপ দুর্দমনীয় তৃষ্ণাত্মক সেই শত্রুর নিপাত করো। এখানে অনুজ্ঞা, ষোড়শ অধ্যায়ে বিধি। তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি এইরূপ অনুজ্ঞা দ্বারা শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। ঠাকুর বলিতেন, বৈদ্য তিনপ্রকার, গুরুও তিনপ্রকার। যিনি শুধু বিধি-নিষেধ প্রেস্‌ক্রিপশান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহা অপেক্ষা যিনি আদেশ করিবার দায়িত্ব নেন তিনি বেশী উপকারী। যাহা হউক শৈশবে অনুজ্ঞা উপকারী, পরিণত বয়সে বিধি। তখন বুদ্ধির permit পাওয়া গিয়াছে। উভয়তই সেই এক কথা—কামত্যাগ।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখান হইল কর্মকে কামত্যাগরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা দরকার। পঞ্চম অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই 'বিহায় কামান্' আদি সূত্রের বিস্তার। পঞ্চমের দুইটি শ্লোক ইতঃপূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। সেখানে, কামক্রোধ-উৎপত্তি-রহিত পুরুষের ইহজগতেই পরমার্থ লাভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নির্ধারিত করিয়া পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি সন্নিবেশিত হইল—

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ (৫।২৮)

পূর্বেই বলিয়াছি কাম ও ইচ্ছা একার্থবোধক শব্দ। তবে ইচ্ছাকে যদি স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে হয় তাহা হইলে বলিব যে, ইচ্ছা স্থূল বা মূর্ত বা ব্যক্ত, কাম সূক্ষ্ম, অনভিব্যক্ত। আকার ধারণ করিলেই ইহাকে ইচ্ছা বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা। ইহা কর্তার ঈপ্সিত শরীর ও মানসব্যাপার-রূপ কর্মই বটে। সেখানে দেখান হইল যে, যখন চিত্ত "নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ" (৬।১৮) তখনই 'যুক্ত' অবস্থা। পরে ৬।২৪ শ্লোকে বিস্তৃত উপদেশ—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ (৬।২৪)

ইহার পরে 'তৎ'-শুদ্ধি ষড়ধ্যায়ে 'বিভূতি-সম্পন্ন বিশ্বরূপ ভগবান বাসুদেব'-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেখানে ভক্তির প্রাধান্য। পরাকাষ্ঠা শুদ্ধভক্তভাবে। দ্বাদশ অধ্যায়স্থ 'অদ্বেষ্টা'দি লক্ষণগুলি সেই সৌভাগ্যবানের। মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে পরবর্তী ষট্‌কে যে গুণাতীতের কথা হইবে তাঁহার লক্ষণের অনুরূপ। অবশ্য ধ্যানযোগীরও উহাই লক্ষণ। যাহা হউক এই ষট্‌কে ভক্তির প্রাধান্য বলিয়া এখানে ভক্তি সকাম হইলে তাহা (অপেক্ষাকৃত) নিকৃষ্টতর, প্রকরণানুরোধে তদ্ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার আবশ্যক হয় নাই (৭।১৮)। তবু সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখিতেছি কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইলে ফল কিরূপে বিনাশীই থাকে। (৭।২০, ২৩) নবম অধ্যায়ে আমরা পাই কামকামীর গতাগতি নষ্ট হইতে পারে না। (৯.২১)

গুণাতীত ষট্‌কের মুকুটমণি হইতেছে পঞ্চদশ অধ্যায়। সেখানে পুরুষোত্তম। তিনি ক্ষরাতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম। ব্যাকরণোক্ত উত্তম পুরুষ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।১২।৩) ব্যতীত ইতি আর কে হইতে পারেন? এই পুরুষোত্তমই একাধারে অধিকৃত পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। সাংখ্য ও যোগদর্শনকে পরিত্যাগ করা হয় নাই। পূর্ণাঙ্গ করিয়া গ্রহণানন্তর বেদান্তানুমোদিত এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম গীতায়। এই পুরুষোত্তম-অনুভূতি তাঁহাদেরই হইতে পারিবে যাঁহারা বিনিবৃত্তকামাঃ—'জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি'-রূপ ত্রিবিধ অনাদিনিদ্রা হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইয়া পূর্ণ জাগরণে নিখিলদ্বৈতোপরাগ-বর্জিত পরমানন্দ আত্মচৈতন্যে অবস্থিত।

এইরূপ উপদেশ কেন? অনাদি অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মিকা মায়া (=প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪।১০) হইতে কাম উৎপন্ন। সেই কামই অবিদ্যা (অজ্ঞান)-প্রসূত নানাবিধ করণ-সাহায্যে কর্মের সৃষ্টি করে। কামজনিত কর্মে বন্ধন। তাহাই আত্মার বিনাশ।

দেখাইবার চেষ্টা করা হইল যে, কামত্যাগ যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসহ। দ্বিতীয়তঃ ইহা স্বানুভবসিদ্ধও বটে। বর্তমান অবস্থায় একটুখানি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেও অন্ততঃ কিঞ্চিৎপরিমাণ চিত্তপ্রসন্নতার পুলক পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ ইহা প্রমাণসিদ্ধও বটে। কঠোপনিষদ্-ভুক্ত (২।৩।২৪) এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদন্তর্গত (৪।৪।৭) সেই পরম ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রটি যাহা গীতার এই কামত্যাগ-সাধনের মূলভিত্তি তাহা কীর্তন করিয়া সমাপ্ত করি—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

সুতরাং পরম ঋষিদের এবং শঙ্করাদি আচার্যদের স্মরণ করিয়া পূর্ণাদ্বৈত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করি এবং ত্যাগী হইবার জন্য সচেষ্ট হই। নিজে না পারিয়া উঠিলে তিনিই সাহায্য করিবেন। তিনি যে করুণাময়। বলিতেছেন আমিই সমুদ্ধর্তা। (গীঃ ১২।৭)

শ্রাবণে

প্রণব ঘোষ

অন্ধকার মেঘে মেঘে শ্রাবণের মধ্যদিন শুরু।
মনের মর্মর সাথে মেশে তার গুরু গুরু গুরু ;
আলো ঝলে। বৃষ্টি পড়ে। বসে থাকি খোলা জানালায়।
দিক থেকে দিগন্তর মেঘমন্দ্রে মুছে দিয়ে যায়।
যেন কোন বন্দী দ্বীপে। চারিধারে অশ্রুর সাগর,
বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সারাদিন কথায় মুখর।
অন্তরে অনন্ত মৌন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিত।
বিস্মৃতির পার হ'তে শুনি কার সুদূর সঙ্গীত।
সুচির প্রতীক্ষা মনে, যেন তারি পদধ্বনি লাগি,
সে যে মোর চিরবন্ধু, আমি তার চির-অনুরাগী।

কর্ণচরিত্রের নিরপেক্ষ চিত্র

স্বামী সংস্বরূপানন্দ

বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যাহ্নে, বিশেষতঃ ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, আর্যশিক্ষা ও সভ্যতা বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মহাভারতের আদর্শ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। মহাভারত বলিতে আমরা ব্যাসপ্রণীত মহাভারতই গ্রহণ করিব, প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত মহাভারতগুলি লইব না। মহাভারতের আদর্শ বলিতে আমরা এতদিন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মুখপাত্র ভীষ্ম ও অর্জুনকেই বুঝিতাম। কিন্তু নানা বুদ্ধিতে আদর্শ নানা আকার ধারণ করে। যুগে যুগে আদর্শ বদলাইয়া যায়; সেইজন্ত কাব্যের নায়ক হইতে নায়কান্তরে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। এক যুগে মিল্টনের Paradise Lost-এর নায়ক সয়তান হইয়া উঠিল। কারণ কবি যে আদর্শ ও তাহা লাভ করিবার যে উপায় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বিপ্লবী যুগের সমালোচকদের অনেকের চক্ষুতে ফিকা বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা সংযমের স্নিগ্ধ ধীর গতির পরিবর্তে উচ্ছল চাঞ্চল্য চাহিয়াছিলেন। এইদিক দিয়া বিচার করিলে মিল্টনের God বা তাঁহার মুখপাত্র Son of God সত্যই 'ফিকা'। কিন্তু মহাভারতের চারিটি চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন ও কর্ণ—কেহই 'ফিকা' নহে। বরং প্রথম তিনটির প্রত্যেকটি সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে চতুর্থ অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। তথাপি যদি কর্ণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়, তবে বলিতে হইবে সহানুভূতিই ইহার কারণ। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি সহানুভূতি কেন হয় তাহা মনস্তাত্ত্বিকেরা বিচার করিয়াছেন।

কিন্তু দেশে যখন এইরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে, তখন এই ব্যাসসৃষ্ট কর্ণ-চরিত্রের উদ্‌ঘাটন অবশ্য কর্তব্য। নানা কারণে কর্ণের প্রতি আমরা সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। তাই মনের সমতা রক্ষা করিয়া এই গুরু বিষয়টির আলোচনা আবশ্যক।

কর্ণের মহত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সজাগ ছিলেন চারিজন—শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, নারদ ও যুধিষ্ঠির। তাই কর্ণচরিত্র আলোচনা করিবার পূর্বে ইঁহাদের অভিমত জানা বিশেষ প্রয়োজন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট হইতে সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিলে রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে আশা ও আশঙ্কায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া রুদ্ধবীর্য কর্ণ নিমীলিতনেত্র প্রশান্ত-বদন মহাবীরের পাদবন্দনা করিলেন ও আপনার পরিচয় দিয়া তাঁহার আশিস্ প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "কুরুপ্রবীর, যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হইত এবং আপনি যাহাকে সর্বদাই দ্বেষ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।" ভীষ্ম কর্ণকে পরমস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আমি সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমি কখনও দ্বেষ করি নাই। তুমি অযথা পাণ্ডবদের নিন্দা করিতে বলিয়া তোমার তেজোনাশের জন্ত তোমায় রূঢ় কথা বলিতাম। নীচের আশ্রয়, মাৎসর্য ও ধর্মলোপে জন্মবশতঃ তোমার এইরূপ গুণিবিদ্বেষী বুদ্ধি হইয়াছে।...

আমি তোমার দুর্বিষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠতা, দানশীলতা বিশেষ অবগত আছি।...তুমি শর ও অস্ত্রসন্ধান এবং লঘুহস্ততায় অর্জুন ও বাসুদেবের সমান। তুমি একাকী...সমুদায় রাজাকে বিমর্দিত করিয়াছিলে।[১]..." দ্রোণপর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়েও কর্ণ ও ভীষ্মের এই মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয়ে কর্ণ অর্জুনের গুণগ্রাহী।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের মহত্ত্ব দ্রোণপর্বের ১৮১তম অধ্যায়ে বর্ণন করিতেছেন, "হে অর্জুন, (কর্ণ কবচ) কুণ্ডল ও 'শক্তি'হীন হইলেও তুমি ভিন্ন আর কেহই উঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ইনি নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে রত, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতধারী, শত্রুদিগের প্রতিও দয়ালু। এই রণপণ্ডিত মহাবাহু শরাসন উদ্যত করিয়া মহাবীরগণকে মদহীন করেন ও তাঁহাদের সুদুর্দর্শনীয় হইয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করেন।"

দেবর্ষি নারদ শান্তিপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে এই ভাবে কর্ণের গুণ বর্ণন করিতেছেন, "মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। হোমধেনুবধের জন্য ব্রাহ্মণ ও মিথ্যাভাষণের জন্য ভার্গব কর্তৃক শাপপ্রদান, দেবরাজ কর্তৃক কবচকুণ্ডলহরণ, রথিগণনা-সময়ে ভীষ্ম কর্তৃক তাঁহাকে অর্ধরথ আখ্যান, অর্জুনের সহিত যুদ্ধের প্রাক্‌কালে শল্যের কটূক্তিতে তেজোহ্রাস—এইরূপ নানাভাবে দৈববিড়ম্বিত হওয়াতেই ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করিতে পারিয়াছেন। কর্ণ যদি কুন্তীর নিকট অর্জুন ব্যতীত অন্য ভ্রাতাদিগের প্রাণসংহার করিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি না দিতেন এবং ভীষ্মের যুদ্ধকালে সংগ্রাম হইতে বিরত না হইতেন, তবে পাণ্ডবদিগের জয়শ্রী লাভ হইত না।"

মহামতি যুধিষ্ঠির কর্ণ-সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে বেশ প্রকাশ পাইতেছে—"আমাদিগের প্রতি অমর্ষযুক্ত, সদা উদ্দৃপ্ত, সর্বাস্ত্রবিৎ, অধৃষ্য ও অভেদ্য কবচাবৃত মহারথ কর্ণ ধনুর্ধারিগণের অগ্রণী ও পুরুষসত্তম। তাঁহার হস্তলাঘবই চিন্তা করিয়া আমার নিদ্রা হয় না।"[২] পুনরায় শান্তিপর্বে তিনি বলিয়াছেন, "অযুতনাগতুল্য বলবান্, লোকে অপ্রতিরথ, সিংহবিক্রম, ধীমান্, দয়ালু, দাতা, যতব্রত, মানী, তীক্ষ্ণপরাক্রম, পরোৎকর্ষ-অসহিষ্ণু, ক্রোধদৃপ্ত, অতিশীঘ্র শস্ত্রক্ষেপণ-সমর্থ, চিত্রযোধী কর্ণ বহুরণে আমাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন।"[৩]

এই চারি ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের ধারণা মিথ্যা নহে। কর্ণ প্রকৃতই পুরুষপ্রবর। তথাপি আমরা মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার মাহাত্ম্য অপূর্ব হইলেও সেই চরিত্রে এমন কতকগুলি নীচজনোচিত দোষ আছে যেজন্য মানুষ কোনকালেই তাঁহাকে আদর্শস্থানীয় করিতে পারে না। কবিবর ব্যাস অর্জুনচরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কর্ণচরিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, নায়করূপে সমাজের শীর্ষস্থানে বসাইবার জন্য নহে। আমরা এখন কর্ণের ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ করিব।

যে সব গুণবশতঃ কর্ণ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তন্মধ্যে তাঁহার বীরত্বই শ্রেষ্ঠ। তাই প্রথমেই তাঁহার বীরত্বের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কৃতবিদ্য শিষ্যদিগের নিকট দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসাবে চাহিলেন, "দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমার নিকট বাঁধিয়া লইয়া আইস।" আদেশপ্রাপ্তি-মাত্র দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতিকে লইয়া দ্রুপদকে অবরোধ করিলেন। পাণ্ডবেরা গুরুর নিকট দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যখন এই যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ দুর্যোধনাদি

১ ৬।১২২ ;

২ ৩।৬৩।১৮-২০ ;　　৩ ১২।১।১৯-২।

উদ্ধৃতিগুলি মহাভারতের বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে গৃহীত।

বেশ নিগৃহীত হইলেন, তখন ভীমার্জুন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং অতি সত্বর দ্রুপদকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া গুরুর নিকট আনিলেন। এই সময় কর্ণ ভার্গবের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তখন তিনি সহজাত কবচকুণ্ডলধারী এবং অনভিশপ্ত।

বিরাটের গোহরণ-সময়ে কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই পূর্ণভাবে গৃহীতাস্ত্র। কর্ণের অবশ্য এখন কবচকুণ্ডল নাই; অর্জুনেরও নাই। অর্জুন একাকী, তাঁহার সারথি ভীত বালক বিরাটনন্দন। অপরদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিবিংশতি ইত্যাদি এবং বিপুল কুরুবাহিনী। প্রথম দ্বৈরথ যুদ্ধে একে একে সকলে অর্জুনহস্তে পরাজিত হইলেন; পরে দুইবার সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াও হতগর্ব হন।[৪] যুদ্ধকালে যে শেষ পর্যন্ত খাতির করা যায় না, তাহা অশ্বত্থামা দ্রোণপর্বে স্বীকার করেন।[৫] দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে কর্ণ ব্রাহ্মণরূপী অর্জুনের তেজোবীর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন।[৬]

এখানে কর্ণের পরাজয় ও পলায়নের এক ফিরিস্তি দেওয়া যাইতেছে। তিনি দুর্যোধনাদিকে ঘোষযাত্রায় প্ররোচিত করিলেন, কিন্তু গন্ধর্ব-যুদ্ধে আশ্রিত বন্ধুদিগকে বিপৎসাগরে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। আবার পাণ্ডবদের কৃপায় দুর্যোধন সস্ত্রীক সবান্ধব মুক্ত হইয়া যখন অধোবদনে রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন তখন কর্ণ কিরূপ নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে প্রবোধ দেন তাহা উৎসুক পাঠক মহাভারতে দেখিয়া লইবেন।[৭] সাত্যকি,[৮] অভিমন্যু[৯] এবং ভীম-[১০] হস্তে কর্ণ বার বার পরাজিত হইয়াছেন ও পলায়ন করিয়াছেন। অভিমন্যুর শরে তিনি এরূপ জর্জরিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেন, "যুদ্ধে থাকিতে হয় তাই আছি, নচেৎ থাকিবার মত অবস্থা আমার নাই।"[১১] ভীমের সহিত যুদ্ধেও তিনি ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।[১২] জয়দ্রথ-বধের দিন কর্ণ ভীমহস্তে সাতবার পরাজিত হন ও বহুবার পলায়ন করেন।[১৩] ভীম তাঁহাকে শ্লেষবাক্যে বিদ্ধ করেন নাই। কিন্তু বিরথ ও শস্ত্রবিহীন অবস্থায় কর্ণ তাঁহাকে যেরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন তাহা কোন বীরের মুখে শোভা পায় না। যিনি জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করেন সেই কর্ণ নিরস্ত্র ভীমকর্তৃক সর্বসমক্ষে মল্লযুদ্ধে আহূত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিলেন—এই সংবাদ যাঁহারা মহাভারত শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের অধিকাংশই জানেন না। এই সময় ভীম কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার সমক্ষে তাঁহারই সাহায্যে আগত ১৯ জন দুর্যোধন-ভ্রাতাদিগকে সংহার করেন। কর্ণ কি অবস্থায় নীত হইয়াছিলেন তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বলা হয় কর্ণ—ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে হত্যা করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় উহা করেন নাই। কথা মিথ্যা নয়। শেষোক্ত তিনজন অপেক্ষা যে কর্ণ বহুগুণে বড় যোদ্ধা

৪ ৪।৫৪।৩৪-৩৬, ৪।৬০।২২-২৭, ৪।৬৩।১-১৪, ও ৪।৬৬।১-১২

৫ ৭।১৫৮।৩

৬ ১৯৩।১৬-২২

৭ ৩।২৪৫-২৫০

৮ ৭।৩১।৬৮-৭১, ৭।১৪৫।৬২-৭১

৯ ৭।৩৯।১৫-৩৭, ৭।৪০।১-৯

১০ ৭।১২৭-১৩৭

১১ ৭।৪৭।২৪-২৫

১২ ৭।১৪৩।২৩-২৫

১৩ ৭।১২৭-১৩৭

—ইহা কেহই অস্বীকার করে না। পলায়নপর নিরস্ত্র ভীমকে কর্ণ বধ করিতে পারিতেন ইহাও স্বীকার্য; কিন্তু বিরথ, অস্ত্রহীন, পলায়নপর কর্ণকেও কি ভীম হত্যা করিতে পারিতেন না? অর্জুন কর্ণকে বধ করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহাই কর্ণের বর্মস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ভীমের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল—একথা ভুলিলে চলিবে না।

অর্জুনের সহিত কর্ণের বহুবার যুদ্ধ হয়—দ্বৈরথ ও অপরাপর মহারথীর সাহচর্যে। বিরাটের গোহরণকালীন যুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। জয়দ্রথবধের সময় কর্ণ—অশ্বত্থামা, দ্রোণ, কৃপ, বৃষসেন, শল্য, জয়দ্রথ, সৌমদত্তি ও শল এই আটজন মহারথের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করেন ও পরাজিত হন।[১৪] যে যুদ্ধে অর্জুন জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করেন, সেই সময়ে জয়দ্রথ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, বৃষসেন ও দুর্যোধন কর্তৃক রক্ষিত ছিলেন।[১৫] যে শেষ দ্বৈরথ-সমরে কর্ণ নিহত হন, তাহাতেও কর্ণ অর্জুনকে সাতবার অতিক্রম করেন এবং অর্জুন কর্ণকে দশবার অতিক্রম করিয়া একাদশবারে হত্যা করেন। মহাভারতে লেখা আছে যে, শাপবশতঃ কর্ণ দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ ভুলিয়া যান; আমরা এই কথাই মনে রাখিয়াছি। কিন্তু ইহা যে কতটা সত্য তাহা জানিতে হইলে কর্ণপর্বের একনবতিতম অধ্যায় ভাল করিয়া পাঠ করিতে হয়।[১৬] হাঁ, একথা সত্য যে পৃথিবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেন। কিন্তু কর্ণ ভূমিস্থ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন, করিলেন না কেন? জয়দ্রথবধের দিন যখন শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত অশ্বগুলিকে জলপান ও বিশ্রাম করাইতেছিলেন, তখন কিন্তু অর্জুন ভূমিতে দাঁড়াইয়া একাকী অতগুলি মহারথ ও সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ নিজেকে, শ্রীকৃষ্ণকে ও অশ্বগুলিকে রক্ষা ও শত্রুসৈন্য সংহার করিয়াছিলেন। শেষ কর্ণার্জুন-যুদ্ধে অর্জুন একবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। অর্জুন ইহা নিজে সানন্দে স্বীকার করেন। কিন্তু এখানেও একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। কর্ণের এই শরটি বিষযুক্ত[১৭] আবার তাহাতে (অবশ্য কর্ণের অজ্ঞাতসারে) মহানাগ অশ্বসেন প্রবেশ করিয়া তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই—বিষলিপ্ত বাণ সমরে প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। অর্জুনের নিকট অমোঘ অস্ত্র বহু ছিল, তিনি তাহাদের প্রয়োগও ভুলিয়া যান নাই। তথাপি তিনি আর্জব যুদ্ধই করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। সকলেই জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হওয়ার পূর্বে অর্জুনকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করেন নাই। তিনি সারথি ও বন্ধুর কর্তব্যই করিয়াছেন। অর্জুন কিন্তু তাঁহাকে উহা করিতে বলেন নাই; বরং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বেই কর্ণসমীপে রথ লইয়া যাইতে বলেন। ইহার পূর্বে অর্জুন যে কতটা ক্লান্ত হইয়াছিলেন তাহা আমাদের অনেকের জানা নাই। সেদিন তিনি কর্ণবধ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবেন এই চিন্তায় উৎসাহিত ও বে-পরোয়া হইয়া বহুরথী ও সৈন্যের সহিত, বিশেষ করিয়া নারায়ণী সেনা ও সংসপ্তকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এরূপ শ্রান্ত হইয়াছিলেন যে সুশর্মা তাঁহাকে একবার নিশ্চেষ্ট[১৮] ও অশ্বত্থামা আর একবার তাঁহাকে বিপন্ন[১৯] করেন। দুর্যোধন অর্জুনের এই ক্লান্তির বিষয়

১৪ ৭।১০৩।১০-২৪, ৭।১৪৩।৪৯-৯৪

১৫ ৭।১৪৪।৪৮-৫৪, ৮৭-৯৫, ১১১-১১৯

১৬ ৮।৯১।২১-২৮

১৭ ৮,৪০।৬-৯

১৮ ৮।৫৩।৩২-৩৪　১৯ ৮।৫৬।১২৪-৩২

জানিতেন।[২০] ইহা সত্ত্বেও কর্ণ—দুর্যোধন, কৃপ, ভোজ, সানুজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ-পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহী-দিগকে বলিলেন যে তাঁহারা অগ্রবর্তী হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন এবং পরে অর্জুন ক্ষতবিক্ষত হইলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন।[২১] কর্ণ এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন; এইরূপ যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন করা সেনাপতির কর্তব্য, অন্যায় নহে। তথাপি এই দুই মহারথের বিভিন্ন মনোভাব তাঁহাদের তারতম্য নির্দেশ করিতেছে। অবশ্য যুদ্ধকালে কেহই ক্লান্তিপ্রদর্শন করেন নাই।

বর্তমান কালে এইরূপ যুদ্ধ ও যোদ্ধার শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপনের কোন মূল্যই নাই। তথাপি এত কথা বলিবার সার্থকতা এই যে, অর্জুন হিন্দুজাতির প্রাণের দেবতা। সর্বজ্ঞ 'নারায়ণ' অপেক্ষা এই অল্পজ্ঞ স্বচরিত্রমহিমায় জাগরূক অথচ পরম বিনয়ী 'নরের' প্রতি, আধুনিক ভাবধারার অনুসরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা আপনা হইতেই ছুটিয়া যায়। তাই সত্যকে পাশ কাটাইয়া ইঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে এই সত্যোদ্‌ঘাটন শুধু প্রয়োজন নয়, কর্তব্য।

এখন আমরা কর্ণচরিত্রের অন্যান্য দোষগুণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। বীরত্বের পরই কর্ণের দানশীলতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ দানবীর পৌরাণিক রাজ্যেও বিরল দেখা যায়। মহাভারতের কর্ণ কিন্তু আমাদের সুপরিচিত দাতাকর্ণ নহেন, যিনি স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া করাত দ্বারা পুত্রকে কাটিয়া সেই মাংসে ব্রাহ্মণভোজন করান। মহাভারতের কর্ণ যে যাহা চাহিতেন তাঁহাকে তাহা দিতেন; এবং এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া ইন্দ্রকে তাঁহার সহজাত কবচকুণ্ডল দান করেন—এই জন্য তিনি দাতাকর্ণ আখ্যা লাভ করেন। স্বীয় পুত্রকে বলিদান দেওয়ার চটক ইহাতে না থাকিলেও এরূপ ব্রত উদ্‌যাপন করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এখানেও দুইটি বিষয় জ্ঞাতব্য আছে—তিনি কেন এই দুঃসাধ্য ব্রত ধারণ করেন এবং স্বার্থশূন্য হইয়া কবচকুণ্ডল দান করিয়াছিলেন কি না। ব্রতটি মহান্ ও উদার হইলেও উহা ধারণ করিবার উদ্দেশ্য নীচ; কারণ অর্জুনকে বধ করিবার জন্যই তিনি উহা গ্রহণ করেন। ইহা দানব্রত নয়। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন না তিনি অর্জুনকে সমরে বধ করিতেছেন ততদিন তিনি পা ধুইবেন না, মদ্য-মাংস খাইবেন না, যাচককে ফিরাইবেন না।[২২] ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল যে তিনি দিয়াছিলেন তাহা সূর্যের নির্দেশে একবীরঘাতী অমোঘ 'ঐন্দ্রশক্তি'র বিনিময়ে। এই দানে তাঁহার অর্জুনবধরূপ আসল উদ্দেশ্য অব্যাহতই ছিল—অন্ততঃ তিনি তাহা মনে করিয়াই দিয়াছিলেন। কাজেই কর্ণের দানশীলতা ঔদার্যে ও মহত্ত্বে খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না।

মহত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এক অতি ঘৃণিত নীচতা ও নীচাশয়তা কর্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুরুক্ষেত্রে যে ভারত নিঃক্ষত্রিয় হইল—ইহার জন্য শকুনি অপেক্ষা কর্ণ দায়ী। যত কুপরামর্শ দুর্যোধনকে ধ্বংসের দিকে লইয়া গিয়াছিল সেই সকলের মূল কর্ণ। যেখানে তিনি উদ্ভাবয়িতা নন সেখানেও তিনি উৎসাহবাক্য ও কর্মদ্বারা পরি-পোষক। জতুগৃহ-নির্মাণ, অক্ষদ্যূতক্রীড়া, ঘোষ-যাত্রা, দুর্বাসাকে অসময়ে দ্রৌপদীর আতিথ্য-গ্রহণে প্ররোচিত করা, সর্বোপরি সভায় নীতা দ্রৌপদীর প্রতি দুর্ব্যবহার—সবগুলির মূলে কর্ণের এই নীচাশয়তা। দ্রৌপদীকে বারস্ত্রী বলা[২৩],

২০ ৮।৮৮।৩৩ ২১ ৮।৭৯।৫২-৬১ ২২ ৩।২৫৬।১৬-১৮ ২৩ ২।৬৮।১-৩৭

একবস্ত্রা দ্রৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর বলিয়া দুঃশাসনকে তাঁহার বস্ত্রহরণ করিতে প্ররোচিত করা,[২৪] দ্রৌপদীকে অন্যপতি বরণ করিতে বলা,[২৫] দুর্যোধন উরু দেখাইলে কর্ণের উচ্চহাস্য করা,[২৬] ইত্যাদি কার্য যে কোন মহান্ ব্যক্তিতে সম্ভব হয়, ইহা ধারণা করা কঠিন। দ্রৌপদী স্বয়ংবর-সভায় "সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না" বলিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার প্রতি অসহায় অবস্থায় এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও মহানের পক্ষে বড়ই অশোভন ও গর্হিত এবং সর্বতোভাবে সমর্থনের অযোগ্য।

যোদ্ধা হিসাবে কর্ণের স্থান ভীষ্ম অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অর্জুনের সমকক্ষ করিয়া ব্যাসদেব ইঁহাকে সৃজন করিয়াছেন—ইহা সার্থক। কিন্তু কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যতবার পলায়ন করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ মহারথদের মধ্যে অতবার আর কেহই করেন নাই। ইহা তাঁহার সহজাত গুণ। যখন তিনি কবচকুণ্ডল দান করেন নাই এবং অভিশপ্তও হন নাই, তখনও তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নিজে পরামর্শ দিয়া এবং রক্ষক সাজিয়া দুর্যোধনাদিকে ঘোষযাত্রায় লইয়া গিয়া সস্ত্রীক তাঁহাদিগকে গন্ধর্ব-হস্তে ফেলিয়া কর্ণ পলায়ন করিলেন—ইহা আমাদের ঘৃণার উদ্রেক করে।

কর্ণ-চরিত্রের আর একটি মহাদোষ তাঁহার গুরুভক্তির অভাব। ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজে গুরুভক্তি সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া আছে। যাঁহার নিকট কোন বিদ্যা গ্রহণ করা হয়, তাঁহার নিকট মানুষ আপনা হইতেই কৃতজ্ঞ হয়—ইহা শিখাইবার দরকার হয় না। দ্রোণের প্রতি কর্ণের ব্যবহারে ইহা কোনদিনই প্রকাশ পায় নাই। দ্রোণ যে দক্ষিণা চাহিবেন তাহা শিষ্যদিগের নিকট অব্যক্ত রাখিয়া তাহাদের প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন। কর্ণও শিষ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু অর্জুন ব্যতীত আর কেহই সে প্রতিশ্রুতি দেন নাই। দ্রোণ প্রথম হইতেই অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত করেন নাই। প্রথমে অশ্বত্থামাকেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি মেধাবী শ্রমতৎপর অর্জুন যাহাতে অশ্বত্থামাকে অতিক্রম করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুন গুরুশুশ্রূষা ও অধ্যবসায়-গুণে গুরুর প্রিয় হইয়া উঠেন। ইহা কর্ণও করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। অর্জুন অশ্বত্থামাকে কোনদিনই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন নাই, চিরকাল গুরুপুত্রকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। কর্ণ দ্রোণের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন; দ্রোণ উহা শিখাইলেন না। ইহার কারণ কর্ণের সূতকুলে জন্ম বা দ্রোণের অর্জুনপ্রীতিই নহে। যে বিনয়, আত্মসংযম ও শ্রদ্ধা থাকিলে মানুষ এই পরমাস্ত্রের গ্রাহক হইতে পারে তাহার অভাব থাকায় কর্ণ উহা লাভ করিতে পারেন নাই। হাঁ, ইহা সত্য যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলে কর্ণ অর্জুনকে নিগ্রহ করিবেন—দ্রোণের এই আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ নহে। দ্রোণ নিজ প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকেও প্রথমে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দান করিতে অস্বীকার করেন—এখানেও আত্মসংযমের অভাবই কারণ বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলেন না বলিয়াই যে যাঁহাদের নিকট অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হইবে বা দ্বেষবুদ্ধি আসিয়া

২৪ ২।৬৪।৩৮ ২৫ ২।৭১।৩ ২৬ ২।৭১।১০-১২ ২৭ ৫।১৪১ ; ৭।৩

হাজির হইবে—ইহা মহত্বের লক্ষণ নয়। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে দ্রোণকে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গালি দেন নাই যদিও আচার্যের অর্জুনপ্রীতির জন্য তাঁহার প্রতি কোনদিনই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। দ্রোণের সামর্থ্য-সম্বন্ধেও কর্ণ কথনও উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নাই। কর্ণ তাঁহার অপর গুরু পরশুরামের প্রতি অবশ্য ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। এদিকে অর্জুন সারা জীবন কৃপ, দ্রোণ, ইত্যাদি সকল গুরুর প্রতি এমন কি গুরুপুত্রাদির প্রতি, নির্বিশেষে অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাই সময় সময় কর্ণে অদ্ভুত মহত্ব প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন এবং একাকী শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সহিত যখন তিনি সাক্ষাৎ করিতেছেন, তখন কর্ণের মহত্বের উদ্বোধনে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু ইহা জলধরে প্রকাশিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে—বিস্ময়কে বাক্যে রূপ দিবার অবকাশ দিতেছে না। সয়তানেও ক্ষণিক মহত্বের প্রকাশ হয়; কিন্তু এই প্রকাশ অন্ধতমঃকেই প্রকাশ করে। তাই সে মহত্ব প্রশংসনীয় নহে। ধ্বংসপথের যাত্রীরা ইহাকে প্রশংসা করে। ফলে নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অপরকেও বিনাশ করে। এজন্য কর্ণকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না।

কর্ণ যে শুধু প্রশংসার অযোগ্য তাহা নহে, তিনি আমাদের সহানুভূতিরও পাত্র নহেন। যিনি দুঃখভোগ করিবার অযোগ্য তিনি যদি দুঃখভোগ করেন তবেই তিনি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। কর্ণ জীবনে কোন দুঃখভোগ করিয়াছিলেন কি? কুন্তী ও সূর্য যে তাঁহার মাতা ও পিতা তাহা তিনি কুরুক্ষেত্র-সমরের প্রাক্‌কালে জানিতে পারেন এবং সেইদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী ও সূর্য—এই তিনজনেই তাঁহাকে পাণ্ডবপক্ষে আসিয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে আহ্বান করেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন; ইহা তাঁহার মহত্ত্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি মহাশয়তা-প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য করেন তাহা তাঁহার ক্ষোভ বা দুঃখের কারণ হয় না। আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ণের উৎসাহ, সাহস ও কর্মতৎপরতা ইহার পর সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্ম-পরিচয় লাভ করিবার পূর্বেও তিনি নিজকে দৈববিড়ম্বিত মনে করিতেন না—সূতপুত্ররূপেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন। রাজপুত্রগণের সহিত তিনি দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন এবং নিজকে অর্জুনের সমকক্ষ জ্ঞান করেন। দ্রোণের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র-লাভে অকৃতকার্য হইলেও তিনি পরশুরামের নিকট গমন করেন ও দিব্য, মানুষাদি সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য হন। অতএব এখানেও তাঁহার দুঃখের কারণ কিছু দেখা যায় না। তিনি যে দুই শাপে অভিশপ্ত হন তাহাও তাঁহার চরম যুদ্ধের সময় ঘটিবার কথা। অতএব ইহার জন্য কোন বীর সারা জীবন হা-হুতাশ করেন না—তাঁহাকেও করিতে দেখা যায় না। তাহার পর ইহাও দ্রষ্টব্য যে, রাজকুমারদিগের যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার রঙ্গমঞ্চে আগমন করিয়া নিজের অস্ত্রপ্রয়োগ-চাতুর্য দেখাইবার অব্যবহিত পর হইতেই তিনি দুর্যোধনের পরম সুহৃদ্ হইয়া অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত ও পৃথিবীর যাবতীয় ভোগসুখের অধীশ্বর হন। দুর্যোধনের প্রীতির জন্য তিনি সারা ভারতের বীর-মণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া পরম যশস্বী হন। কাজেই আমরা দেখিতে পাই—কি যশে, কি

ধন ও পদমর্যাদায়—কোন বিষয়েই তাঁহার ন্যূনতা ছিল না। এদিকে পাণ্ডবেরা সর্বগুণের আধার হইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছেন। অথচ আমরা দেখি কর্ণ ঈর্ষায় জর্জরিত, ক্রূরতায় আশীবিষসদৃশ এবং পাণ্ডবগণ মহিমা ও গরিমায় প্রোজ্জ্বল। কর্ণ-চরিত্রে এই দোষের জন্য কর্ণ নিজেই দায়ী। দৈববিড়ম্বিত বলিয়া তাঁহার নিজের বোধ ছিল না। আমরাও বিচারশীল হইলে তাঁহার জীবনকে বিড়ম্বিত বলিতে পারি না—বরং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনই সমধিক জয়যুক্ত। একজন সূতপুত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের একমাত্র ভরসাস্থল ও পরমবন্ধু হইয়া ইহলোকের যাবতীয় অভ্যুদয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন—এরূপ ব্যক্তির প্রতি আমরা আর যাহা কিছু দেখাই না কেন, (আমরা যে অর্থে সহানুভূতি শব্দটি প্রয়োগ করি সেই অর্থে) সহানুভূতি দেখাইতে পারি না।

কর্ণ-চরিত্রের এই দুর্ধর্ষ দোষের জন্য দায়ী কে? সমাজ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিল, অতএব সমাজ দায়ী নয়। এই পুরুষসিংহে পুরুষকারের অভাব ছিল না। বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের কেহ কেহ স্মিতমুখে বলিবেন, তাঁহার জন্মের অবৈধতা; ভীষ্মও উহাকে অন্যতম কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাও কিন্তু যথার্থ কারণ নয়। ইহা কৌন্তেয়কে রাধেয় করিয়াছিল মাত্র—তাঁহার চরিত্রে কুঠারোপণ করিতে পারে নাই। কারণ তৎকালীন সমাজে ইহা দূষ্য বিবেচিত হইলেও দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, এমন কি তাঁহার গর্ভজাত বৈধ পুত্রত্রয়—কেহই এজন্য কুন্তীর ও তাঁহার কানীন পুত্র কর্ণের প্রতি রুষ্ট হন নাই। কর্ণ নিজেও মাতৃচরিত্রের প্রতি দোষারোপ করেন নাই; কেবল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-সংস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন—এজন্য ধিক্কার দিয়াছিলেন। তবে দায়িত্ব কোথায়? কর্ণের দম্ভ ও অহংকারে। এই দম্ভাহংকার যাবতীয় আসুরগুণের উৎসস্বরূপ—ইহা আর্য-সভ্যতার গোড়ার কথা। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যাহাকে Personality বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া প্রশংসা করে আর্য-সভ্যতা তাহাকেই সকল অনর্থের মূল, সকলের আগে ত্যাজ্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছে। এই দম্ভ ও অহংকারের বশবর্তী হইয়া তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন—কাহাকেও তাঁহাদের মাহাত্ম্যানুযায়ী সম্মান দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন, অপরের মহত্ত্ব দেখিয়া ঈর্ষায় জর্জরিত হইতেন, এবং জামদগ্ন্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়নির্মূলতা-সাধন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। এই দোষে অভিভূত হইয়াই তিনি তাঁহার দেবজন্ম দৈবীশক্তি, অপূর্ব পুরুষকার, প্রভৃতিকে তিলাঞ্জলি দিয়া আসুরধর্মী হইয়া উঠেন। এই জন্যই কথিত হয় তাঁহাতে নরকাসুরের আত্মা প্রবেশ করে।[২৮] অর্জুনের অহংকার যে ছিল না তাহা নহে। তবে ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সহিত জড়িত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকৃপায় অপনীত হয় এবং তখনই গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবধারণ সার্থক হয়। যিনি যত impersonal বা ঈশময় হইতে পরিয়াছেন, আর্যধর্মে তাঁহার স্থান তত উচ্চে। ব্যাসের যাবতীয় গ্রন্থের—শুধু মহাভারতের নয়—ইহাই প্রতিপাদ্য। উপনিষদের যুগ হইতে অদ্যাবধি ইহাই আর্যধর্মৈকলক্ষ্য। তাই কর্ণদুর্যোধনাদির প্রশংসায় মুখর হইবার পূর্বে এই ভারত-ধর্ম, যাহা সনাতন ও সার্বজনীন ধর্ম, যাহা শাশ্বত, শিব ও সুন্দর, তাহা প্রণিধান করা আমাদের কর্তব্য।

২৮ ৩।২৫১।২০-২১

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতীয় সংস্কৃতি মিশন তাঁহাদের চীনদেশের পরিভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। মিশনের একাধিক প্রতিনিধি নূতন চীন-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। একজন বলিয়াছেন তিনি চীনে তিনপ্রকার 'না' দেখিয়াছেন, যথা—তথায় (১) বেকার নাই (২) ভিক্ষুক নাই এবং (৩) কোন দুর্নীতি নাই। আর একজন সভ্যের উক্তি—মানুষের মর্যাদা মানুষ সেখানে পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উচ্চ-নীচের প্রভেদ দূরীভূত হইয়া নূতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। চীনের জনসাধারণের মনে এক নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। বিপুল উৎসাহ লইয়া তাহারা চীনকে নূতন করিয়া গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি বিরাট দেশে এইরূপ ব্যাপক জাগরণ এবং উন্নতি উপকথার ন্যায় শুনাইলেও আমাদের প্রতিনিধিদের নিজের চোখে দেখিয়া আসা সত্যকে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভারতও স্বাধীন হইয়াছে—কিন্তু স্বাধীনতার আলো এখনও আমাদের জনগণের জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করে নাই। পরিবর্তে এখানে সর্বত্র দেখা যাইতেছে দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা, নিরাশা। গভীর বেদনায় প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হইল? চীন যাহা পারিতেছে আমরা তাহা পারি না কেন? সংস্কৃতি-মিশনের একজন সভ্য ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—চীনের ভূমিব্যবস্থার সংস্কারই চীনাদের এই অভূতপূর্ব প্রেরণার প্রধান কারণ। এই উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা চলে না—কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেশাত্মবোধের দিক দিয়া বর্তমান চীনবাসী এবং ভারতবাসীদের মধ্যে একটা গভীর পার্থক্য রহিয়াছে এবং অনেকটা এই পার্থক্যের দরুনই চীন যাহা সংসাধন করিতেছে আমরা তাহা পারিতেছি না। চীন-প্রত্যাগত আর একজন প্রতিনিধির কথাতেই উহা ব্যক্ত করি—

কেহ আজ আর সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবে না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থই আজ তাহাদের নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা নিজেদের সম্বন্ধে বুকে হাত দিয়া একথা বলিতে পারি কি? তাহা যদি পারিতাম তাহা হইলে বোধ করি, স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যে জটিল এবং ব্যাপক দুর্গতি আজ সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার অনেকটা অবসান ঘটিত। স্বামী বিবেকানন্দ যে আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন—আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দেশ-মাতৃকাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন—সে কথা কি আমরা পালন করিতেছি? দেশমাতৃকা অপেক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত মত ও স্বার্থই কি অনেকক্ষেত্রে বড় হইয়া পড়িতেছে না?

* * *

সংস্কৃতি-মিশনের জনৈক মহিলা প্রতিনিধি তাঁহার অভিজ্ঞতাবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন বর্তমান চীনে নারী ও পুরুষের পার্থক্য-বিলোপের কথা বলিতেছিলেন তখন শ্রোতৃবৃন্দের অনেকে (বা সকলেই কি না ঠিক জানা নাই) উচ্চ করতালি দ্বারা হর্ষ-প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও অপর একজন সভ্যের উক্তি হইতে জানিতে পারি—"চীনে নারী আজ পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিলেও তাহারা শালীনতা বিসর্জন দেয় নাই;

তাহাদের নৈতিক মান অতি উচ্চ ধরনের।"—তবুও আমরা উক্ত শ্রোতৃবৃন্দের সহিত করধ্বনি তুলিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীর কথা মনে হয়: "গাড়িটার ঘোড়াও চলছে, সারথিও চলছে, যাত্রীরাও চলছে, গাড়ির জোড় খুলে গিয়ে তার অংশ প্রত্যংশগুলোও চলেছে, একে তো চলা বলে না; এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা।" মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অগ্রগতিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই মনীষা, উদ্যম এবং পরিশ্রম সমানভাবে প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এবং কর্মপ্রণালী সর্বাংশে এক হওয়া বাঞ্ছনীয় কি? সমাজের সুসংহতির জন্য নারীর কতকগুলি বিশিষ্ট অবদান আছে—নারী যদি সেগুলি অবহেলা করিয়া ও "পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলা"-টাকেই বড় বলিয়া মনে করে এবং পুরুষও যদি তাহাই চায় তাহা হইলে সমাজজীবনের সামঞ্জস্য ও সংহতি ব্যাহত হইবে না কি?

* * *

স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীজাতির উন্নতির জন্য প্রাণের নিবিড় আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ স্বামী বিবেকানন্দের যতটা ছিল, বোধ করি কম লোকেই তাহা দেখা যায়। সেই স্বামীজীকেই কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলিতে শুনা গিয়াছিল—"এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইত না—ঠিক যেন পুরুষমানুষ! গাড়ী চালায়, অফিসে যায় স্কুলে যায়, প্রফেসারী করে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়।"

ইহা প্রায় ৫৪ বৎসর পূর্বেকার কথা। আজ অর্ধশতাব্দী পরে সমাজের অবস্থার বহুতর পরিবর্তন হইয়াছে। নারীপ্রগতির মধ্যে যে জিনিষগুলি স্বামীজীর বিসদৃশ মনে হইয়াছিল তাহা আজ পাশ্চাত্ত্যে তো বটেই, ভারতেও প্রায় সকলেরই কাছে প্রতিদিনকার মানিয়া-লওয়া ঘটনা। আমাদের দেশে আজ মেয়েরা গাড়ী চালান, শিক্ষকতা করেন, অফিসে যান, তাহা ছাড়াও আরও কতপ্রকার 'পুরুষের কাজ' করেন—ইহা দেখিয়া কেহই আজ মর্মপীড়িত হন না এবং বোধ করি স্বামীজীও আজ বাঁচিয়া থাকিলে কালের এই দুর্নিবার গতিকে সহজ ভাবেই মানিয়া লইতেন। কিন্তু কথা এই—আর কত দূর? ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতির পরম সৌভাগ্য যে, এখনও আমাদের মাতা, ভগিনী, কন্যাগণ—এই ব্যাপক 'পুরুষা-ভিমুখ' প্রগতির প্লাবনের মধ্যেও ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য চরিত্রে বহুলাংশে বজায় রাখিতে পারিয়াছেন এবং পারিতেছেন। কিন্তু প্রগতি যদি ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া চলে তাহা হইলে এই বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে কি? পুরুষের সহিত "সমান তালে পা ফেলিয়া চলা"র একটা মাত্রা রাখার প্রয়োজন নাই কি? ভারতীয় নারীর "চোখ জুড়াইয়া যাওয়া" যে দিকগুলির কথা স্বামীজী উল্লেখ করিয়াছেন সেইগুলির মূল্য ও মর্যাদা আমরা পুরুষ ও নারীর সাম্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া হাততালি দিবার সময় যেন ভুলিয়া না যাই।

* * *

সহযোগী 'বসুমতী' বলিয়াছেন (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯)—"কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী নেতৃত্বের আজ প্রকৃত কর্মক্ষেত্র পরিষদে ও লোকসভায় নহে, যেখানে দুর্গত নিঃস্ব স্বাস্থ্য-শিক্ষাহীন জাতি লক্ষ লক্ষ গ্রামে অন্তিম শ্বাস ছাড়িতে উদ্যত, সেই

শ্মশানেই তাঁহাদের প্রকৃত স্থান। এই স্বায়ত্ত-শাসনে অনভ্যস্ত দুর্গত নিঃস্ব জাতিকে হাতে ধরিয়া শিখাইতে হইবে, কি করিয়া পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিয়া তাহারা নিজেদের জীবন নিজেরা গুছাইয়া লইতে পারে। ভবিষ্যতের প্রকৃত নেতার স্থান আজ অন্নবস্ত্রহারা দেশবাসীর মধ্যে।"

সহযোগীর এই কথাগুলি আমাদের খুব ভাল লাগিল। উপায় লইয়া মারামারি না করিয়া দেশকর্মিগণের দেশের সেবায় প্রত্যক্ষ ভাবে লাগিয়া যাওয়াটাই আশু প্রয়োজনীয়। রাজনীতির পরিধির বাহিরেও জনসেবা করিবার বহুতর ক্ষেত্র নাই কি? এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্রের কথা মনে পড়িল। গুরুপূজা ছাড়িয়া দিলে "অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা" স্বামীজী-প্রবর্তিত দেশসেবা-কার্যে সহায়তা করিতে পারেন এই মতকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছিলেন—"যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি। তবে মানুষ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হইতে চলিলাম। * * * আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন, সেইটি মনে পড়িল—

'মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।'

* * * বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করিয়া দিল? এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যাহার বেগে পাহাড়-পর্বত যেন ভাসিয়া যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরাইয়া দিল! বলি ওই রকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন বা, ও রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? * * * তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাকসিঁটকান?"

* * *

পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ যখন প্রাচ্যসভ্যতার প্রশংসা করেন অনেক সময়েই তাঁহাদের গুণ-গ্রাহিতার সহিত একটি মাতব্বরী ভাব মিশিয়া থাকে। নিজেদের প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যবোধ এবং অহঙ্কারই ইহার কারণ। প্রাচ্যসভ্যতাকে যথাযথ বুঝিবার পক্ষে ঐরূপ মাতব্বরী যে একটি বৃহৎ অন্তরায়—সুখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ্রপ্ মে মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"আমাদের (আমেরিকা-বাসীর) কর্তব্য ইসলাম, কনফুসীয়, তাও, হিন্দু এবং বৌদ্ধ এশিয়ার নবজাগরণের সহিত উপর উপর মাত্র একটা প্রাথমিক সম্পর্ক না রাখিয়া একটি স্থায়ী নীতি হিসাবে অকপট ভাবে উহাতে তাদাত্ম্য-বোধ। এশিয়াবাসীকে তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবার উপদেশ দিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—আমরা যেন বলিতে পারি যে, প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি।"

'নীতিকথা'

অধ্যাপক শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিকথার বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়। তাহার কারণ বোধ হয় সে সময় রসিক-মনোহরণ অপেক্ষা লোক-মনোরঞ্জনই সে সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রাচীন প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের প্রাচুর্য সাহিত্যের অঙ্গে জনসাধারণের হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। এই ধরনের লোককথা সৎসাহিত্যের বিষয় নয়, লোক-সাহিত্যেই তাহাদের অধিকাংশের স্থান হওয়া উচিত, জনসমাদরের ফলেই সৎসাহিত্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার হইয়াছে। অর্বাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য হইতেই আবার অনেক বাংলা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, এই শ্রেণীর সাহিত্যও প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্যই রচিত বলিয়া মনে হয়। ('প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতি-সাহিত্যের উপদেশ-সম্বলিত শ্লোকগুলিই এইভাবে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। চলিত গল্পগুলি যেন শ্লোকের উপদেশের ব্যাখ্যারূপেই বিবৃত। ইংরেজী এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় রচিত Aesop's Fables প্রভৃতির গল্পও এই প্রথায় রচিত। নীতিকথা সরাসরি বলিলে অনেক সময় লোকে অর্থ নাও ধরিতে পারে, নীতিকথা না শুনিলে কি ভাবে হাতে হাতে ফল ফলে সেই কথাই বিস্তারিত ভাবে বলাই যেন উদ্দেশ্য। প্রবাদরূপে ইহাদের উৎস সন্ধান এবং ব্যবহার-সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া সে বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না।

এই নীতিকথাগুলি দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে সাধারণের বিশেষ পরিচিত ছিল; কথাবার্তা এবং আলাপ-আলোচনায় সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি যে অশিক্ষিত লোকও করিতে পারিত, তাহা এই সংস্কৃত প্রবাদ-বাক্যাংশই প্রমাণ করে।

আদর্শ জীবনযাত্রার সঙ্কেত এইগুলি বহন করিতেছে। কোন্‌ সময়ে কি করা উচিত, বন্ধুকে চিনিতে হইলে কোন্‌ পথ লইতে হইবে, পারিবারিক শান্তি কিসে ব্যাঘাত-প্রাপ্ত হয়, কাহার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হয় প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদেশ-অনুশীলন এইগুলি প্রচার করিতেছে। ধর্মের সঙ্গে এইগুলির ঘনিষ্ঠযোগ আছে। আমাদের হিন্দুধর্মের অনুশাসন প্রভৃতি দেবভাষায় রচিত, যাহা কিছু সংস্কৃতে কথিত হইবে তাহাই অপেক্ষাকৃত পবিত্র উক্তি, তাহাই ধর্মের পুণ্যবারির দ্বারা মার্জিত বলিয়া গণ্য হয়। এই উপদেশগুলি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় সেই সুবিধাটি লাভ করিয়াছে। বাংলা প্রবাদ-গুলি যতখানি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে ইহারা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি শ্রদ্ধাভরে শ্রুত হয়। শ্রোতারা এইগুলির অন্তর্নিহিত ভাব যতটা না বুঝুক, অনেকখানি অজানিতেই ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। এইগুলির কিছু কিছু সাহিত্যের অঙ্গেও উন্নীত, অনেকগুলি শ্লোকের ভাষা ছন্দ উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার রীতিমত সৎসাহিত্যের পদবীতে আসন পাইবার যোগ্য।

সতর্ক, সাবধানবাণীতে এইগুলি পূর্ণ। শ্লোককার

নিজের জীবনে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া আমাদের সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। গার্হস্থ্যজীবনে সত্যই অনেক সময়ে ইহাদের অর্থবোধ হয়। এই শ্রেণীর নীতিকথা—

নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণীনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥

নদীকে, নখ ও শিঙ্‌ওয়ালা জন্তুকে, সেই সঙ্গে অস্ত্রধারী সৈনিককে, স্ত্রীলোকদিগকে এবং রাজপরিবারের লোকদিগকে যে বিশ্বাস করে, সে রীতিমতো বোকা—

নদী আর শৃঙ্গনখধারী পশুগণ।
বিশেষতঃ শস্ত্রপাণি হয় যেই জন॥
নারী আর রাজবংশ অতি ভয়স্থান।
করিবে না এ সবে বিশ্বাস বুদ্ধিমান॥

রাজশক্তি চিরকাল বজ্রসুকঠিন, বজ্র তবু নির্দিষ্ট স্থান ধ্বংস করে, রাজশক্তি সমগ্রদেশকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়—

বজ্রঞ্চ রাজতেজশ্চ দ্বয়মেবাতিভীষণম্।
একমেকত্র পততি পততাস্তং সমন্ততঃ॥

ইহার বাংলা মর্মানুবাদ—

বজ্র আর রাজশক্তি তুল্য ভয়ানক।
ইহাতে বিশেষ বলি শুন বিবেচক॥
পতিত হইলে বজ্র একস্থানে হয়।
ভূপতির শক্তি পড়ে সর্ব রাজ্যময়॥

কপট মিত্রকে চিনিবার উপায় নাই। তবু কতকগুলি পরীক্ষায় এই বিষয়ে হয়ত সাহায্য করিবে—

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিং।
ভার্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥

আপৎকালে মিত্র পলাইলে, যুদ্ধে বীর পশ্চাদপসরণ করিলে, ঋণশোধে সাধুজন গাফিলতি করিলে তাহারা আর মিত্র থাকিবে না। স্ত্রীর পরীক্ষা হয় অর্থকষ্টের সময়ে, বন্ধুদের পরীক্ষা দুঃখের কালে।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

তবে কি বন্ধু এ সংসারে কেহ নাই? উৎসবে ব্যসনেই কেবল নয়, যাহারা রাষ্ট্র-বিপ্লব বা যুদ্ধের সময়, বিচারাগারে, শ্মশানেতেও সহায় হন তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু।

একবার বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়া যাওয়ার পরও আবার যে পুরাতন বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায়, তাহার মতো বেকুব আর কিন্তু নাই—

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ মিত্রঞ্চ পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমুপগৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা॥

বাংলা শ্লোকটাও শুনুন—

একবার যার সঙ্গে হয়েছে শত্রুতা।
পুনঃ তার সঙ্গে করে যে জন মিত্রতা॥
আপনার মৃত্যু সে আপনি আনে করে।
কাকড়ী যেমন গর্ভ মৃত্যু জন্ম ধরে॥

কাহাকেও বিশ্বাস করা চলে না। বন্ধু কখনও হয়ত পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কাজেই বন্ধুজন হইতেও গুপ্ত কথায় সতর্ক থাকা ভালো—

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্বদোষং প্রকাশয়েৎ॥

আর চেষ্টা করার দরকার শত্রু দিয়াই যাহাতে শত্রুনিধন হয়, অর্থাৎ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার ব্যবস্থা—

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥

সতর্কতা-অবলম্বনের আরও নানা পথের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দুর্জন লোক খলসর্পের মত ভয়াবহ, দুর্জন যদি গুণী পণ্ডিতও হয়, তবু তাহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়—

দুর্জনং পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি চেৎ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

দুর্জন মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবে, কিন্তু প্রিয়ভাষীকেই ভয় আরও বেশী, ইহাদের জিভে মধু, অন্তরে হলাহল—

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাসকারণং।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্‌॥

উদারচেতা ব্যক্তিগণ সমস্ত বিশ্বকে আপন ভাবেন, লঘুচেতাগণ অবশ্য আপন-পর বিবেচনা করিয়া কাজ করে—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌॥

এ সংসার বিধিলিপির ফল, সমস্তই অদৃষ্টের লিখন; না হইলে সূর্য-চন্দ্রও মধ্যে মধ্যে রাহুগ্রস্ত হন; কাজেই নৈরাশ্যের কারণ কি?

স হি গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকারী
দশশতকরধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধিযোগাদ্‌ গ্রস্যতে রাহুণাসৌ
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥

কোন কিছুতেই সেইজন্য নিরাশ হইবার কারণ দেখি না। তোমার মঙ্গলবিধাতা নিশ্চয়ই তোমার উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন—

যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥

হংসকে যিনি শ্বেতবর্ণ দিয়াছেন, শুককে যিনি সবুজবর্ণ করিয়াছেন, ময়ূরকে যিনি চিত্র-বিচিত্র করিয়াছেন, তিনিই তোমার আহার দিবেন, অর্থাৎ—মঙ্গল করিবেন।

ধর্মপথে থাকিলে মঙ্গল হইবেই; প্রধান ধর্ম পিতামাতা আর গুরুকে তুষ্ট রাখা—

ত্রয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্যাদাচার্যস্য চ সর্বদা।
তেষেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে॥

বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রকে লালন-পালন করিবার জন্য যদি অপকর্মও করিতে হয় তবু পাপ নাই—

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্যশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

হিংসাই মানুষের ধর্মপথের প্রধান অন্তরায়। হিংসাবৃত্তিকে জয় করিলে স্বর্গের পথও খুলিয়া যাইবে—

সর্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্বংসহাশ্চ যে।
সর্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

দারিদ্র্যের আক্ষেপই মানুষের অশান্তির মূল কারণ, হিংস্র জন্তুগণের মধ্যে বনে জীবন কাটান হইতেও কষ্টকর ধনী বন্ধুজনের মধ্যে ধনহীন জীবনযাপন—

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং দ্রুমালয়ং
পক্কফলাম্বুভোজনং।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন-
জীবনম্‌॥

নানারকম নির্দেশ-উপদেশ-সম্বলিত শ্লোক আছে অনেক। পুত্রগণের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে?

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

পুত্র ও শিষ্যকে কেবলমাত্র আদর না করিয়া শাসনও করিতে হইবে—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥

বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া অনেক সময়ে আমরা ভুলি, ভিতরে ভাল জিনিষ থাকিলেও বাহিরের কাঠিন্য দেখিয়া আমরা অবহেলা করি—যেমন নারিকেলের বাহিরে কঠিন আবরণ থাকিলেও অন্তরে স্নিগ্ধ জল আছে, কিন্তু বদরিকা-ফল বাহিরে মনোরম হইলেও ভিতরে তাহার কিছুই নাই—

নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ॥

স্থানভ্রষ্ট দ্রব্য সব সময়ে অশুচি। কর্মচ্যুত ব্যক্তি এবং পরিত্যক্ত দেহাংশ অপবিত্র, যেখান-কার যাহা সেখান হইতে বিচ্যুত হইলে তাহার মূল্য চলিয়া যায়—

রাজা কুলবধূর্বিপ্রা মন্ত্রিণশ্চ পয়োধরাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশা নরা নখাঃ॥

ইহার বাংলা শ্লোকানুবাদ—

মহীপাল কুলবালা আর বিপ্রগণ।
রাজমন্ত্রী পয়োধর চিকুর দশন॥
নরনখ যদ্যপি স্বস্থানভ্রষ্ট হয়।
তবে আর ইহাদের শোভা নাহি রয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

'হে জগদীশ (কৃষ্ণ), আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী কামিনী চাই না, কিংবা কবিত্ব-শক্তিও চাই না। তুমি এই দয়া কর যেন আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বর-স্বরূপ তোমাতে অহৈতুকী (রাগানুগা বা শুদ্ধা) ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরচিত শিক্ষাশ্লোকাষ্টক হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি স্মরণ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের ও তৎসাধনের সরল, উদার ও মধুর প্রণালীগুলির প্রচার পৃথিবীর বর্ত্তমান নৈতিক ও সামাজিক নবধারার প্রচলনে সরসতা আনিয়া দিতে পারিবে—এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"—

জীবের শুভাশুভ কর্ম্মই ফলপ্রদ হইয়া তাহাকে প্রতিজন্মে পাশরূপে বন্ধন করিয়া সংসারের কবলে পতিত করে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের হাত হইতে (অর্থাৎ জন্ম-জরা-রোগ-মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের কঠোর শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে) নিজেকে মুক্ত করিয়া পরম আনন্দ ও শান্তির পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। হতাশ ও বিফলমনোরথ হইয়া, চিত্তে প্রসাদ অনুভব না করিয়া শান্তিলাভের আশায় সময়ে সময়ে গুরুপদচিন্তা, সজ্জন-সঙ্গ ও ভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনও করিয়া থাকি। কিন্তু, মানুষ জন্মাবধি আপদ্‌গ্রস্ত থাকে এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার সর্ব্বপ্রকার আশার উচ্ছেদকারী হইয়া দাঁড়ায়। সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর-পরিগ্রহরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মানুষ মুক্তির ও ভগবানের সেবাসুখের পথ খুঁজিতে আরম্ভ করে। মহাকবি ভারবি একস্থানে সেই কথাই লিখিয়াছেন—

অন্তকঃ পর্য্যবস্থাতা জন্মিনঃ সন্ততাপদঃ।
ইতি ত্যাজ্যে ভবে ভব্যো মুক্তাবুত্তিষ্ঠতে জনঃ॥

সংসারের কারণ ও মুক্তিবিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে চিরকালই মতভেদ বা বিপ্রবাদ রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন বাদীরা আত্মাকে একমাত্র অস্তিবস্তু মনে করিয়া শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা তাহারই জ্ঞান ও তৎপুণ্যজনিত মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন। দেহাত্মবুদ্ধি লোকায়তিক প্রভৃতি অপর শ্রেণীর বাদীরা বলেন—সবই 'অকারণ-সম্ভূত'। আবার অন্য দলের বাদীরা বলেন সবই 'ঈশ্বরাধীন'। তথাগত (গৌতমবুদ্ধ) মনে করিতেন—এই মতগুলি সবই সংসারসাধন ধর্ম্ম এবং বাদীগণের মধ্যে কেহই নিবৃত্তিবিধানবিৎ নহেন। কোন বস্তুর উপলব্ধিতে যে পরমার্থ লাভ হয়, তাহা লইয়াই যত মতভেদ। শাস্ত্রে মুক্তিরই বা কত প্রকার ভেদ আলোচিত দেখা যায়—সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য। সাধারণ ধর্ম্মপিপাসু লোকের পক্ষে বৌদ্ধের 'শূন্য',

বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, সাংখ্য-পাতঞ্জলের 'পুরুষ' ও 'ঈশ্বর' এবং প্রথমের প্রতীত্যসমুৎপাদ, দ্বিতীয়ের 'মায়া' ও তৃতীয়ের 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি'— প্রভৃতির জ্ঞান ও ধারণা করা অতীব দুরূহ কার্য্য। আমাদের শান্তির জন্য প্রথমতঃ উদার অভয়-বাণী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৯ম অধ্যায়) ঘোষণা করিয়াছিলেন, যথা—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে, তেষু চাপ্যহম্‌॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥
(৯।২৮-৩২)

শ্রীকৃষ্ণ যেন অর্জ্জুনকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তিনি ভক্তপক্ষপাতী, তথাপি মানুষের প্রতি ব্যবহার-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও প্রকার বৈষম্য-দোষ নাই। ভগবদ্‌ভক্তিরই এমন মহিমা যে, ভক্তই দুঃখ হইতে মুক্তি পায়, অভক্ত তাহা পায় না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কেহ তাঁহার অনুরাগের পাত্র, কেহ বিরাগের—এরূপ ভাবনা সত্য নহে। তবে যাহারা তাঁহাকে ভক্তিতে উপাসনা করে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণেরই আপন হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের আপন হইয়া থাকেন। এমন কি, কেহ যদি অত্যন্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যদেবতা-ভজনকারী হইয়া তাঁহাকেই কেবল ভজনা করে, তবে সে ব্যক্তিকে তাহার সম্যগ্‌ব্যবসায় জন্য 'সাধু' আখ্যাই দিতে হইবে। তজ্জন্য সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া পড়ে এবং তাহার চিত্তের উপপ্লব দূরীভূত হওয়ায় সে পরমেশ্বরে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। একথা উদ্‌ঘোষিত হইতে পারে যে, কৃষ্ণভক্তের বিনাশ নাই। তাঁহাকে ভক্তিবশতঃ আশ্রয় করিয়া নিকৃষ্টকুলে জাত জনেরাও—এমন কি স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই—পরম ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে।

ভজনের প্রণালীও তিনি সেই অধ্যায়ে বলিয়া দিয়াছেন, যথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌॥ (২৭)

পুনশ্চ—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (৩৪)

স্বভাববশতঃ, অথবা শাস্ত্রের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া যে কোন কর্ম্ম আমরা করি, যাহা কিছু আহার করি, যাহাই হবন করি, যাহাই দান করি এবং যাহাই তপস্যা করি—সেই সমস্ত ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। মন কৃষ্ণময় রাখিতে হইবে, আমাদিগকে কৃষ্ণের ভক্ত বা সেবক হইতে হইবে, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য যজন করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে— এইভাবে কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণে চিত্তসমাধান করিতে পারিলেই পরমানন্দস্বরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে (২।৭।৪৫) এই ভাবেরই পুনরুক্তি স্পষ্টভাবে অভিহিত আছে। সৎসঙ্গ পাইলে—ভগবদ্‌ভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—পাপী জীবেরও উদ্ধার সাধিত হইতে পারে। যথা—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি, কিমু শ্রুতধারণা যে॥

'ভগবৎ-পরায়ণ ভক্তগণের আচরণ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে, স্ত্রীলোক শূদ্র, হূণ, শবর, পাপী এবং নিকৃষ্টজীবও কৃষ্ণের মায়াশক্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে (কৃষ্ণকে)

জানিতে পারে—শাস্ত্রোক্ত ভগবৎস্বরূপ যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই।'

কাজেই আমাদের উদ্ধারের আশা আমরা কখনই ত্যাগ করিতে পারিব না। আর বাস্তবিক ভগবদ্‌ভক্তিহীন জনের পক্ষেই জাতি, শাস্ত্র, যম, তপের প্রয়োজনের কথা সমাজে বেশী শুনা যায়। সেগুলি অনেক সময়ে কেবল তাহার অ-প্রাণ দেহের লোকরঞ্জন মণ্ডনমাত্র।

আমাদের উদ্ধারের জন্ত উপযুক্ত ভগবদ্‌ভক্ত কোথায় পাইব—যাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া নিস্তারের পথ আমরা খুঁজিতে পারি? যখনই ধর্মের বিপ্লব ও গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়া পড়ে, তখনই স্বধর্মানুরাগী সাধু ভক্তগণের পরিত্রাণের ও অধর্মচারীদিগের বিনাশ বা দণ্ডের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। তখন যেন ভগবানের চিত্তে এক ভাবনা উদিত হয়—কেমন করিয়া তিনি নিজকে মানুষী তনু আশ্রয়পূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ করাইবেন।

তখন তিনি—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া—

স্বয়ং কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত হইলেও নিজের শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছায় নিজের মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং অবতার-গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবত শ্রবণ করাইবার সময়ে রাজা পরীক্ষিৎকে অবতার-সম্বন্ধে সেই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি কারণে স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্॥
১০।১৪।৫৫-৫৭

'হে রাজন্, এই (অবতারগ্রাহী) কৃষ্ণকেই অখিল জীবগণের আত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের হিতের জন্ত সেই কৃষ্ণই নিজ মায়া-অবলম্বনে এই পৃথিবীতে অন্যান্ত দেহীদিগের ন্তায় দেহধারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। এই জগতে যাঁহারা (অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্তেরা) কৃষ্ণকে তত্ত্বঃ মূল পুরুষোত্তমরূপে জানিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সব বস্তুই ভগবান্ কৃষ্ণেরই স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। জগতে তিনি ছাড়া অন্ত কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সব বস্তুরই পরমার্থতত্ত্ব কারণে অবস্থিত এবং সেই সব কারণেরও কারণ হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। অ-তৎ (অর্থাৎ ভগবানের শক্তিরহিত) কোন বস্তুই কি বর্ত্তমান দেখিতে পাও?'

উল্লিখিত এই শ্লোক তিনটি হইতেই অতি সংক্ষেপে আমরা ঈশ্বর, জীব ও জগতের সম্বন্ধে মূলতত্ত্বের খানিকটা ধারণা করিতে পারি।

আমাদের বাল্যজীবনে ঢাকা-নগরীর গৌর-ভক্তগণের মুখে গৌরলীলা-বিষয়ক যে-সব গান শুনিতাম, তন্মধ্যে একটি গানের একটি পঙ্‌ক্তি এখনও কানে লাগিয়া রহিয়াছে, যথা—

'লুকাইয়া ঐ কালরূপ গৌর হ'য়েছ যে কানাই।'

বসুদেব-তনয় দেবকীনন্দন ভগবান্ কালরূপ-ধারী শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ-পুত্র শচীদুলাল অকলঙ্ক গৌরাকৃতি শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবহৃদয়ে প্রেমধর্মচন্দ্রিকাপাতে সুখ, শান্তি ও আনন্দরসের অনুভূতি আনিবার জন্ত আজ প্রায় ৪৬৭-৬৮ বৎসর পূর্ব্বে পুণ্যসলিলা সুরধুনীর তীরে বাঙ্গালার নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রেমবিগ্রহ সমস্ত গৌড়বঙ্গে কেন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথও প্রেম-ভক্তির বন্যায় প্লাবিত করিয়া ভক্তজনকে কৃষ্ণলীলামাধুরী আস্বাদন করাইয়াছিলেন। গৌর-

চন্দ্র এক বিশিষ্ট ধর্ম্মাবতার ছিলেন। তাঁহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহা করা যায় না। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥

কৃষ্ণের করুণাদ্বারাই তদীয় দুর্জ্ঞেয় অবতারতত্ত্ব ও সেই অবতারের প্রচারিত ধর্ম্ম সুজ্ঞেয় হইতে পারে। ঠাকুরের এই উক্তি কঠোপনিষদের সেই মহাসত্যেরই অনুবাদ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

সাধক যাঁহাকে জানিতে চাহেন, ভক্ত যাঁহাকে প্রেমভক্তিদ্বারা ভজনা করিতে চাহেন—তাঁহার কৃপানুগ্রহ-ব্যতিরেকে তাহাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। যদি ভগবানকে আন্তরিক উপলব্ধি ছাড়াও বাহ্য নয়নাদি-ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়—এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গাদি অবতাররূপেই লোকনয়নের গম্য হইয়া থাকেন। অবতারদর্শনেই ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হয় ইহা সত্য কথা। এই সত্যের প্রচার-জন্য ভারতের পরমবৈষ্ণব সুপ্রাচীন মহাকবি মাঘ লিখিয়াছেন, যথা—

নিজৌজসোজ্জাসয়িতুং জগদ্দ্রুহামুপাজিহীথা ন মহীতলং যদি।
সমাহিতৈরপ্যনিরূপিতস্ততঃ পদং দৃশঃ স্যাঃ কথমীশ মাদৃশাম্॥

অতি বিনয়-সহকারে ভক্ত নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'হে ঈশ, আপনি যদি স্বপ্রভাবে (কংসাদি-) জগদ্-বিপ্লবকারিগণের বিনাশসাধন জন্য মহীতলে অবতার-গ্রহণ করিয়া আগমন না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের মত দৈহিকনেত্রসমন্বিত মূঢ়গণের কেহই জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগিগণদ্বারাও অনিরূপিত-স্বরূপ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইত কি?

তাই রাসাদিবিলাসী ব্রজললনা-নাগর রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণই গৌরহরিরূপে ভক্তভাব লইয়া আমাদের বাঙ্গালাদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শৈবগণ শিবকে 'অর্দ্ধনারীশ্বর'-কল্পনায়ও ভজনা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও আমরা সেই আখ্যা দিতে পারি। তিনি জগৎকে প্রেমধর্ম্ম শিখাইবার উদ্দেশ্যে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু লইয়া অবতীর্ণ হইয়া উন্নত উজ্জ্বলরসধন নিজ ভক্তিসম্পদ্ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ এক-আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য-গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্—সেই কারণে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহারা স্বভাবতঃ একাত্মতা অনুভব করেন। তথাপি এই যুগলটি পরস্পর ভিন্ন, অথচ নিত্য। তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের বিলাস অনুভব করেন। বিলাসে তাঁহারা লীলারস আস্বাদন করেন। সেই রাধা ও কৃষ্ণ কলিযুগে একই শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহে মিলিতভাবে প্রকটিত হইয়া রসাস্বাদনের পূর্ণতা ভোগ করিয়াছিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের বিচিত্র ও অচিন্ত্য ধারণা ইহা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইজন্যই আমরা শ্রীচৈতন্যকেও 'অর্দ্ধনারীশ্বর' বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি। তিনি যেন নারী-অংশে শ্রীরাধার ও ঈশ্বর-অংশে শ্রীকৃষ্ণের ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ভক্তভাবময় শুদ্ধ কলেবর লইয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামিকৃত কড়চাতে শ্রীচৈতন্য-দেবের অবতারের মূল প্রয়োজন নিম্নলিখিত শ্লোকে নিপুণভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যেন শ্রীকৃষ্ণ গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; (১) গোপবধূ শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কিরূপ, (২) শ্রীরাধার এই প্রেমমাহাত্ম্য দ্বারা তাঁহার আস্বাদনযোগ্য কৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুর্য্যই বা কি-প্রকার, এবং (৩) কৃষ্ণের সেই মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীরাধার কীদৃশ সুখই বা উদ্ভূত হইয়াছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের এই তিন বিষয়ে লালসাধিক্য হওয়ায় তিনি যেন রাধাভাবসম্পন্ন হইয়া শচীদেবীর গর্ভসমুদ্রে (গৌরচন্দ্ররূপে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

স্বমাধুর্য্য রাধা প্রেম-রস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥

তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীচৈতন্য ভগবানের এক বিশিষ্ট অবতার। তাঁহার পক্ষে শ্রীরাধার মহাভাব ও তদীয় দেহকান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতার-গ্রহণের ইহাই মূল কারণ।

সে-ই কৃষ্ণ সে-ই গোপী—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর—অতিসুদুর্ব্বোধ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমন তাঁহার সন্ন্যাসেও বৈশিষ্ট্য আছে। আবার তৎপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মেরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণবদর্শনে বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবভজনে বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবরসে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমরা তদীয় প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের খানিকটা আলোচনা করিব। তাঁহার অবতার ও সন্ন্যাস-গ্রহণের বৈশিষ্ট্য না বলিলে তাঁহার প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বলা অসম্বদ্ধ হইবে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানতঃ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥
(তত্ত্বসাগর)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইয়াও লোকশিক্ষা ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণ-জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ-সম্পাদন সময়ে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গুরু ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষরী গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্ররূপ রসায়নবিধিতে কাঁসারূপ নিমাই কাঞ্চনরূপ গৌরাঙ্গ হইয়া গেলেন।

দীক্ষা অনন্তর কৈল প্রেম পরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥

তদনন্তর তিনি কেবলই গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া গোপীনাম স্মরণ করেন—

গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া।

তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে পর নবদ্বীপের অনেকেই প্রভুর নব ভাব দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রভুর মনে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। শাস্ত্রে বলে—

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

তাই তিনি শীঘ্রই প্রব্রজ্যা বা গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সেখানে অধ্যাপক ও শিষ্যেরা, ধর্ম্মী, কর্ম্মী ও তপোনিষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই নিমাই-এর নিন্দাতে শতমুখ। প্রভু ভাবিলেন—

মোর নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব নিস্তার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥

প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার॥

সম্ভবতঃ—হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ—ভাগবতের এই বাক্য স্মরণ করিয়া সুবর্ণসুন্দর নিমাই জাতনির্ব্বেদ হইয়া বাৎসল্য-রসপূরিতা অতিবৃদ্ধা জননী শচীদেবীকে ও অতিযুবতী পতিগতিকা ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অক্লেশে ত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখী হইয়া ২৪ বৎসর বয়সে যতিপ্রধান কেশবভারতীর নিকট যাইয়া 'গুরুকে' ছলে 'শিষ্য' করিয়া তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তের পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ কেবল মুকুন্দপদসেবার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, সে-কথা ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন—

একাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং
পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-
নিষেবয়ৈব॥
(১১.২৩।৫৭)

ভাগবতের ভিক্ষুগীতোধ্যায়ে অবন্তিদেশীয় বিপ্র বলিয়াছিলেন—'প্রাচীন মহর্ষিগণ যে পরমাত্ম-নিষ্ঠাকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও সেই নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দের চরণসেবাদ্বারা দুরন্তপার অন্ধকারময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব।' ভক্তির প্রবল প্রেরণায় নিমাই ত কেশব ভারতীর নিষেধবাক্য মানিলেন না—

একে নব অনুরাগী, এ নবীন বয়স,
নিমাই, কেমনে মুড়াবি কেশ।
তোমার গৌর কাঁচা সোনার বরণ।
কেমনে পরিবে তুমি অরুণ বসন,
সন্ন্যাসী না হয়ে, গৃহে করহ গমন,
এখন সময় নয় রে।
সোনার অঙ্গে কৌপীন পরে কেবল
শচী মায়ে কাঁদাবে॥

তিনি মহাধন্য; তিনি সদ্‌গুরুকে চিনিয়া লইয়াছেন, ছাড়িবেন কেন তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসমন্ত্র লইতে? তিনি ত ভাগবতের সেই উপাদেয় শ্লোক জানিতেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স
স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন
মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥
(৫.৫।১৮)

সংসাররূপ মৃত্যুকে আমরা সর্ব্বদা সন্নিহিত দেখিতে পাই; কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়া যদি উপযুক্ত কেহ আমাদিগকে সেই সংসার হইতে মোচন করিতে সমর্থ না হয়েন, তবে তিনি গুরু হইলেও গুরু নহেন, স্বজন হইলেও স্বজন নহেন, পিতা হইলেও পিতা নহেন, মাতা হইলেও মাতা নহেন, দেবতা হইলেও দেবতা নহেন এবং পতি হইলেও পতি নহেন। নিমাই-এর পক্ষে কেশব ভারতী তাঁহার সংসার-মোচক গুরু বলিয়াই তিনি তাঁহার পরমার্থগুরু—তাই ব্যবহারিক গুরুর মত তিনি আর তাঁহার ত্যাজ্য হইলেন না। নিমাই তাঁহার নিকটই সন্ন্যাসে দীক্ষা লইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমতঃ বৈদান্তিক হইয়াও পরে প্রেমের অবতার হইতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন না—অধ্যাত্মজগতে এই কথা অসমঞ্জস। ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্‌ভক্তি—এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা অযুক্তিযুক্ত। কৃষ্ণভক্তি-প্রচারের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগেরও (বিশেষতঃ কাশীবাসী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদিগেরও) মন কৃষ্ণে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমজলে ডুবাইয়া নিজের ভক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে॥
'সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন-নাচন
না করে বেদান্তপাঠ—করে সঙ্কীর্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে'॥

কাশীর সন্ন্যাসীরা গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসীর প্রধান করণীয় বেদান্ত-পাঠ ও ধ্যান হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া এবং ভাবকের কর্ম্ম নর্ত্তন ও গায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খজ্ঞানে তাঁহাকে এই হীনাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর শ্রীগৌরাঙ্গ এইভাবে ইহার উত্তর ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
'মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নামবিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম'॥

তাহার পর এই নবীন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কাশীর প্রধান সন্ন্যাসীদিগকে উপনিষদের ও বেদান্ত-সূত্রের কিরূপ ব্যাখ্যা হওয়া উচিত এবং তদীয় মতে শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ কি প্রকারে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের 'ভগবান'-অর্থ ত্যাগ করিয়া নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ পরমাত্মার স্থাপন করিয়া সাকার, সবিশেষ ও সগুণ আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, সে-সব কথা তাঁহাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান কথা ছিল এই—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥

এবং এই—

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ-অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥

আরও এই—

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়'—নাম।
সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনে অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥

এই ভাবে নানারূপ যুক্তিদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব কাশীর সন্ন্যাসীদিগকে সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট ও তদ্ভক্ত করিয়া লইলেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসেও বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার॥

তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই 'সম্বন্ধ-তত্ত্ব', তাঁহাকে পাইতে হইলে 'অভিধেয়'-নামা সাধন-ভক্তিই উপায় এবং শাস্ত্রের মূল 'প্রয়োজন' সেই সাধনের ফল প্রেমভক্তি লাভ করা।

সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন।

তদবধি—

সব কাশীবাসী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥

তিনি ত—

আপনি করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।

বারাণসী তখন দ্বিতীয় নবদ্বীপে পরিণত হইল। শ্রীচৈতন্য পরম কৃপালু, বদান্য ও ভক্তবৎসল। তিনি বাহ্যে অবধূতাকৃতি, কিন্তু অন্তরে ভক্তি-রসপূর্ণ—যেন শৈবালাবৃত মহাসরোবরের তুল্য ছিলেন এই বিশিষ্ট অবতার-সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'দক্ষিণামুখ সমুদ্রে'

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

কন্যাকুমারী বা কুমারিকা অন্তরীপ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে। এই স্থানই বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থল। কন্যাকুমারীর তিন দিকেই সমুদ্র। ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি ছোট শহর ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণে। এই তীর্থস্থানে কয়েকটি দোকানপাট ও যাত্রীদের জন্য একটি ধর্মশালা আছে, অনেকের গ্রীষ্মাবাসও আছে। জনৈক ভদ্রলোক সর্বসাধারণের জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটি নামে একটি পুস্তকাগার করিয়াছেন। এই স্থান হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোরম। অকূল সমুদ্রের নীল জলরাশির তরঙ্গমালার উন্মাদ নৃত্যের দৃশ্যও অপূর্ব।

মায়ের মন্দিরটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। ইহার পর আর কোন বাড়ীঘর নাই। প্রাচীরের মূলদেশে সমুদ্রের তরঙ্গমালা আসিয়া অবিরাম স্পর্শ করিতেছে, যেন সমুদ্র অহর্নিশ মায়ের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় বিশ ফুট। পূর্ব ও উত্তর দিকে ইহার দুইটি উচ্চ গোপুরম্ বা প্রবেশদ্বার আছে। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম ও যাত্রীদের দর্শনাদি উত্তর দিকের দ্বার দিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব দিকের দ্বারটি বৎসরে দুইদিন মাত্র খোলা হয়। এই দ্বার খুলিলে গর্ভ-মন্দির হইতে সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই দ্বার অহর্নিশ খোলা থাকিত। অন্ধকার রাত্রে, মায়ের কপালের হীরকখণ্ড সমুদ্র হইতে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। কোন এক সময় একদল জলদস্যু ঐ হীরকখণ্ড হরণ করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করে। মা তাহাদের বলবীর্য সব হরণ করেন। দস্যুদল অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এই ঘটনার পর হইতেই পূর্ব দিকের দ্বার বন্ধ আছে। মন্দিরটি এরূপভাবে নির্মিত হইয়াছে যে, সূর্যদেবের প্রবেশ নিষেধ। সমুদ্রের এত নিকটে হইলেও বহিঃস্থ উত্তাল তরঙ্গের গর্জনধ্বনি মোটেই মন্দিরের ভিতর কর্ণগোচর হয় না। মা নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সন্তানদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন!

মায়ের বিগ্রহ কষ্টিপাথরের। উচ্চতায় প্রায় আড়াই ফুট। মাথায় স্বর্ণমুকুট, হাতে নানা রকম অলঙ্কার, পায়ে ঘুঙুর, পরিধানে রঙিন বস্ত্র, ডান হাতে মালা। মনে হয় যেন আট নয় বৎসরের একটি বালিকা। মায়ের মুখের ভাব এতই সুন্দর যে, চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। কপালে ও দুই গালে তিনটি সোনার টিপ বসান আছে। ঐসব দীপের আলোতে জ্বল জ্বল করিতে থাকে। মায়ের পাঁচবার ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারেই অঙ্গরাগের পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক বারেই বিভিন্ন রকমের কাপড় ও নানা সাজসজ্জায় তাঁহাকে সুসজ্জিত করা হয়। আদি অমাবস্যায় অর্থাৎ বৈশাখী অমাবস্যায় এবং নবরাত্রি ও দশেরা-উপলক্ষে এই স্থানে নানা দেশ-বিদেশ হইতে যাত্রীরা দর্শনমানসে আসিয়া থাকেন। ঐ সব দিনে বিশেষ উৎসব ও শোভাযাত্রা হয়। যাত্রীরা সমুদ্রস্নান ও মাতৃদর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

প্রবাদ আছে যে, উমা কুমারী-অবস্থায় শিবকে পতিত্বে বরণ করিবার মানসে এই স্থানে তপস্যা করেন। নিত্য সমুদ্রে স্নান করিয়া তিনি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। সেইজন্য মায়ের হাতে মালা। মন্দিরটি এমন ভাবে নির্মিত হইয়াছে যাহাতে বাহিরের কোন কোলাহল মায়ের তপস্যার ব্যাঘাত না করিতে পারে। উমা কুমারী-অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন বলিয়া এই স্থানে শিবমন্দির নাই।

মন্দিরের নিকটে সমুদ্রে স্নান করিবার ঘাটে একটি মণ্ডপ আছে। তার পরই ঘাটের সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচেই কিছুটা স্থান মোটা লোহার শিকলে ঘেরাও করা আছে—যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা। সিঁড়ি হইতে সামান্য দূরে সমুদ্রের ভিতর একটি ছোট পাথর আছে, তাহার নাম 'কিচেনার রক্'। অনতিদূরে আরও একটি বড় পাথর আছে, তাহার নাম 'বিবেকানন্দ রক্'। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক-অবস্থায় মায়ের দর্শনমানসে এই পবিত্র তীর্থস্থানে উপস্থিত হন। সমুদ্র-সন্তরণে এই রকে আসিয়া তিনি ভারতমাতার পূজা করেন। ভারতবর্ষের সীমার বাহির হইতে জন্মভূমি ভারত-মাতাকে পূজা করেন। পয়সার অভাবে তিনি সাঁতার কাটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে এই রকের নাম হয় 'বিবেকানন্দ রক্'। স্বামীজী ঐ রকে ভারতমাতার পূজান্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। পরে এক গভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে Metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালিপেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা, আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত শুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে মাড়িয়েছি।"

দক্ষিণ ভারতের মনীষীরা বলিয়া থাকেন, মা এই স্থানে মূলাধারে বিরাজ করিতেছেন। মানব-দেহে সাধনার সাতটি স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরকে অতিক্রম করিয়া মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী-শক্তি ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ীর মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া সহস্রারে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষরূপ দেহেরও কুমারিকা হইতে কৈলাস পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থ এক একটি চক্র। যথা—

মূলাধার=কুমারিকা—কন্যাকুমারী (শক্তি)। শিব ও বিষ্ণুকে ইড়া ও পিঙ্গলা বলা হইয়া থাকে।

স্বাধিষ্ঠান = মাদুরা — সুন্দরেশ্বর, আলেগড়—শ্রীসুন্দররাজন্।

মণিপুর=চিদম্বরম্—নটরাজন্, শ্রীরঙ্গম্—গোবিন্দ-রাজন্।

বিশুদ্ধা=কালহস্তী—কালহস্তীশ্বর, তিরুপতি—বেঙ্কটেশ্বর।

অনাহত=কাশী—বিশ্বনাথ, বৃন্দাবন—জগন্নাথ (শ্রীকৃষ্ণ)।

আজ্ঞাচক্র=কেদার—কেদারনাথ, বদ্রি—বদ্রিনাথ।

সহস্রার=কৈলাস—শিব, বিষ্ণু ও শক্তির মিলন।

অর্থাৎ—সহস্রার যেমন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনের মিলনস্থান, সেইরূপ কৈলাসেও শিব, বিষ্ণু ও শক্তি এই তিনের মিলনস্থল।

মালাবার দেশের পুরাণে বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে বনাসুর ও বকাসুর নামে দুইটি দুর্দান্ত অসুর ছিল। তাহারা তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অমরত্ব লাভ করে। পরে অসুরদ্বয় দেবতাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। দেবতারা তাহাদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া শিবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—প্রভো! আপনি এই দুর্দান্ত অসুরদ্বয়ের হাত হইতে আমাদের রক্ষা করুন। শিব ভাবিয়া আকুল, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

তখন পার্বতী বলিলেন, ব্রহ্মার বর আছে যে, তাহারা কুমারীর হাতে নিহত হইবে। পার্বতী কুমারীবেশে মর্ত্যে আগমন করেন। অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর দেবী অসুরদ্বয়কে নিহত করেন। পরে তিনি শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। শিব তাঁহাকে কুমারীবেশে দেখিয়া নিজের সহধর্মিণী-ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন না, বরং বলিলেন এই যুদ্ধজনিত পাপক্ষয়ের জন্য কুমারীবেশে তুমি 'দক্ষিণামুখ সমুদ্রে' প্রায়শ্চিত্ত কর। সেই হেতু পার্বতী কুমারিকাতে তপস্যায় রত। বর্তমান কুমারিকাকে পুরাকালে 'দক্ষিণামুখ সমুদ্র' বলিত। আজকালও উৎসবের সময় এই যুদ্ধলীলার শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে।

আর একটি প্রবাদ আছে। কন্যাকুমারী হইতে বার মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রাতে একটি শিবমন্দির আছে। কোন এক সময়ে শিব কন্যাকুমারীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কন্যাকুমারীও প্রস্তাবে রাজী হইলেন। শিব চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে স্বর্গ ও মর্ত্যের দেবতারা সকলেই উপস্থিত হইলেন। শিব যৌতুক-স্বরূপ বহু ধন রত্ন ও দেবতাদের আহারের নিমিত্ত অনেক খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিলেন। নানারকমের শোভাযাত্রা করিয়া দেবতাগণসহ শিব বৃষে আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। শিব আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া শিঙ্গা বাজাইতে লাগিলেন। শোভাযাত্রার কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সমুদ্রও উত্তাল তরঙ্গে উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। শিব শোভাযাত্রা সহ কুমারিকাতে উপস্থিত হইলেন। শুভক্ষণে কন্যাকুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শিব দুঃখিত হইয়া ধনরত্নাদি ও খাদ্যসামগ্রী সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। ঐসব ধনরত্নাদিই আজকাল সমুদ্রের তীরে কখন কখন দৃষ্ট হয়, এইরূপ লোকের বিশ্বাস।

এই স্থানের নাম কুমারিকা অন্তরীপ। দেবীর নাম কন্যাকুমারী। কন্যাকুমারী-নামেও স্থানটি পরিচিত। পূর্বে এই মন্দিরে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। বর্তমানে সকলকেই প্রবেশ ও দর্শনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আজ উচ্চ-নীচ সকলেই মায়ের পুণ্যদর্শনে আপনাদের জীবন সার্থক করেন।

কবীরবাণী

('মো কো কহাঁ ঢুঁঢ়ো বন্দে'-বাণী অবলম্বনে)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

আমারে কোথায় খুঁজিছ সেবক
আমি তো তোমারি পাশে,
বৃথা দেবালয়ে মসজিদে ধাওয়া
মোর দরশন আশে।

কাবা-কৈলাসে আমারে পাবে না
নাহি পাবে ক্রিয়া-কাজে—
মর্মে বুঝিও আমি নাহি থাকি
যোগ-বৈরাগ মাঝে।

খুঁজিতে জানিলে এখনি মিলন
ঘটিবে পলক-ভাসে—
কহিছে কবীর শুন ভাই সাধু
রহি আমি শ্বাসে শ্বাসে।

প্রকৃতির মর্মকথা *

(সৈনিকের দিব্যদর্শন)

কর্ণেল ইয়ং হাজব্যাণ্ড

১৯০৪ সালে যে সন্ধ্যাবেলা তিব্বতের রাজধানী লাসা ছাড়িয়া আসি সেইদিনই আমি প্রকৃতির মনের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম। একটি সৈন্যদল লইয়া আমি লাসা যাই, সেখানে ১৫ মাস পরিশ্রম করিয়া তিব্বত সরকারের সহিত একটি সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হই। ফিরিয়া আসিবার দিন সকালে দালাই লামার অনুপস্থিতিতে যে লামা-প্রতিনিধির সহিত আমাদের কথাবার্তা চলিতেছিল তিনি স্বয়ং আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সন্তোষ-জ্ঞাপন করিলেন, তাহা ছাড়া নানা দেশের নানা প্রধান ব্যক্তির নিকট হইতে লাসাতে বসিয়াই আমি অভিনন্দন পাই। কাজেই মনের প্রসন্নতা লইয়াই আমরা লাসা ত্যাগ করি।

প্রথম দিনের যাত্রার শেষে ছাউনিতে পৌছিয়া আমি একাকী পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলাম। বৈকালের রৌদ্র পাহাড়ের গা বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল এবং নীচের দিকের উপত্যকাতে গভীর শান্তি বিরাজিত দেখাইতেছিল। সেই উপত্যকার মধ্যে লাসা শহরও দেখা যাইতেছিল। আমার মনে হইল যেন প্রকৃতির সুর আমার অন্তরের ভিতর বাজিতেছে। ১৫ মাসের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক পরিশ্রমের পর আমি আমার মনকে ছাড়িয়া দিবার অবসর পাইয়াছিলাম এবং তাহাকে স্বচ্ছন্দ এবং শিথিলভাবে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলাম। মনে হইল যেন সত্যই আমি প্রকৃতির মর্মের সংগে একসুরে বাঁধা। আমার চক্ষু দিয়া বিশ্বের হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি—মানুষের মনে কি আছে, সারা মানবজাতির মনে কি আছে, তাহাও যেন আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ঠিক আমি কি দেখিয়াছিলাম সে কথা যথাসম্ভব অতিশয়োক্তি-বর্জিত ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার বোধ হইল যেন আমি সারা বিশ্বের সংগে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। তখনকার মনের ভাব আমি আর কোনও কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। মনে হইতেছিল যেন প্রেমের আবেগে আমি নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সারা বিশ্ব যেন প্রেমেই সৃষ্ট—এবং প্রেম-ব্যতিরেকে আর কিছুই কোথাও নাই। সকলেই হয়তো কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নিজের দেশের প্রতি প্রবল প্রীতির উচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছেন। আমার সেদিনকার দেশপ্রীতি ছিল সারা বিশ্বের জন্য। আমার মনে তখন কোন সন্দেহ ছিল না যে, সারা সৃষ্টির পশ্চাতে এবং মূলে প্রেমই বিরাজমান। শুধু শান্ত মানবপ্রীতি নয়—জ্বলন্ত একনিষ্ঠ সক্রিয় ভালবাসা। সারা পৃথিবী যেন ভালবাসার আলোকে উজ্জ্বল এবং প্রতি মানুষ প্রত্যেকের প্রতি ভালবাসাতে উদ্বেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যে অনুভূতি

* লেখকের Heart of Nature গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় হইতে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) কর্তৃক অনূদিত।

আমার হইয়াছিল সেটা একটু অসাধারণই ছিল। কিন্তু প্রাতরাশটি বেশ পরিপাটী হইলে কিংবা কোম্পানীর শেয়ারে ভাল ডিভিডেণ্ড দিবার খবর পাইলে যেমন মনটা খুসী হইয়া উঠে ইহা সেরকম খুসী মনের গোলাপী দৃষ্টি ছিল না। সাধারণতঃ যাহাকে বলে আনন্দে উৎফুল্লভাব সেরকম ভাবও আমার মনে ছিল না—আত্মার একটি গভীর প্রসন্নতাই আমি অনুভব করিয়াছিলাম। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাকে এই ভাবে প্রকাশ করা যায়—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা, দোষপাপ বাহিরের ব্যাপার, কল্যাণই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ। মানুষের প্রতি মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধ প্রীতির, শত্রুতার নয়। মানুষ মূলতঃ মন্দ নয়, ভাল। অবশ্য সদ্‌গুণের স্ফূর্তি মানুষ সব সময় পায় না—নানা বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া তাহার প্রকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে হয় এবং সেই বাধা কাটাইতে মানুষ নিজের চেষ্টায় সব সময় সমর্থ হয় না—কিন্তু মানুষ সর্বদাই পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে পরিপূর্ণ এবং সেই প্রীতি প্রকাশ করিবার জন্য সর্বদাই লালায়িত। মানুষ পরস্পরের সহিত সোজাভাবে, সরলভাবে, সাধুভাবে এবং বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবার জন্যই ব্যগ্র এবং এইরকম ব্যবহার করিবার উপায় পাইলে বর্তাইয়া যায়। মন্দভাব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ইহা মানুষের মজ্জাগত নয়—অজ্ঞান, অশিক্ষা এবং অবহেলার ফলেই—ইহার প্রকাশ, ছেলেমানুষদের দুষ্টুমির মত। অবস্থার দোষে মানুষ অন্যায় করে—অন্তরের প্রেরণায় করে না। সঙ্গত পরিবেশ এবং মনের পরিপক্বতা যদি পায় তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক সদ্‌গুণ আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এইভাব জ্বলন্ত বিশ্বাসের সংগে সেদিন আমার মনে আসিয়াছিল। ইহা সাময়িক আনন্দের আবেগ ছিল না এবং তাহার পরেও উবিয়া যায় নাই। পনর বৎসর ধরিয়া ইহা আমার মনে জীবন্ত আছে এবং মনে হয় মৃত্যু পর্যন্তই থাকিবে। অবশ্য পরজীবনে অনেক সময় নিজের মনকেও অবিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াছি, সংসারকেও। সংসারের দৈনিক সাধারণ খাটুনীর ধূলিধূসরতার অন্তরালে সে উজ্জ্বলতা অনেকটা ফিকে হইয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসটাই স্থায়ী হইয়াছে যে সেই উজ্জ্বলতাই সংসারের প্রকৃত রূপ, ধূলিধূসরতা বাহিরের ব্যাপার-মাত্র। যে 'বাহার' দেখিয়াছি তাহা প্রকৃতির হৃদয়েরই বাহার—এবং একদিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, অন্ততঃ হইতেও পারে।

এই যে আমার অনুভূতি ইহা সাধারণ না হইলেও অভূতপূর্ব কিছু নয়। সর্বদেশে সর্বকালেই অনেক পুরুষের, অনেক নারীর এ প্রকারের অনুভূতি হইয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ অনুভূতির ফলে এই একই রকম দৃঢ় প্রত্যয়ের উদ্ভব হয় যে, প্রকৃতির মর্মস্থল মংগলময়, মানুষ অন্ধসম্ভাবনার ক্রীড়নক নয়, অপরন্তু প্রকৃতির কার্যাবলীতে ঐশ প্রেমেরই বিকাশ বিদ্যমান, ভগবানের প্রেমই সমস্ত বিশ্বকে চালাইতেছে এবং তাঁহার দিকে দৃঢ়হস্তে ধাবিত করাইতেছে।

"একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্‌রা, খড়কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি, আমি এমনকি সমুদয় প্রকৃতিই সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি—জীবন ও আনন্দের অসীম সমুদ্রে একদিন আমরা পঁহুছিবই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)—যুগ্ম গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৪৬+৮৩/০। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গবেষক তাঁহাদের এই অমূল্য ও তথ্যবহুল সংগ্রহ-পুস্তক লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত বিবিধ সমসাময়িক সাহিত্যে প্রকাশিত বিবরণ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সাক্ষাৎদ্রষ্টাদের লেখনীমুখে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার অনেকটাই গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি বিশদ তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের আলোচনায় যাঁহারা আনন্দলাভ করেন—তাঁহারা ভক্তই হউন আর সাধারণ পাঠকই হউন—সকলেই এই গ্রন্থে যথেষ্ট অনুধ্যানের সামগ্রী পাইবেন।

গ্রন্থকারদ্বয় অবশ্য ভূমিকাতে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, গ্রন্থের উপাদান ভক্তের দৃষ্টিতে নির্বাচিত না হইয়া বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা-প্রণালী-অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। এমন কি, 'সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা' অধ্যায় সম্বন্ধে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন—"তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যভক্তদের স্মৃতিকথা আমরা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছি" এবং পরিশিষ্টে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি সংগ্রহ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"এ ক্ষেত্রেও তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের বাদ দিয়াছি।" ভক্তগণের ইহা হয়তো তত মনঃপূত হইবে না। তথাপি সংগৃহীত উপাদান-মাত্র অবলম্বনেই গবেষকদ্বয় একটা মস্ত বড় কথা লিখিতে পারিয়াছেন—"আমাদের দীর্ঘকালের বহু আয়াস ও যত্নলব্ধ অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছি যে, তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় অসাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁহার প্রবল আকর্ষণী-শক্তির প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যে-কেহ জিজ্ঞাসু ও তাপিতচিত্ত লইয়া তাঁহার কাছে গিয়াছেন, তিনিই পরিতৃপ্ত ও শীতল হইয়া ফিরিয়াছেন।" ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণাকারীর অতি-সাবধানী বাণী। কিন্তু গ্রন্থমধ্যেই এমন সব কথা রহিয়াছে, যাহা হইতে বুদ্ধিমান ভক্ত পাঠক ইহা অপেক্ষাও সাহসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। গ্রন্থকারদ্বয়ের অতি সাবধানতার কারণ এই যে, তাঁহারা অতীতের কলহের ধূলি পুনরায় উড়াইতে চাহেন না। আমরাও এই বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত একমত। তথাপি মনে হয় সাক্ষাৎ শিষ্যদের উক্তিকে আর একটু স্থান দিলে মন্দ হইত না।

মোটের উপর গ্রন্থখানি সকলের পক্ষেই সুখপাঠ্য এবং তথ্যসংগ্রাহক ও সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে অবর্জনীয়। সাহিত্যের এই ক্ষেত্রে স্বীয় সকল প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা গ্রন্থকারদ্বয়কে অভিনন্দিত করিতেছি।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

প্রেমানন্দচরিত—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। মূল্য—সুলভ সংস্করণ ৩।০ টাকা এবং সুন্দর প্রচ্ছদপটসহ বাঁধান—৪৲ টাকা। প্রকাশক—শ্রীনিষ্কামচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির, পোঃ কুণ্ডা, দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা)। পুস্তকখানিতে আচার্য স্বামী প্রেমানন্দের পুণ্য জীবনচরিত সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সর্বতোভাবে অভিমানশূন্যতা এবং সর্বজীবে প্রেম ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ধর্মজীবনের মূলমন্ত্র। লেখকের হৃদয়ের শ্রদ্ধায় এবং লেখনীর শক্তিতে ঐ মূলমন্ত্র এই গ্রন্থে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই পরম আদরের লীলাসহচর তাঁহার নিজ জীবনের সাধনার ইতিহাস বিবৃত করিয়া যান নাই। কিন্তু লোকচক্ষুর সম্মুখেই যাপিত তাঁহার ধর্মজীবনের গৌরবোজ্জ্বল আলেখ্য আমরা দেখিতে পাই বর্তমান গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পুষ্টি এবং উহার ভাবধারার বিস্তারের জন্য স্বামী প্রেমানন্দ প্রাণপাতী কি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তি তথা সমষ্টির সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি এই গ্রন্থপাঠে পরম উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল

শিক্ষাব্রতী—(রবীন্দ্রসংখ্যা) কার্যালয়: ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা—৬ ১১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

শিক্ষাব্রতী মাসিকপত্রের (এই বৈশাখে তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে) রবীন্দ্র-সংখ্যা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশ্বকবির জীবনে শিক্ষার বিকাশ এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার বিবিধ অমূল্য চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টা লইয়া বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণের লেখা অনেকগুলি তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে অন্যান্য রচনা এবং কবিতাগুলিও ভাল লাগিল। কবির বিভিন্ন সময়ের একক এবং গ্রুপ ফটোগুলি পত্রিকাখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। সুন্দর কাগজে পরিপাটিরূপে ছাপা শিক্ষাব্রতীর এই বিশেষ সংখ্যা রবীন্দ্রানুরাগী প্রত্যেক বাঙ্গালীকে একখানি রাখিতে অনুরোধ করি।

প্রতিধ্বনি—(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৫৯) সম্পাদিকা—শ্রীমতী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী। অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা। আলোচ্য প্রথম সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায়—"অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরম-হংসদেবের বাণীপ্রচারই…'প্রতিধ্বনি'র অন্যতম উদ্দেশ্য।" ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ধর্মসাধনা এবং সমাজগঠন-সম্পর্কে অখণ্ড মণ্ডলেশ্বরের অনেক-গুলি বাণী এবং কুমারী শিষ্যাগণকে লিখিত সদুপদেশপূর্ণ কয়েকখানি চিঠিও এই সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। বারাণসী এবং কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁহার জন্মোৎসবের আলোকচিত্রগুলি পত্রিকাখানিকে চিত্তাকর্ষী করিয়াছে। বারাণসী জয়ন্তী উৎসবে বিশিষ্ট বক্তাগণের ভাষণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

(১) "একদা শঙ্করাচার্য যাহা করিয়াছিলেন, একদা শ্রীবুদ্ধ যাহা করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতের জন্য এবং সমগ্র জগতের প্রয়োজনে আচার্য স্বরূপানন্দও তাহাই করিতেছেন।"

(২) "আগামী দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারত যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হইবে, আমরা বুঝিয়াছি, ইনিই তিনি।"

এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে নেতৃত্বের সঙ্কট ও সাম্প্রদায়িক ভারতের সত্যই সুদিন আসিবে সন্দেহ নাই।

মর্ম-মরাল—লেখক—শ্রীরবি গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। প্রকাশক: শ্রীসরোজ দাস গুপ্ত; ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা। ৯৮ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

বইখানিতে ৪৮টি ছোট বড় কবিতা এবং ১১টি গান আছে। প্রত্যেক রচনায় একটি অতীন্দ্রিয় মরমী ভাবের স্পর্শ পাওয়া যায়। ছন্দের বৈচিত্র্য ও সাবলীল গতি এবং ভাষার মিষ্টতা মনকে টানিয়া রাখে। মর্ম-মরাল পড়িয়া আমরা প্রভূত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। সরল আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনাপূর্ণ প্রকৃত কাব্যধর্মী গ্রন্থখানির সমাদর কামনা করি।

২৪ পরগণা জিলায় দুর্ভিক্ষসেবাকার্য্য

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

২৪ পরগণা জেলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণের ভীষণ অন্নকষ্টের কথা জনসাধারণ সকলেই অবগত আছেন। ঐ জেলায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের—বিশেষতঃ চাউলের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। যাঁহারাই ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন তাঁহারাই সহস্র সহস্র ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ক্ষুধাতুর নরনারীর এক গ্রাস অন্নের জন্য হাহাকারের দৃশ্য অবলোকন করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমাদের সেবকগণ দেখিয়াছেন যে প্রতি ইউনিয়নে অনুমান ৫,৬ হাজার লোক বিপন্ন হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে প্রায় দুই হাজারের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন। অনাহারের তাড়নায় ঐ সকল হতভাগ্যগণ ভীষণ হতাশার কবলে পতিত হইতেছে। সাহায্যপ্রার্থী স্ত্রীলোকদের অনেকেরই পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা ২৫০ মণ চাউল খরিদ করিয়াছি এবং তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আমরা হাসনাবাদ থানার অধীনস্থ ভবানীপুর ও হিঙ্গুলগঞ্জ ইউনিয়নে এবং হারোয়া থানায় চাউল বিতরণ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের উক্ত দুই থানায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ১০০০ মন চাউল ও ১০০০ মন আটার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল অঞ্চলে পরিদর্শন কার্য্য এখনও চলিতেছে।

কয়েকমাস ধরিয়া ব্যাপকভাবে এই সেবাকার্য্য চালাইবার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভ্রাতা ভগিনীগণের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)

২। কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন অফিস, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলিকাতা-৩।

৩। কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন্ লেন, কলিকাতা-১৩।

৪। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি সংসদ, ১১১নং রসা রোড, কলিকাতা-২৬।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড়মঠ (হাওড়া)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব সংবাদ—গতমাসে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের বিবরণী পাইয়াছি :—দিনাজপুর, কাটিহার (পূর্ণিয়া), মনসাদ্বীপ (২৪ পরগণা)। বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগাদি, ভজন, প্রসাদবিতরণ এবং পাঠ ও আলোচনা এই সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। দিনাজপুরে দুইটি জনসভা হয়। একটিতে স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড পি আর গ্রীণ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব জানাউল্লাহ আহম্মদ এবং অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র খাসনবীশ যথাক্রমে খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম এবং বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরটিতে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব এবং জেলাজজ্ শ্রী টি তালুকদার বক্তৃতা দেন। কাটিহারে উৎসব ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দুইটি জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজীর জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। একটিতে পৌরোহিত্য করেন ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ডিভিসানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রী এন্ কে রায়। অপর একদিন একটি মহিলাসভায় শ্রীমতী পুষ্পময়ী সিংহ, শ্রীমতী বকুল মিত্র, শ্রীমতী সুপ্রীতি সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী শেফালী চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উড়িষ্যার বিদায়ী রাজ্যপালের পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার পরিদর্শন—গত ১লা জুন উড়িষ্যার বিদায়ী রাজ্যপাল জনাব আসফ আলি পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। গ্রন্থাগারের পরিচালন-ব্যবস্থা ও যুগোপযোগী নানা ভাষার বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার বিরাট সংকলন দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

এতদুপলক্ষে আহূত একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান-সভায় রাজ্যপালমহোদয় বলেন যে, এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রের কার্যকারিতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত। বেদান্তভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিবিধ সংবাদ

চীনে ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর—ভারত গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ এবং অল্ ইণ্ডিয়া ফাইন্ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ সোসাইটি কর্তৃক চীনের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীগুলি সর্বত্র প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে। মাদাম সুন ইয়াট্ সেন্, সহকারী প্রধানমন্ত্রী কু মো জো, অধ্যাপক হু সাও চুঙ, অধ্যাপক উ সোজেন, মন্ত্রী মাও টুণ প্রভৃতি মনীষীর ভারত-শিল্পের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উক্তিগুলি পড়িয়া আমরা প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভারত-সংস্কৃতির মর্মকথা-সম্বন্ধে তাঁহাদের যতটা পরিচয় পাওয়া গেল দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক 'বিখ্যাত' লোকের,ততটা নাই।

বাংলার সুসন্তানগণের স্মরণে—গত মাসে কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অমরকবি মধুসূদন, বঙ্গগৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির মৃত্যুতিথি-স্মরণে নানা-স্থানে আলোচনা সভায় বাংলার এই সকল সুসন্তানগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে। ইঁহারা বিভিন্নক্ষেত্রে তাঁহাদের অমর প্রতিভা ও কর্মশক্তি দ্বারা বাংলা ও বাঙ্গালীকে বিপুল গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমরাও এই সকল মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

খাতড়া (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার স্নানযাত্রার দিন এই আশ্রমের নবনির্মিত দ্বিতলগৃহের উদ্বোধন উৎসব অতি পবিত্র পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, কঠোপনিষৎ-পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রসাদবিতরণ, জনসভা, ভজন, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি উৎসবের মনোজ্ঞ অঙ্গ ছিল। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মুন্সিফ্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি। বেলুড় মঠের স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ ও স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পরদিন স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী মহেশ্বরানন্দ, স্বামী হংসানন্দ, স্বামী অনঘানন্দ, স্বামী কাশীশ্বরানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ উৎসবে যোগদান করেন।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—টেম্পল লেন, কলিকাতা-৩১-স্থিত এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি আলোচিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠান একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও পরিচালন করিতেছেন। আশ্রমের পাঠাগার এবং ছাত্রাবাসও বিশেষ উল্লেখ্য। শ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবও এই প্রতিষ্ঠানে সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়ার পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—হাওড়া জেলার মুন্সীরহাটের অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে সম্প্রতি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বীতশোকানন্দের পৌরোহিত্যে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বীতশোকানন্দজী এবং প্রধান অতিথির হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে।

পরলোকে বিশিষ্ট গ্রামসেবক—মেদিনীপুর জেলার দূর অভ্যন্তরে একটি গণ্ডগ্রামে (বড়বাড়ী, পোঃ হেঁড়্যা) কামদেবচন্দ্র মণ্ডল বাস করিতেন। তিনি ছিলেন বেলুড় মঠের দীক্ষিত ভক্ত—কিন্তু তাঁহার ধর্মানুরাগ ঠাকুরঘরে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনায় গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। স্বামীজীর জনসেবার বাণী তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইহা রূপ লইয়াছিল অশিক্ষা ও কুশিক্ষা-পরিব্যাপ্ত পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা ও সুনীতি প্রচারের জন্য এই অখ্যাত, অনাড়ম্বর বিত্ত-বৈভবহীন ব্যক্তিটির নিরলস উদ্যমে ও প্রাণপাতী পরিশ্রমে। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত লোক তাঁহার শবানুগমন করে। ইহা হইতেই তাঁহার জনপ্রিয়তা অনুমিত হয়। আমরা এই পরহিতপ্রাণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তের লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী

আবেদন

পৃথিবীর নানা জায়গায় বহু লোক শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর সহিত সুপরিচিত—কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই শ্রীশ্রীসারদা দেবীর বিষয় তেমন কিছু জানেন না। লোকচক্ষুর অগোচরে একান্তে যাপিত এই মহীয়সী নারীর সরল ও অনাড়ম্বর অথচ গভীর ও উদার ভাবসমৃদ্ধ জীবন হইতে মানুষ বহু অমূল্য শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যখন বিবাহ হয় তখন সারদামণি মাত্র পাঁচ বৎসরের বালিকা। পল্লীর শান্ত পরিবেষ্টনীতে একা একা তিনি বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন ঠাকুর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য একবার স্বগ্রামে আসেন এবং সারদামণিকে কাছে আনিয়া সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেন। স্বামীর সহিত এই স্বল্পকালের সংযোগ তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

তাহার পর অনেক দিন আর উভয়ের দেখা হয় নাই—একে অপর হইতে রহিলেন বহু দূরে—যেন তাঁহারা পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত! শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন—দিবানিশি ঐশ্বরীয় আবেশে বিভোর—বাহিরের জগতের সব কিছু সম্পূর্ণ ভুল হইয়া গিয়াছে।

১৮৭৩ সাল। সারদামণি ঊনবিংশতি-বয়স্কা যুবতী। জনরব শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ তাঁহার চিত্তকে অহরহঃ পীড়িত করিতে লাগিল। আশু কর্তব্য স্থির করিতে দেরী হইল না—স্বামীর এই প্রয়োজনের সময় নিকটে গিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। পথের বহুতর কষ্ট এবং বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া পদব্রজে জয়রামবাটী হইতে ৬০ মাইল দূর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

সারদাদেবীর পরবর্তী জীবন-কথা শুনিতে অতি অলৌকিক। পাঁচ বৎসর পরে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ; দেখিলেন তাঁহার মন সর্বদাই ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট। তবুও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরিণীতা পত্নীর সহধর্মিণীত্বের দাবী অস্বীকার করিলেন না। কিন্তু বলিলেন যে, তাঁহার মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে। সারদাদেবীরও আধ্যাত্মিক পিপাসা ঠাকুরের অপেক্ষা কম ছিল না। দাম্পত্যজীবনের ভোগবাসনা সহজেই ত্যাগ করিয়া তিনি ঈশ্বরপ্রেমিক স্বামীর উচ্চ ধর্মানুভূতিসমূহের অধিকারিণী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে সারদাদেবীকেই আমরা পাই ঠাকুরের প্রথম এবং প্রধান শিষ্যরূপে। দীর্ঘ তের বৎসর ঠাকুরের নির্দেশে সাধনায় মগ্ন থাকিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি এত উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে স্বতই তিনি 'শ্রীশ্রীমা' বলিয়া সম্মানিতা হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমা প্রায় সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল অক্লান্তভাবে সহস্র সহস্র মুমুক্ষুর আধ্যাত্মিক পিপাসা ও প্রয়োজন মিটাইয়াছিলেন। জনকোলাহল হইতে দূরে শান্ত অনাড়ম্বর ভাবে তিনি থাকিতেন—কিন্তু সংসার-তাপদগ্ধ নরনারীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতির পরিসীমা ছিল না। শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন তিনি মা ছিলেন করুণা, পবিত্রতা, ও সরলতার প্রতিমূর্তি। ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে, এমন কি চরিত্রের গুণাগুণ পর্যন্ত বিচার

না করিয়া সকলকে সাহায্য করিবার জন্ত তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ সত্যই অতি বিস্ময়কর ছিল। শ্রীশ্রীমার সহজ সরল কথাগুলি শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিত।

যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের দেশে নারীজাতির যে সকল মহান্ আদর্শ উদ্ভূত হইয়াছে জনগণের সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব জীবনের কাহিনী বহুতর সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই। জাতির উদীয়মান বংশধরগণের নিকট এই অমূল্য জীবন-সম্পদটির পরিচয় ভাল করিয়া উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে—কেননা, ভারতীয় জাতির অনবদ্য বৈশিষ্ট্য-সমূহে কাহাদের আস্থা হারাইবার আশঙ্কা আজ দেখা দিতেছে।

অতএব আগামী ১৯৫৩ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত ভাবে উদ্‌যাপন করা সম্পূর্ণ কালোপযোগীই হইবে। এই সঙ্কল্পটিকে সক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দের সভাপতিত্বে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি বর্তমানে শ্রীসারদাদেবীর একটি বিস্তারিত প্রামাণিক জীবনী ও উপদেশগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন। 'ভারতের মহীয়সী নারী' নামে ইংরেজী ভাষায় আর একখানি গ্রন্থ রচনার কাজও চলিতেছে। ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, বিবিধ ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীগণের অবদানের (তাঁহাদের জীবনী সহ) বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইবে।

উপরোক্ত দুটি গ্রন্থ প্রকাশন ছাড়া কমিটি উৎসবের নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলিও করিয়াছেন :—

১। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে।

২। শ্রীশ্রীমায়ের নানা সময়কার এবং তাঁহার স্মৃতি-জড়িত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ফটো-সম্বলিত একটি এলবাম-প্রকাশন।

৩। শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং তাঁহার পত্রাবলীর সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৪। কামারপুকুর, জয়রামবাটী এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থযাত্রার আয়োজন।

৫। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে 'স্মৃতিফলক' রাখিবার ব্যবস্থা।

৬। ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীসারদাদেবীর জীবনীবিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

৭। বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ মহিলা-প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা সভার ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীমা তাঁহার পল্লীজীবনের অধিকাংশ কাল যে গৃহটিতে কাটাইয়াছিলেন উহা কমিটি ২০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এই বাড়িটির এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসম্পর্কিত আরও কয়েকটি বাসগৃহের মেরামত ও সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে হইবে। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে ২০৲ টাকা এবং তদূর্ধ্বের দান যাঁহাদিগের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে তাঁহাদিগকে কমিটির সাধারণ সভ্য করিয়া লওয়া হইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উৎসবের উপরোক্ত পরিকল্পনা-সমূহকে সুনিষ্পন্ন করিতে হইলে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হইবে। স্ত্রীজাতির উন্নয়ন এবং মাতৃ-শক্তির পূজায় যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা এই মহৎ কার্যে সাধ্যমত সাহায্য করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

সম্পাদক, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী, পোঃ—বেলুড় মঠ (হাওড়া) পশ্চিম বঙ্গ—এই ঠিকানায় টাকা কড়ি পাঠাইতে হইবে। ইতি

নিবেদক—স্বামী অবিনাশানন্দ
সম্পাদক, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী

শাশ্বত শিশু

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঁকারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রম্)

শিশুর মুরলী-ধ্বনি !
ত্রিভুবন হল আউল শুনিয়া
বেদ-মুখে ফুটে বাণী—
কঠিন শৈল গলে, তরুদেহে
দেয় শিহরণ আনি।

বাজিছে শিশুর বেণু—
সে সুরে বিবশ যত প্রাণিকুল
ছুটিছে হরষে ধেনু—
মুকুলিত মুনি-হৃদয়-কমল,
ভোলে প্রাণ-মন-তনু।

জয়তু সপ্তস্বরা !
গোপালকৃষ্ণ-বংশী-নিনাদ
গোপ-জন-চিত্ত-হরা—
সুর-মূর্চ্ছনা মহা-ওঁঙ্কার-
অর্থ-প্রকট-করা।

শ্রীকৃষ্ণ

পুনরায় শ্রাবণী-কৃষ্ণা অষ্টমী ঘুরিয়া আসিল—জন্মাষ্টমী—ভারতপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি। কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে—তাঁহার জন্ম-কর্ম-কথায় ইতিহাসের নিশ্চিততা দিতে হয়তো এখন অনেকেই ভরসা করেন না—তবুও কী অমোঘ প্রভাব তিনি রাখিয়া গিয়াছেন আসমুদ্রহিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিন্তায়, আবেগে, আকাঙ্ক্ষায়, আদর্শে। শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী যদি উপাখ্যানও হয় তবুও সত্যের অপেক্ষাও উহা অমিত বলশালী, অপ্রত্যাখ্যেয়।

সেদিনকার রজনী ছিল দারুণ প্রাকৃতিক-দুর্যোগময়ী—ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজের আকাশেও তখন নিবিড় মেঘ প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় ছুটাছুটি করিতেছে। সেই আধিদৈবিক তমিস্রাকে অগ্রাহ্য করিবার রূপক দ্বারা ভারতের পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিক অন্ধকার অপনোদন করিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা লইয়া দেবকীর কোলে তিমিরান্তক শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমার উদয় হইয়াছিল।

বালক শ্রীকৃষ্ণ। শিশুকাল হইতেই জীবনের বহুমুখ দুষ্কর ব্রত সংসাধন করিবার ব্যাপৃতি আরম্ভ হইয়াছিল। খেলাছলে কত দুষ্টকে শাসন, কত বিপন্নকে সহায়তা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান—দীন-অবজ্ঞাতদের ভালবাসিয়া, হৃদয়ে টানিয়া লইয়া মানুষের মর্যাদার পূজা, নিঃস্বার্থ প্রেমের দুর্নিবার শক্তির বিজয়-ঘোষণা। বালক শ্রীকৃষ্ণ, কিশোর শ্রীকৃষ্ণ—লীলা-মধুর, আনন্দ-বিগ্রহ, ভারত-প্রাণের শাশ্বত স্নেহ-পুত্তলী।

যমুনাতীরে ধেনু চরাইয়া, বনে বনে খেলিয়া দিন কাটাইবার দিন ফুরাইয়াছে। তরুণ শ্রীকৃষ্ণ। সমষ্টি-মঙ্গলের গুরু দায়িত্ব তাঁহার ব্যষ্টিজীবনে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়াছে—ধড়া-চূড়া ফেলিয়া রাজবেশ পরিয়াছেন, বাঁশী ভাঙ্গিয়া চক্র হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের সহিত মিলন—নর-নারায়ণের যুগ্ম পৌরুষ অদূর ভাবীকালে যে অভাবনীয় কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিবে তাহারই সূত্রপাত।

মহাভারতের আশ্চর্য ধর্ম-সংস্কৃতি—শীর্ষে ভারতপুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম কিন্তু মোক্ষ নয়, ইহকাল-বিমুখতা উহার রূপ নয়—ধর্ম মানুষের সমগ্রজীবনের সংধারক; তাহার শিক্ষায়, জ্ঞানে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহারে, রাষ্ট্রে, সাংসারিক অভ্যুদয়ে—সর্বত্র ধর্মের অপরিহার্য প্রয়োজন। ধর্ম অনুসরণ না করিলে মানুষ বায়ু-বিধ্বস্ত তৃণগুচ্ছের ন্যায় বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। আবার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের আচরণীয় ধর্ম পৃথক পৃথক। ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রের ধর্ম। কাহারও ধর্ম ক্ষুদ্র নয়। প্রত্যেকে স্বীয় ধর্ম প্রতিপালন করিয়া ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত শ্রেয়ঃ নিষ্পন্ন করিবে। এই আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষক—কুরুক্ষেত্রের

সমরাঙ্গনে পাঞ্চজন্য-নিনাদকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ। রোমাঞ্চকর ঘোষণা—এই সীমাবদ্ধ রক্তমাংসের শরীরে সেই সনাতন পরমপুরুষই বিরাজ করিতেছেন যিনি নিজকে আহুতি দিয়া একদা এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিধাতারূপে ইহাকে সংরক্ষণ করিতেছেন—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষকে পথ দেখাইবার জন্য তাহাদেরই একজন ব্যথার ব্যথী রূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাঁহাকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। নূতন নয়—পূর্বেও বহুবার এইরূপ হইয়াছে—ভবিষ্যতেও হইবে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

আলোক এবং ছায়ার বিচিত্র সংমিশ্রণ—মানুষ ও দেবতার অপরূপ একত্র-বিলাস—অত্যদ্ভুত দুরধিগম্য অবতার-শ্রীকৃষ্ণচরিত্র। অনন্ত ক্ষমা আবার অত্যুগ্র নিষ্ঠুরতা—দিগ্‌দিক্-প্রসারিত প্রীতির বন্ধন আবার সর্ব-বিস্মৃত নির্মম ঔদাস্য—প্রখর সংসার-লিপ্ততা আবার নিঃসঙ্গ আত্ম-স্বরূপাবস্থান। মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে 'শোকসংবিগ্ন-মানস' অর্জুনের প্রতি যে উপদেশ-ছন্দ উৎসারিত হইয়াছিল, তাহারই মূর্ত-প্রতিমা গীতা-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহল শান্ত হইয়াছে—লক্ষ্যহারা দুর্মদ ক্ষাত্র-শক্তি দমিত এবং সর্বজনের হিত ও সুখ-বিধায়ক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—মোক্ষকামিগণ মোক্ষসাধনায় নূতন প্রাণ, শক্তি এবং আলোক দেখিতে পাইয়াছেন। ভারতবাসী মহাত্মা বাসুদেবের মধ্যে ভারতাত্মাকে আবিষ্কার করিয়াছে—শত শত বৎসরব্যাপী উত্তরকালে সনাতন বৈদিক-সেতু প্রসারণের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়াছে। নিত্যধামের আহ্বান কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। মর্ত্যলোকের লেন-দেন মিটাইয়া পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারবতীতে চিরযাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। কিছু কাজ অবশিষ্ট ছিল—অতি মর্মান্তিক কর্তব্য—যাহাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন, পরিপালন করিয়াছেন, ভারত-ভূমির বৃহৎ কল্যাণের জন্য সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধককুলকে নিজের হস্তে বিসর্জন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন-নাট্যের করুণতম অন্তিমদৃশ্য প্রভাস। কর্ম-কঠোর, বৈরাগ্য-ভাস্বর, জীবন-ধন্য, মৃত্যু-সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ।

পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার কর্ম জ্ঞান-প্রেম-দীপ্ত অলৌকিক যোগ-জীবনের স্মৃতি সকল মানুষের হৃদয়ে সকল কালের জন্য রহিয়া গিয়াছে। সেই স্মৃতি আমাদের দুর্দিনের ভরসা, অন্ধকারে আলোক, বেদনার শান্তি, চল-চঞ্চল মিথ্যাপ্রবাহে অবিনশ্বর সত্য।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শতদল

অধ্যাপক শ্রীপরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

"সম্ভবামি যুগে যুগে"। চারিদিকে তমসা, ক্লান্তিতে চোখ আর খুলতে পারে না, দেহ আর বয় না, মন আশা করতেও ভুলে গেছে। কলঙ্কের পঙ্কে মানবসত্তা নিমজ্জিত-প্রায়। তখনই বুঝি জন্ম হয়।

কোথায় এবার ফুল ফুটল, কোন্ বীণের সুর শোনা যায়? কে জানতো মানব-মানসে এত কান্না গুমরোচ্ছিল, পাঁজরার ভেতর এমনভাবে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল? আজ যদি দেখা দিল মানস-সরোবরে বিকশিত শতদল, কোন্ হাহাকারের আলোড়ন তাকে শিঞ্জিত করেছে তা কি একবারও মনে হয়? ফোঁপরা পাঁজরার কত রক্ত লেগেছে তার প্রতিটি দলকে রক্ত-রাঙ্গা করতে তার কি হিসেব হয়? পঙ্কেই তো পঙ্কজের জন্ম। রাধার কলঙ্কই তো তার প্রেম-শতদলের অঙ্কুর। মনে হয় তাই রামকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল বাঙ্গালায়, ভারতের অন্য কোথাও নয়।

তাই এবার সুরভি আসছে বাঙ্গালা থেকে, মহাব্যোমের শান্ত সুষমার মত সবার ওপর পরিব্যাপ্ত হবে। গঙ্গোত্রীর বুকে যা গুমরোচ্ছিল, প্রাণদায়িনী রসধারায় তা প্রবাহিত হবে। যে মানুষ মরে 'মাটি' হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে অমৃতধারা সিঞ্চিত হবে, অচিন্তনীয় লোক থেকে প্রাণস্পন্দন তাতে অঙ্কুরিত হবে।

সমাজ-বিবর্তন প্রয়োজনের তাগিদে বদলে চলে, এগিয়ে চলে। যুগ-প্রয়োজনেই যুগাবতার আসেন। এক এক যুগের এক এক দেশের এক এক রকম প্রয়োজন। সব মাটিতে সব গাছ জন্মায় না; সব দেশে, সব যুগে একই রকম যুগাবতার হন না। আরব বেদুইনের মধ্যে শ্রীচৈতন্য আসেন না, মা-ষষ্ঠীর অনুকম্পিত বাঙ্গালায় মহম্মদ জন্ম নেন না। বাংলা সত্যই হয়েছিল কম্পিত, সপ্তকোটী যুগ্মপদভারে কম্পিত, আর্ত আশ্রয়হীনতায় তার হৃদয়ের অণুপরমাণুও কম্পিত। এতদিন যাহোক্ মাথার ওপর ছাদ ছিল, হোক্ না বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কারের আবর্জনায় ভারাক্রান্ত, তবু তো আশ্রয়। কিন্তু আর নয়, এই বুঝি ভেঙ্গে যায়। খ্রীষ্টান হব না মুসলমান হব না ব্রাহ্ম হব? কোথায় আশ্রয় পাব? এতদিনের বনেদী ঘর, কত ঝড়ঝাপটা সয়ে তবুও দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমী হাওয়া সব বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যার ওপর ভিৎ, যার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম, সব ভুল? সহস্রাতীত বৎসরের ঋষিদের সাধনার সঞ্চিত ধন শুধু ধুলো? যে গোপাল বাঙ্গালার বাড়ীতে বাড়ীতে ননী চুরি করে যায়, ভোগের ওপর হাতের ছাপ রেখে যায়, যে কৃষ্ণকথা চোখে চোখে অশ্রুর বিগলিত বন্যা বইয়ে দেয়, সে গোপাল কেবল একটা জড় মূর্তি, সে কথা না কি অশ্লীল!

শোনা গেল যীশু ছাড়া গতি নেই, ঈশ্বরের আর কোনও নাম নেই। তিনিই করুণানিধান, তিনিই সর্বপাপহর। ভাবলাম সত্যিই বুঝি তাই, তা না হলে কোথা থেকে সাগরপার থেকে এসে এই মিশনারী সাহেবরা আমাদের

সমাজসংস্কারে মন দিয়েছেন, কত দুঃখ, বাধা-বিঘ্ন সহ্য করে অযাচিত করুণাধারার মত আমাদের জ্ঞান ও সেবা বর্ষণ করছেন। যে ধর্মের অনুরাগীরই এত দয়া, তার প্রতিষ্ঠাতা কত দয়াময়, কত ক্ষমাময়! যাবো তাঁরই আশ্রয়ে।

কিন্তু আমাদের শাস্ত্রও তো আমাদের দেবতার দয়ার লক্ষকোটিপদচিহ্ন বুকে ধরে রয়েছে, সে তো নতুন নয়। তবে কি অপরাধে তাকে পরিত্যাগ করবো? হ্যাঁ, অপরাধের সীমাসংখ্যা নেই। বিধবার অশ্রু, নিপীড়িতের লাঞ্ছনা, অজ্ঞানের কালিমা তার সব কিছু মুছে লেপে একাকার করে দিয়েছে।

কিন্তু তবু মনে হয়, পুরাতনের পুঞ্জীভূত পাপকে তার সঞ্জীবনী সুধা থেকে কি বিচ্ছিন্ন করা যায়! সামনেরটাই এত বড় হয়ে দেখা দেবে, অকৃতজ্ঞ স্মৃতিতে এত দিনের এত কাহিনী এতটুকুও ছোপ রেখে যাবে না? গরল আজ অমৃত ছাপিয়ে উঠেছে, বনেদী ঘর আজ জীর্ণ, তবু টুকরো টুকরো দেয়ালের শিল্প আজও তো অপরূপ, অতুলনীয়।

রামকৃষ্ণ এই দ্বন্দ্ব-নিরাশার উদ্বেল সাগর-মন্থিত অবতার। সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরই মধ্যে বারে বারে পরিস্ফুট হয়েছে। তোদের চোখে নেশা লেগেছিল "আমি ভালো" ডাকের দৃপ্ত বিশ্বাসে। আমি বলি ভালো হওয়া কারুর একচেটিয়া নয়, এক ধর্ম ভালো বলে অন্যটা কেন মন্দ হবে? সব ভালো, সব ধর্ম ই ভালো। এমন উত্তর আগে কেউ দেয়নি। এত সহজ সমাধান ছিল, অথচ কারুর মনে তা আসেনি। কিন্তু তারই ছিল সবচেয়ে বড় দরকার।

তাঁর মত নতুন নয়, পথও নয়। বৈশিষ্ট্য-হীনতাই তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য। তিনি কেবল সবকিছুর মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আনলেন। সব মনে হতো আলাদা, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই, বরং যেন আছে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাঁর স্পর্শে সব এক হয়ে গেল। যে বিরোধের মনে হতো মীমাংসা নেই, তার বাষ্পও রইলো না।

বাস্তবিক, ধর্ম নিয়ে এত যে মারামারি সেগুলো সব কি? যুগে যুগে কতকগুলো জায়গার কতকগুলো মানুষ বিভিন্ন চিন্তা করেছে, তারই না নানান্ সংগ্রহ-তালিকা? মন যদি আলাদা, চিন্তাও তবে পৃথক হবে। এই তো স্বাভাবিক, এটাই তো বিজ্ঞানসম্মত নগ্ন সত্য যে, যতরকম মানুষ, মতও সেই অনুপাতে, আর পথও তাদের মতে নানান্ রকম। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, যারা আমাদের বিজ্ঞানসম্মত, কুসংস্কারবর্জিত সত্য ও জ্ঞানের আলো দান করছে, যারা বলছে তোমাদের জাতিভেদ-প্রথার নিষ্ঠুরতার অবসান করো, তাদের মধ্যে এই সহজ সত্যের প্রকাশ কেন নেই যে, হিন্দুধর্মেও সত্য আছে। উদারতাই তাদের প্রাণধর্ম, আর তারাই কি না এই সামান্য সহনশীলতাটুকুও রাখে না!

রামকৃষ্ণ সমন্বয়বাদী, শুধু বাণীতে নয় আপনার জীবনবেদে। কখনও অদ্বৈতবাদী, কখনও মূর্তিপূজক, ভক্তির বন্যায় বয়ে যাচ্ছেন, প্রেমসাগরে ডুব দিচ্ছেন, বাৎসল্যরসে ভরাডুবি, দাসভাবে সামান্য সেবক। হিন্দু ব্রাহ্মণরূপে কালীপূজা করেন, মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সানকিতে করে বাবুর্চির রান্না খান, কাছা খুলে কাপড় পরেন, খ্রীষ্টান হয়ে গির্জায় যান।

এত বৈচিত্র্য আর কোথায়? অপরূপের রূপ ও অরূপের সাধনা কার মাঝে এমনভাবে মিশেছে, কে এমন করে আপন জীবনে দেখিয়েছে যে ছবিও যা কবিও তাই, সুরও যা সৌরভও তাই?

নানাভাবের নানা মানুষ। তাই রামকৃষ্ণ

কোনও একটি বিশেষ সাধনাকে সকলেরই অনুসরণীয় আদর্শ বলে তুলে ধরেন নি। যত রকম লোক, যত বিভিন্ন তাদের প্রকৃতি, তারই অনুরূপ তাঁর উপদেশ। একটা কঠিন কাঠামোর মধ্যে মানবাত্মাকে আবদ্ধ করতে বোধ হয় তিনি চাননি, নীলাকাশে বিহঙ্গের স্বচ্ছন্দ বিচরণই তিনি ভালোবেসেছেন। এইজন্যই গোঁড়া ধর্মযাজকের মতো তিনি গিরিশ ঘোষকে 'সাধু' তৈরী করবার প্রয়াসমাত্রও করেন নি এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারক জীবনে জপ তপের ভার চাপাতে যাননি।

তাঁর বৈশিষ্ট্য এই সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সহনশীলতায়, যে মত যে কোনও যুগে, যে কোনও দেশে, যে কোনও জাতির মধ্যে চলতে পারে। কখনও পুরাতন হয়ে উঠবে না। কারণ জ্ঞানকে মার্গ করে কর্মকে বাদ দেওয়া হবে না, বৈরাগ্যকে আঁকড়াতে গিয়ে সমাজকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শক্তিকে অবহেলা করা হবে না। তাঁর ধর্ম তাই মানবধর্ম। সব রকম মানুষ, সব রকম সমাজ, সকলের জন্যই তিনি পথ করে দিয়েছেন। তাঁর বাণী বিশেষ কোনও সমাজের বা জাতির প্রয়োজনোপযোগী করে গঠিত নয়, তাই সে বাণী কারও স্বার্থেরও বিরোধী নয়, এই জন্যই তা শান্তি ও মৈত্রীর বাণী।

তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জীবনকে এড়িয়ে যাননি। ধর্মকে সংসার থেকে আলাদা করে দেখেননি। সৃষ্টির মধ্যে যে ধর্ম, তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব, একথা রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি যে ধর্মের আদর্শ তুলে ধরলেন তা জীবনসমস্যা এড়িয়ে যাবার আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়, বরং সামগ্রিক জীবনের ছোটো বড় আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও ব্যবস্থা সব কিছু মেনে নেওয়া।

তাই তিনি তান্ত্রিক, যৌগিক ও আরও বহু সাধনায় ইষ্টলাভ করে আরও কঠিন সাধনার পথে নামলেন। তাই তিনি ইষ্টলাভের পরও বনবাসী হননি। তাঁরই শিক্ষা বিবেকানন্দের কথায় ফুটে উঠেছে যে, আপনার মুক্তিকামনা না করে এই অধঃপতিত জাতির মুক্তিকামী হয়ে প্রয়োজন হলে শতবারও জন্মগ্রহণ করবেন। রামকৃষ্ণ বোধ হয় এই সাধনার পথেই চলেছিলেন, যাতে আপাত-দৃষ্টিতে যে জীবনকে বড় দুঃখ ও দুর্গন্ধময় বলে মনে হয় তাকেও ভালোবাসতে পারা যায়।

তিনি দেখেছেন জীবনই ধর্ম, কারণ সৃষ্টি ছাড়া, মানুষ ছাড়া, সমাজ ছাড়া মানবজীবনের বিভিন্ন সংগঠনকে বাদ দিয়ে ধর্ম হাওয়ার উপর ভেসে বেড়াতে পারে না। তাই মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র সেই ধর্মেরই জন্য প্রয়োজন। তাঁর এই মতবাদ বিবেকানন্দের মাধ্যমে পরিপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে লেখা তাঁর চিঠিতে বলেছেন, দক্ষিণেশ্বরে পতিতারা আসায় যদি ভদ্রমহিলাদের আসা ব্যাহত হয় তবে তা হোক্। যারা দেবমন্দিরে এসেও এই ঘৃণা পরিত্যাগ করতে পারে না তাদের সেখানে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি লিখেছেন এদের জন্যই তো বিশেষ করে ঠাকুরের আসা। রামকৃষ্ণের সমাজসংস্কারকের রূপ ক্ষণিকের জন্যও দেখা যায়।

বিবেকানন্দের কর্মকে রামকৃষ্ণেরই অভিপ্রেত বলে মেনে নেওয়া যায়। স্বামীজী বোধ হয় ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী। নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম বৈদেশিক দূত। তিনি জাগাতে চেয়েছেন ভারতের মানবসত্তাকে। অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত নীচজাতিকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই বিভেদের মধ্যেই তিনি অবনতির কারণ লক্ষ্য করেছেন। তারই জন্য আমাদের জীবনে এত খাওয়াপরার সমস্যা, এত

দীনতা, হীনতা। এই পুঞ্জীভূত অপরাধের চাপেই হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু, সে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী। তাই বারবার বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠেছে ভারতের বিবেক-সিংহ জাতিভেদের বিরুদ্ধে, বলেছে আগে খেতে দাও, তবে ধর্মের বুলি আওড়াবে।

সংসার পরিত্যাগ করতে হবে না। বৈরাগ্যের এই পথ সকলের জন্য নয়। চারিদিকের আর্ত মানবতার দয়াভিক্ষায় উপজীবিত হয়ে আপন আপন স্বর্গপথ উন্মুক্ত করার অধিকার কারুরই নেই।

কে দিয়েছিল বিবেকানন্দকে এই শক্তি? কে তাঁর চিত্তমধ্যে বিদ্রোহের হোমাগ্নি জ্বালিয়েছিল, কার ধর্মমত তাতে অবিরত ইন্ধন জুগিয়ে চলেছিলো? কে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল যে পাশ্চাত্যের সংগঠন-শক্তি ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে আমাদের জীবনে এনে সমস্যার সমাধান করে জীবনকে নূতন প্রাণশক্তি জোগাতে হবে যাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ আবার এক একটি দল মেলে শতদলের মত ফুটে উঠে? স্বামীজীর যে বাণী আজও সকলের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, রুদ্রের প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ করে, সেই অমিততেজ, সেই সর্বশক্তির আকর জীবনসূর্য কে সঞ্চারিত করেছিল তাঁর হৃদয়পটে? তিনি রামকৃষ্ণ, তিনি তাঁর প্রভু, তাঁর ঠাকুর।

তাই রামকৃষ্ণের বাণী, মানুষকে অবহেলা করলে চলবে না, অফুরন্ত উৎসাহে পীড়িত মানব-সমাজের সেবা করে যেতে হবে। তারাই তো নর-নারায়ণ। সৃষ্টিকে ভালো না বেসে স্রষ্টাকে কেউ ভালোবাসতে পারে? কবিকে জানতে হলে তার কাব্য পড়াই যথেষ্ট, তাকে দেখবার প্রয়োজন হয় না। যুগাবতার আবার যুগ-প্রয়োজন সাধন করলেন, এরই নাম সাধনা—সার্থক সে সাধনা। তিনি ডেকেছেন উৎখাত, আশ্রয়হীন তোমরা এসো, যে কোনও দেশের, জাতির বা ধর্মের হও আশ্রয় পাবে। ধর্মত্যাগ করতে হবে না। আপনাপন ধর্মে অবিচলিত আস্থা রেখেও তোমরা আশ্রয় পাবে। কেউ বড়, কেউ ছোটো নয়, কেউ ভালো, কেউ মন্দ নয়; নির্বিচারে সব এর তলায় আশ্রয় পাবে। কোনওদিন এ থেকে উৎখাত, বিচ্যুত হবে না। যে অনন্ত নীল আকাশের তলে আশ্রয় নিয়েছ, তা কি কখনও কর্পূরের মত উবে যায়?

প্রাণপুরুষ

'বৈভব'

জন্মহীন!
আজ তব শুভ জন্মদিন।
তোমারি ত জনম লাগিয়া
দুর্যোগের রজনী জাগিয়া—
যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী কংসের কারায়
স্তব্ধ রুদ্ধ অন্ধকারে অসহ জ্বালায়
রহিলেন প্রতীক্ষায় সর্বংসহা ধরণী জননী;
মাঝে মাঝে ওই যেন ওঠে ঝনঝনি
দুঃসহ শিকল ভার—
বহা তো যায় না আর
তাই বুঝি কোমলা দেবকী
ক্ষণে ক্ষণে উঠেন কন্টকি!
শৃঙ্খলিত বসুদেব শান্তরোষে চান ঊর্ধ্বপানে—
'সময় হয়েছে পূর্ণ?
—এসো নামি—পৃথিবীর টানে।'

* * *

দিব্য জ্যোতির্ময়!
শিশু? শিশু এ ত নয়—
এ যে হাসিয়া হাসিয়া
ধ্যানের মূরতি সম আসিছে ভাসিয়া
সাধক-নয়নে—
যুগ-প্রয়োজনে
কারার সাধনা আজ উঠিল ফলিয়া
শত যুগ যুগান্তের
ঘনীভূত আঁধার জঞ্জাল
পলকেতে উঠিল জ্বলিয়া।
ধরণীর চক্রবাল
রক্তরাগে উঠিল ঝলিয়া!

* * *

—আসিয়াছে প্রাণের পুরুষ!
আকাশেতে দিল দেখা আশার প্রত্যুষ—
আনন্দের দিব্য অরুণিমা
নবীন গরিমা!

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অধ্যাত্মবাদ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তিস্থল বেদ। ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার আধ্যাত্মিকতা। এই অধ্যাত্মসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াই ভারতবর্ষ বহু ঘাত-প্রতিঘাতে আজও তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-সমন্বিত বেদের জ্ঞানকাণ্ডেই কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যার কথা আলোচিত হইয়াছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞাদিক্রিয়া-বহুল, ইহাতে অধ্যাত্মতত্ত্বের নিদর্শন নাই, এইরূপ ধারণা যাহাতে আমাদের মনে না হয় তাহারই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ-রচনার প্রয়াস।

ঋক্‌সংহিতায় (৪।৭।৩৩) মধুবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মধুবিদ্যা যে কি তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। ইন্দ্র যখন আথর্ব্বণকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তখন তিনি ইহা অপর কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। ইহা দ্বারা মধুবিদ্যার গূঢ়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং মধুবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। (বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রবর্গ্য-প্রকরণে এই মধুবিদ্যাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে—বৃঃ উঃ, ২।৫।১৬-১৮)
"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শরীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্।" (বৃঃ উঃ, ২।৫।১) সুতরাং মন্ত্রসংহিতায় (কর্ম্মকাণ্ডে) অধ্যাত্মবিদ্যা নিহিত আছে—উপনিষদে কেবলমাত্র তাহা বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্লোক ঋগ্বেদের যে অস্যবামীয় সূক্ত (২।৩।১৪) আছে তাহারই অন্তর্গত। এই অস্যবামীয় সূক্তে ৫২টি মন্ত্র আছে—৫২টি মন্ত্রই মোক্ষ এবং জ্ঞানবিষয়ক। সেখানে লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্য দেখান হইয়াছে।

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ হোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদ্ অব্জা গোজা ঋতজা
অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥"
(কঠ, ২।২।২)

এই মন্ত্র ঋকসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইহাকে হংসবতী ঋক্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (৩।৭।১৫)

বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার কথা উক্ত (৬।২।২) তাহার মূল উৎস ঋঙ্মন্ত্র—"দ্বে সৃতী অশৃণবম্।" (৮।৪।১২)

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত
বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্
দেব একঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর উঃ, ৩।৩)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই মন্ত্রে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্ত্র ঋক্‌সংহিতা হইতে উদ্ধৃত। (ঋগ্বেদ, ৮।৩।১৬)

গায়ত্রী-মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার শীর্ষস্থানীয়, তাহাও ঋক্‌সংহিতায় (৩।৪।১১) উক্ত। এই মন্ত্র যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক তাহা সায়ণভাষ্যে ও এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত দেখা যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের মধুমতী

ঋকে (৬।৩।৬) এই গায়ত্রীর উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। শুক্লযজুঃসংহিতার ৩১ অধ্যায়ে গায়ত্রী-মন্ত্র পঠিত।

ঋক্-সংহিতায় ৩।১।২৭ বর্গের তিনটি মন্ত্রে অগ্নি ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বাত্মরূপে নিজের স্তুতি করিয়াছেন। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বরূপঃ অগ্নিঃ স্বাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বানুভবমাবিষ্করোতি।" ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা যে সর্ব্বাত্মকত্ব লাভ হয় তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদেও (১।৪।৯) বিবৃত—তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তঃ মনুষ্যাঃ মন্যন্তে কিমু তদ্‌ ব্রহ্ম অবেদ যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে অধ্যাত্মবিষয়ক মন্ত্র বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক আত্মস্তুতি কেবল ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদাদিতে নাই, তাহার দৃষ্টান্তে ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা, অথর্ব্বসংহিতাও পরিপূর্ণ।

পাদবদ্ধ মন্ত্রই ঋক্-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত-গ্রন্থে ঋক্ তিন প্রকার বলিয়াছেন—যথা (১) পরোক্ষকৃতা ঋক্, (২) প্রত্যক্ষকৃতা ঋক্, (৩) আধ্যাত্মিকী ঋক্। পরোক্ষকৃতা ঋক্, যেমন—'ইন্দ্রায় সাম গায়ত'; প্রত্যক্ষকৃতা ঋক্, যথা—'ত্বমিন্দ্রবলাদধি', আধ্যাত্মিকী ঋক্—'অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরামি' ইত্যাদি। যে অধ্যাত্মবিদ্যা উপনিষদে বহু বিস্তৃতভাবে আলোচিত এবং ব্রহ্মসূত্র গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে যে ব্রহ্মবিদ্যা বহুধা প্রদর্শিত হইয়াছে এই ব্রহ্মবিদ্যার মূল উৎস ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি। বেদের মন্ত্রভাগে (কর্ম্মকাণ্ডে) যে যে স্থলেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে ভগবান যাস্ক সেই মন্ত্রগুলিকে আধ্যাত্মিকী ঋক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত আধ্যাত্মিকী ঋক্‌ই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা আধ্যাত্মিকী ঋঙ্‌মন্ত্র ভিন্ন অন্যমন্ত্রেও বহু আলোচিত দৃষ্ট হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদের ২৩ অধ্যায়ের ৪৮ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিকী ঋক্ নহে। এই অধ্যায়ের ৪৭ মন্ত্রে সূর্য্যের মত জ্যোতি কি এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইহার উত্তর ৪৮ মন্ত্রে প্রদত্ত—ব্রহ্ম সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ। এই মন্ত্রটির এত নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে এই মন্ত্রটির দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। আকীটপতঙ্গমাত্র সূর্য্যজ্যোতির অধিকারী। ব্রহ্মও যদি এইরূপ সূর্য্যজ্যোতির মত হন তবে ব্রহ্মও আকীটপতঙ্গের নিকট প্রকাশমান বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম জীবাত্মরূপে সমস্ত জীবে স্থিত আছেন বলিয়া জীবমাত্রই ব্রহ্মজ্যোতির অধিকারী।

স্তুত্যর্থ ঋচ্‌ ধাতু হইতেই ঋক্-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋচ্‌ ধাতুর অর্থ স্তুতি। এজন্য ঋঙ্‌-মন্ত্রাদি দেবতাদের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। কেবল যে দেবতাদের স্তুতি করা হইয়াছে তাহা নহে—অদেবতাও দেবতার ন্যায় স্তুত দেখা যায়। যাস্ক নিরুক্ত-গ্রন্থের দেবতাকাণ্ডের উপোদ্‌ঘাত-প্রকরণে "অদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে, যথা অশ্বপ্রভৃতীনি ওষধীপর্য্যন্তানি"—বলিয়াছেন। অশ্ব প্রভৃতি প্রাণী এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিও বেদমন্ত্রে স্তুত হইয়াছে। যে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সোমলতার রস নিষ্কাশন করা হয় তাহার নাম গ্রাব, ঋঙ্‌মন্ত্রে এই গ্রাবের স্তুতিও দৃষ্ট হয়। যদি এখানে এরূপ শঙ্কা উপস্থিত হয় যে মরণশীল বস্তুর স্তুতি নিরর্থক, এইপ্রকার ইন্দ্রাদি দেবতার স্তুতিও নিরর্থক হইবে। এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ "মহৈশ্বর্য্যশালিনী দেবতা মহাভাগ্যা"—দেবতার এই মহাভাগ্যপ্রযুক্ত একই আত্মা বহুরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। ইহা সমর্থন করিবার জন্য নিরুক্তগ্রন্থের টীকাকার দুর্গাচার্য্য—"রূপং রূপং মঘবা বো ভবতীতি"—(ঋ স, ৩।৩।২৪) এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমস্ত দেবতাই যে একই

আত্মার অভিব্যক্তি ইহা সমর্থন করিবার জন্য দুর্গাচার্য্য "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ (ঋ-স, ২।৩।২২) এই প্রসিদ্ধ ঋঙ্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর যাস্ক বলিয়াছেন—সমস্ত দেবতা একই আত্মার বিভূতি হইলেও একস্য আত্মনঃ অন্যদেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি—অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতারা পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন হইলেও সর্ব্বদেবসমষ্টি হিরণ্যগর্ভকে অপেক্ষা করিয়া সকলেই অভিন্ন।

মৃত্তিকাজাত বস্তু পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহারা যেমন মৃত্তিকারূপে এক, এইরূপ অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতা পরস্পর ভিন্ন হইলেও হিরণ্যগর্ভরূপে এক। মৃত্তিকার সহিত মৃত্তিকাজাত পদার্থের অভেদ এবং মৃত্তিকাজাত পদার্থের সহিত পরস্পর ভেদ বলাতে ভেদাভেদবাদ সমর্থিত হইয়াছে। যেমন সমুদ্রের সহিত তরঙ্গ ফেন, বীচির ভেদাভেদ স্বীকার করা হইয়া থাকে, এইরূপ। ব্যাকরণ-শাস্ত্র যেমন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের নিকট নিরপেক্ষ, এইরূপ নিরুক্তশাস্ত্রও সমস্ত দার্শনিকগণের নিকট নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বেদমন্ত্রের আলোচনা করিলে এই ভেদাভেদবাদেই সকলকে উপনীত হইতে হইবে। বেদের সমস্ত উপাসনা-কাণ্ড (কর্ম্মকাণ্ড) এই ভেদাভেদবাদেই পর্য্যবসিত। উপাসনা পরিপূর্ণ হইবার পর পুরুষের জ্ঞানে অধিকার জন্মে। জ্ঞানকাণ্ড বিবর্ত্তবাদে প্রতিষ্ঠিত। পরিণাম বা ভেদাভেদ-বাদে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিবর্ত্তবাদে বোধ জন্মে না।

"ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে
স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ॥

(সংক্ষেপ-শারীরক, ২।৬১)

সংক্ষেপশারীরকের এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে পরিণামবাদ কি। বিবর্ত্তবাদের সহিত পরিণামবাদের কোন দিনই বিরোধ নাই। বিবর্ত্তবাদের প্রথম স্তর পরিণামবাদ।

যাহা হউক, যাস্ক বিভিন্ন দেবতা কেন স্তুত হইয়া থাকেন তাহা বলিয়াছেন। অশ্ব, ওষধি পর্য্যন্ত কেন স্তুত হইয়াছে, স্তুতিকর্ত্তা এই হীন বস্তুগুলির কেন স্তুতি করিয়াছেন তাহাই দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—'অপি চ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভিঃ ঋষয়ো স্তুবন্তি ইত্যাহুঃ'—যাস্ক 'ইত্যাহুঃ' বলায় যাস্ক হইতেও প্রাচীনতর নিরুক্তকারগণও যে এই কথাই বলিয়াছেন তাহা সূচিত হইয়াছে। দেবতারা ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন তাহা নহে। অশ্বাদি সমস্ত সত্ত্বেরই প্রকৃতি-প্রসিদ্ধ এক সত্তা মহান হিরণ্যগর্ভ। স্থাবর-জঙ্গমভাবে একই হিরণ্যগর্ভ নানামন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড যে স্থলে বিরত হইয়াছে সেই স্থানকে আদি করিয়া জ্ঞানকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রারম্ভে 'অশ্বমেধ-ব্রাহ্মণ' দেখিতে পাই। অশ্বমেধ-ব্রাহ্মণে যে প্রজাপতির উপাসনা বলা হইয়াছে তাহাতেও ঐকান্তিক শ্রেয় লাভ সম্ভব নহে বলিয়াই তারপর ব্রহ্মবাদ আরম্ভ হইয়াছে। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও নির্গুণ ব্রহ্ম এই একই তত্ত্ব উপাধিযুক্ত হইয়া স্থূল ও উপাধিরহিত হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া-সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বর; এই ঈশ্বর সূক্ষ্ম সমষ্টি-প্রপঞ্চের সহিত যুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভ-রূপে প্রকাশমান হয়। কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ডই বটে। এই উপাসনাকাণ্ডের শেষ গতি হিরণ্যগর্ভ-ভাবপ্রাপ্তি; ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। যদি আমরা মনে করি কর্ম্মকাণ্ডে আধ্যাত্মিকতার স্থান নাই, কেবলমাত্র স্থূল অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, গো, অশ্ব, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি লইয়া ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহ পর্য্যবসিত হইয়াছে তবে যাস্কের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে। যাস্ক বলিয়াছেন—'প্রকৃতিসর্ব্বনামাচ্চ'—

মহানাত্মা বিশ্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সমস্তরূপে অবস্থিত, এইজন্য যাহাদিগকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে অদেবতা মনে করি তাহারা হিরণ্যগর্ভেরই বিপরিণাম এবং তাহারা সর্ব্ববিধ কল্যাণ-বিধানে সমর্থ। 'আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি', 'আত্মা অশ্বঃ' 'আত্মা আয়ুধম্', 'আত্মা সর্ব্বম্ দেবস্য দেবস্য' (দৈবতকাণ্ড, নিরুক্ত)। রথ, অশ্ব প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুও প্রকৃত তুচ্ছ নহে। সমস্ত ঋঙ্মন্ত্রে একই পরমপুরুষ রথ, অশ্ব, বৃক্ষ, পুষ্প ইত্যাদি রূপে স্তুত হইয়াছেন। এইজন্য সমস্ত ঋঙ্মন্ত্রই আত্মস্তুতিতে পর্য্যবসিত।

স্থানে স্থানে স্তুতিঃ সর্ব্বা স্থানাধিপতিভাগিনী।
আত্মপ্রতিষ্ঠা বোদ্ধব্যা তথোপকরণস্তুতিঃ॥

সেস্থলেই যাহার স্তুতি করা হইয়াছে সেই উপকরণের স্তুতির সহিত আত্মাই স্তুত হইয়াছেন।

পিটারসন, কিথ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলকে বহু পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ তাহাতে বহু অধ্যাত্মবিদ্যার মন্ত্র পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার নির্দ্দেশ করিয়াছে, যাহা কিছু অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা তাহা আরণ্যক এবং উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত, কারণ আমরা এখানে যে সকল অধ্যাত্মবাদের মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছি তাহার সমস্তই দশম-মণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য মণ্ডলের মন্ত্র। কর্ম্মকাণ্ডের আরও বহু মন্ত্র উল্লেখ করা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধের দীর্ঘতার ভয়ে তাহা করা হইল না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আরণ্যক বা উপনিষদে যে অধ্যাত্মবাদ পরিস্ফুট হইয়া এক মহীরুহে পরিণত হইয়াছে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে তাহাই বীজাকারে নিহিত এবং কর্ম্মকাণ্ডের সমস্ত মন্ত্র অতি যত্নসহকারে অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, মন্ত্রভাগও অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ, কেবলমাত্র আরণ্যক ও উপনিষদের সহিত দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য।

ধর্ম্মের নামে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ধর্ম্মের নামে দেশে দেশে দ্বেষাদ্বেষি
ধর্ম্মের নামে ভায়ে ভায়ে রেশারেশি।
ধর্ম্মের নামে স্বদেশে পীড়ন করে
কালাপাহাড়ীর আসুর দম্ভ ভরে।
ধর্ম্মের নামে ভগবানে নাহি মানে
মানুষে পীড়িয়া তাঁর বুকে শেল হানে।
ধর্ম্মের নামে শনি হয়ে ঘরে ঢোকে,
হরে পরধন সাধু সেজে ক্রূর লোকে।
ধর্ম্মের নামে অবরেণ্যেরে বরি
মাথা কোটে লোকে তাহার চরণ ধরি।

ধর্ম্মের নামে হরে নয়নের আলো,
বলে—চোখ বুজে অন্ধ থাকাই ভালো।
ধর্ম্মের নামে হ'য়ে সম্বল-হারা
ভিখ মাগে পথে সাথে লয়ে সুতদারা।
ধর্ম্মের নামে পশু হতে লোকে চায়,
বর্ব্বরতার স্তরে পুন ফিরে যায়।
ধর্ম্মের নামে শোণিত ঝরেছে যত
রণাঙ্গনেও কখনো ঝরেনি তত।
ভগবান আর মানুষে করিয়া হেলা
দেশে দেশে শুধু চলে ধর্ম্মের খেলা।

অপধর্ম্মের অবসান হবে কবে?
মানুষ আবার সত্য মানুষ হবে?

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়

(তিন)

আমার একটি খুড়তুতো ভাইয়ের নেত্রনালী হইয়াছে। ইহা অপারেশন করার জন্য আমাদের পরিবারের অনেকের সহিত তাহার মা ও বাবা তাহাকে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। অপারেশনের পূর্বে তাহাকে লইয়া মায়ের কাছে যাই। পূর্বেই এই অপারেশনের কথা মাকে বলিয়াছিলাম। মার কাছে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই বলিলাম (ছেলেটিকে দেখাইয়া), মা, এরই চোখের অপারেশন করা হবে। মা বলিলেন, দেখি কেমন চোখ। দেখিয়া বলিলেন, বাবা, এখন হরেক রকম রোগও হয়েছে যেমন, ডাক্তার বা চিকিৎসকও হয়েছে তেমন! আগে এত রোগও হত না, এত চিকিৎসাও লোকে জান্‌ত না। এই রাধুরই কত রকম রোগ, আর কত বা চিকিৎসা! আর কত দেবতারই বা মানত করলাম, কিন্তু সে আর কিছুতেই ভাল থাকে না। ঠাকুরের যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। মায়ের কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম; ভাবিলাম, তুমি কিছুই জান না! কথায় মনে হয় রাধুই যেন তাঁহার সর্বস্ব। মা-ঠাকরুণ নিজেকে অত্যন্ত চাপা রাখিতেন, তাঁহার চালচলন দেখিয়া কাহারও শক্তি নাই যে তাঁহাকে চিনিতে পারে। তিনি নিজে যাহাকে ধরা দিয়াছেন, একমাত্র তিনিই মাকে চিনিয়াছেন। মা ছেলেটির চোখ দেখিয়া কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। চোখ অপারেশন ভাল ভাবেই হইল। পরে দেশে ফিরিবার পূর্বে আমার খুড়ীমা তাঁহার ছেলেমেয়েদের লইয়া একদিন সকালবেলা মাকে দর্শন করিতে গেলেন। তখন মা পা মেলিয়া বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ফল কাটিতেছেন। তাঁহারা যাইয়াই মাকে প্রণাম করিলেন। মা খুড়ীমাকে বলিলেন, এই সব ছেলেমেয়েই-কি তোমার? তিনি বলেন, হাঁ মা, আমারই সব। মা বলিলেন, বেশ বেশ, দেখেছ, এদের ভক্তি কত! সবগুলি ছেলেমেয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছে। বলিলেন, বৌমা এখানকার সব জানে, তবুও সকালবেলা তোমাদের নিয়ে এসেছে; এখন ঠাকুর-পূজোর সময়, তোমার সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারব না। খুড়ীমা বলিলেন, সে এখন আসতে বাধা দিয়েছিল। আমাদের আর সময় নেই, সেজন্যই এখন এসেছি। আরও বলিলেন—মা, আমরা দেশে যাওয়ার সময় ক্ষীরোদকে কিছুদিনের জন্য দেশে নিয়ে যেতে চাই। এতে আপনার কি মত জানতে ইচ্ছা। মা বলিলেন, দেশে নিয়ে যাবে, এতে দোষ কি আছে? তবে রাস্তাখরচটি দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলেই হয়। তা হবে, বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন।

আমার পরিচিতা একটি মেয়ে শ্রীশ্রীমাকে কখনও দেখে নাই, তাহার স্বামী ওসব খুব পছন্দও করেন না। মেয়েটি আমাকে একদিন জোর করিয়া ধরিল, তাহার স্বামী আফিসে চলিয়া গিয়াছেন, বাসায় ফিরিবার পূর্বে যেন

তাহাকে লইয়া মাকে দর্শন করাইয়া আসি। বলিলাম, এসময় মা বিশ্রাম করেন, এখন গেলে দেখা পাবে না। সে বলিল, চল না, পরে যা হয় হবে। তাহাকে লইয়া মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখি গোলাপ-মা প্রসাদ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাছেই গেলাম। ভাবিলাম, মা যখন জাগিবেন তখন দর্শন হইবে। গোলাপ-মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, তোর যত সব কাণ্ড, এখন একে নিয়ে কেন এলি? জানিস না, এখন মায়ের বিশ্রামের সময়? বলিলাম, কেন বকছেন? মা-ঠাকুরুণ না জাগলে আমি তাঁর কাছে যাব, আমি কি এতই পাগল? একটু পরেই শুনিলাম মা আমাকে ডাকিতেছেন, বৌমা এদিকে এস। মায়ের কাছে গিয়া দেখি, মা তক্তপোষের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিলেন, ঐ মেয়েটি কে মা? এখন এসেছে বলে গোলাপ বুঝি তোমাদের মন্দ বলেছে? এ যে ঠাকুরের রাজ্য। এখানে কোন আইন-কানুন নেই। এখানে সকলেরই অবারিত দ্বার। যখন যার সময় ও সুযোগ হবে, তখনই আসবে। তুমি কিছু মনে করো না, মা। আমরা মাকে প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিলাম। গোলাপ-মাকে বলিলাম, দেখলেন? মানুষ কতখানি আর্তি নিয়ে মাকে দর্শন করতে আসে। শুধু মা কেন, আপনাদেরও দর্শন করতে চায়। কিন্তু আপনারা মায়ের দ্বারী কি না, মানুষকে ঠেলে বিদায় করতে চান। মা যে আমার এক দুজনের মা নন্, তিনি সকলের মা। গোলাপ-মা হাসিয়া বলিলেন, যা যা, তোরই জিত হয়েছে। গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গৌরী-মা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতি আমাদের যেরূপ স্নেহ করিতেন তাহা অতুলনীয়।

কলিকাতার লেডি ডাক্তার শ্রীমতী প্রমদা দত্তের বাড়ী আমাদের দেশে। তিনি আমাদেরই আত্মীয়া। তাঁহার স্বামীও ছিলেন ডাক্তার। তাঁহারা ব্রাহ্ম। প্রমদা দত্ত এক দিন মাকে দর্শন করিতে চাহিলেন, আমাকে লইয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিলেন। একদিন প্রস্তুত হইলাম। তিনি ডাক্তারী পোষাক না পরিয়া একখানা লালপেড়ে কাপড় পরিলেন। পায়ে জুতাও দিলেন না। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা লইয়া রওনা হইলেন। মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়া উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পাশের ঘরটিতেই মায়ের ধ্যানস্থ একখানা ফটো থাকিত। ইহা দেখিয়াই প্রমদা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার ফটো? বলিলাম, মায়েরই। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ইনিই স্বয়ং মা। আমার হাসি পাইল, ব্রাহ্ম হইয়া এসব কি বলেন। উপরে যাইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কতক্ষণ পরে সরলাদিকে মা বলিলেন, ঐ খোকাকে এনে এঁকে দেখাও ত। খোকাটি যে কাহার, সেকথা আমার মনে নাই। মা এই কথা বলিতে প্রমদা দত্ত আমাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কি করে জানলেন যে, আমি ডাক্তার? পরে ছেলে দেখানো হইল। বিকাল চারটায় ঠাকুরকে মিষ্টিভোগ দেওয়া হইয়াছে। মা সকলকে প্রসাদ খাইতে দিলেন, কিন্তু প্রমদা দত্তকে দিলেন না। আমার যেন একটু লজ্জাই করিতে লাগিল। এদিকে প্রমদা দত্ত কেবলই আমাকে বলিতেছেন, সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে কেন দিলেন না? আমি বলিলাম, তুমি মাকে বল না। আমার হাতে প্রসাদ যাহা আছে, তাহাও তাঁহাকে দিতে আমার সাহস হয় নাই। পরে প্রমদা দেবী মাকে বলিলেন—মা, সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে দিলেন না কেন? মা বলিলেন, তুমি যে বাছা ব্রাহ্ম, তুমি ইচ্ছা করে না নিলে কি করে দিই? তিনি বলিলেন, আমাকে একটু প্রসাদ দিন। মাও ঠিক একটি রসগোল্লা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা তাঁহার হাতে দিলেন।

প্রমদা দেবী প্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—দেখ, আজ আমি যেখানে গিয়েছিলাম তা স্বর্গ। যাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করে এসেছি তিনি স্বয়ং রাধা। তোমার জন্য একটু প্রসাদ এনেছি, তুমি যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে নাও তবে দেব। তিনি বলিলেন, আমার মত নগণ্য একজন মায়ের প্রসাদ না খেলে বিশ্বজননীর কি এসে যায়, এই বলিয়া প্রসাদ হাতে করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া খাইলেন। প্রমদা দেবীও সব বর্ণনা করিয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, আজ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধারাণীর পাদপদ্ম দর্শন করে এসেছি, ধন্য হয়ে এসেছি।

খুড়ীমা প্রভৃতির দেশে আসা কালীন আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাই নাই। দেশে আসিয়া আমার কাকা আমাকে একখানা পত্র দিলেন। লিখিলেন ঃ মা, তুমি আস নাই বলিয়া বড়ই দুঃখ হইতেছে। তুমি জগন্মাতার পাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়াছ ইহা ভাবিলে আনন্দের অবধি থাকে না। যদি কোন দিন দেশে আস, তবে যত দোষের গোড়া মনটাকে মায়ের পাযে বলি দিয়া আসিও। তবেই আর কোন ভাবনা থাকিবে না। আমি মাকে সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া শুনাইলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, মন কি শুধু দোষেরই গোড়া? ব্রহ্মপদ লাভ করার জন্য ছুটেছ, এখন মনকেও সঙ্গে নিতে হবে। সেখানে পৌছলে তখন এরা কেউ থাকবে না। এখন মনের সহায়তারই বেশী দরকার। শুদ্ধ মনই তো মানুষকে পথ দেখিয়ে নেয়। আমি সে কথা আমার কাকাকে লিখিলাম। শ্রীশ্রীমা আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, দুষ্ট মনকে যদি মোড় ফিরিয়ে দাও, তবে সে-ই ইষ্টকে ধরতে পারে। তা তোমাদের ভাবনার কোনই কারণ নেই। ঠাকুর তোমাদের হাতে ধরেই আছেন। যে কোন অবস্থায় তিনি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছেন। মায়ের ওসব কথায় যে কত শক্তি রহিয়াছে, ইহা জীবনে অনেক অনুভব করিয়াছি।

এক দিন বিকাল বেলায় কয়েক জন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। এক জন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, অনেকেই বলে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি অবতার নন, এ কি সত্য? মা বলিলেন, তা তারা বলতে পারে, কারণ দেহধারী এক জন মানুষকে অবতার বলে ধরে নেওয়া সহজ নহে। এক কথায় সকলেই যদি অবতার বলে ধরে নিতে পারতো তবে আর তাঁকে মার খেয়ে প্রেম বিলাতে হত না।

এই বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দিয়া শতধারে জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, অবতার-পুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে? দু-এক জনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন। ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত বের হত তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়। তাহার পর মা 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল' গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই কথাটি কি ভাবে বলা হইয়াছিল, কিভাবে লোকে বুঝিয়াছিল, ইহার প্রকৃত অর্থ কি সব বলিয়া সর্বশেষে বলিলেন, অবতার দিয়ে তোমাদের কাজ কি? যার যার গুরুই তার কাছে অবতারের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ—এই মনে করে বসে থাক।

"নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আসছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতীয় রাষ্ট্র, ধর্ম ও সংস্কৃতি

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্-এ

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ঐহিক (secular) আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত; অর্থাৎ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকলের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ন্যায়নীতি-বিরুদ্ধ না হইলে রাষ্ট্র কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না, বা সম্প্রদায়গত ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্র কাহাকেও সাহায্য করিবে না। ব্যক্তিগত ধর্মানুষ্ঠানে সকলেরই অধিকার থাকিবে। সংক্ষেপে রাষ্ট্র কোন ধর্মমতকে প্রশ্রয় দিবে না বা ধর্মের দাবীতে কিছু গ্রাহ্যও হইবে না। ঐহিক বা লৌকিক কল্যাণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষে বহু ধর্মের, বহু বর্ণের, বহু জাতির লোকের বসবাস—সুতরাং কোন একটি বিশেষ ধর্মমত রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে গ্রহণীয় হইতে পারে না। সুতরাং State Religion বা রাষ্ট্রধর্মের স্থান শাসনতন্ত্রের মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই মতের যাঁহারা পরিপোষক তাঁহারা বলেন যে, ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ ধর্মমত ও অনুষ্ঠানাদি পরস্পর-বিরোধী—কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বা অজ্ঞেয়বাদী, কেহ বা নিরীশ্বরবাদীর পর্যায়ে পড়েন। ধর্মসম্প্রদায়গুলিও পরস্পর বিরোধে উন্মত্ত। কাজেই আদর্শ প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে রাজশক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সুবিবেচনার বিষয় নহে।

ঐহিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে মতবাদ প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহার অর্থ হইতেছে যে ভারতবর্ষে হিন্দুই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে হিন্দুধর্মকেই রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। ভারতের সংস্কৃতি নানা জাতি ও নানা ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত হইলেও হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দুধর্মই রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রহণীয় হওয়া সংগত। বিশেষতঃ যে ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য আমরা গৌরব বোধ করি সেই সংস্কৃতির মূল উৎস যখন হিন্দুধর্ম, তখন সেই ধর্মকে দূরে সরাইয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতিটুকুকে গ্রহণ করার প্রকৃত সার্থকতা নাই।

দুইটি মতবাদের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছে এবং সত্য আছে বলিয়াই কোনটিকেই আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। নিরপেক্ষ ভাবেই আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোন মতবাদটির গুরুত্ব অধিক। এইজন্যই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞা কি তাহাই আমাদের সর্বপ্রথম নিরূপণ করা প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের যোগাযোগ শ্রেয় কি না তাহাও আমাদের বিচার্য বিষয়।

ইংরেজীতে যে অর্থে 'Religion' কথাটি ব্যবহৃত হয়, ধর্মের অর্থ তাহা হইতে অনেক গভীর ও ব্যাপক। Religion একটা বিশেষ পন্থাকেই নির্দেশ করে—যেমন Christianity বা ইসলাম; কিন্তু ধর্ম-অর্থে আমরা একটি বিশেষ পন্থাকে স্বীকার করি না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে: 'ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি'—নিখিল জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি হইল ধর্ম, এই ভূলোকে নরগণ ধার্মিকের নিকট গমন করে।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মের অর্থ অত্যন্ত উদার। মানবজাতির জন্যই ধর্ম আবশ্যক—ইহাই আমাদের প্রাচীন আদর্শ। আমাদের বেদ-উপনিষদে সেই বিশ্বকল্যাণকর ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহা বিশ্বকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। ধৃতিই সেই ধর্মের গুণ। যে অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বচরাচর ধৃত হইয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই ধর্ম। মহাভারতে কর্ণপর্বে উক্ত হইয়াছেঃ যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ—যাহা অহিংসা-সংযুক্ত, যাহাতে ধারণশক্তি আছে, তাহাই ধর্ম। অহিংসা ও প্রেম ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য—উপাদান তো নিশ্চয়ই। সুতরাং ধর্মের পরম লক্ষ্য প্রকৃত মানবতা। নিখিল বিশ্বের একাত্মতা-বোধই হিন্দুধর্মের শেষ নির্ণয়। ভারতের বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণশাস্ত্র আমাদের সেই উপদেশই দিয়া আসিতেছে। বেদবেদান্ত-পুরাণ এক একটি পন্থা নহে। মানবধর্মের চরম অভ্যুদয় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে। হিন্দের ধর্ম বলিয়া ইহাকে হিন্দু-নামে অভিহিত করিতে দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম বলিতে যাঁহারা একটি বিশিষ্ট পন্থাকে নির্দেশ করেন, তাঁহারা আসলে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মকে অবলোকন করেন নাই। যাহারা হিন্দু-ধর্মকে সংকীর্ণ, অনুদার ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা ধর্মের গূঢ় অর্থ বিচার করিয়া দেখেন নাই। কালক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া জাতির যে বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাই ধর্মের উপর চাপাইয়া দিয়া ধর্মকে অনুদার বলিয়া আখ্যা দিই। শাস্ত্রে কি উক্ত হয় নাই—ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষিতো রক্ষতি? আমরা ধর্মকে রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়াই ধর্মের শক্তি আজ আমাদের মধ্যে লুপ্ত। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের বেদ-উপনিষদ আমাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম—আমাদের গৌরবকে আজিও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ধর্মরাষ্ট্র, রাজধর্ম ও ধর্মযুদ্ধ প্রভৃতি কথাগুলির অর্থ ভাবিয়া দেখিলে স্বতই উপলব্ধি হয় যে, ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিল। শুক্রনীতিসারে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, যে রাজা ধর্মপরায়ণ তিনি দেবাংশজাত, আর যে রাজা পরপীড়নকারী সে রাজা রাক্ষসাংশ-সম্ভূত। এইজন্যই রাবণকে পুরাণশাস্ত্রে রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে ভীষ্ম বলিয়াছেন, যেমন সকল প্রাণী পর্জন্যকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, পক্ষিসকল যেমন মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ ধর্মপরায়ণ নৃপতিকে আশ্রয় করে।.........রাজার গুণনির্ণয়-সম্বন্ধে ভীষ্ম উপদেশ দিয়াছেনঃ 'মৃদুবুদ্ধিজাত ধার্মিক ও দয়াবান ব্যক্তিকে লোকে ক্লীব আখ্যা দেয়, সেই জন্যই এইরূপ রাজাকে লোকে পছন্দ করে না। সাহসী বীর শত্রুসংহারক, অথচ অনৃশংস জিতেন্দ্রিয় স্নেহপরায়ণ সুব্যবস্থাপক নৃপতিকে প্রজাগণ আশ্রয় করিয়া থাকে।

রাজাই ধর্মের রক্ষক। রামায়ণে দেখিতে পাই কোশলাধিপতি দশরথ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষার্থ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই রাবণবধ ও সীতার বনবাস; ধর্মরক্ষার জন্যই মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের অবতারণা। ধর্মের জন্যই হরিশ্চন্দ্র সর্বস্বান্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করিয়া চণ্ডালবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মের আদর্শই ভারতীয় নৃপতিবর্গকে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি-পরিচালনায় প্রেরণা দিয়া আসিয়াছে। উপনিষদের কাহিনীর মধ্যে আমরা কৈকেয় অশ্বপতি, প্রবাহণ ও বৈদেহ

জনক প্রভৃতি যে রাজন্যবর্গের উল্লেখ পাই তাঁহারা সকলেই আদর্শ ধর্মচরিত্র। তাঁহারা একদিকে ব্রহ্মবিদ্, অন্যদিকে বিরাট সাম্রাজ্য সুপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহলোককে তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা কর্মকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

রাজা যে মাত্র ধর্মের রক্ষক তাহা নহে, ধর্মও তাহার পালনীয়। রাজ্যের কল্যাণের জন্য যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, বর্ণভেদে কর্ম-নিরূপণ দ্বারা সমাজ-পালন, দণ্ডনীতির দ্বারা দুষ্টের শাসন ও রাজ্য-রক্ষা—ইহাই ভারতীয় রাজধর্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। শুধু সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া আপন আপন সুনির্দিষ্ট কর্ম নির্বাহ দ্বারাই ধর্মের অর্থ প্রতিপাদিত হইত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (১৮।৪৫) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে ঃ রাজা কখনই ধর্মের ব্যভিচার করিবেন না। কারণ স্বধর্ম-পালনে সুখ-মোক্ষ, স্বধর্ম-ত্যাগে বর্ণসংকর-সৃষ্টি ও তাহার ফলে লোকক্ষয় ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে রাজধর্ম দ্বারাই প্রজার ধর্ম রক্ষিত হয়।" রাজা স্বয়ং ধর্মদ্বেষী হইলে প্রজার সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে। রাজাকে তাই ধর্মপ্রতিভূ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ আখ্যা দিয়াছেন। রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রাচীনকালে বহু গবেষণা হইয়াছিল। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে ইহার সবিশেষ পরিচয় আছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম শুধু বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল না। প্রাচীন ভারতের সমাজবিধান হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্রে যাগযজ্ঞের সহিত রাষ্ট্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রচেতনার কথা উল্লিখিত। প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা বহুলাংশে যে মানবধর্মের প্রতিপাদক এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সংস্কৃতির সংগে ধর্ম তাই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সভ্যতার উৎকর্ষই সংস্কৃতি, আর সেই সভ্যতার মূল প্রেরণা ধর্ম। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম-প্রচারের পরই সভ্যতার উন্মেষ হয়—ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য দেয়। আর ভারতে ধর্মই একাধারে জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। সংস্কৃতিই জাতির পরিচয়। বিচ্ছিন্নভাবে গুটিকতক শিল্পসৃষ্টি, কারুকলা বা ভাস্কর্যের নিদর্শনই জাতির আসল সংস্কৃতির পরিচয় নহে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রেরণা যে লৌকিক বা secular আদর্শ নয় সে কথা সহজেই প্রমাণিত হয়।

সংস্কৃতির নানা অর্থ আজকাল দেখিতে পাই। কোন কোন প্রগতিশীল লেখক শুধু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা প্রভৃতির উৎকর্ষকেই সংস্কৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার সমন্বয়—একথা মহাত্মা গান্ধীও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস কি তাহা আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমি সাহেব হইয়াছি বলিয়া পিতৃপিতামহকে অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা, বর্তমান সংস্কৃতির রূপান্তর দেখিয়া তাহার প্রাণ-উৎসকেও অস্বীকার করাও তেমনি কম বাতুলতা নহে। আগ্রার তাজ বা ইৎমৎদৌল্যা ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যেই ভারত-সংস্কৃতির সমধিক অভিব্যক্তি। প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণশাস্ত্রই বর্তমানে বিদেশী মনীষিগণের গবেষণার বস্তু। বেদ-উপনিষদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেদিনকার তুলসীদাসী রামায়ণ (রামচরিতমানস) বিদেশী পণ্ডিতসমাজে যে আলোড়ন আনিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়।

রামায়ণে রামরাজ্য-প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম হইতেছে যে, রাজা শুধু ইহকালের নয়, পরকালের ও সহায়ক। শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র প্রজাগণের ঐহিক কল্যাণে নিরত ছিলেন না, তাহাদের পারত্রিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত নৃপতিগণই আমাদের পুরাণ-শাস্ত্রের আখ্যানভাগে বর্ণিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পুরাণের বেণরাজার কথা উল্লেখনীয়। বেণ রাজা রাজ্যমধ্যে সকল প্রকার ধর্ম-আচরণ নিষেধ করিয়াছিলেন। ফলে লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠায় রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণের দ্বারাই বেণরাজা নিহত হন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মই মুখ্যবস্তু এবং সেই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজজীবন পরিচালিত হইয়াছে।

ভারতের নীতিশাস্ত্র ধর্মানুগত। ধর্মকে বাদ দিয়া নীতির অস্তিত্ব নাই। তাই ভারতীয় শাস্ত্রে নীতিবিদ্‌কে ধার্মিক বলা হইয়াছে। বর্তমানের নীতি রাষ্ট্রানুগ। তাই নীতির প্রতি মানুষের আর স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধা নাই—যাহা আছে, তাহা রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতার ভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। রাষ্ট্র তাহার বলের দ্বারা এই বাধ্যতার ভাব মানুষের মনে সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু শুধু আইন-অনুমোদিত নীতির দ্বারা তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে না। কিন্তু ধর্মনীতি মানুষ হৃদয়ের দ্বারা স্বীকার করিয়া লয়। রাষ্ট্রের বন্ধন কখনও শিথিল হইলেও ধর্মের অনুশাসনে ভারতীয় সমাজ আবদ্ধ থাকায় কখনও আমাদের সমাজ-জীবন বিশৃংখলতার দ্বারা পর্যুদস্ত হয় নাই। তবে নানা বিরুদ্ধ রাজশক্তির চাপে সময়ে সময়ে আমাদের সমাজ-জীবনে বিকৃতি দেখা দিলেও তাহা কখনও আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করিতে পারে নাই। ভারতীয় ধর্মের উপর নির্মম আঘাত আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের ধর্মের সহিষ্ণুতাই সেই আঘাত সহ্য করিয়া তাহার গ্রহীষ্ণুতাব দ্বারাই অপরকে আপন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই গ্রহীষ্ণুতাই নিত্য নব সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন: "It would not be possible for this country to give up her characteristic courage of religious life and take up for herself a new career of politics or something else. You can only work under the law of least resistance, and this religious line is the line of life, this is the line of growth and this is the line of well-being in Bharat to follow the track of religion."

ধর্মের ভিতর দিয়াই ভারতের পথ-প্রশস্তি। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে এই ধর্মের স্বরূপ কি? ভারতের ধর্ম সনাতন ও সর্বজনীন। বেদবেদান্তই সেই ধর্মের ভিত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই ধর্মাদর্শই প্রচার করিয়াছেন। রোমাঁ রোলাঁ তাই আমাদের ধর্মকে Universal Gospel আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের ধর্ম তাই বিশ্বজগতের জন্য। আমাদের ধর্ম বিশিষ্ট কোন মতবাদ বা পন্থার সঙ্গে তুলনীয় নহে। শাশ্বত ধর্মের প্রবক্তা স্বয়ং ভগবান; যাহা ভারতীয় ঋষির ধ্যানযোগে প্রকটিত হইয়াছে সেই লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞান-ভাণ্ডার—যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, যাহা অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহের সংগে একত্র একভাবে স্থির হইয়া আছে, তাহাই বেদপদবাচ্য। বেদোক্ত ধর্ম তাই শাশ্বত ও সনাতন। আমরা ধর্মের আঙ্গিক লইয়াই কলহ করি, আসল

সত্যের কাছ দিয়াও যাই না। সেইজন্যই আঙ্গিকের উপর জোর না দিয়া সর্বজনীনত্বের উপরই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠিত হইলে কাহারও কোন দ্বন্দ্বের কারণ থাকিতে পারে না। মনু বলিয়াছেন অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌর্য ও সংযম—এই সকল ধর্ম সকলেরই পালনীয়। এই সর্বজনীন ধর্ম হিন্দুর তো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। অথচ হিন্দুর জীবন-দর্শন এই ধর্মনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মনীতির দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন বিধৃত হইলে কল্যাণ ও শান্তি স্বতঃ উৎসারিত হয়। এই ধর্মনীতির পরিপোষণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য ধর্মানুগ ছিল বলিয়া সমাজজীবনের সহিত তাহার একাত্মতা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রজারঞ্জনেই 'রাজার' সার্থকতা। প্রজাগণের অধিকতর সুখ-সুবিধার জন্যই আধুনিক কালে গণতন্ত্রের অভ্যুদয়। কিন্তু গণ-সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের হৃদয়ের যোগ না থাকায় চারিদিকে আজ মাৎস্য-ন্যায়ের আবির্ভাব দেখা যায়।

ঐহিক কল্যাণই যখন আমাদের রাষ্ট্রের কাম্য, তখন ধর্ম কথাটি রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়িয়া দিবার কি কিছু প্রয়োজন আছে? এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐহিক কল্যাণের ভিত্তিই হইতেছে ধর্মনীতি। আত্মা আছে বলিয়াই দেহ আমাদের প্রিয়। মৃতদেহকে আমরা অগ্নিদগ্ধ করি, সেখানে আমাদের এতটুকু মমতা নাই। ঐহিকতাই আমাদের চরম আদর্শ নয়—এইখানেই পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"Politics without a religious backing is a dangerous pastime reacting in nothing but harm to individuals"—ধর্ম-সমর্থনহীন রাজনীতি একটি বিপজ্জনক ব্যসন, ইহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির অনিষ্ট বই ইষ্টলাভ হয় না। ভারতীয় জীবন-স্বীকৃতির মধ্যে শুধু বস্তুবাদ বা ঐহিকতার প্রশ্রয় নাই—একথা নেতাজী সুভাষচন্দ্রও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "Indian Struggle"-গ্রন্থে যে অর্থে 'সাম্যবাদ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন বিশিষ্ট মতবাদ নহে—'সমন্বয়'-অর্থেই তিনি সাম্যবাদ কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন—"I want to strike the golden mean between the demands of spirit and matter, of the soul and of the body and thereby progress simultaneously." ভারতের ঐতিহ্যই তাহার স্বকীয়তা—সেই সংস্কৃতির মূল উৎসই তাহার শাশ্বত ধর্ম—এই জন্যই পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের দ্বারা ভারতের প্রকৃত ইষ্ট লাভ হইতে পারে না। ভারতীয় শাসনতন্ত্র পাশ্চাত্ত্য ন্যাশনালিজম্-সুলভ ঐহিকতাকে গ্রহণ করিয়া ঐহিক রাষ্ট্রের আদর্শ বজায় রাখিয়াছে, ধর্মকে সে গ্রহণ করে নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম পৃথিবীর যে কোন অংশের রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা বহু উদার ও মানবতার পরিচায়ক। অহিংসার মূলাধার শাশ্বত ধর্মকেই রাষ্ট্র হইতে বর্জন করিয়া জগতের নিকট আমরা কি লইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইব? শুধু মুখের বাণীতেই তো অহিংসার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় না। তাই আজ অহিংসার ব্যর্থতা প্রতিপদেই প্রতিপন্ন হইয়া চলিয়াছে। ঐহিকতা যে রাষ্ট্রের আদর্শ, যেখানে নীতিবোধের প্রেরণা ধর্ম হইতে উদ্ভূত নয়, সেখানে কথায় কথায় অহিংসার বাণী উচ্চারণ কি অসংগতির পরিচয় দেয় না? আজ দেশে প্রকৃত ধর্ম-চেতনার অভাবেই চৌর্য, শাঠ্য, নৃশংসতা ও স্বার্থপরতার বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ বিদ্বেষ মানবতাকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছে। আজ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতের আদর্শ এটম্ বোমা নহে, ভারতের আদর্শ ঐকাত্ম্যবাদ, বিশ্বপ্রেমের দ্বারা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা; তাহা ঐহিকতা বা সংকীর্ণ জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের দ্বারা সম্ভব নহে।

একটি ভাগবত জীবন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

ইংরেজীতে একটি উক্তি পড়িয়াছিলাম "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিচিত।" এই উক্তিটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত মানুষটির প্রতি সুপ্রযোজ্য বলা চলে। স্বামী জগদানন্দ নামে সুপরিচিত, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসি-সংঘের একজন শ্রেষ্ঠ সাধু গত ৪ঠা ডিসেম্বর পবিত্র বৃন্দাবনধামে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। অন্তকালে তাঁহার শেষ বুলি ছিল 'মা' 'মা'। দেহত্যাগের দুই ঘন্টা পূর্ব্বেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার অসদ্ভাব ঘটে নাই। এইভাবেই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার যে মৃত্যু, তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এই মহাত্মা। Christian patience নামক গ্রন্থের লেখক বলিয়াছেন "স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অপেক্ষা জীবাত্মার সুস্থাবস্থার আর কোনও ভাল প্রমাণ থাকিতে পারে না।" ইহারই নাম গীতার 'মনঃপ্রসাদ'। এই অক্ষুব্ধ চিত্তপ্রসাদের অদ্ভুত ক্ষমতাই স্বামী জগদানন্দকে ভগবৎকিঙ্করররূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল।

জগদানন্দজী অত্যন্ত সূক্ষ্মধীসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যাহার বলে উপনিষদের জটিল উপদেশ-সমূহের গভীর গহনে তিনি প্রবেশ করিতে পারিতেন। "অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" প্রভৃতি যে বিংশতিসংখ্যক গুণকে ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'জ্ঞান' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, মনে হয় তিনি সেগুলি অনেকাংশেই স্বকীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। একবার কাশীতে ৺বিশ্বনাথের রাস্তায় অনবধানতা-বশতঃ একটি শিশুর সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় শিশুটি পড়িয়া যায়; তাহাতে তাহার অভিভাবক তাঁহাকে অযথা তিরস্কার করেন। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তাঁহার মনেও একটু উষ্মার সঞ্চার হইতে অমনই তাঁহার মনে হইল গীতার বাণী "অহিংসা সত্যমক্রোধঃ" (১৬।২) আর তৎক্ষণাৎ উদীয়মান কোপাভাস প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন। এ ঘটনা ঘটে সন্ন্যাসী হইবার অনেক পূর্ব্বে। এমনই ছিল তাঁহার আত্মনিরীক্ষণ ও আত্মানুসন্ধান—আমরণকাল।

ইমানুয়েল কান্ট বলিয়াছেন, সৎ ইচ্ছা ব্যতীত একেবারে নির্দ্দোষ সৎ আর কিছুই নাই। স্বামী জগদানন্দের মধ্যে যে এই বৃত্তিটি প্রভূত পরিমাণে ছিল শুধু তাহাই নহে, তাহার রূপ অর্থাৎ প্রকৃতি ছিল একেবারে অনুপম। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, গুরুগম্ভীর পাদন্যাস ও উন্নত বপুর সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও অধিক সমুন্নত প্রকৃতি। তাই সন্ন্যাসী ও ভগবৎপরায়ণ গৃহী এই উভয় শ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইতেন। যতদূর মনে পড়ে সেন্ট ইগ্‌নেশিয়াস্-সম্বন্ধে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে যে তিনি যদিও ছিন্নবস্ত্রে আবরিত থাকিতেন, তথাপি তাঁহার বদনমণ্ডলে এমন একটি প্রভাব বিরাজ করিত যে, যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতেই বহুসন্ন্যাসীর মধ্যেও তাঁহাকে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারিত। স্বামী জগদানন্দ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলে চলে। বহুবেষ্টিত হইলেও মনে প্রশ্ন উঠিবে "ইনি কে?"

এমন একটি সাচ্চা সাধুর পূর্ব্বজীবনের একা

আধটু ইতিবৃত্ত জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। রমণী ভট্টাচার্য্য ছিল তাঁহার বাড়ীর নাম। শিলং হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত শ্রীযুক্ত বাসমণি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেনঃ "রমণীবাবু বি-এ, বি-টি ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার ভুলালি পরগণায় পাটলি-পাড়া গ্রামে মধ্যমাবস্থাসম্পন্ন মেধাবী পণ্ডিত-পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার এক সহোদর অতি তেজস্বী পণ্ডিত ছিলেন।"

যদিও তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই তথাপি তাঁহার হৃদয় ছিল পরম বদান্য। কার্লাইল্ বলেন, ক্ষুদ্রাশয়তাই দারিদ্র্যের মূল-স্বরূপ, তাঁহার হৃদয়ে কিন্তু এই ক্ষুদ্রাশয়তার স্থানই ছিল না। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান ছিলেন। যতদূর জানা আছে তিনি ভালভাবেই পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন এবং গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল শিলং। অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্' ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর' এই কাগজদ্বয়ের প্রভাবে শিলংএ স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। এই খানেই তিনি কয়েক জন প্রাণবান যুবকের সংস্পর্শে আসেন এবং ম্যাক্সমূলার-বর্ণিত 'ভারতের খাঁটি সাধু' পরমহংসদেবের অমর বাণীগুলি এবং শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রী'রামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হন। অতি শীঘ্রই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া গেলেন।

তাঁহার প্রকৃতির কমনীয়তা ও চরিত্রের পবিত্রতা-সূচক একটি ছোট দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। একদিন তাঁহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সেই বন্ধুটি কৌতুকবশে তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রীর আলাপ করিয়া দিতে চাহেন। তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হন না, অথচ বন্ধুটিও ছাড়েন না। অবশেষে রহস্যপ্রিয় বন্ধুটি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর আটকাইয়া রাখেন। কিন্তু তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা গেল না। অতর্কিত ভাবে জানালা গলিয়া লম্ফ দিয়া বাহিরে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। তখন তিনি অবিবাহিত যুবক। কিন্তু এই নিতান্ত শুদ্ধিকামী যুবকের 'প্রকৃতি-সম্ভাষণে' এই অরুচির মধ্যে তো কোনও ছলনা ছিল না। তাইত বন্ধুগৃহ হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে গবাক্ষ দ্বারা নিষ্ক্রমণ তাঁহার উৎকট আন্তরিকতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইতোমধ্যে 'মাষ্টার মহাশয়' গৃহস্থজীবন যাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যথাসময়ে একটি সুশীলা বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। ধার্ম্মিক বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি তখন শিলংএ বিস্তৃতি লাভ করিলেও তিনি অনাড়ম্বর ভাবে গৃহস্থের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার মধ্যে কোনও লোকদেখানো ভাব বা সংকোচ কিছুই ছিল না। বালিকা পত্নীকে কোনও কষ্ট বা দুঃখ দেন নাই।

'মাষ্টার মহাশয়' সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনুস্মৃতির প্রতি আমরণ কাল তাঁহার অচলা আস্থা ছিল। দেশ ও কালে প্রচলিত বেদবোধিত ব্রাহ্মণোচিত সদাচারে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। এমন কি তিনি অ-বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অন্নও লইতেন না। সেই জন্য প্রায় দুই মাস কাল তাঁহাকে স্কুলের কঠিন শিক্ষকতা করিয়াও দুইবেলা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইয়াছে। শাস্ত্র, দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি তাঁহার এত পক্ষপাতিত্ব ছিল যে সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি তাঁহার জনৈক বর্ষীয়ান পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্রাহ্মণবন্ধুকে খাদ্য-বিষয়ে প্রচলিত ব্রাহ্মণাচারে পরিনিষ্ঠিত থাকিতে উপদেশ দেন। বন্ধুটি শেষ বয়সে চিরাচরিত নিয়ম হইতে একটু সরিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি নিষেধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি পাইলেন তাঁহার

পরম দেবতা—জীবনের সারাৎসার পরমসত্যকে। পাশ্চাত্ত্য দর্শন লইয়া পূর্বে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার চিত্ত-প্রকোষ্ঠ হইতে হেগেল, হার্বার্ট স্পেনসার, উইলিয়াম জেম্‌স্ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। কচকচি আর ভাল লাগে না। যদি রামকৃষ্ণ বলেন বেদ সত্য, তবে উহা সত্য; যদি তিনি বলেন বেদ মিথ্যা, তবে উহা মিথ্যা। ইহাই ছিল তাঁহার মত, ইহাই ছিল তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস। সকল সংশয় দ্রবীভূত হইতে লাগিল। স্থির করিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন—সঙ্গী দুই জন, কলিকাতা হইতে আরও একজন সঙ্গে চলিলেন। বন্ধু-চতুষ্টয়ের মধ্যে কনিষ্ঠটি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাঁহার বিশ্বাসের মাত্রা ও আনন্দের পরিমাণ যেন সমতুল। মাতৃসমাগমের উল্লাস যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিতেছিল। দার্শনিক ও গম্ভীরপ্রকৃতি রমণীর উৎকণ্ঠা আকুল—কিন্তু তথাপি দ্বিধা কাটে নাই। তৃতীয় ৺প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-ই (পরে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অগ্রণী) গুরুলাভের জন্য তখন উৎকটভাবে ব্যাকুল, কিন্তু কি যে করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। চতুর্থ টি বিষম সংশয়াত্মা ও তার্কিক। ইঁহার সঙ্গে রমণীর সর্ত্ত ছিল যে শ্রীমাকে যাচাই করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটনা এমন দাঁড়াইল যে বিষ্ণুপুরে দুইটি প্রায় সম-বিশ্বাসী একটি গরুর গাড়ীতে উঠিলেন; আর এক গাড়ীতে উঠিলেন তার্কিকপ্রবর ও প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে রমণী ও তাঁহার বিশ্বাসী সঙ্গীটি বেশ আনন্দে ও নির্ব্বিবাদে গল্প করিতে করিতে চলিলেন। আর ও গাড়ীতে বাধিল বিপুল তর্ক—তার্কিকের সঙ্গে প্রফুল্লের। কিন্তু সেই যে দুই জোড়া আলাদা হইয়া গেল সে জোড় আর ভাঙ্গিল না। যে কয়দিন জয়রামবাটি ছিলেন ইঁহারা দুই জোড়া একটু আলাদা আলাদাই চলাফেরা করিতেন। শ্রীমাকে যাচাই করিবার কথাতে আর রমণী কর্ণপাতই করেন নাই।

জয়রামবাটী উপস্থিত হইবার বোধ হয় পর দিনই পূর্ব্বাহ্ণে সেই মহোৎসাহী কনিষ্ঠ সঙ্গীটি অগ্রগামী হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাহার পরই রমণী-কুমারের পালা। দেখা গিয়াছিল তিনি যেন একটা অমীমাংসিত চিন্তার পীড়ায় তখনও ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। করিবারই কথা। তদপেক্ষা কম পণ্ডিত অথচ স্বভাব-বিশ্বাসী পূর্ব্বগামী ন্যূনবয়স্ক ভক্তটির মত অত সহজেই বোধ হয় তাঁহার বিচার-পরিপক্ক পরিণত বুদ্ধি পূর্ণবিশ্বাসে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তাই এই উদ্বেগ। অবশেষে তাঁহার পালা আসিল ও তিনি মন্ত্র লইয়া ফিরিলেন। তারপর গেলেন প্রফুল্ল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই ধরনের কথাবার্ত্তা হয়। শ্রীশ্রীমা যখন মন্ত্র দিতে উদ্যত, তখন প্রফুল্ল বলেন, "মা, বিশ্বাস যে হচ্ছে না।" মা উত্তরে বলেন, "বিশ্বাস কি অমনই হয় বাবা? মন্ত্র নাও।" উত্তরকালে প্রফুল্ল অতি উচ্চস্তরের সাধক ও আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মী হন। প্রফুল্লের পরে আসিলেন তার্কিক। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একজন সন্ন্যাসি-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতেন। তাহা তিনি প্রকাশ করিলে মা তাঁহাকে সেই মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। "যেমন ভাব তেমন লাভ।" বৈকালে রমণীকুমার ও কনিষ্ঠ ভক্তটি একটি ব্যাপারের সম্মুখীন হইলেন যেটিকে তাঁহারা উভয়েই বোধ হয় অলৌকিক মনে করেন। কিন্তু তার্কিককে বলেন নাই—বোধ হয় আশঙ্কা ছিল তিনি তাহাতে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিবেন। এখন হইতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসকে আশ্রয় করিলেন। যাঁহারা

উঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই উঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তিনি সত্যসত্যই বিশ্বাস করিতেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য-সঙ্গিনী, পরা শক্তি ও লীলা-সহচরী।

সম্ভবতঃ ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যতদূর মনে পড়ে এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে কলিকাতা লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা লওয়ান। শৈশবেই কন্যাটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মৃত্যুতেই তাঁহার নবনীত-কোমল হৃদয়ে তীব্র শোকের সঞ্চার হয়—শোকে তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি তাঁহার চিত্তে সংসার-সুখের নিঃসারতা-সম্বন্ধে একটি গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষে সংসার-ধর্ম্মপালন অসম্ভব হইয়া উঠিল। মন ও মুখ এক করিবার দৃঢ় সংকল্প এবং ভগবদনুরাগমণ্ডিত তীব্র বৈরাগ্য-লাভের বলবতী ইচ্ছা এই সময়ে বোধ হয় তাঁহাকে 'পাইয়া' বসিয়াছিল। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ ও পারিবারিক বন্ধন এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বস্তুরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

একমতে আছে যে পরমদেবের কৃপালব্ধ চারিটি প্রধান ধর্ম আছে, যথা:—দীনতা, বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং ভূতদয়া। ইহারা সম্মিলিত হইয়া জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। এই চারিটি ধর্ম্মই রমণীকুমারের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। যখন তিনি তাঁহার প্রিয় এবং নিতান্ত নিরপরাধা জীবনসঙ্গিনীকে বর্জ্জন করেন, তখন তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই গভীর বেদনায় আতুর হইয়াছিল। কিন্তু উপায় ছিল না তাঁহার। হয়তো সুধীজনের প্রতি আচার্য্য শঙ্করের সেই বজ্র-নির্ঘোষের মত আদেশ-বাণী, "তূর্ণং গৃহাৎ বিনির্গম্যতাম্" তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে তখন অনবরত নিনাদিত হইতেছিল। আর পরমহংসদেবের তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ। তাঁহার সাধ্য ছিল না এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা। সর্ব্বত্যাগের অন্তর্গূঢ় বেদনা এবং সর্ব্বদাহী বৈরাগ্যের আকুল আগ্রহে তিনি ছুটিয়া আসিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণতলে। শ্রীশ্রীমা তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। মা বলিয়াছিলেন "এ পূর্ব্বজন্মে ঋষি ছিল। সামান্য ভোগের ইচ্ছা ছিল বলে এর জন্ম হয়েছিল। এখন যে ঋষি সেই ঋষি হয়ে চলে যাচ্ছে।"

তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হইল স্বামী জগদানন্দ। দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা"-বাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের মতে একমাত্র শমদমাদি ষট্সম্পত্তি, নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ ও মুমুক্ষুত্ব এই চতুষ্টয়সাধন-সম্পন্ন প্রমাতা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এই কষ্টি-পাথর দিয়া যাচাই করিলে কয়জন 'বেদান্তী' পাওয়া যাইবে? দুই চারিটির বেশী নয়। জগদানন্দ ছিলেন এই দুই চারটির মধ্যে। তাঁহার পক্ষে ফিলজফি, 'ফ্যালাজফি' ছিল না; উহা ছিল ভারতের নিজস্ব জিনিষ, অর্থাৎ দর্শন, তত্ত্বনির্দ্ধারণ ও স্বকীয় জীবনে সেই তত্ত্বের পরিস্ফুরণ ও প্রতিফলন।

যাঁহাকে ভবসমুদ্রের কর্ণধাররূপে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহার উক্তিতে 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা' আরোপ না করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ধ্রুব সত্য এবং তাহাতেই পরম কল্যাণ উপচিত হইবে এই যে ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাহাকেই শ্রদ্ধা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই শ্রদ্ধা ছিল জগদানন্দের অপরিসীম এবং অনেক পূর্ব্ব-সুকৃতির বলে অহঙ্কার নামক 'কষ্টতম' দোষের উপর আধিপত্য ছিল তাঁহার

স্বভাবজাত। তিনি পরমহংসদেবকে চর্ম্মচক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভগবত্তায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। বাস্তবিক ইঁহাকে সেই শ্রেণীর ভাগবত বলা যাইতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে 'ঋষিকৃষ্ণ' বলিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য টমাস্‌কে "টমাস্, তুমি আমাকে (সাক্ষাৎ) দেখিয়াছ, তাই বিশ্বাস করিয়াছ। কিন্তু তাহারাই ধন্য যাহারা আমাকে দেখে নাই অথচ তবুও বিশ্বাস করিয়াছে।"

তাঁহার এত দান্ত, শান্ত ও নম্র স্বভাব ছিল যে নিজের দীনতা উপলব্ধি করিয়া বলিতেন, তিনি "গুঁতার চোটে" সন্ন্যাসী হইয়াছেন। প্রশ্ন এই, এই গুঁতা আসিল কোথা হইতে? অদৃষ্টের কশাঘাত খায় নাই, এমন মানুষ কে আছে? কিন্তু তবু তাহারা জোঁকের মত সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকে, ছাড়িতে পারে না কিছুতেই। একমাত্র বৈরাগ্য—যথার্থ বৈরাগ্য, নকল নহে—এই গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিতে পারে। বৈরাগ্য কি? যে ধ্যানী ব্যক্তি জীবনের ও জীবনের চেষ্টা-সমূহের গতি ও আগতি গাঢ় অভিনিবেশ সহ অনুধ্যান করিয়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে যে, সংসারের সুখ ও দুঃখের যে বিচিত্র রঙ্গপট তাহা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য, একেবারে শূন্যগর্ভ, একটা যাদুমাত্র, তখন যে তাহার মনের মধ্যে একটা অনপনেয় অনুভূতির দাগ বসিয়া যায়, যাহাতে জীবনক্রম আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহাকে বৈরাগ্য বলা চলে। ইহা আল্‌ডুস্ হাক্স্লির ইন্দ্রিয়-ভোগের পরিণাম হইতে প্রসূত অবসাদ-জনিত detachment (অসঙ্গতা) নহে। ইহা যাহার তাহার হয় না।

উপনিষদ্ ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, মনন ও নিদিধ্যাসনই হইল এখন তাঁহার প্রধান কর্ম। মাষ্টারীর প্রতি তাঁহার একটা অত্যন্ত বিরক্তির ভাব ছিল। কিন্তু 'কমলি' তাঁহাকে ছাড়ে নাই। যেখানেই থাকিতেন সেইখানে প্রায় উঁহাকে উপনিষদের ক্লাস্ লইতে হইত। এমন অধ্যাপক কোথায় পাওয়া যায়? মন ও মুখ এক। তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসের মর্ম্ম কি ছিল? সন্ন্যাস বলিতে কি বুঝিতে হইবে একটি নিঃসাড়, নিস্পন্দ, পাণ্ডুর অব্যক্ত অদ্বয়ে নিষ্ক্রিয়াত্মক পরিনির্ব্বাণ? তাহা তো মনে হয় না। কোনও মানবমনই একেবারে কোনও মন্তব্য ছাড়া নির্ম্মনস্ক থাকিতে পারে কি না এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান। সুস্থ মনের ধর্ম্ম এই মনে হয় যে, তাহাতে অশুভ ও নীচ মননের স্থলে শুভ ও উচ্চ মননের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতে থাকিবে। আমাদের যোগশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে স্বামী জগদানন্দের মধ্যে দেশপ্রীতির প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির আকারের সহিত, 'দেশহিতৈষী' অর্থাৎ পেট্রিয়টদিগের দেশ-প্রীতির আকারের একটা প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য ছিল বলা চলে। তাঁহার প্রীতি ছিল যেন পুরুষ-পরম্পরাক্রমপ্রাপ্ত একটা স্বভাবজ, স্বারসিক সুসংস্কার। তাহার শিকড় খুঁজিতে হইলে যাইতে হইবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন ভারত-ধর্ম্ম, বৈদিক প্রকরণ প্রথম সংস্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের 'মাটির টান' নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি আচার-সম্পর্কে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বেশী নিষ্ঠাবান ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি নিশ্চয় মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ ছিল পুণ্যভূমিদিগের মধ্যে পুণ্যতম; অন্যান্য ভূমি ভোগভূমি মাত্র, ভারতই একমাত্র কর্ম্মভূমি, নরদেবতাদের বাসভূমি; ভারতের প্রত্যেকটি ধূলিকণিকাই শুধু প্রিয় মাত্র নহে, পুণ্যময়। যে ভারত ধর্ম্মের ভারত—আত্মার, দেবত্বের, অবতারদিগের, বেদের ভারত—ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভারত নহে, সেই দিব্য ভারতের প্রীতি তাঁহার রোমে রোমে সঞ্চারিত হইত এবং তাঁহার মস্তিষ্ক আবিষ্ট করিয়া রাখিত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাঁহার সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের ভোগ-বিলাস হইতে উপরত করিয়াছিল বটে, কিন্তু পুণ্যভূমি-ভারত-প্রীতি হইতে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ করে নাই। নিশ্চয়ই তিনি এই উদার মনোবৃত্তিকে বন্ধনের নিগড় মনে করেন নাই। দেখা গিয়াছে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যাপীঠে অবস্থান-কালে তিনি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মা গান্ধীর বিচিত্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টাগুলির বিবরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত। ভারতবর্ষ সত্যই যে কোনও দিন দাসত্ব-পাশ হইতে মুক্ত হইবে এই ধারণাও যখন সাধারণতঃ লোকের মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই, যতদূর মনে হয় তখনই এই ভারতপ্রাণ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, রামকৃষ্ণদেবের মত মহাপুরুষের ভারতভূমিতে অবতরণ দ্বারা স্বাধীনতার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের অপরিহার্য্যতা অবশ্যম্ভাবিরূপে পূর্ব্ব হইতেই সূচিত করিয়াছিল। এমনই ছিল তাঁহার বিশ্বাসের বলবত্তা।

কার্লাইল্ এক যায়গায় বলিয়াছেন যে, সামরিক জীবন অপেক্ষা সজ্জীবনযাপন করা অধিকতর কষ্টসাধ্য। চমকপ্রদ ঘটনা-বিরল আমাদের সাধুর জীবন শেষোক্ত ধরনের ছিল—শুধু একটি অদূষিতচিত্ত পুণ্যশীলের জীবন মাত্র, যিনি সংসারও দেখিয়াছেন বটে, আবার তাহার বাহিরেও কিছু দেখিয়াছেন।

তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির নির্ম্মল ধারা সতত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও তাঁহার মনোগতি মুখ্যতঃ জ্ঞানযোগের অভিমুখে নিবদ্ধ ছিল। চুপ করিয়া প্রশান্তভাবে উপবেশন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং স্বাত্ম ও পর-প্রবোধনার্থ তত্ত্বের কথন ও ভাষণ—এই সব দিকেই তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্যের ঝোঁক ছিল। তাঁহার উপনিষদালাপ না কি ছিল মনোমুগ্ধকর। একজন যুবক (এখন প্রৌঢ়) সন্ন্যাসী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন এই ভাবের একটি কথা—"যখন উপনিষদের কোনও একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁর নিকট ঠিক বোধ হতো না, তখন তিনি বুকের মাঝখানে হাত রেখে বোলতেন 'এখানে ওটা (ব্যাখ্যাটি) সায় দিচ্ছে না।'"

তাঁহার সমক্ষে বাদ-প্রতিবাদ চলিত, কিন্তু বিবাদ যেন লজ্জায় চুপ হইয়া যাইত। সতত অসূয়া-পরবশ ঈর্ষ্যী ব্যক্তিও যেন তাঁহার সমক্ষে উন্নত-মনা হইয়া যাইত, এমনই ছিল তাঁহার চিত্তের বিশালতা।

"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু অভিমান ও অহঙ্কারের নিত্যনিবাস ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিভূত অহংবোধে আবৃত থাকার দরুন, বিশ্বাত্মা বা পূর্ণ বা ভূমা অথবা প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে যে সুনির্ম্মল আনন্দ-ধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, জীব কদাচিৎ সেই আনন্দরস উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করিলেও এই ক্ষুদ্র আমি নিষ্পিষ্ট হয় না। পুনঃ পুনঃ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মনে হয় ইহার শক্তির ধ্বংস সম্ভব নহে। প্রায় সকলেরই—নিতান্ত মূঢ়েরও—আমি-জ্ঞান তীক্ষ্ণ। প্রায় প্রত্যেক মানুষের চিত্তের উপর—এমন কি যাহারা অত্যন্ত খাঁটি এবং উন্নতিকামী তাঁহাদের মনের উপরও এই ক্ষুদ্র আমিরূপী 'জিন'টির যে পর পর অভিঘাত, তার ফল হয় সর্ব্বনাশা এবং তজ্জনিত ক্লেশ হয় মর্ম্মান্তিক—বিশেষতঃ সৎপুরুষদের পক্ষে।

জগদানন্দ যেন কোন উপায়ে এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেমন একটি ভাত টিপিলেই জানা যায় হাঁড়ির সমস্ত ভাত সিদ্ধ হইল কি না, তেমনই বহু দৃষ্টান্তের মধ্য হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে তাঁহার নিরভিমানিতা কতখানি ছিল। বোধ হয় বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কথায় কথায় তাঁহার এক বন্ধুকে বলেন যে, কাশ্মীরের একটি বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত আদর-যত্ন করেন। এই সম্মানের জন্যও তাঁহার স্থূলবুদ্ধি বন্ধুটি তাঁহার স্বকীয় গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তদুত্তরে তিনি অকৃত্রিমভাবে রুষ্টপ্রায় হইয়া ভ্রূকুটির সহিত যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম এই—"কি বলেন আপনি? আমার মধ্যে কি আছে যে আমি এই সম্মান পাইতে পারি? কিছুই নাই। ঠাকুরের কৃপাতেই আমার এই আদর-সম্মান। আমি একটা কি? নগণ্য। সবই ঠাকুরের প্রসাদে।" বন্ধুটি অপদস্থ, চুপ! এই উক্তির ভিতর কপট-দৈন্যের লেশমাত্রও ছিল না। ছিল শুধু প্রাণের অকপট বিশ্বাসের অভিব্যক্তি।

ভারতে গ্রন্থাগার

শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায়, বি এ, সি-লাইব্, বি-এল্-এ

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা কথা দুটি আধুনিক অর্থে ভারতবর্ষে একেবারেই নূতন আমদানী। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস-খ্যাত নালন্দা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগারগুলির কথা বাদ দিলে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের আর কোন গৌরবময় ঐতিহ্য খুঁজে পাই না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ যুগের মঠ, স্তুপ ও বিহারগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই যা কয়েকটি ছোট বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নতুন রাজনীতি ও দর্শনের সঙ্গে গ্রন্থাগারটিও ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ অবদান—একথা ভুললে চলবে না। জনসাধারণের ভগবান তথাগত তাঁর মহান সার্বভৌম ধর্মের সিংহ-দরজা খুলে দিয়ে যে দিন বিশ্ব-মানবকে ডেকে এক নবতর মুক্তির বাণী—আত্মবিশ্বাসের বাণী শুনালেন, সেই দিন থেকেই আচণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সকলেই জ্ঞান-রাজ্যের চিরকেলে বদ্ধ জগতে সমান অধিকার পেল। শূদ্রদের শূদ্রত্ব আর রইল না তখন; পালির সহজ প্রবেশ-পথে, মানুষের অন্তর-দেবতার দিকে চেয়ে জ্ঞানের ও আনন্দের পথ উন্মুক্ত হল। অবশ্য পরবর্তী কালে ইউরোপের church library-গুলির মত এই সব বৌদ্ধবিহার-গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। পঠন-পাঠন, বই লেখা, বইয়ের প্রচার—এই সব বৌদ্ধযুগেরই বৈশিষ্ট্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী যুগের একচ্ছত্র সম্রাট অশোকের শিলালেখ ও পর্বত-লিপি আজো সেযুগের জনসাধারণের বইয়ের প্রতি আগ্রহশীলতার ও অক্ষরজ্ঞানের পরিচয় দেয়। তবে এদেশের মাটিতে এ নয়া ধর্মটি যেমন চলল না, মানুষের গ্রন্থপ্রীতিও বেশিদিন বেঁচে রইল না। জ্ঞানের জন্য পড়াশুনার যতই প্রয়োজন থাকুক, আত্মার পরম মুক্তির জন্য বইয়ের পরোক্ষ জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না বলে হিন্দুর চিরন্তন সংস্কার। ইহ জগতের সুখ, ঐশ্বর্য, প্রগতি ও উন্নতির চেয়ে আত্মমুক্তির প্রশ্ন এদেশে অনেক বড়। তা' ছাড়া বইয়ের বহুকরণ-পদ্ধতি তখন ছিল একান্তভাবে মানুষের ক্ষুদ্র একখানি হাতের উপর নির্ভরশীল, তাই বইয়ের পঠন-পাঠনে সাধারণ মানুষের আগ্রহ আর দেখা গেল না। এ ধর্মপ্রধান দেশে ধর্মতত্ত্বকে মস্তিষ্কের সাহায্যে উপলব্ধি করার চেয়ে, বুদ্ধির দ্বারা, যুক্তির দ্বারা বুঝার চেয়ে জীবন-চর্যার মধ্যে, প্রত্যহের কাজ-কর্মের মধ্যে রূপায়িত করার দিকে মানুষের ঝোঁক ছিল বেশি। তাই ত কালের পরিবর্তনের পথে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থাগারগুলির আর কোন ধারাবাহিক ঐতিহ্য বা সামান্য চিহ্নও দেখা গেল না। অবশ্য সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান-আক্রমণে এই সব গ্রন্থাগারগুলির বহু ক্ষতি হয়েছিল।

হিন্দুযুগে ও পরবর্তী মুসলমান-যুগে বিশেষ ক'রে মোগল-পাঠান যুগে রাজা ও নবাবদের রাজকীয় গ্রন্থাগারের কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন মেলে। কিন্তু সে সব গ্রন্থাগারে সাধারণ মানুষের প্রবেশ-অধিকার স্বীকৃত হয় নি। তাই আধুনিক অর্থে এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে ঠিক ঠিক গ্রন্থাগার বলা চলে না। কারণ এই সব গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই ছিল রাজকীয় বিলাস ও ঐশ্বর্যের

একটি প্রকাশ-মাত্র। এ সব গ্রন্থাগারে পঠন-পাঠনের বিশেষ কোন বালাই ছিল না। আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা-নির্দেশে ছটি জিনিষ বিশেষ করে লক্ষণীয়। একটি হল ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে গ্রন্থাগারে থাকবে সকলের সমান প্রবেশাধিকার। আর দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্পদের হবে পরিপূর্ণ ব্যবহার। শুধু সাজাবার জন্য বা বিলাসের উপকরণ হিসাবে আজ আর গ্রন্থাগারের বিশেষ কোন মূল্য নেই। মানুষের জন্যই গ্রন্থাগার, আর তার পড়ার জন্যই গ্রন্থঘরের গ্রন্থসম্পদ। অবশ্য ডকুমেন্টারি লাইব্রেরী, দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের গ্রন্থাগার, আর্ট লাইব্রেরী প্রভৃতি এ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। ঐতিহাসিক মর্যাদা নিয়ে এগুলির প্রয়োজন অবশ্য অনুপেক্ষণীয়। তবে জনসাধারণের জন্য এগুলি নয়।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত হল এবং গ্রন্থাগার এইজন্য শিক্ষারই একটি বাহন হিসাবে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রীর বাণী শত সহস্র মানুষের রক্ত-ধারায় একটি সার্বভৌম রূপ লাভ করে সব দেশে স্বীকৃত হল। গুটেনবার্গের মুদ্রাযন্ত্রের অমর আবিষ্কার এই পথে দিল নতুন প্রেরণা। কিন্তু এসবই ইউরোপের ব্যাপার। আমাদের দেশে আধুনিক অর্থে গ্রন্থাগারের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে ব্রিটিশ আমলের শেষ অধ্যায়ে। ঐ সময়ই বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরীর জন্ম। ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশে রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের অনেক নব নব ভাব, কল্পনা ও চিন্তাধারা—এমন কি রুচি ও বিলাস পর্যন্ত আমদানী করেছিল, কিন্তু গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থকতর করার কোন প্রচেষ্টা তাদের ছিল না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষক শক্তি কোন দেশেই তা করতে পারে না—মুনাফা-লাভই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা তাদের এই মুনাফা-লাভের অন্তরায়। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সঙ্গে জনশিক্ষা ও জনচিত্ত-উদ্বোধনের যে কতটা নিবিড় যোগ আছে তা সে যুগের ব্রিটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ নিজেদের দেশে ভালোভাবেই অনুভব করেছিল। দেশ ও সাম্রাজ্য এক নয়; তাই তাদের দূরতম প্রাচ্যের এই স্বর্ণ-সাম্রাজ্য নিজেদের দেশের প্রগতিমূলক আন্দোলনের ধারাটি বিশেষ যত্নে ঠেকিয়ে রেখেছিল। অবশ্য একথাও ঠিক যে, আমাদের দেশে ব্যবহারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছিলাম—তাই বইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা যেখানে এই পরজীবন-সর্বস্ব দেশে সেদিন সম্ভব ছিল না। আধিভৌতিক জীবনের চেয়ে আধিদৈবিক ও পারমার্থিক জীবনের চরম পরিণতিটিই আমাদের চিরকালের ধ্যানের বস্তু। তাই ঐহিক উন্নতির পথে শিক্ষা-বিস্তারকে আমরা বাচবার একটা পথ হিসাবে গ্রহণ করিনি। বীর স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়ের বাণী তখন ঘোষিত হয় নি,—আত্ম-প্রতিষ্ঠার বেদমন্ত্র, পরিপূর্ণ মুক্তির গান তখনো দেশের যুবকণ্ঠে কেউ পৌছিয়ে দেয় নি। তাই জীবনকে অশ্রদ্ধা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহজীবনের অগ্রগতি ও উন্নতিকে আমরা শ্রদ্ধাসন দিই নি। ঠিক এই কারণেই দেখতে পাই ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে Public Library Act বিধিবদ্ধ হবার এক শ' বছর পরে আজও বৃটিশসৃষ্ট প্রাচ্যের মহানগরী কলকাতায় জনগ্রন্থাগার তৈরী হয়ে উঠতে পারে নি। কলকাতার সৌন্দর্যের জন্য, উন্নতির জন্য মনুমেণ্ট করেছে; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল করেছে; চিড়িয়াখানা যাদুঘর, বোটানিকাল গার্ডেন করেছে; কিন্তু বৃটিশ রাজশক্তি এত বড় দেশের কোথাও গ্রন্থাগার বিশেষ স্থাপন করে নি এবং করেনি বলেই

ব্রিটিশ সুশাসনের দৌলতে আজ শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারল না। এমন কি বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের গঠন-প্রচেষ্টায়ও সে যুগের রাজশক্তি ও রাজপুরুষদের চেয়ে দেশীয় মহান দেশনায়কদের সঙ্গে ওদেশের মহানুভব লোকদের দান অনেক বেশী। কাজেই এ দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের এই শোচনীয় অবস্থার পিছনে দুইটি কারণ দেখা যাচ্ছে—একটি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বঞ্চনানীতি ও আমাদের নিজেদের ইহজীবন-সম্বন্ধে উদাসীনতা।

আগেই বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশপূর্বযুগে ও দুই একটি রাজকীয় গ্রন্থাগার ও টোল-চতুষ্পাঠীর সীমিত গ্রন্থসম্পদ্ ছাড়া এদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। গ্রীস, রোম, ইরাক, ইরান, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাচীন সভ্য দেশে কিন্তু দেখেছি এর ঠিক উল্টো। ও সব দেশে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার-আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। পৃথিবীর একটি সর্বপ্রাচীন দেশ মিশর—সেখানে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য পর্যন্ত গ্রন্থের ব্যবহার দেখা যায়। মৃত ফারাওদের কবর পিরামিডের তলা থেকে অনেক প্রাচীন প্যাপাইরাস * পাটির, প্রস্তর-পুস্তকের ও মাটির পুস্তকের আবিষ্কার হয়েছে। মৃতের আত্মার তৃপ্তির জন্য অন্যান্য নানা উপকরণের সঙ্গে তাঁরা কয়েকখানি প্রিয় পুস্তকও মৃতের সঙ্গে কবরের তলায় রেখে দিতেন। জীবনে ও মরণে এদের কাছে গ্রন্থাগারের ছিল বিশেষ আদর—তাই গ্রন্থাগারের অপর নাম ছিল 'Dispensary of souls'—'আত্মার আরোগ্য-ভবন'। মিশর-ব্যাবিলনের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা গ্রীস-রোমে আসি সেখানেও দেখতে পাব তাদের সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছিল। রোমের মার্ক এন্টনির ঐতিহাসিক ঘটনাটি সমগ্র রোমক-সভ্যতার ও রোম-জাতির গ্রন্থপ্রীতির একটি চমকপ্রদ উদাহরণ। রোমের এন্টনি তাঁর প্রিয়তমা ক্লিয়োপেট্রাকে (মিশরের রাজকন্যা) যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি দিয়েছিলেন, সেটি এশিয়ার লুণ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার। প্রিয়তমাকে গ্রন্থাগার উপহার দেওয়ার কথা এর আগে বা পরে কোন দিনই শোনা যায় নি। এশিয়া মাইনরের পার্গামাম (Pargamum) থেকে এই সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটি লুণ্ঠন করে সেই যুগে অতদূর বহন করে নিয়ে মিশরের রাজকন্যার হাতে উপহার তুলে দিতে এন্টনির যে কতটা শ্রম ও ধৈর্য স্বীকার করতে হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। এই গ্রন্থাগারটি নানা কারণে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। এতেই প্রথম পার্চমেন্টের ব্যবহার হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৯১-১৫৯ সনে এই গ্রন্থাগার এশিয়া মাইনরের নৃপতি দ্বারা স্থাপিত হয়। বহু যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে প্রায় ২০০,০০০ প্যাপাইরাস পাটিতে (papyrus rolls) সজ্জিত ছিল এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্পদ। তালিকাপ্রণয়ন, পুস্তক-পরিচিতি প্রভৃতি নানা সুব্যবস্থায় এ গ্রন্থাগারটি সে যুগের গ্রন্থাগার-আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল সাক্ষী। মধ্য-এশিয়ার আরো অনেক অধুনালুপ্ত প্রাচীন সভ্য জাতিরও গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। রোমে এক সময় কোন শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার না থাকা বিশেষ অপমানের বিষয় ছিল। প্রাচীন সভ্য দেশ চীনের তো কথাই নেই। মুদ্রাযন্ত্রের আদি স্রষ্টা তারা—Block books এর তারা জন্মদাতা; কাগজের আবিষ্কারক। সান-বংশের উজ্জ্বল ইতিহাস আজ চীনদেশের অতীত যুগের গৌরবময় সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেখানেও আমরা গ্রন্থঘরের অস্তিত্ব খুঁজে পাই, কিন্তু

* **(Papyrus rolls) Terracota** *&* *Store* **tablets.**

আশ্চর্য এই ভারতবর্ষে—যেখানে সমগ্র মানবজাতির আদি পুস্তক ঋগ্‌বেদের জন্ম, সেখানে গ্রন্থাগার কোন দিন প্রচার লাভ করে নি। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মে ও আচরণে—তত্ত্বকে সুষমামণ্ডিত করাই যেন ছিল এ দেশের পরম সাধনা। তাই দেখতে পাই বই পড়ে জ্ঞানলাভের চেয়ে এ দেশে চোখ ও কানের সহজ মাধ্যমে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মূলতঃ কানই ছিল বিদ্যাগ্রহণের প্রধান যন্ত্র। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ" এ শুধু বৈষ্ণব-যুগের কথা নয়—এ তথ্য এ দেশে চির-স্বীকৃত। তাই আর্যবংশধরগণ শ্রুতির মধ্য দিয়াই সর্বশাস্ত্রপরায়ণ হতেন। বেদের মত অত বড় গ্রন্থকেও কানে শুনে সেযুগের শিক্ষার্থীরা শিখে নিতেন। বেদের অপর নাম তাই শ্রুতি। তা ছাড়া গুরুর সাহায্য ছাড়া এদেশে কোন কিছুই শেখা যেত না—তাই ব্যক্তিগত ভাবে বইয়ের পঠন-পাঠনের এ দেশে প্রয়োজন ছিল না।

আমার মনে হয় পরবর্তী যুগেও ঠিক এই কারণে এ দেশে গ্রন্থাগার সৃষ্টি না হয়ে চতুষ্পাঠী প্রভৃতির সুস্নিগ্ধ আবহাওয়ায় বেদপাঠ, ভাগবত বা রামায়ণ-গানের মধ্য দিয়েই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা হয়েছিল। তাই দেখা যায় আমাদের এত বড় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সর্ববাদিসম্মত recordsএর অভাবে আজ উহা বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করা অনেক সময়েই কঠিন হচ্ছে। ঠিক এই কারণেই গ্রন্থাগারও গড়ে উঠতে পারেনি।

চোখ ও কানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি—একথা সত্য হলেও বইয়ের পরোক্ষ জ্ঞান আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বইয়ের উপর ততটা আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই মধ্যযুগে ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপ জেগে উঠল আপন মহিমায়। বইয়ের মাধ্যমে নয়—চোখ কানের কাছে সহজ করে খুলে দাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি, রসের নিবিড় উপলব্ধিটি—তাতেই ভাবের সহজ প্রচার হবে। (ক্রমশঃ)

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীশৈলেশ

মহাকাল যতিহীন, অবিরাম
শুধু বহি চলে;
চলমান পথে রচি ঘূর্ণাবর্ত
দুর্নিবার বলে।
সে আবর্ত-প্রচলনে ক্ষণিক যে
রেখে যায় ছেদ,
তারে দিই পরিচয় বর্ষরূপে,
আদিত্য-বিভেদ!
সমহীন চলে স্রোত, চলে যায়
অজানার পথে;
তিথি মাস নেমে আসে নিয়ন্ত্রিত
আবর্তের রথে;
মৌন স্তব্ধ অতীতের কোলাহল
করুণ নয়নে
চেয়ে থাকে নতুনের প্রেমাদৃত
অভিযান-পানে।
নতুনের পরিবেশ ভালবাসে আশা-কুহকিনী,
অনন্ত কালের স্রোতে বারে বারে তাই ছেদ টানি।

মহাকাল অট্টনাদে হাসে শুধু
এ ছলনা হেরি,
আবর্তনে দেয় আনি ঋতুচয়
নব বেশধারী;
পরিত্যক্ত অতীতের স্মৃতিময়
অনন্ত জীবনে
আবেগে ধ্বনিয়া তোলে দুরাশার
অলীক স্বপনে।
এই আশা, কেন আসে? কে বলিবে,
কে দিবে কারণ?
বর্তুলিত কালচক্রে বিশ্ব ঘোরে,
কোন্ প্রয়োজন?
নিত্য আমি বুদ্ধ আমি সর্বলোক-
মূল উপাদান
তবু মোরে ভুলাইয়া মহাকাল
কি করে নির্মাণ?
শ্রুতি, স্মৃতি মিলে যায়, মিলে যায় মোর উপাদান
মহাকাল অধ্যাসীন আবর্ত-শৃঙ্খলে, নিত্য বিদ্যমান।

কথাপ্রসঙ্গে

"মসিয়েঁ ল্যাপ্‌লু, শুনতে পাই জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডের সংহতি-বিষয়ে আপনি একখানা প্রকাণ্ড বই লিখেছেন, অথচ তাতে নাকি সৃষ্টিকর্তার নাম একবারও উল্লেখ করেন নি?" প্রশ্ন করিয়াছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন। প্রথিতযশা ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাপ্‌লু (Laplace) উত্তর দিয়াছিলেন,—"হাঁ সম্রাট্‌, কেন না আমার গবেষণায় ঐরূপ কোন প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হয়নি।"

সম্প্রতি মাদ্রাজ বিধান পরিষদে ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী এবং কতিপয় বিরোধী সদস্যের মধ্যে যে একটি বিতণ্ডার বিবরণ পাওয়া গেল, তাহাতে দেড়শত বৎসর পূর্বেকার উপর্যুক্ত কথোপকথনটির কথা মনে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর উপর অভিযোগ আনা হইয়াছিল,—"আপনি গভর্নমেন্টের কর্ম স্বীকার করিয়াছেন—ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার আপনার কোন অধিকার নাই। ভগবানের কথা আওড়াইয়া আপনি ভুল করিতেছেন।" শ্রীরাজগোপালাচারী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আমার সমালোচক বন্ধুদের আমি বলিতে চাই যে, ঈশ্বর সত্য, ইহা একটি বাস্তব তথ্য। আমাদের সামান্যতম ক্রিয়াকলাপের শক্তিও তাঁহা হইতেই আসে। ভগবানকে সর্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে।"

জ্ঞানবৃদ্ধ এই প্রবীণ দেশনেতা জীবন-সায়াহ্নে সমগ্র জীবনের ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা তরুণদের হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া অনুচিত। তাঁহার কথার তাৎপর্য নিশ্চিতই ইহা নয় যে, রাষ্ট্রের প্রতি-কর্মব্যাপারের সহিত হরিনাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—তিনি মানবচরিত্রে একটি প্রচণ্ড প্রচ্ছন্ন শক্তির উদ্বোধনেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবানই এই শক্তি। ভগবানে বিশ্বাস রাখিলে, তাঁহার সহিত হৃদয়মনের যোগ স্থাপন করিতে পারিলে মানুষের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। পরকাল, মুক্তি, শাশ্বত শান্তি প্রভৃতি উচ্চতর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও ইহ-জীবনের খতিয়ানেই ভগবন্নিষ্ঠা মানুষকে প্রচুর লাভবান করে। ভগবৎপরায়ণ মানুষকে দেখিতে পাই সুনীতিশীল, সত্যসন্ধ, নির্ভীক, সহিষ্ণু, উদার। এগুলি কি কম কথা? মানুষই তো সমাজ গড়ে, রাষ্ট্র চালায়, জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া মানুষ যদি উপরোক্ত প্রকারের সাচ্চা মানুষ হয় তাহা হইলে সে কি সমাজ, রাষ্ট্র, গণসেবা আরও ভালভাবে করিতে পারিবে না? এতএব মাদ্রাজ-রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি গভর্নমেন্টের তথ্‌ত্‌ হইতে ঈশ্বরের কথা বলিয়াই থাকেন তাহাতে এমন কি অন্যায় হইয়াছে?

* * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ল্যাপ্‌লু বিজ্ঞানকে যে স্বাধীনতা দিয়া গেলেন, দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান উহার চরম প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার নির্বাধ উন্নতির জন্য এই স্বাধীনতার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেই প্রাকৃতিক ঘটনার কিছু না কিছু উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের গবেষক যদি ধর্মশাস্ত্রের ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিয়া পূর্ব হইতেই কতকগুলি বদ্ধ ধারণা করিয়া বসিয়া থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণের সিদ্ধান্তের সহিত উহাদের বিরোধ লাগিলেও 'ধার্মিক' দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ধর্মশাস্ত্রের মতকেই প্রাধান্য দেন তাহা হইলে সত্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণা

অগ্রসর হইতে পারে না। বিজ্ঞান কিছু ধর্মশাস্ত্র নয়—বৈজ্ঞানিককে তাঁহার স্বকীয় পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে। জল, মাটি, আকাশ, বায়ু-সম্বন্ধে, গ্রহনক্ষত্রাদির ঘূর্ণন-সম্বন্ধে, জীবদেহে প্রাণের ক্রিয়াকলাপ-সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এমন অনেক কথা লেখা আছে যাহা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রমপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক যদি ঐ ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ত্যাগ করিতে চান, করুন না—করাই তো উচিত। ধর্মশাস্ত্রের প্রত্যেক কথাটিকে চিরকালের জন্য অভ্রান্ত সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে এমন মতের গোঁড়া ধর্মধ্বজী যদি কেহ থাকেন, তিনি নিশ্চিতই অনুকম্পার পাত্র।

তবে ধর্মশাস্ত্রের যেগুলি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—ঈশ্বরতত্ত্ব, মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, জীবনের পারমার্থিক লক্ষ্য ও সাধনা প্রভৃতি—সেগুলি লেবরেটরীর পরীক্ষার এলাকায় আসে না এবং লেবরেটরীর পরীক্ষকগণের সেগুলি-সম্বন্ধে কিছু না বলাই সঙ্গত। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখ্য ক্ষেত্র আলাদা—যে যাহার পথে চলো—ঐরূপ একটা আপসের মনোভাব লইয়া চলিলেই বোধ করি উভয়তই মঙ্গল। বিগত দেড়শতাব্দীতে বহুদিন পর্যন্ত এইরূপই চলিয়াছিল। ধর্মের অনেক অবান্তর মত ও বিশ্বাস-সমূহে ধাক্কা দিলেও মুখ্য প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ধর্মের উপর তেমন কিছু আঘাত হানে নাই। ব্যবহারিক ধর্মও পূর্বের তুলনায় অনেক উদার হইয়া প্রকৃতির রহস্য-সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সমীক্ষিত সত্যগুলি মানিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু তাহার পরেই পটভূমিতে পরিবর্তন আসিল। বিজ্ঞান ক্রমশই যত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল তাহার গবেষণার ক্ষেত্রও বাড়িয়া চলিল। যেগুলি পূর্বে তাহার এলাকা ছিল না, সেগুলিতেও সে উত্তরোত্তর প্রবেশাধিকার দাবী করিতে লাগিল। মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এই সকলও ক্রমে ক্রমে 'বিজ্ঞান'-এর মর্যাদা লাভ করিল। অবশেষে ধর্মের যে সব তথ্য পূর্বে বিশ্বাসী ভক্ত ও সাধকগণেরই মাত্র আলোচনার ও জ্ঞানের বিষয় ছিল, সেইগুলির দিকেও বিজ্ঞানের সন্ধানী দৃষ্টি নিপতিত হইল। মানুষ কেন ভগবান ভগবান করে; ধর্মপ্রাণতা মানুষের কোন সহজাত জৈবী প্রবৃত্তির রূপান্তর কি না; ভগবদানন্দ জিনিসটির প্রকৃত বিশ্লেষণ কি ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন 'বৈজ্ঞানিক' ভাবে পরীক্ষিত হইতে লাগিল।

ধর্মে বিজ্ঞানের এই বাহু-সম্প্রসারণের সু এবং কু দুইটি দিক আছে। নিছক সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছায় যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা উহা অবশ্যই সু—উহা দ্বারা ধর্মানুরাগী ও ধর্মসাধকগণ নিজদের বিশ্বাস এবং আন্তরিকতাকে ভাল করিয়া যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য শুধু ধর্মের দুর্বলতা দেখানো, সমাজের বহুতর কালিমার জন্য পাকে-চক্রে ধর্মকেই দায়ী করা, সেই বিশ্লেষণ মানুষের উপকারের অপেক্ষা অপকার বেশী করিতেছে। বিজ্ঞানের ছাপ দিয়া উহা আর এক নূতন ধরনের কুসংস্কার মানুষের মনে চাপাইয়া দিতেছে। দেখা গিয়াছে বহুক্ষেত্রে এই শেষোক্ত বিশ্লেষণ-গুলি আদৌ 'বৈজ্ঞানিক' নয়—বিদ্বেষ এবং আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি লইয়া গবেষকগণ অপর্যাপ্ত ঘটনার নিরীক্ষণ দ্বারা একটি ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চাহিয়াছেন। কোন দেশের কোন এক জন মরমীর (mystic) স্নায়বিক দৌর্বল্য ছিল—বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, মরমিয়া আবেগ-অনুভূতিগুলি সবই স্নায়বিক বিকার; লাটিনদেশের কোন একজন ভগবৎপ্রেমিক শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ছিলেন—মনোবিজ্ঞানীর রায় শুনিলাম,

ভগবানে ভালবাসা জিনিষটি স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের একটি আত্মসৃষ্ট কল্পনা-বিলাস ইত্যাদি।

এই সকল 'বৈজ্ঞানিক' সিদ্ধান্ত বিনা বিচারে গলাধঃকরণ করিবার লোকের অভাব নাই। কেন না 'অমুক বিখ্যাত পণ্ডিত যখন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই সত্য' এই ধরনের বিশ্বাস লইয়াই সংসারে অধিকাংশ মানুষকে চলিতে হয়। সরিষার মধ্যে যে ভূত ঢুকিয়া আছে এবং সেই সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়ানো যায় না এই অনুসন্ধান কয় জন করে? 'বৈজ্ঞানিক' বলিয়া যে সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা মাথায় তুলিয়া ধরিয়াছি সেগুলি যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণের সব সর্তগুলি না মানিয়াই নকল রাজা সাজিয়া বসিয়াছে ইহা যাচাই করে কয় জন?

তাই তো দেখিতে পাই 'বৈজ্ঞানিক' মনোভাবসম্পন্ন আধুনিক 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল'দের অনেকেই ধর্ম ও ধর্মানুসারীদিগের প্রতি বেত্র-দণ্ড তুলিয়া ঘুরিতেছেন। সুযোগ পাইলেই দু'ঘা বসাইয়া দিতে উদ্যত! যে প্রতিবাদিগণের সহিত মাদ্রাজের প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রীকে বাগ্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল উঁহাদের কথাবার্তা হইতেই তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যাঁহারা ছিলেন অগ্রদূত—গ্যালিলিও, বেকন্‌, ডেকার্ট ও নিউটন্‌ ইঁহারা সকলেই জগতের কর্তা ভগবানকে স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। বিজ্ঞানের গবেষণা ও উন্নতির সহিত ভগবদ্বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের কোন সংঘর্ষ তাঁহারা দেখেন নাই। ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ যখন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলেন, তখন তাঁহাদের অনেকেই বোধ করি, মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের সহিত রাষ্ট্রকার্যের কোন বিরোধ নাই ইহা মনে রাখিয়াই ঐ কথা বলেন, যেমন উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের নিকট ঈশ্বরবিশ্বাসের সহিত বৈজ্ঞানিক-উন্নতির কোন প্রতিকূলতা ছিল না সেইরূপ। অতএব রাষ্ট্রপরিচালনার কার্যে যোগ দিলে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে বর্জন করিয়া আসিতে হইবে এমন দাবীর কোন অর্থ হয় কি? বরং আমরা বলি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যথাযথ ভাবে চালাইতে গেলে পরিচালকবর্গের গভীর ভাবে ধর্মপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। তবেই তাঁহাদের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না, বিদ্বেষবুদ্ধি, স্বার্থপরতা থাকিবে না—সকলের প্রতি ন্যায্য উদার ব্যবহার তাঁহারা করিতে পারিবেন।

* * *

প্রাচীনকালে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি ও রাষ্ট্রের সুপরিচালন যে হয় নাই তাহাও তো নয়। কিন্তু তখনকার গবেষক এবং পরিচালকগণ ধর্মের প্রবেশের আশঙ্কায় ঐ দুই ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক্ত বেড়া দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। বরং তাঁহারা মানুষের ইহলৌকিক ব্যাপৃতিগুলিতেও ধর্মের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিতেন—রাষ্ট্রে তো বটেই, বিজ্ঞানেও। নেপোলিয়ন যখন বিজ্ঞানাচার্য পেয়ের সাইমন ল্যাপ্‌লাকে পূর্বোল্লিখিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় সেই ঋষি-কর্মিগণের দৃষ্টিভঙ্গীই যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিতে দেখিতে পাই। ভগবান যদি বিশ্ববিধানের নিয়ন্তা হন, তবে বিজ্ঞানেরও বিধান তাঁহারই রচনা ইহা মানিতে ও বলিতে সঙ্কুচিত হইব কেন? রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিচালনেও তাঁহার মঙ্গল আশীর্বাদের দিকে চাহিব না কেন?

আবার কি ভারতে সেই দিন ফিরিয়া আসিবে যখন ধর্ম তাহার বিশুদ্ধতম, ব্যাপকতম অর্থে আমাদের সমগ্র জীবনের সংধারকরূপে সমাদৃত হইবে—ব্যষ্টিজীবনে এবং সমষ্টিজীবনেও, গৃহে এবং গৃহের বাহিরেও, ব্যক্তিগত উপাসনার নিভৃত কক্ষে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ প্রচণ্ড কর্মোন্মাদনার মধ্যেও?

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ভাগবতে বর্ণিত গোপীপ্রেমের মহিমা কিঞ্চিৎ আস্বাদন করা আবশ্যক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাস-পঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-কৌতুকে কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদিগের বিরহের অনলে সংস্কারপ্রাপ্ত প্রেমের যেরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়, সংস্কৃতসাহিত্যে তাহা একরূপ অতুলনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য কত যুক্তিযুক্ত কথা দ্বারা উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—

(১) "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।"

বিনা কৈতবে স্বামীর সেবা পত্নীর পক্ষে পরম ধর্ম্ম।

(২) "পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্‌-সুভিরপাতকী।"

অপাতকী পতিকে স্বর্গাদিলোকের কামনায়ও স্ত্রী কথনই ত্যাগ করিবে না।

(৩) "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্‌সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥"

কুলবধূর পক্ষে উপপতিসুখ স্বর্গ ও যশোনাশকারী—ইহা তুচ্ছ, কষ্টবহুল, ভয়ানক ও ঘৃণিত কার্য্য। সর্ব্বশেষে কৃষ্ণ বলিলেন—

(৪) "শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ, প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"

(১০।২৯।২৭)

'হে গোপীগণ, মনে রাখিও যে, আমার লীলা-গুণ শ্রবণ করিয়া, আমার মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, আমাকে ধ্যান করিয়া ও আমার নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া যতটা প্রেমভাবের উদয় হইতে পারে, আমার সান্নিধ্যলাভ দ্বারা ততটা হইবে না,—অতএব, তোমরা এই নিভৃত স্থান হইতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাও।'

কৃষ্ণের এই নিষেধসূচক উপদেশবাক্যে গোপীরা কি উত্তর করিলেন? তাঁহারা কৃষ্ণকে বুঝাইতে চাহিলেন—

'হে নাথ, তুমি বলিয়াছ যে, পতি, সন্তান ও বন্ধুদিগের অনুবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, তাহা হউক। তাহা ত হইবেই, যে-হেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ হইয়া তেমনই উপদেশ করিতেছ। কিন্তু সেই সমস্ত অনুবৃত্তি-সম্বন্ধী উপদেশের বিষয় হইয়াছ তুমিই, কারণ তুমি 'ঈশ' (পরম-ঐশ্বর্য্যশালী), বিশেষতঃ তুমিই দেহধারী জীবের প্রিয়তম, বান্ধব ও আত্মস্বরূপ (সুতরাং সর্ব্ব বান্ধবের প্রতি যাহা করণীয়, তাহা আমরা তোমার প্রতিই আচরণ করিব)।" (১।২৯।৩২) গোপীপ্রেমের কি মাহাত্ম্য! কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা শূন্যচেতাঃ হইয়া পাগলিনীর মত—

"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥"

(১।৩০।৪০)

'হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হে মহা-বাহো—তুমি কোথায়, তুমি কোথায় আছ, আমি যে তোমার দুর্গতা দাসী, হে সখে, তুমি তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর'—এইরূপ প্রলাপ করিয়া

রাত্রিতে যত ক্ষণ জ্যোৎস্না রহিল, ততক্ষণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া, অন্ধকার হইয়া আসিলে, অন্বেষণ-কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইলেন। গোপীরা ত কৃষ্ণের অশুল্কদাসী—তিনি যেন দৃষ্টি দ্বারাই তাঁহাদের বধ সাধন করিয়াছেন। তাই তাঁহারা তাঁহাদের অপহৃত প্রাণের প্রত্যর্পণ ভিক্ষা করিলেন। তৎপর কাতর গীতিদ্বারা তাঁহাদের কি প্রার্থনা—'তোমার বংশীনিনাদে মোহিত হইয়া আমরা পতি, পুত্র, জ্ঞাতিবর্গ, ভাই, বান্ধব—সকলকে ফাঁকি দিয়া তোমার জন্য রাত্রিতে গৃহত্যাগিনী হইয়াছি; কিন্তু, তুমি শঠ, তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ ত এমন প্রেমমুগ্ধ রমণীদিগকে রাত্রিযোগে এই ভাবে ত্যাগ করে না? হে কৃষ্ণ, 'তোমার বিশ্বমঙ্গলরূপা অভিব্যক্তি ব্রজবনবাসিগণের দুঃখনিরসনে সর্বথা সমর্থা। আমাদের মনও তোমার প্রতি প্রেমমুগ্ধ, অতএব, কৃপণতা না করিয়া তুমি সদয় হইয়া আমাদের স্বজন-হৃদ্‌রোগের নিবর্ত্তক ঔষধ একটু বিতরণ কর, তুমিই আমাদের সেই রোগের বৈদ্যরাজ।' (১০।৩১।১৮)

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ বিরহক্লিষ্ট গোপীদিগের নিকট পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের ত্রিগুণময় দেহ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাই পার্থিব কামগন্ধহীন রতি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ বিহার ও বিলাসক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলিয়া—'হে সখীগণ, তোমরা আমার উপকারার্থ আমাকে ভজনা করিয়া সম্ভবতঃ প্রত্যুপকার চাহিতেছ, কিন্তু তোমাদের সৌশীল্যের ঋণ আমি প্রত্যুপকারদ্বারা কখনই শোধিত করিতে পারিব না। হে প্রিয় অবলাগণ, তোমরা আমার প্রতি প্রেমভক্তিবশতঃ আমার অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া এই ভাবে লোকভয়, বেদধর্ম্ম-ভয় ও জ্ঞাতিকুলের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছ—তাই আমি তোমাদের প্রেমমাহাত্ম্যের মাত্রাপরীক্ষার জন্য তোমাদের প্রেমালাপাদির শ্রবণ মানসে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। আমার সেই প্রিয় আচরণে দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নহে।' (১০।৩২।২৭) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং
বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ
প্রতিযাতু সাধুনা॥"
(১০।৩২।২২)

'যে-হেতু আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য বা নিষ্কলঙ্ক, কাজেই আমি দেবতার আয়ুষ্কাল গণনা করিয়াও অর্থাৎ কোন কালেই নিজে তোমাদের প্রত্যুপকার-সাধন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু, তোমরা যখন অজর গৃহ শৃঙ্খল নিঃশেষভাবে ছিন্ন করিয়া আমার সেবায় ব্রতিনী হইয়াছ,—অতএব তোমাদের সেই সাধু-কৃত্যই আমাদ্বারা প্রতিকৃত হউক।' শ্রীকৃষ্ণের এই সান্ত্বনা-বাক্যে গোপীদিগের বিরহজ দুঃখ বিদূরিত হইল। তদনন্তর রাসক্রীড়ার আরম্ভ হইল। আত্মারাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নিজলীলার্থ গোপীগণ সহ নানারূপ বিহারক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। অকাম, নিষ্কাম ও আপ্তকাম যদুপতির পক্ষে রাসক্রীড়া জুগুপ্সিত বা ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া স্বীকৃত তাঁহার পক্ষে কামগন্ধহীন পরদারের সেবাগ্রহণ দোষযুক্ত—ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। গোপীদিগের 'জারবুদ্ধিতে' কৃষ্ণে সঙ্গত হওয়ার আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' লিখিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা গোপীদিগের "ভজন-প্রাবল্যমেব ব্যঞ্জিতম্"—এইরূপ ভজনপ্রণালীর প্রাবল্যই ব্যঞ্জিত হইতেছে, কারণ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "তথাবিধভাবস্য অতিনির্গলত্বং দর্শিতম্"—এইপ্রকার প্রেমভাবের কোন অর্গল বা সংবাধা থাকে না। মনে রাখা উচিত যে—

"বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।"

ও

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ধরে প্রেম-নাম॥"

আরও

"কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও বলা হইয়াছে—

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"॥
(১০।৩৩।৩৬)

শৃঙ্গাররসে (কামরসে) আকৃষ্টচিত্ত বহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলার অভিনয় হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ব্রজললনাগণের আচার-ব্যবহার হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ব্রজ-বধূদিগের এই নিরবচ্ছ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়াই বাঙ্গালার প্রাণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবও প্রেমপাগল হইয়াছিলেন। এই নিষ্কলঙ্ক প্রেম শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি জগজ্জনকে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবানের প্রতি প্রেম, নাম-সংকীর্ত্তন ও রাগানুগা ভক্তি স্বয়ং আচরণ করিয়া তিনি তাহা পরকে শিখাইয়াছেন। জীবের উদ্ধারার্থ ই তাঁহার সন্ন্যাস ও ধর্ম্মপ্রচার।

তিনি কিন্তু, ঐশ্বর্য্যের প্রতি ততটা আকৃষ্ট ছিলেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য স্ব-স্ব-ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার মানসে, দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিজনগণেরও জ্ঞানদ্বারা অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ ভজনা করিতেন। আনন্দরসময় পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বা প্রপত্তির আশ্রয় লইয়া সেবা-পরতায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই উৎকট সেবা-পরায়ণতার নামই বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'অহৈতুকী' বা 'রাগানুগা' ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের বৃন্দাবনলীলার কদর্থকারী তাৎকালিক নবশিক্ষিত যুবকদিগকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই লীলার অন্তঃস্থিত ভাব উপলব্ধি করাইবার জন্য এইরূপ উপদেশ দিতেন —"তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্‌না, ধর না— ঈশ্বরে মনের এইরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ্‌ দেখি, গোপীরা স্বামী, কুল, শীল, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল! ঐরূপ করিতে পারিলে তবে ভগবান্ লাভ হয়।"

মহাপ্রভু সাধ্যের নির্ণয়জন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে পর রায় প্রথমতঃ সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—

"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।"

অর্থাৎ তাঁহার মতে বিষ্ণুভক্তিই 'সাধ্য' এবং স্বধর্ম্মাচরণ ইহার 'সাধন'। তারপর এই বিষয়ে প্রভুর অভিমত জানিবার আকাঙ্ক্ষায় রামানন্দ-রায়ের এবং রায়ের ভক্তি পরীক্ষার জন্য প্রভুর মধ্যে নানাপ্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল। রায়ের ক্রমশঃ উক্ত সাধনসমূহকে মহাপ্রভু 'বাহ্য' সাধনরূপে আখ্যা দিতে লাগিলেন। রায় একবার বলিয়াছিলেন যে, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' সাধ্যসার। তার পর 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি', তদনন্তর 'প্রেমভক্তি', তৎপর 'দাস্য-প্রেম', 'সখ্য-প্রেম', 'বাৎসল্য প্রেম' প্রভৃতির কথাও তিনি প্রভুর নিকট সাধ্যসার বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তার পরে—"রায় কহে 'কান্তাপ্রেম' সর্ব্বসাধ্যসার।" অবশেষে রায় বলিলেন যে, যদ্যপি—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥"

তথাপি—"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।" সুতরাং সত্যসত্যই "ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা।" আর বাস্তবিকই ইহা সম্ভাবিত যে—

"গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন কেমন করিয়া নিজ সেবাদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করিবেন। আনন্দময়কে আনন্দিত করার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারিলেই নিজেও তিনি অত্যধিক আনন্দিত হইতেন। তিনি যেন সর্ব্বদা ভক্তগণকে উপদেশ করিতেন জীব নিজে ভিন্ন হইয়াও প্রেমরসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মিলন ঘটাইতে পারে। বাস্তবিক ভক্তিরসদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব বা অনন্যত্বের উপলব্ধি হইতে পারে। সেই রসস্বরূপ আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণে মানুষের জীবাত্মা যদি নিজকে ডুবাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উভয়ের নিরন্তর তাদাত্ম্য উপলব্ধি হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পাবে। বৈষ্ণবমাত্রই অবগত আছেন উপনিষদের সেই মহাবাক্য "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।" মনে হয়—শ্রীরাধারূপী আমাদের জীবাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মার মধ্যে ভগবন্মায়াশক্তিজনিত যে ভেদ আছে, প্রেমরসদ্বারা সে ভেদের নিরসন ঘটাইতে পারা যায়। কিন্তু দার্শনিক বৈষ্ণব আচার্য্যগণ একটি নূতন তথ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জীব কৃষ্ণ হইতে তদীয় অংশরূপে অভিন্ন হইলেও, নিজে ভিন্ন থাকিয়া স্বসেবাদ্বারা নিত্য লীলামাধুরীর উপভোগরূপ পরম সুখ চাহে। রসস্বরূপ অদ্বয় আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনদ্বারা প্রীত করিয়াই শ্রীরাধারূপী আমাদের জীবাত্মা প্রীত হইতে চাহেন ও প্রীত হইতে পারেন।

যে উপাসক অব্যক্তের উপাসনায় আসক্তচিত্ত তিনিও কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন সত্য, তবে তাঁহার উপাসনা-পথ বড় ক্লেশদায়ক—তদ্দ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌছিতে তাঁহাকে বড় দুঃখকষ্ট পাইতে হয়। গীতাতে সেই কথা স্মারিত হইয়াছে, যথা—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"
(১২।৫)

সেই জন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা উপাস্য দেবতারূপে তাঁহাতেই (কৃষ্ণেই) আসক্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ-সহকারে অহৈতুকী বা অনন্যা ভক্তি-অবলম্বন করিয়া ধ্যানাশ্রয়ে তাঁহার উপাসনায় ব্রতী হইতে পারেন, তিনি তাঁহাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। যথা—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন-চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"
(১২।৭)

শ্রীকৃষ্ণ অখিলগুণাত্মা—অনন্ত গুণের আধার। তদীয় ঐশ্বর্য্যের পারাপার নাই। নিজের গুণরাশির অন্ত তিনি নিজেই হয় ত জানেন, মানুষের পক্ষে তাঁহার বৈভব জানা দুরূহ। রামানুজদর্শনের পরিচয়-প্রসঙ্গে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার বলিয়াছেন যে, রামানুজের মতে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ'-পদটি নিরস্ত-সমস্ত-দোষ ও অসংখ্যেয়-কল্যাণ-গুণাস্পদ এবং জগতের উদয়, বিভব ও লয়ের লীলাবিধায়ক ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। যথা—

"তৎ-পদং নিরস্তসমস্তদোষং অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি।"

আচার্য্য রামানুজ নিজেও শ্রীভাষ্যের একস্থলে (৩।২।১১) লিখিয়াছেন—"যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণম-ভিধীয়তে, নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।"

সব যুগেই দেখা যায় যে, যে সাম্প্রদায়িক দেবতা যাঁহার উপাস্য, তিনি সেই দেবতাকেই পরব্রহ্মরূপে ভজনা করেন। বৈষ্ণব ভাবেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"
(ব্রহ্মসংহিতা)

"ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥"

এই প্রসঙ্গে ভাগবতের সেই চির-প্রসিদ্ধ শ্লোকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"
(১।২।১১)

এই অদ্বয় জ্ঞানকেই ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা কেহ (যথা, ঔপনিষদগণ) 'ব্রহ্ম', কেহ (যথা, হৈরণ্যগর্ভগণ) 'পরমাত্মা', আবার কেহ (যথা, সাত্বতগণ) 'ভগবান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদের মতে—"সেই অদ্বয়তত্ত্ব—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।" তাঁহাদের মতে জ্ঞানসাধনে 'ব্রহ্মের', যোগসাধনে 'পরমাত্মার' ও ভক্তিসাধনে 'ভগবৎতত্ত্বের' উপলব্ধি ঘটে। চিত্তে ভক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যসত্যই সগুণ ব্রহ্ম বা কৃষ্ণকে, এমন কি উপাস্য অন্য দেব-দেবীকেও, কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বড়ই উপাদেয়, নির্গুণকে বুঝা ও ধরা বড় কঠিন কার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদীয় পারিষদবর্গ ও ছয় গোস্বামী সকলেই নররূপী শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যে স্বয়ং আপ্লুত হইয়া জনসমাজে সেই মাধুরীর বিতরণকল্পে বাঙ্গালার নিজস্ব এই নবপ্রণালীর প্রেমধর্ম্মের উপদেশ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥"

আর্য্যভূমিতে আমরা চতুর্বর্গের কথা ও তদ্‌ব্যাখ্যা বহুকাল শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ভগবদ্‌ভক্ত আচার্য্যগণ সেই বর্গ কাটাইয়া পঞ্চবর্গের অস্তিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রেমভক্তিনামক এক পঞ্চম পুরুষার্থের অলৌকিক, অদ্ভুত ও অভিনব সন্ধান দিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষেরও উপর ইহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। এই অভিনব সৃষ্টিও জগতের উদ্ধারের এক প্রকৃষ্ট সহায় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসাধনোপায়ও অত্যন্ত সরল। তিনি ধর্মকে এতটা সরস ও সরল করিয়া আ-পামর সকলের গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্মে অনধিকারী বলিয়া কেহ নাই —এই বাণী এই দয়ালু অবতার পরিষ্কারভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন—

"পাত্রাপাত্র নাহি জ্ঞান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি।"

ইতোমধ্যে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে ('দিব্যাবদানে') পড়িয়াছিলাম—

"আবাহকালেঽথ বিবাহকালে জাতেঃ পরীক্ষা
ন তু ধর্ম্মকালে।
ধর্ম্মক্রিয়ায়াং হি গুণা নিমিত্তা (ম্ভং ?)
গুণাশ্চ জাতিং ন বিচারয়ন্তি॥"

ধর্ম্মার্জ্জনবিষয়ে সাধকের জাতি বা জন্ম বিচার্য্য নহে—গুণ থাকিলেই তাঁহার ধর্ম্মে অধিকার হয়!

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রও এক অভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট সৃষ্টি। ভারতীয় আলঙ্কারিক পূর্ব্বাচার্য্যগণ মানুষের মনে শৃঙ্গার হাস্য-করুণাদি নয় প্রকার রসের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা লৌকিক ব্যবহারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে এই নয় রসেরই নিষ্পত্তির কথা লিখিয়া কাব্যপঠন ও নাটকের প্রয়োগদর্শনসময়ে পাঠক ও দর্শক সামাজিকগণের মনে উদ্ভূত পরমসুখের অনুভববিষয়ে রসগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পারমার্থিক ব্যবহারে (অর্থাৎ অধ্যাত্মবিষয়ে) ভগবদুপাসনায় উন্নত-উজ্জ্বলরসনামে পরিচিত হইয়া ভক্তিও যে একটা প্রকৃষ্ট রস হইতে পারে, সেই সন্ধানের কথা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনীয় রসকেলিবার্ত্তা কালে লুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীরূপ-গোস্বামীর উপর নিজ শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া শ্রীরূপ-গোস্বামী বিবুধসমাজের জ্ঞান ও ভক্তিবর্দ্ধনমানসে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি'-নামক দুই উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা অলঙ্কারশাস্ত্র-জগতে বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে তুলিয়া দিয়াছেন। বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মনিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনে যাইয়া অন্যান্য বহুগ্রন্থসহ এই দুই গ্রন্থ রচনা করিলেন। মহাপ্রভু প্রয়াগে এক সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্য এব পরো রসঃ'—কহে উপাধ্যায় ॥"

শ্রীরূপগোস্বামী তদীয় 'পদাবলীতে' উপাধ্যায়ের সমগ্র শ্লোকটি এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥"

'শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরী বা মথুরাপুরীই শ্রেষ্ঠ পুরী, কিশোর বয়সই ধ্যানযোগ্য বয়স এবং আদিরসই (অর্থাৎ উজ্জ্বল শৃঙ্গারই) শ্রেষ্ঠ রস।'

প্রাচীন আলঙ্কারিক রুদ্রভট্টও লিখিয়াছিলেন—"শৃঙ্গারো নায়কো রসঃ"। সে যাহা হউক, প্রয়াগে নিজশক্তি-সঞ্চারদ্বারা শ্রীরূপকে—

"কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥"

ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানোপলব্ধির উপায়রূপে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির স্বরূপাদি বর্ণিত পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবিতেন—

ধর্ম্মচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে 'অশান্ত'॥

যিনি ভাগ্যবান্ তিনিই "গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি চমৎকারভাবেই চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদে) ভক্তিকে লতারূপে ও কৃষ্ণের চরণকে কল্পবৃক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই লতাতেই প্রেমফল পাকে ও মালী তাহা আস্বাদন করিতে পারে, এবং সেই লতাদ্বারা অবলম্বিত কৃষ্ণকল্পবৃক্ষকে অবশেষে পাইয়া মালী প্রেমফলের রস 'কৃষ্ণমাধুরী' আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়।

এই প্রেম সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। নারদ-পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতে সেই অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির যে লক্ষণ পাঠ করা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ একটি মাত্র পয়ারে ইহা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥"

শ্রীকৃষ্ণকে অনুকুলিত করার উদ্দেশ্যে ভক্ত অনন্যমনা হইয়া নয়নশ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুশীলন করিবেন। ইহাই শুদ্ধভক্তির পরিচয়। মনে রাখিতে হইবে যে, যতক্ষণ ভুক্তি

ও মুক্তির স্পৃহা হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিবে, ততক্ষণ ইহাতে ভক্তিরসসুখের অর্থাৎ প্রেমের অনুভব সম্ভাবিত নহে। তাই শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

নিজের অনুভূত এই প্রেমরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া অপরকেও ইহা ভোগ করান যায়—এই সুকথা ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন অবতারে এতটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই প্রেমরস নিজে আস্বাদন করিয়া আচণ্ডাল সকল ভক্তের, এমন কি, স্থাবরজঙ্গমের মধ্যেও, ইহার সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তি হইতে উদ্ভূত এই প্রেমের লক্ষণ বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রকর্ত্তা শ্রীরূপ-গোস্বামী তদীয় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

প্রত্যেক রসেই একটা স্থায়ী ভাব আছে—আলঙ্কারিকগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাবের নাম হইল 'প্রেম'। কৃষ্ণে যে সান্দ্র বা গাঢ় রতি (অপর নাম—সমর্থা রতি) হয়, যাহা মানবচিত্তের মাসৃণ্য বা মসৃণতা উৎপাদন করে এবং যাহার বিষয়ীভূত মমতার আতিশয্য (অর্থাৎ ভক্তপক্ষে, 'কৃষ্ণে মমত্ব-বোধ' এবং কৃষ্ণ-পক্ষে, ভক্তে মমত্ববোধের আতিশয্য) উৎপাদিত হয়—সেই রতির নাম 'প্রেম'। 'তুমি ত আমার আছই' এবং 'আমিও তোমার আছিই' ('তবাস্মি'-ভাব)—এইরূপ ভাব পরস্পরের মধ্যে ব্যঞ্জিত না হইলে এই গাঢ় প্রেমের উদয় সম্ভাবিত নহে। উভয়-মধ্যে (অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার মধ্যে; এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং ভক্ত নায়িকা-শ্রেণীভুক্ত) যে রতির উদ্ভব হয় তাহারও ক্রমবৃদ্ধির এক একটা স্তর থাকে, যথা—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। এই প্রকার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান রতিগাঢ়ত্বের দরুনই প্রেমের সান্দ্রতা বা গাঢ়তা বা ঘনীভাব বুঝিতে হইবে। এ-সব সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা এই প্রবন্ধের বিস্তরভয় আনিতে পারে, তাই ইহার বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকাই এখানে বাঞ্ছনীয়। সে যাহা হউক, সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা কবিরাজ গোস্বামী এই স্তরগুলিকে যে-একটি পয়ারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ, যথা—

"যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রী, উত্তমমিশ্রি আর॥"

পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে—

"ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।" (মম্মটভট্ট)

আলঙ্কারিকের মতে—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

প্রত্যক রসের 'বিভাবে' আলম্বন ও উদ্দীপন-নামক দুইটি অঙ্গ আছে। কৃষ্ণভক্তিরসের আলম্বন বিভাব হইলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়; ইহার উদ্দীপন বিভাব বংশীধ্বনি প্রভৃতি। এই রসের 'অনুভাব' হইল হাস্য-নৃত্য-গীতাদি। স্বেদ, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভাদি ইহার সাত্ত্বিক ভাবগুলিও এই অনুভাবেরই অঙ্গীভূত। নির্ব্বেদ, হর্ষ প্রভৃতি এই রসের 'ব্যভিচারী' ভাব। পান, গুবাক, খদির ও চূর্ণিকা (চূণ)—এই কয়েকটি দ্রব্যের সংযোগে মুখমধ্যে চর্ব্বণ ঘটিলে যেমন এক উপাদেয় চমৎকারী আস্বাদ্য রসের সঞ্চার হয়, তেমন তৎ-তদ্-বিভাবাদিসং-যোগেও ভক্তের মনে এক অপূর্ব্ব চমৎকারী ভক্তি-রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই ভক্তিরসের স্থায়ী ভাবের নামই 'প্রেম'। এই প্রেমেরই নামান্তর হইল মহাভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি করুণাবশতঃ নিজের আস্বাদিত কৃষ্ণপ্রেমরস ভক্তের আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট প্রেমধর্ম্মের ইহাই মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

জাতিগঠন করিতে আমরা চাই। কিরূপে করিব—ইহাই সমস্যা। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশে ধর্মের পুনরভ্যুত্থান না হইলে আমরা উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। আমাদের এমন একটি ধর্মের প্রচারণ দরকার যাহা প্রত্যেক ধর্মকে স্বীকার ও গ্রহণ করে। বিবেকানন্দ-প্রচারিত মহান্ বেদান্তই এই ধর্ম। আমাদের দেশে বেদান্ত কিছু নূতন নয়, কিন্তু বেদান্ত আমাদের নিকট দুরবগাহ ছিল; আমরা উহার ব্যবহার করি নাই, উহা জীবনে রূপায়িত করিতে পারি নাই। আমাদের প্রয়োজন বুদ্ধের প্রেম ও কার্যকারিতা এবং বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব। স্বামীজি তাঁহার মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তিনি এমন একটি বার্তা বহন করিয়া আনিবেন যাহা শুধু তাঁহার স্বদেশের নিকটই নহে, অন্যান্য বৈদেশিক জাতির নিকটও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভগবান্ বুদ্ধ যেরূপ সন্ন্যাসি-সংঘ গঠন করিয়াছিলেন, স্বামীজিও তেমনি স্বদেশবাসি-গণের নিকট তাঁহার শিক্ষা ফলপ্রসূ করিবার জন্য একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিয়াছেন। গর্ব ও আনন্দের বিষয় এই যে, এই মিশনের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন সফলতা লাভ করিতেছে এবং দরিদ্রের সেবা, নিরক্ষরের শিক্ষাদান, পতিতের উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণকর কার্যদ্বারা বেদান্ত জনসাধারণের নিকট পৌঁছিয়াছে।

ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিবেকানন্দকে আমি নেতা বলিয়া গণ্য করি—এগুলি সবই আমাদের প্রাচীন যুক্তি-মূলক বেদান্তদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমরা যদি পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে দায়স্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর জাতি গঠন করিতে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে ভারত আর ভারত থাকিবে না। স্বামীজির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে নিজেদের চেষ্টায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও সম্পন্ন করিবার জন্য পরম আগ্রহের সহিত যত্নপর হইতে হইবে। ব্যষ্টি-জীবনের উপলব্ধিতেই আমাদের প্রগতি পর্যবসিত হইবে না; অন্যান্যের যাহাতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয় তজ্জন্যও আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার এই দিকটা আমাদের সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য এবং ধর্মের আওতা হইতে আমাদের গ্রাম, দেশ ও ভ্রাতা-ভগিনীদের অত্যাবশ্যক সমস্যা-সমূহের অনুধাবন ও সমাধানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে চলিবে না। আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসরণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও অব্যর্থ সমাধান মিলিবে।

* দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণমিশনে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা হইতে সংকলিত। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

ওরেগন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধর্মসম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

গত জানুয়ারী মাসে ওরেগন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্‌যোগে একটি ধর্ম-সম্মেলন আহূত হয়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অভিমত—ধর্ম মনুষ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মহতী অভিব্যক্তি। বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস ও অনুভূতি যতই বিচিত্র হউক, তাহারা সমগ্র মানবগোষ্ঠীরই সাধারণ সম্পত্তি। মানুষের ইতিহাসের সহিত মানুষের ধর্মবোধ অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। অতি আধুনিক সামসময়িক যুগেও ধর্মের পাবন প্রভাব মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। বিভিন্ন ধর্ম-সম্বন্ধে সহানুভূতি-পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বারাই শিক্ষার্থীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে। এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ওরেগন্ বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ গত দশ বৎসর যাবৎ একটি ধর্মবিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। আবার প্রতিষ্ঠানটির এই বিশেষ স্মরণীয় বৎসরে বিশ্বধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাঁহারা আপনাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। ওরেগন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ্ কে নিউবার্ন সম্মেলনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে এক চমৎকার আশার বাণী শুনাইয়াছেন: আমরা বিশ্বাস করি এই বিশ্বধর্ম-সম্মেলন হইতে উদ্ভূত হইবে এক গভীরতর পারস্পরিকতা, সর্বমানবের নিবিড়তর সৌভ্রাত্রবোধ, আসিবে মানবজীবনের বৃহত্তর মর্যাদা—যে মর্যাদা ব্যাকৃত হইয়াছে বিভিন্ন ধর্ম মতের মধ্যে। ধর্মবোধ দ্বারাই আমরা প্রাণধারণ করি।

চার দিনব্যাপী এই ধর্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। ২০শে জানুয়ারী প্রারম্ভিক অধিবেশনের বক্তা ছিলেন পোর্টল্যাণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্মযাজক রেভারেণ্ড্ পল্ এস্ রাইট্। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সত্যানুসন্ধিৎসার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, বর্তমানে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যই চাই, সত্য চাই না, সত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ নাই। আবার কেবলমাত্র নিজের ধর্মের উপর জোর দেওয়া যথেষ্ট নয়, সত্যসন্ধ দৃষ্টি দ্বারা অন্যের ধর্মানুরাগকেও মর্যাদা দিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহূত। ওয়াশিংটন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্যাটসুমি সম্মেলনটিতে একটি সক্রিয় অথচ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার আলোচিত বিষয় ছিল মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম। তিনি বলেন, মানবের দুঃখ ও অসন্তোষের মূলীভূত কারণ হইল দুরপনেয় স্বার্থ-পরতা; তৃষ্ণাদষ্ট জীব দুঃসহ দুঃখে জর্জরিত। এই তৃষ্ণাই আমাদিগকে বিষয়াভিমুখী করিতেছে। আমি অনন্তকাল বাঁচিব, সুখে সম্পদে ডুবিয়া থাকিব—এইরূপ স্বার্থবুদ্ধিই দুঃখাভিঘাতের জনক। বুদ্ধ বলেন, এই তীব্র বিষয়াভিনিবেশ জয় করিলেই আসিবে বিক্ষোভহীন শান্তি, চিত্তের অচঞ্চল সমতা। নির্বাণের অর্থ 'আমি'র বিলয়। বাইবেলও বলিয়াছেন, পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইলে ক্ষুদ্র জীবনকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে।…বৈদ্যুতিক শক্তি আর বৈদ্যুতিক দীপ ত এক নয়। বৌদ্ধধর্ম মূল তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন, তাহা হইতেই সব কিছু প্রপঞ্চিত। কত দীপ আসিবে, কত দীপ যাইবে; কিন্তু আসল তাড়িত শক্তি থাকিবে এক,

অবিকৃত।···বর্তমানে মানুষের দুঃখের কারণ এই যে, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সামঞ্জস্য আমরা রক্ষা করিতে পারি না, অথচ এই সামঞ্জস্যের শিক্ষাই বুদ্ধ ও বোধিধর্মের বাণী। অনেকের প্রচেষ্টা দেহ ও মনের স্তরে পর্যবসিত, জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াই চলেন। জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া নির্ভীক ভাবে মৃত্যুবরণ করিতে ত তাহারা প্রস্তুত হয় না। পাশ্চাত্ত্যবাসী আপন আমিত্বকে ধরিয়া রাখিতে চায়; প্রাচ্যবাসী অনন্তে বিলয়প্রয়াসী।···বিংশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু দিবার আছে। সত্যসন্ধিৎসা, ধ্যানাভ্যাস, নিরন্তর কর্মরতি, উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা—এইগুলিই বুদ্ধবাণীর বৈশিষ্ট্য।······প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাচ্যাদর্শ বুঝিতে হইলে এই কথাটি স্মরণ রাখিতেই হইবে। সর্বং দুঃখম্—এই বোধের ভিতর দিয়াই আসে পরিণামে অনির্বাণ প্রশান্তি। অধ্যাপক ট্যাট্‌সুমি লাউৎজে ও কনফুসীয় ধর্ম-সম্বন্ধেও মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ট্যাট্‌সুমির জীবনের বৈচিত্র্য বেশ চমকপ্রদ। এগারো বৎসর বয়সে তিনি টোকিওর একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি কনফুসীয় শাস্ত্র এবং অন্যান্য চৈনিক গ্রন্থ পাঠ করেন। পরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া অবসরসময়ে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মুখ্যতঃ তিনি বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ এবং সঙ্গীত-শিক্ষা করেন। ১৯১৮ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগে যোগ দেন এবং যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত সেই কাজে নিযুক্ত থাকেন। তারপর তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে জাপানে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনকার্যে এবং জেন্ (Zen) বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন। আবার আমেরিকায় গিয়া ওয়াশিংটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৮ সাল হইতে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষার অধ্যাপনা করিতেছেন। জাপানী-শিক্ষার তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

সম্মেলনে আর একজন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পোর্টল্যাণ্ড (ওরেগন্) বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী দেবাত্মানন্দ। দেবাত্মানন্দজী প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিভাষণ দেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—ভারতবর্ষে আমরা ধর্মের কথা মুখে বলি না, কার্যতঃ ধর্মজীবন যাপন করি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হইল—প্রাচ্যধর্ম অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্ত্যধর্ম বহির্মুখী।······হিন্দুধর্ম কোন সংঘবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় নহে, ইহা জীবন-নিয়ন্ত্রণের একটি পথমাত্র। ইহার নিকট জীবমাত্রই নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সকলেই অনাদ্যন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের তরঙ্গ। সরলমতি হিন্দু কৃষক পর্যন্ত—ধর্মের কথা যে কিছুই জানে না—জীবনে ভগবানকেই প্রাধান্য দান করে। ভগবান এক বা বহু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি নয়, সে জানে 'রাম'ই তাহার প্রাণের ঈশ্বর। বক্তা পণ্ডিতম্মন্য তথাকথিত কেতাবী ধর্মবিশেষজ্ঞদিগের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, পুঁথিপড়া এই সবজান্তাগণ বিদেশে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করিয়া বৈদেশিকদের ধর্ম-সম্বন্ধে চপলতাসুলভ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইঁহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিতেই হইবে। আপাততঃ মনে হয় তাঁহারা কত বিদ্যাই না সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কথা স্তূপীকৃত মিথ্যা। দেবাত্মানন্দজী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের

বৈলক্ষণ্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম শ্রম-বিভাগের আদর্শের উপর স্থাপিত। সমাজের বৃহত্তর জীবনে প্রত্যেক বর্ণ ও প্রত্যেক আশ্রমের একটি বিশিষ্ট স্থান ও নিশ্চিত কার্যকারিতা আছে। সমাজের ব্যক্তি-মাত্রেরই পবিত্র কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত রাখিয়াছিল এই ধর্মব্যবস্থা। হিন্দুধর্মের দৃষ্টি সমাজমুখী, বৌদ্ধধর্ম চাপাইয়াছে ব্যক্তির উপর গুরু দায়িত্ব, সুতরাং ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। হিন্দুধর্ম বলে বর্তমান জীবনই সব নয়, গতাগতের পরম্পরা আমুক্তি চলিবে। দুঃখ-জর্জরিত জীবনের প্রতি এবং মৃত্যুর প্রতি হিন্দু উদাসীন, যদিও দয়াদ্র্যভাব হিন্দুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধমতে অমৃতত্ব-স্পৃহা দেহাব্যাপার-মাত্র, ধ্যান দ্বারা এই আকৃতিকে জয় করিতে হইবে। সত্যকে জান, কেবলমাত্র সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে। ভগবান্ সর্বান্তর্যামী, অন্তরীক্ষের কোন বিশেষ অজ্ঞাত মেঘলোকে তিনি লুক্কায়িত নন। অনন্ত দুইটি থাকিতে পারে না। অনন্ত অংশহীন, নিরাকার। অনন্তই সকল, আবার সকলই ঈশ্বর। হিন্দুরা কেবলমাত্র আঘাতই গ্রহণ করিতেছে, আঘাত ত তাহারা করে না। আমি যদি প্রতিশোধ লই, নিরীহ লোক দুঃখভোগ করিবে। একটি বিশেষ প্রাচ্য মন, আরেকটি পাশ্চাত্ত্য মন—এই ধারণাটি ভ্রান্ত। আমাদের যে সকল কর্ম এই জীবনে ফলপ্রসূ হইল না তাহাদের ভার বহিতে হইবে জন্মান্তরে। এই পার্থিব জীবনের যাবতীয় চিন্তা, উচ্চারিত শব্দ এবং অনুষ্ঠিত কাজ সকলেরই বোঝা বহিয়া চলিব মৃত্যুর পর। সুতরাং কর্মের প্রতি যেমন অবহিত হইবে, চিন্তার প্রতিও তেমনি। মানুষ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দের অবস্থা অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান পাইলেই জন্মমৃত্যুর পরপারে যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্যেরা বলেন: বর্তমানের জন্য জীবনধারণ কর; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবেন ভগবান্। কিন্তু প্রাচ্যেরা কি বলেন? তাঁহাদের কথা হইল: অনন্তের জন্য বাঁচ; বর্তমানের কথা ভাবিবেন ঈশ্বর।···নিজের ভাগ্য আমরা নিজেরাই গঠন করি, কিন্তু আবার যখন আমরা জন্ম পরিগ্রহ করি, অতীত সংস্কারের বোঝাও সেখানে হাজির হয়। জীবনের শক্তিক্ষয় কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। শাস্ত্র বলেন, আশি লক্ষ অবর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জীব একবার পরমেপ্সিত মনুষ্যজীবনে উপনীত হয়। নির্বাণ সুখে সুখী হইয়া এই অমূল্য জীবনকে সার্থক ও সুনির্বৃত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। নির্বাণই অনন্ত জ্ঞানাবস্থা, অনন্ত আনন্দের অবস্থা।

মেথোডিষ্ট ধর্মযাজক রেভারেণ্ড ডক্টর জেরাল্ড কেনেডি ধর্মসম্মেলনের অন্তিম অধিবেশনের প্রধান বক্তা। তিনি ক্রমবর্ধমান ঐহিকতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালাইতে খৃষ্টীয় যাজকগণকে আহ্বান করেন। তিনি আরও বলেন, খৃষ্টীয় জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে গণতন্ত্র অচল। যাজকসম্প্রদায় সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন হইবেন, বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁহাদিগকে হইতে হইবে সক্রিয়ভাবে অবহিত। ভগবান্ যীশু ইহারই জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, এই প্রাথমিক জীবনমর্যাদাই তিনি চাহিয়াছিলেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী গির্জা মহাবিপত্তির নিদর্শন।

ক্যাথলিক্ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড্ মার্টিন থিলেন্ও সামাজিক দায়িত্বের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র ও শিক্ষা নীতি-নিরপেক্ষ হওয়া অবিধেয়। যথার্থ শ্রমের মূল্যদান দয়া নহে, ইহা বিচার। শ্রমিকের, রাষ্ট্রের কর্মচারীর সম্পূর্ণভাবে, সুন্দরভাবে দৈনন্দিন কাজ করাও বিধেয়। স্বীকার করি খৃষ্টানজাতি অখৃষ্টানজাতির প্রতি সপ্রেম ব্যবহার করে নাই, সত্যই তাহাদের বৈষম্যাত্মক নীতি মানুষে মানুষে ভেদসৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ইহাও সত্য, তাহারা যদি ঠিক ঠিক খৃষ্টাদর্শপ্রেমিক হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানেতর মানবজাতির সহিত তাহাদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। প্রাচ্যধর্ম ও খৃষ্টীয় চার্চের একটি মধ্যপন্থার উপর জোর দিয়াছেন রেভারেণ্ড্ ইভান্ উইলিয়ামস্। বৈরাগ্যপ্রবণ অতীন্দ্রিয়ানুরাগী প্রাচ্যের ধর্মাদর্শের সহিত বৈরাগ্যবিমুখ পাশ্চাত্ত্য খৃষ্টধর্মভাবের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন।

ইসলামের প্রতিনিধি বসির আহমদ্ মিন্টো, ইহুদি ধর্মনেতা রুবি জুলিয়াস্ জোসেফ্ নোডেল্, রেভারেণ্ড ডক্টর জর্জেস ফ্লোবোভ্স্কি প্রমুখ ধর্মনেতাও উদার, মতসহিষ্ণু আলোচনা দ্বারা সম্মেলনটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯২০ সালের পূজার পূর্বে পূজ্যপাদ হরি মহারাজের নিকট যোগবাশিষ্ঠ শ্রবণকালে ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব লোকাদি-সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়, পূজার পর যখন 'উদ্বোধনে' গেলুম, তখন ঐ বিষয়ে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের সঙ্গেও কথা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, যে দেশ-কালে আমরা এই পৃথিবীটা দেখছি, ঠিক সেই রকম একটা বিশিষ্ট দেশ-কালে কি ব্রহ্মলোকাদি আছে?" তিনি বললেন, "দেশ-কালে আছে বৈকি; ব্রহ্ম-লোকই হোক আর যে লোকই হোক, যখন লোক—দৃশ্যজগৎ, তখন দেশকাল ছাড়িয়ে আর কোথায় যাবে? তবে এই রকম দেহেন্দ্রিয় দিয়ে ব্রহ্মলোক দৃশ্য হয় না। কেউ যদি তোমায় ব্রহ্ম-লোকে নিয়েও যায়, এইরূপ স্থূল ভোগায়তন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে ঠিক এখানকার মতই দেখতে পাবে, এ ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির অতীত কিছু দেখতে পাবে না। এ সব যন্ত্রপাতির খুব সূক্ষ্ম তরঙ্গসকলের গ্রহণ এবং ধারণের ক্ষমতা নেই। যেমন মানুষের কান কতকগুলো শব্দতরঙ্গ-মাত্র ধরতে পারে, আবার চোখও কতকগুলো বিশিষ্ট আলোকতরঙ্গ-মাত্র ধরতে পারে, তার নীচেও পারে না, ওপরেও পারে না। কিন্তু সাধন-ভজনের দ্বারা ঐ সব ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ে এবং এখন যা আমাদের কাছে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সে সকলেরও সূক্ষ্ম তরঙ্গ গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে; তখন ঐ সকল জগৎ চিত্তে প্রতিভাত হয়। যেমন ধর না, একটা ফুলের রেণুর মধ্যে অত কাণ্ড কি সাদা চোখে দেখা যায়? কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চোখের গ্রহণ ও ধারণা শক্তিটা বাড়িয়ে দিলে তখন দেখতে পাওয়া যায়। (ঐ সময় আমরা উদ্বোধনে একটা মাইক্রস্কোপ নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করি)।

"মন শুদ্ধসত্ত্ব কর, তখন ব্রহ্মলোক কেন, এমন সব দেখতে পাবে, যা দেবতাদেরও দৃশ্যের অতীত। ভগবানকে দেখতে পাচ্ছ না কেন? তিনি তোমার অন্তরেই রয়েছেন, তিনি জগতের অন্তর্যামী, তাঁতে জগৎ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, আবার মূর্তি ধরেও তোমার সামনে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু দেখবে কি করে, মন যে বিষয়মুখী হয়ে ছটফট করছে—কেবল মোটা চিন্তা নিয়ে থাকলে মন ও মস্তিষ্ককেন্দ্র কেবল স্থূল তরঙ্গগুলোই ধরতে পাবে। কারণ, তাইতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বেশ সন্তুষ্ট থাকে। কোন সূক্ষ্ম চিন্তা মগজে ঢুকতে গেলেও তারা দল বেঁধে তাড়িয়ে দেয়, তারা আসতে দেবে কেন? তারা কত জন্ম ধরে ঐ রকমই দেখে শুনে আসছে।

"সংসারটা যেন একটা কারাগার, ইন্দ্রিয়গুলো হলো যেন তার মধ্যে ছোট ছোট রং বেরঙের দরজা, তার ভেতর দিয়ে ছাড়া বাইরে কিছুই জানবার উপায় নেই, আবার ভেতরে যে বুদ্ধির একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে, তাতে আলো-ছায়ার মত ভেতরের ব্যাপারও সব অস্পষ্ট, কারণ তার চিমনিটা একেবারে ময়লায় ভরা। এই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত জীবনের নাম সংসার। মনের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক স্পন্দে স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি জীবন সব স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। মন নিঃস্পন্দ, নির্বীজ হলে তবে ব্রহ্মদর্শন হয়।"

* * *

১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের দিকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মঠে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের সহিত ফিরে এসে গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। বললেন, "মহা সৌভাগ্য তোদের, যাঁকে লাভ করবার জন্য সাধন-ভজন, তিনি স্বয়ং কৃপা করলেন, আর ভয় কি? জানবি, তোরা হচ্ছিস ঠাকুরের sappers and miners—এটা ছোট কাজ নয়, গুরুতর কাজ। ঠাকুরের কাজের ছোট বড় নেই; যে রকম কর্মীই হোক ঠাকুরের হয়ে গেলেই সোনা হয়ে গেল। জগৎটা যদি মায়া হয়, তাহলে, তার মধ্যে আবার ছোট বড় কাজ কি? ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়, দেখ্ না যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না, আভীররা তাঁর সামনেই যদুস্ত্রীদের হরণ করে নিয়ে গেল। লব ও কুশ হনুমানকে নাগপাশে বাঁধলে, তিনি মনে মনে বললেন, 'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে?' রুদ্রাবতার মহাবীরকে বাঁধবে কে? অষ্টমূর্তিতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন। একটা গল্প বলি শোন—

"দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে অর্জুনের একবার সমুদ্রের ধারে মহাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। অর্জুনের সৈন্যেরা তাঁর কদলীবন ভাঙ্গছিল। তিনি মানা করে পাঠালেন। অর্জুন বললেন, 'কে মহাবীর আমরা চিনি না। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর কৃষ্ণরক্ষিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। মহাবীরকে এখানে আসতে বল। মহাবীর বিনীত ভাবে উপস্থিত হলেন এবং অর্জুনকে ছল কোরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কৃষ্ণ কিরূপ গুণ ও বলশালী?' অর্জুন বললেন, 'আমাদের ভগবান এক হাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ কোরে ইন্দ্রের বজ্রকেও ব্যর্থ করেন। এখন তুমি তোমার পরিচয় দান কর।' মহাবীর বললেন, আমি জগতে রামদাস বলে খ্যাত।' অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই রাম কিরূপ গুণ ও বলশালী?' মহাবীর বললেন, আমার ভগবান পর্বত-সেতুর দ্বারা এই বিশাল সমুদ্র বন্ধন করেন। লক্ষ লক্ষ বানর পাথর যোগায়, রাম-নামে সেই শিলা জলে ভাসে।' অর্জুন হেসে বললেন, 'এ আর কি আশ্চর্য! আমি মুহূর্তের মধ্যে বানে বানে সেতু বন্ধন কোরে দিই দেখ।' মহাবীর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিন্তু হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার ধনুর্বিদ্যা ধন্য। কিন্তু এর ওপর দিয়ে কি পর্বতপ্রমাণ বানরসৈন্যেরা যেতে পারবে? আমি একলাই যদি পাহাড় পর্বত নিয়ে যাই ত এ এক্ষুনি মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।' অর্জুন বললেন, 'তুমি পরীক্ষা কোরে দেখ।' বলতেই মহাবীর স্বীয় বিরাটমূর্তি প্রকট করলেন। দেখে অর্জুন অন্তরে অন্তরে খুব ভীত হয়ে পড়লেন। মহাবীর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস! দেখ, আমি কি এর ওপর দিয়ে যেতে পারব?' অর্জুন মুখে সাহস দেখিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, কিন্তু বিবর্ণমুখে দর্পহারী, বিপদভঞ্জন মধুসূদনের স্মরণ করতে লাগলেন। মহাবীর সেতুর উপর পদভার দিলেন, সেতু অটুট রইল। কিন্তু দেখে মহাবীরের সংশয় হলো। ভাবলেন, 'আমি রুদ্র, অষ্টমূর্তিতে এ বিশ্বসংসার ধারণ করছি, আমার ভার সাক্ষাৎ ভগবান ছাড়া আর কে বহন করতে পারে?' তিনি ধ্যানে দেখলেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান অতিবিশাল কর্মঠমূর্তি ধরে জলের মধ্যে নিজ পৃষ্ঠে সেতু রক্ষা করছেন। সমস্ত সমুদ্র বাণবিদ্ধ ও পদভারে বিরাট কচ্ছপ শরীরস্থ রক্তপ্রবাহে লোহিতাভ হয়ে উঠেছে। তখন উভয়ে পরস্পরের অপরাধ বুঝতে পেরে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর কাছে

সব সমান। তিনি ছোটকে বড়, বড়কে ছোট করে দিতে পারেন। তিনি কাকে দিয়ে কিরূপ কাজ করাবেন তা তিনিই জানেন। স্বামীজী একবার লিখলেন, 'তাঁর নামে মূর্খ পণ্ডিত হয়ে যাবে।' "

এ অমৃতময় বাণীর ছন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে—

নীচ হোক, পাপগন্ধে পর্যুষিত ; হোক বিনিন্দিত
যদি কহে একবার, 'হে প্রভু ! আমি যে তোমার'।
অকস্মাৎ তুমি তারে দান আত্মলোক
কি কহিব দয়া তব অনন্ত অপার ॥

প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "এ জগদ্ব্যাপার কি তাঁর খামখেয়ালি, না, এতে কোন কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে ?" বললেন, "খাম-খেয়ালি নয়, লীলা। অজ্ঞান থেকে খামখেয়ালি হয়, আর পরিপূর্ণ জ্ঞানে হয় লীলা। অজ্ঞানী জীবজগতে অধিক সময়ই কার্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পায় না ; ব্যবহারিক সত্তায় কার্যকারণসম্বন্ধ আছে, তা এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে অল্পজ্ঞ জীব তা ধরতে পারে না বলে, 'ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে, তিনি খেয়ালী।' কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত জানে, তিনি কর্মফলদাতা, কিন্তু কৃপাময়। 'তিনি কানখড়কে, পিঁপড়ের পায়ের নূপুরধ্বনিও শুনতে পান।' তিনি আইন করেছেন, কিন্তু তিনি আইন ভাঙ-তেও পারেন—তাঁর ইচ্ছায় লাল জবার গাছে সাদা জবাও ফুটতে পারে। তাঁর মাফ করবার ক্ষমতার শেষ নেই। তার মানে নয় তিনি whimsical ; বাপ-মা ত ছেলে-পুলের কত দোষ ত্রুটি মার্জনা করেন, তার মানে কি তাঁরা whimsical ? তিনি একশো বছরের বন্ধ তালা কড়াৎ কোরে এক মুহূর্তে খুলে দিতে পারেন, তাঁর কৃপায় অসাধুও এক মুহূর্তে সাধু হয়ে যায়।

"কিন্তু পারমার্থিক সত্তায় যখন জগৎ থাকে না, তখন আবার কার্যই বা কি, কারণই বা কি ? ঠাকুর বলতেন, 'ভগবানের ছোট ছেলের স্বভাব, যে চাইছে তাকে দিলে না, আবার থপ্ করে একজনকে দিয়ে দিলে।' একজন শ্মশানে সাধন করছিল, তাকে বাঘে নিয়ে গেল, আর একজন সেই আসনে বসে মায়ের স্মরণ করতেই মা দেখা দিলেন। সাধক মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা বললেন, 'বাবা, তোমার পূর্ব-জন্মের অনেক কঠোর সাধনা ছিল, কেবল একটু বাকি ছিল। সেটুকু হয়ে গেল, তাই আমার দেখা পেলে।' মহাকাল সর্বদর্শী। তিনি সকলের সকল কর্মের সাক্ষী, তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। ফাঁকি দিলেই ফাঁকিতে পড়তে হবে। 'ও সে কড়ার কড়া তস্য কড়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে লবে।' তবে তিনি কপালমোচন, তাঁর যদি দয়া হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি দেখছি অসহায় জীব এমন কী করতে পারে যে তাঁকে পাবে—যাক্, যার কৃপায় তোরা কৃপাসিন্ধু, তাঁর অশেষ কৃপায় তোদের আর ভয় নেই, দেখবি যে কোন বন্ধন আসুক মা কেমন কেটে দেন। ফোঁড়া কাটবার সময় ছেলে চিৎকার করে, খুব লাগে, কিন্তু জানবি সেটা সারাবার জন্য।"

আমি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলুম, উঠবার সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সমস্ত শরীরে একটা অপূর্ব আনন্দানুভূতি হতে লাগলো, চোখে আপনি জল এলো। বললেন, "প্রাণভরে ঠাকুরের কাজ কর, ঠাকুরের মহিমা প্রচার কর, নাম বিলো, দেখবি তিনি পরিপূর্ণ করে দেবেন ?" বলে গাইতে লাগলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায় !
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয় !
(তোরা কে নিবি রে আয় !)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় !
(গৌরপ্রেমের হিল্লোলেতে নদে ভেসে যায়)

* * *

বোধ হয় এর পরই তিনি মালদহে প্রচারকার্যে যান।

সমালোচনা

শক্তিসাধনম্—(সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ) ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত। ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। রয়াল অক্টেভ পৃষ্ঠা ১৬, দাম আট আনা।

১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং ভারতবর্ষের তৎপরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা বর্ণনার নিমিত্ত সুললিত সংস্কৃত পদ্যে ডক্টর চৌধুরী এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বসিয়া নিরন্তর মনে হইতে থাকে সংস্কৃত ভাষা কত অনায়াসে অতি আধুনিক বিষয়েরও পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্বক ডক্টর চৌধুরী বলিয়াছেন, যুগে যুগে ভারতবাসী এই প্রকার দুঃখ আততায়ীদের হস্তে সহ্য করিয়াছে এবং তাহার প্রতীকারও করিয়াছে। এই প্রকার দুঃখের বিনাশের জন্য আজও শক্তিসাধনের প্রয়োজন। এই সকল শক্তির প্রকারভেদ এবং সাধনের উপায় লেখক বিবৃত করিয়াছেন; তজ্জন্য এই গ্রন্থের নাম 'শক্তিসাধনম্'। তিনি বলিয়াছেন

"যুগে যুগে দুঃখমেবং সোঢ়ং ভারতবাসিভিঃ।
নাশনায়াস্য দুঃখস্য কর্তব্যং শক্তিসাধনম্॥"

শক্তিসমূহকে ডক্টর চৌধুরী শারীর শক্তি, অর্থ-শক্তি, সঙ্ঘ-শক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি এই চারি পর্যায়ে বিভাগ করিয়া সুললিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্ঘশক্তির বিবর্ধনপ্রসঙ্গে ডক্টর চৌধুরী "ভাষয়া সঙ্ঘশক্তিঃ" নামক অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের জনসাধারণের ঐক্যসূত্র অটুট রাখিতে হইলে এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করিতে হইলে সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করা ব্যতীত ভারতবাসীর গত্যন্তর নাই। শেষে আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনার প্রতি বিশেষ জোর দিয়া গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই বরণীয় পন্থা বলিয়া লেখক ঘোষণা করিয়াছেন—

"নিষ্কামকর্মযোগো যো গীতায়ামুপদিশ্যতে।
জ্ঞানভক্তিযোগয়োঃ স আয়ত্তো ভবতি ধ্রুবম্॥
নিষ্কামস্য কর্মযোগস্যাবলম্বনপূর্বকম্।
সম্যগাচরিতে ধর্মেঽধ্যাত্মশক্তিসমুদ্ভবঃ॥"

আমরা এই সুললিত পদ্যগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পুরাণশাস্ত্রী

ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন—লেখক—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। ৫৮।১।১২ কে, রাজা-দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; "উমাচল প্রকাশনী" হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৭৪; মূল্য ২৲ টাকা।

জাতির ভবিষ্যৎ—ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ব্রহ্মচর্যের সুপবিত্র আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্যই শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই সাধু প্রচেষ্টা। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং শাশ্বত প্রয়োজন সম্পর্কে কোনও মতদ্বৈধের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্যপালন ভারতীয় সাধনার ভিত্তিস্বরূপ। প্রত্যেক যুগ-গুরুই নিজের জীবনটিকে এই উপদেশবাণীর জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে সর্বসাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। যে উদ্দেশ্য এই পুস্তকপ্রণয়নের অনুপ্রেরণা দিয়াছে তাহা অবশ্যই মহৎ, কিন্তু এ শ্রেণীর পুস্তকের জন-প্রিয়তা ও সার্থকতা নির্ভর করে রচনাকৌশল এবং প্রকাশভঙ্গীর উপরই। বইখানিতে এমন সব বিষয়ের অনাবৃত অবতারণা রহিয়াছে যাহা অনেকের নিকট অপ্রাসঙ্গিক, এমন কি, অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য-শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, জলন্ত জীবনাদর্শই তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ রসায়ন;—সৎসঙ্গ, সদালাপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদ্‌ভাবের নিরন্তর অনুশীলন, প্রেম ও পবিত্রতার

আধারভূত মহাপুরুষ-চরিত্রের নীরন্ধ্র অনুধ্যান এবং অনলস কর্মতৎপরতা—এই সকল অস্তিমূলক (positive) নীতিই ছাত্র-ছাত্রীগণকে জীবনের পিচ্ছিল পথে সুহৃদের মত হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। 'নেতি' মূলক সাবধানবাণী অনেক সময়ে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করে। ৬২ পৃষ্ঠার বর্ণনায় শ্লীলতা ও সুরুচির অভাব দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় পাঠ্যপুস্তকের অনুকরণে এ বিশদ ব্যাখ্যার বোধ করি কোনই প্রয়োজন ছিল না। স্নান, আহার, শরীর-চর্চা ও যৌগিক ব্যায়ামসম্পর্কে লেখক যে সব আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক। পুস্তকখানির ভাষা সাবলীল, ছাপা ভাল।

অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ঘোষ, এম্ এ

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্ এ

নয়াদিল্লী রাইসিনা বঙ্গীয় বিদ্যালয়-বার্ষিকী—আমরা এই বার্ষিকীখানি আগ্রহের সহিত পড়িলাম। পত্রিকাটির বাংলা এবং ইংরেজী উভয় বিভাগে অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্রগণের গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি রচনা স্থান পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তর্গত ও শিক্ষাবহির্ভূত বহুমুখী কার্য-কলাপ, অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতিরও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি ইংরেজী বিভাগ অপেক্ষা বাংলা-বিভাগে রচনার অল্পতা ও ও বিষয়-গৌরবের দৈন্য চোখে পড়ে। গৌরবময় বাংলা-সাহিত্যের তথা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বাংলাদেশের শিল্প-কলা, সংগীত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ কোন আলোচনা ইহাতে স্থান পায় নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীদের জাতীয় মূল জীবনধারার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার পক্ষে এগুলির অনুশীলন ও অনুধ্যান অপরিহার্য। আশা করি, পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে আমাদের প্রবাসী ভাইদের এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ-কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা ও ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী এম্-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী

শব্দব্রহ্ম ও ব্রহ্মানুভূতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ৫৫, সুবারবন্ স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার-কর্তৃক-প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২০০; মূল্য আড়াই টাকা।

বর্তমান গ্রন্থপ্রণেতা ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। বইখানি মুখ্যতঃ দার্শনিক রচনা হইলেও ইহার প্রকাশভঙ্গীর স্বারসিকতা ইহাকে সর্বাদৃত করিয়া তুলিবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। "সাধারণ মানুষের কুসংস্কার নিরসন জন্য ধর্মের প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব সহজ ও সরল ভাষায় আলোচনা করা"-রূপ মহৎ দায়িত্বপালনে লেখকের কৃতিত্ব পরিস্ফুট। শব্দব্রহ্ম, মহাশক্তি, ব্রহ্মানুভূতির সাধনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় মনোজ্ঞভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভাষা স্বচ্ছ, যুক্তিও সবল।

জ্ঞানসাধন—শ্রীমৎ অতুলানন্দ স্বামী—প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা এবং শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৭১; মূল্য একটাকা মাত্র।

এই ক্ষুদ্রপরিসর পুস্তকে বেদান্তসিদ্ধান্ত সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক বইখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন মনে করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

The Mysteries of Man, Mind and Mind-functions—স্বামী নারায়ণানন্দ প্রণীত ; প্রকাশক ঃ মেসার্স এন্ কে প্রসাদ এণ্ড কোং, হৃষীকেশ (ইউ, পি) ; মূল্য ১২৲ টাকা।

বইখানি পড়ে মানবমনের রহস্য-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ ক'রলাম। বাংলা ভাষায় অনুবাদ হ'লে বইটি পড়ে অনেক বাঙ্গালী উপকৃত হতে পারবেন।

প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং ধারণা থেকেই বোধ করি বইখানি লেখা। তাই এর অনেক জায়গায় অবৈজ্ঞানিক উক্তি করা হয়েছে বলে মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গন্ধ এতে নেই বললেই চলে। অনেক জায়গায় সাধারণ পাঠকের কাছে ব্যাখ্যাগুলি একটু বেশী দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

এই ধরণের বইয়ের শেষে বিষয়ের নির্ঘন্টের অভাব একান্তভাবে অনুভব করেছি। বইখানির মূল্য আরও একটু কম হ'লে ভাল হত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রমদা চৌবে।

গদাধর—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যা- বিনোদ, সাহিত্যভারতী-প্রণীত। প্রকাশক ঃ অরোরা, ১২৪, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫ ; ৪০ পৃষ্ঠা ; মূল্য বারো আনা।

কিশোরদের জন্য গল্পাকারে লেখা শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বালকজীবনের কাহিনী—এই ছোট বইখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। গল্পের পরিপূর্তির জন্য স্থানে স্থানে কাল্পনিক কথোপ-কথনের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু লেখক বইখানিকে সম্ভবতঃ জীবনীর পরিবর্তে কথিকার রূপ দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া এই ত্রুটি মার্জনীয়। ভাষা বেশ স্বচ্ছ ও সরস। ছেলেমেয়েরা বইটি খুব উৎসাহের সহিত পড়িবে এবং বালক গদাধর তাহাদের চরিত্রে নিশ্চিতই কিছু 'মায়া'-বিস্তার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় জীবন (ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় হিন্দী মাসিক পত্রিকা)—শ্রীহরিবংশ শাস্ত্রি সম্পাদিত। ১৭৭।এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৭ হইতে প্রকাশিত ; বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা।

সমালোচনার জন্য প্রেরিত ১ম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৯৫২) আর্য-জীবননীতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত বর্তমান যুগের শিক্ষার সমন্বয়-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ভাল লাগিল।

মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পত্রিকার উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে। যথা ঃ—(১) আর্য-সংস্কৃতির প্রচার, (২) সত্য, অহিংসা, সদাচার, নৈতিক বল এবং আর্যধর্মের প্রচার, (৩) হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি বিবিধ মতের সমন্বয়চেষ্টা এবং সাম্প্র-দায়িকতারূপ মহাকলঙ্কের সমূলে নাশ, (৪) ভারতের অন্নবস্ত্র-সমস্যার মুখ্যতম সমাধান কৃষি, শিল্প এবং গো-রক্ষার উৎসাহ দান।

এই মহৎ উদ্দেশ্য-সমূহের সংসাধনের জন্য আমরা "ভারতীয় জীবন"এর বলিষ্ঠ এবং সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

দিব্যদর্শন- ধর্ম-বিষয়ক আংশিক বাংলা এবং আংশিক হিন্দী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যা (অন্নপূর্ণা-পূজা—১৩৫৮) 'দেবসঙ্ঘ' (বমপাশ টাউন, বৈদ্যনাথ দেওঘর, এস্ পি) হইতে প্রকাশিত। কলিকাতার ঠিকানা; ৪৮সি, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা—১৪ ; বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

সম্পাদকীয় 'মাতান্নপূর্ণেশ্বরী' প্রবন্ধটি খুব ভাল লাগিল। অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্যাখ্যানগুলি উদার এবং অসাম্প্র-দায়িকভাবে লেখা। 'সাধনসমর' গ্রন্থ-প্রণেতা "ব্রহ্মর্ষি" শ্রীশ্রীসত্যদেবের প্রসঙ্গ ও উপদেশগুলি তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণের উপভোগ্য হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উটাকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—উটাকামণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭ তম জন্মোৎসবের বিবরণ আমরা পাইয়াছি। শহর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৫ হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা, সংকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বিকাল পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রায় ২১টি ভজনের দল বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকালে জনসভায় পৌরোহিত্য করেন কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর) আশ্রমের স্বামী আগমানন্দ। অধ্যাপক পঞ্চপকেশনের তামিল-বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ-দীপম্'। ত্রিচিনাপল্লীর সন্নিকটস্থ তিরুপ্পালাথুরাই 'শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন' আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চিদ্‌ভবানন্দও তামিলভাষায় মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৯ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ১৯২৫ সালে এই লাইব্রেরী পরলোকগত হরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র পাঠপ্রকোষ্ঠ (Reading Room)-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার কার্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং শ্রীকানাইলাল পাল প্রদত্ত ২৫০০৲ টাকাকে কেন্দ্র করিয়া স্থায়ী গৃহ-নির্মাণের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগৃহীত হয়। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে লাইব্রেরী ১৯৩২ সালে নূতন গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হেতু উদ্যোক্তাগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালন দুষ্কর হইয়া উঠায় ১৯৪৪ সালে উহার কার্যভার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বর্ষত্রয়ে প্রথমতঃ লাইব্রেরী-ভবনের একটি অংশের বিস্তৃতি-সাধন করা হয় এবং ২১,৯৪৫৲ টাকা ব্যয়ে ইহার দ্বিতল নির্মিত হয়। এই অর্থের মধ্যে উড়িষ্যা সরকার ১৩,৩৩৩৲ টাকা দান করেন, অবশিষ্ট অর্থ জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত হয়। ১৭ই জুন, ১৯৫০ উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী লাইব্রেরী-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। দ্বিতীয়তঃ কটকের প্রসিদ্ধ চন্দ্র-পরিবারের সমগ্র অন্নপূর্ণা লাইব্রেরীটি এই লাইব্রেরীকে দান করা হয়। উহা এতদিন কটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনাধীন ছিল।

লাইব্রেরীটির সঙ্গে একটি অবৈতনিক পাঠ প্রকোষ্ঠ (Free Reading Room) সংযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৪৯ সনের প্রারম্ভে লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৫৬৭৮; ইহার বর্তমান পুস্তক-সংখ্যা ১২,৪৫৬। বর্তমান বর্ষত্রয়ে ৫৮, ২৫৭ খানা পুস্তক পাঠার্থ প্রদত্ত হয়। পাঠ-প্রকোষ্ঠে ১০ খানা দৈনিক, ২৯ খানা সাপ্তাহিক এবং ৪৩ খানা মাসিকপত্র আছে।

১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থানীয় কমিটি দ্বারা লাইব্রেরীটি পরিচালিত হইতেছে। গীতা, উপনিষদ্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠালোচনা ছাড়াও লাইব্রেরী-গৃহে ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা ৪২টি বক্তৃতা দান করেন। এতদ্‌ভিন্ন পুরী ও অন্যান্য স্থানের কয়েক জন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছেন। বর্তমান বর্ষত্রয়ে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশঙ্কর, যীশুখৃষ্ট এবং হজরত মোহম্মদেরও জন্মদিন প্রতিপালিত হইয়াছিল।

লাইব্রেরী-কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি

তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতা উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতামৃত-নামক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের উড়িয়া ভাষায় একটি পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি আশু প্রয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন—(১) লাইব্রেরিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে আরও বহু মূল্যবান সংস্কৃতিমূলক পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রেরও অভাব। এই উদ্দেশ্যে ২০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (২) অবৈতনিক কর্মী ও দ্বারবানের বাসস্থান নির্মাণের জন্যও ২০,০০০৲ টাকা লাগিবে।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫১ সনের কার্যবিবরণী আমাদের নিকট আসিয়াছে। সেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টা দ্বারা এই আশ্রম জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বৎসর আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬৮,৮৫৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। আশ্রম একটি প্রাথমিক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার-বিভাগও পরিচালনা করিতেছেন। ভারতীয় রেড ক্রস্ সোসাইটির বিহারশাখা এবং কর্ণেল শিশিরকুমার বসুর অর্থানুকূল্যে এই বিভাগটি স্থাপিত হয়। বর্তমান বৎসরে ৯২২৭ জন রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা হইয়াছে। ১৯৫১ সনের আগষ্ট মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় নাগরিকগণ ভারতবর্ষের অন্নাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলে বিতরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নিকট ৪০ টন গম পাঠান। এই গম দ্বারা দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণীতে দুর্গত-সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। এই সেবাকার্য সাত সপ্তাহ চলে। ২৭টি গ্রামের ৫৬০০ নরনারী ইহা দ্বারা উপকৃত হন। ফিজি দ্বীপের সুভা ভারতীয় বণিগ্‌গোষ্ঠীও (Suva Indian Chamber of Commerce) ৬১ টন গম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নিকট প্রেরণ করেন। এই দানের সবটুকুই বিহাররাজ্যে বিতরণ করা স্থিরীকৃত হয়। বিহার সরকারের সহিত আলোচনা-ক্রমে পূর্ণিয়া জেলার এক অংশে সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা, ছাত্রনিবাস (Students' Home) এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কার্য পরিচালিত হইতেছে। স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় প্রধানতঃ দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর বালকগণকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বৎসর ১৫১টি বালক বিদ্যালয়টিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

লাইব্রেরী-সংলগ্ন পাঠাগারে বর্তমান বৎসরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্য এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বৎসরে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ৩৬৮টি ক্লাস, ৯টি বক্তৃতা এবং ২৭টি আলোচনা-সভা হইয়াছে।

কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৮-৫০ সনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাশ্রমের প্রচেষ্টা তিন ভাগে বিভক্ত—ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার এবং আর্তসেবা। এই তিন বৎসরের মধ্যে ৩৫টি ধর্মবক্তৃতা এবং ৮৯টি আলোচনা-সভা হইয়াছিল। আশ্রমে প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত শ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারকল্পে দুইটি ছাত্রাবাস, পাঁচটি বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার এবং একটি পাঠাগার রহিয়াছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে থাকিয়া স্থানীয় স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করে। সেবাশ্রম মনসা-দ্বীপে একটি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ-প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় এবং একটি

উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বেলদায় একটি উচ্চ প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় এবং একটি উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারদ্বারা পাঠকগোষ্ঠী বিশেষ উপকৃত। সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫০ সনে ৩৩৩৭ জন রোগী ঔষধ লইয়াছেন। কাঁথি সেবাশ্রমের ছাত্রাবাসের জন্য একটি গৃহ নির্মিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার অর্ধেক ব্যয়নির্বাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল এবং বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি আশ্রম-পরিদর্শন করিয়া ইহার কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই আশ্রমের উদ্যোগে গত জুন মাসে অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ রাঁচি বাংলা হাই স্কুলে 'স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কার-প্রণালী' এবং হিন্দু ক্লাবে 'বর্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়'-সম্বন্ধে তিনটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাগুলিতে শহরের ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। বর্তমানে স্বামী সুন্দরানন্দ শহরে প্রতি সপ্তাহে দুইটি এবং আশ্রমে প্রত্যহ একটি আলোচনা-সভায় ধর্মশাস্ত্র-পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির নূতন উপাসনালয়ের উদ্বোধন—গত ২৬শে মার্চ এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ-প্রমুখ পাঁচ জন ধর্মনেতা এই উপাসনালয়ের অসাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রথমতঃ স্বামী পবিত্রানন্দ একটি সংস্কৃত প্রার্থনার আবৃত্তি করিয়া বেদান্তধর্মের একটি সহজ অথচ সামগ্রিক পরিচয় দেন। নিউ ইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসবিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম ঐ বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে। পবিত্রানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর আশীর্বাণী এবং আমেরিকাস্থ অন্যান্য বেদান্তকেন্দ্রের স্বামীজীদের অভিনন্দন পাঠ করেন।

বোষ্টন্ ও প্রভিডেন্স্ বেদান্তকেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের উপর উহার প্রভাব-সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। নিউ ইয়র্কের বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় হোজান্ সেকি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির প্রতি অভিবাদন-জ্ঞাপন করিয়া জাপানী ভাষায় প্রার্থনা করেন। প্রার্থনাটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়। নিউ ইয়র্কের মাউন্ট্ নেবো টেম্পল্-এর রাবি স্যামুয়েল্ সেগাল্ ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট হইতে কিয়দংশ পাঠ এবং হিব্রুভাষায় প্রার্থনা করেন। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের উক্তি এবং প্রার্থনা উভয়ই তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। নিউ ইয়র্ক-স্থিত Broadway Temple Meth dist Church-এর রেভারেণ্ড এলেন্ ই ক্ল্যাক্‌টন্ বেদীস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির প্রতি প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া নিউ টেষ্টামেন্টের Epistles হইতে কিছুটা পাঠ করিয়া খৃষ্টীয়ভাবে প্রার্থনা করেন। ইস্‌লামের প্রতিনিধি মিঃ এব্রাহাম্ চৌধুরী কর্তৃক আরবীয় ভাষায় প্রার্থনা জ্ঞাপিত হয়। তাঁহার প্রার্থনাও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল।

অতঃপর স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রখ্যাত লেখক ও নাট্যকার মিঃ জন্ ভ্যান্ ড্রুটেন্ বেদান্ত-সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

লেখক ও কবি মিঃ খ্রীষ্টোফার্ ইশারউড্ ব্যক্তিগত ভাবে বৈদান্তিক সত্য কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমষ্টির জীবনে ইহার প্রয়োগ কিরূপ অমৃতপ্রসূ হইতে পারে তাহা গভীর আবেগ ও বিনতির সহিত প্রকাশ করেন।

নূতন উপাসনালয়টি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। উপাসনা-প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ দিকে ধূসরবর্ণ বেদীর উপর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চাদ্-ভাগে স্বর্ণ ও রজত-রঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বেদীর বিপরীতদিগ্‌বর্তী দেয়ালে লম্বমান। পশ্চিমদিকের দেয়ালের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'রূপ বেদবাণী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভেদনিরসক উক্তির উপরে শোভা পাইতেছে পাঁচটি ধর্মের প্রতীক—তারকা ও অর্ধচন্দ্র, বৌদ্ধধর্ম চক্র, পবিত্র ওঙ্কার, ইহুদীধর্মীয় তারকা এবং খৃষ্টীয় ক্রুশ্। মোটের উপর সমগ্র উপাসনালয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ-আচরিত সুমহান্ সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

সিট্‌ল (ওয়াশিংটন) বেদান্তকেন্দ্র—এই প্রতিষ্ঠানের ১লা অক্টোবর, ১৯৫০ হইতে ৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে বেদান্তের তাত্ত্বিক এবং কার্যকরী দিক্-সম্বন্ধে জনসভায় বক্তৃতা দেন। প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে তিনি ছাত্র ও বেদান্তকেন্দ্রের সদস্যদের জন্য পাতঞ্জল যোগদর্শন ব্যাখ্যা করেন। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিবিদিষানন্দজী ওয়ালা ওয়ালা (ওয়াসিংটন) স্থিত হুইট্‌ম্যান্ কলেজে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। কলেজটি একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি ঐস্থানে চারদিন আসিয়া একাধিক বক্তৃতা ও আলোচনা-সভায় যোগদান করেন তাঁহার নিজের বক্তৃতা-গুলির বিষয় ছিল—'সকল ধর্মের মূলীভূত সাধারণ বিশ্বাস', 'বিশ্বমানব দৃঢ়তর পারস্পরিকতার দিকে', 'ভারতীয় কাব্যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব', 'যোগদর্শন', এবং 'জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য' 'হিন্দুসঙ্গীত'-সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। হুইট্‌ম্যান্ কলেজের সভাপতি সমস্ত কলেজের পক্ষ হইতে স্বামী বিবিদিষা-নন্দের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিবিদিষানন্দজী সম্মেলনে সক্রিয়-ভাবে যোগদান করিয়া ইহার আলোচনাকে অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।

এই বৎসরে বেদান্তকেন্দ্রটিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ভগবান্ বুদ্ধ ও ভগবান্ যীশু খ্রীষ্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আমেরিকার অন্যান্য শাখাকেন্দ্র হইতে স্বামী দেবাত্মানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী সৎ-প্রকাশানন্দ এই কেন্দ্রে আসিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা সভ্যগণের উৎসাহ বর্ধন করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রগৃহের নানা সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির উচ্চাদর্শের প্রতি জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে।

সান্ ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি—গত মে মাসে সোসাইটির নেতা স্বামী অশোকানন্দ 'অবিচ্ছিন্ন ধ্যান', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগবদ্‌গীতা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীর দেবত্ব,' 'সার্থক কর্মের রহস্য,' 'আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সত্য' এবং 'কর্মবিধান'-সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দও চিত্তাকর্ষক আলোচনা দ্বারা সোসাইটির প্রচার-ধারাকে পরিপুষ্ট রাখেন। মে মাসে শান্ত-স্বরূপানন্দজীর আলোচ্য বিষয় ছিল 'আরভমান

নূতন ধর্ম এবং 'আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য'। জুন মাসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা হয় ঃ—

স্বামী অশোকানন্দ—'বুদ্ধ এবং আধুনিক মানবের সমস্যাসমূহ' 'স্বাধীন মন ও অদৃষ্টশক্তি' 'আবেগ-সমূহকে কি ভাবে নির্মল করিতে পারা যায়', 'যে সকল শক্তি আমাদের দুঃখকে উৎপাদন করিতেছে' এবং 'আমাদের ভগবৎপরায়ণতা কি ?'

স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ—'ঈশ্বর-অনুভূতির স্তর ও প্রমাণ' এবং 'অমৃতের সন্তান'।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে স্বামী অশোকানন্দ সোসাইটির সদস্যগণকে ধ্যান শিক্ষা দেন এবং বিস্তৃতভাবে বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিক ও কার্যকরী দিক্ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্র—এই প্রতিষ্ঠান গত ৩১শে মার্চ নিজস্ব স্থায়ী গৃহে উঠিয়া গিয়াছে। ঠিকানা ঃ—68 Dukes Avenue, Muswell Hill, London, N. 10. স্বামী ঘনানন্দ পূর্ববৎ সাপ্তাহিক বক্তৃতা, পাঠ, এবং ধ্যান-শিক্ষা পরিচালনা করিতেছেন। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ঃ -(১) ধ্যানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, (২) বর্তমান মানুষের উপযোগী যোগ, (৩) দৈনিক জীবনে বেদান্ত, (৪) মানুষের আপাত এবং প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, (৫) ভগবদ্গীতার লক্ষ্য, (৬) গীতায় সমন্বয়, (৭) জনশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ, (৮) গীতোক্ত যোগ, (৯) গীতোক্ত ধ্যানমার্গ, (১০) ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক্।

স্বামী বৈদ্যনাথানন্দের দেহত্যাগ - স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ (দানবারি) গত ৩১শে আষাঢ় শেষ-রাত্রে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। ১৯৩৯ সালে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া মিশনের সারগাছি, লাহোর এবং দেওঘর কেন্দ্রে তিনি দীর্ঘকাল বিবিধ সেবাকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা এবং ভজননিষ্ঠা সকলেরই হৃদয়ের ভালবাসা আকর্ষণ করিত। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীভগবানের শাশ্বত চরণাশ্রয়ে আমরা এই পরম স্নেহাস্পদ স্বল্পজীবী সন্ন্যাসীর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিবিধ সংবাদ

বিদ্যাসাগর-স্মরণে—গত ২৯শে জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্দ ভাদুড়ী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅচ্যুতকুমার দত্ত, সহাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় এবং অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্র এই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহামানবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি মৃদু বিদ্যাসাগর-চরিত্র আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ্। সভাপতি ডক্টর ভাদুড়ী বলেন ঃ "পারলৌকিক ফললাভের জন্য বিদ্যাসাগর কখনও উদ্‌গ্রীব হন নাই। তিনি ছিলেন মানবদরদী। মানব-প্রেমই তাঁহার জীবনবেদ। পূর্বাহ্ণে অপরাপর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কলেজস্কোয়ারস্থিত বিদ্যাসাগর-মর্মরমূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।"

স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার—গত ২৬শে জুলাই শনিবার রাত্রি ৯॥ টায় বঙ্গভাষার

বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৪ বৎসর। শ্রীযুক্ত মজুমদার কিছু দিন যাবৎ করোনারী থ্রমবোসিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি বি-এ পাশ করিবার পর শিক্ষক-রূপে জীবন আরম্ভ করেন, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক-রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা এবং অননুকরণীয় সাহিত্য-সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের অবিস্মরণীয় সম্পদ্। মোহিত বাবুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক্ ছিল তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আদর্শপ্রীতি। এই ভাববৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁহার 'বাংলার নব যুগ' গ্রন্থে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। 'উদ্বোধনে' তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এই ভাবুক আদর্শপ্রেমিক বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবকের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

হাফলংএ (কাছাড়-আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব।—অপরাপর বৎসরের ন্যায় এবারও 'হাফলং'এ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে মহাসমারোহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন, প্রসাদবিতরণ, আলোকচিত্র-প্রদর্শন, বক্তৃতাদি উৎসবাঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েক জন সন্ন্যাসী উৎসবে যোগ দিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। জনসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত জয়ভদ্র হাগজের, বি-এ, এম্-এল্-এ মহোদয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্য-কলা-সংসদ—নয়া দিল্লীতে গত ৩রা শ্রাবণ হিন্দী কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্তের উৎসাহে উপরোক্ত-নামীয় একটি সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বি ভি কেস্কার। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় সাহিত্য, সংগীত এবং নাট্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে আমাদের খুব লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কুরুচিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবসমূহ একেবারে দূর করিয়া দেওয়া কর্তব্য—কেন না আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহিত উহারা খাপ খায় না।

মিলনমেলা—শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাদুড়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণ কলিকাতার এই নারী-প্রতিষ্ঠানের (ঠিকানা—২৪-সি, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট) পাঁচ বৎসরের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। "বঙ্গনারীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ভাবধারা প্রচার দ্বারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উন্নত করা এবং তদীয় বংশধরগণকে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত করাই মিলনমেলার মুখ্য উদ্দেশ্য।" দরিদ্র ছাত্রীদিগকে সাহায্য, অসুস্থা দুঃস্থা নারীদিগকে দুগ্ধ ও বস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থা সদস্যাগণকে স্বাবলম্বী হইতে সহায়তা করা এবং উদ্বাস্তুদিগের সেবা—প্রতিষ্ঠানের সেবা-বিভাগের অন্যতম কার্য। সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা এবং সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা—ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিভাগের বিশেষ দিক্।

পরলোকে ডাঃ সত্যেশচন্দ্র মিত্র—আমরা অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে জানাইতেছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ডাঃ সত্যেশচন্দ্র মিত্র গত ১৩ই জুলাই রবিবার রাত্রি ১১-১০ মিনিটের সময় মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরস্থ তাঁহাদের বাসভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যেশ বাবু ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত, অকৃতদার এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সম্পন্ন জনসেবক। তিনি কলিকাতা পার্শি-বাগান স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির এবং হুগলী জেলাস্থ তিরোল শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক ছিলেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে দুর্গত নরনারায়ণের সেবাদ্বারা তিনি সর্ব-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হন। হাসিমুখে ইষ্টনাম করিতে করিতে এই নিষ্কলঙ্কচরিত্র মহাপ্রাণ সেবাব্রতী তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

সুন্দরবনাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

সুন্দরবনের অন্তর্গত হাস্‌নাবাদ ও হারোয়া থানার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। টাকী মিউসিসিপ্যাল এলাকার গরীব ও মধ্যবিত্তদের কতকাংশের মধ্যেও সেবাকার্য আরম্ভ করা হইতেছে। বর্তমানে ঐ সকল লোকদের কোনরূপ অর্থোপার্জনের উপায় নাই। প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে পাঁচ-ছয় হাজার লোক বিপন্ন এবং উহাদের মধ্যে প্রায় দুই হাজারের অবস্থা অতি শোচনীয়। সাহায্য-প্রার্থী স্ত্রীলোকদের অনেকের পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত স্থানসমূহের অন্যতম। এই সেবাকার্য আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চালাইতে হইবে। লোকের অবস্থা সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গীন হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মিশন ৪৪৪ মণ ৯ সের খাদ্যশস্য ৬৭৪১ জন পূর্ণবয়স্ক ও ১৩০৩ জন বালকবালিকার মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে অনেক নূতন স্থান পরিদর্শন করিয়া তথায় সাহায্যদান করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুগ্রহ করিয়া ২৭৫০ মণ চাউল ও ঐ পরিমাণ আটা আমাদের হাত দিয়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বস্ত্র, ঔষধ ও শিশুদের জন্য দুগ্ধেরও প্রয়োজন। মিশনকে নৌকা ও গরুর গাড়ীতে করিয়া দূরদূর স্থানে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে হইতেছে। ইহাতে বিস্তর খরচ পড়িতেছে। সেবকগণের ভরণপোষণের ও যাতায়াতের খরচও মিশনই বহন করিতেছেন।

বর্ষাকালে তুফান ও দুর্যোগের মধ্যে যাওয়া আসা ও জিনিষপত্র পাঠানর খুবই অসুবিধা। সেবকদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন; ইহা সত্ত্বেও কার্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা সাধিত হইতেছে।

ব্যাপকভাবে এই সেবাকার্য চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা এই অসহায় ভ্রাতা-ভগিনীগণের সাহায্যকল্পে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট ভিক্ষাপত্র হস্তে উপস্থিত হইতেছি। সেবাকার্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)।

২। কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা—৩

৩। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩

৪। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতিসংসদ, ১১১নং, রসা রোড কলিকাতা—২৬

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

১৯।৭।৫২

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫৯ | পঞ্চবটী | শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

ব্লক ও মুদ্রণঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

নিখিল-সৌন্দর্যময়ী মা

ক্বণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভস্তনভরা
পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা।
ধনুর্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহো পুরুষিকা॥
ত্বদীয়ং সৌন্দর্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।
যদালোক্যৌৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা
তপোভির্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্॥

(শ্রীশঙ্করাচার্য—আনন্দলহরী)

জগজ্জননীর সায়ুধা, সালঙ্কারা ভুবন-পাবন দিব্য মূর্তি আজ আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হউক। মায়ের কটিদেশ ক্ষীণ, তাহাতে বেষ্টিত স্বর্ণমেখলা কণ-কণ বাজিতেছে, উন্নত বক্ষঃস্থলে করিশিশুর গণ্ডদ্বয়ের ন্যায় ললিত স্তনযুগ্ম শোভা পাইতেছে, মুখমণ্ডলে পরিপূর্ণ শরচ্চন্দ্রের সুষমা। হস্তে দৈত্যনিবহধ্বংসকারী বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন - ধনুর্বাণ, পাশ, অঙ্কুশ। অতি প্রচণ্ড ত্রিপুরাসুরকে মথন করিয়াছিলেন মহাদেব—আর সেই দুর্জয় মহাদেবের সকল পৌরুষ, সকল শক্তির উৎস হইতেছেন মা।

হে হেমগিরিকন্যে জগদম্বে, তোমার অনুপম দিব্যকান্তির কি তুলনা দিব? ব্রহ্মাদি সর্বদর্শী দেবতাগণ কোনও প্রকারে সেই সৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ বিচার করিতে সমর্থ হন। অমর-লোকবাসিনী দেবললনাগণ তোমার ঐ ভাস্বর রূপ-মাধুরী আগ্রহভরে ধ্যান করিয়া বহুতপস্যা দ্বারাও যে পদবী পাওয়া যায় না সেই দুর্লভ শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

"সংস্মৃতা সংস্মৃতা..."

মহিষাসুর-বধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ভক্তিবিনম্রচিত্তে মহামায়ার স্তবগান করিলেন, সুরলোকের পবিত্র ধূপ জ্বালিয়া, নন্দনকাননের দিব্য কুসুমসম্ভার, গন্ধচন্দনাদি দিয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন। জগদম্বা স্মিতহাস্যে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের স্তুতি এবং পূজাতে প্রসন্ন হইয়াছি, কি চাও বল, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। দেবতারা কহিলেন, মা, তুমি তো আমাদের দুষ্টশত্রু মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছ—চাহিবার আর কিছুই নাই। তবে একান্তই যদি বর দিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক তো প্রার্থনা এই যে, যখনই আমরা তোমাকে স্মরণ করিব তখনই আমাদের নিকট আসিও, আমাদের সঙ্কট মোচন করিয়ো। সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ। দুর্গাসপ্তশতী আরও বলিয়াছেন, দেবগণ শুধু নিজদের জন্যই এই বর চাহেন নাই—মর্ত্যবাসী মানুষের জন্যও 'তথেতি', তাহাই হউক—ত্রিজগৎ-জননীর মুখ হইতে এই প্রতিজ্ঞাবাণী আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

শারদীয়া দেবীপক্ষ—দেবীকে স্মরণ করিবার কাল উপস্থিত। স্মরণের প্রয়োজন তো রহিয়াছেই। সঙ্কটের আমাদের অবধি নাই। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি—উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ বিপদরাশি আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, পুরুষকার সব কিছুই আজ বিষম বিপর্যস্ত। শুভ সঙ্কল্পের অভাব নাই, উদ্যমের বিরতি নাই, লক্ষ্যও সুপরিস্ফুট—তবুও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরিতেছে না—বহুকাম্য শান্তি ও সামঞ্জস্য জনগণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কোথায় কি গরমিল রহিয়া গিয়াছে। ভয়, নৈরাশ্য, সংশয়, দুঃখ চারিদিকে। আন্তরিক ব্যাকুলতা লইয়া তাই প্রপন্নার্তিহরা ভগবতীর নিকট প্রার্থনা জানাইবার দিন সত্যই আজ আসিয়াছে। সংস্মৃতা সংস্মৃতা হইয়া আজ দেবী আমাদের বুদ্ধিকে নির্মল করুন, কর্মশক্তি সংবর্ধিত করুন, হৃদয়ে ধৈর্য, সাহস, প্রেম জাগ্রত করুন, মিথ্যা ও ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া সত্য ও বৃহৎ কল্যাণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন।

সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দৈবী অনুকম্পার আবাহনকে আমরা যেন দুর্বলতা বলিয়া মনে না করি। যুগে যুগে মানুষ সেই অদৃশ্যা মহাশক্তিকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে তপস্যা দ্বারা, ব্যাকুলতা দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছে—তাঁহার প্রত্যক্ষ সাড়া

পাইয়াছে। দেবীর আবির্ভাব ও কৃপা মানুষের পৌরুষ ও অধ্যবসায়কে খর্ব করে নাই—সমৃদ্ধই করিয়াছে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান-দীপ্ত মধ্যাহ্নে আমাদের সেই বিশ্বধারিণী মহামায়ার পূজা একটি অন্ধবিশ্বাসপ্রেরিত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্রে আমরা যেন পর্যবসিত না করি। আমরা নিজদিগকে যতই উন্নত ও শক্তিমান মনে করি না কেন, বস্তুতঃ আমরা অতি অল্প দূরই অগ্রসর হইয়াছি—যতটুকু পার্থিব সম্পন্নতা লাভ করিয়াছি উহা দ্বারা আমাদের প্রকৃত অসহায়তা কাটে নাই। আমাদের ইহকালসর্বস্বতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য আমরা শক্তি ও ঐশ্বর্যের মূল কেন্দ্র হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি—তাই আগাইয়াও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি—ঐশ্বর্যলাভ করিয়াও আমাদের দীনতা ঘুচিতেছে না। আসুর আত্মম্ভরিতায় আমরা শক্তি ও চৈতন্যরূপিণী অম্বিকাকে অবহেলা করিয়াছি। ইহাই আমাদের জীবনের প্রকাণ্ড গোঁজামিল; এই গোঁজামিলের জন্যই আমাদের সর্বমুখী সঙ্কট। অতএব কর্তব্য, ক্ষীণ বিশ্বাসের দীপশিখাটি পুনর্বার উজ্জ্বল করিয়া, ভাগবতী চেতনার উদ্বোধনে মনঃপ্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া, শিশুর অনাবৃত সারল্যে বিশ্বজননীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানানো—

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

হে দেবি, তুমি প্রসন্না হও, নানাপ্রকার ভয়ে আমরা অবসন্ন—একদা যেমন দুষ্ট অসুরনিবহ ধ্বংস করিয়া তুমি দেবসঙ্ঘকে রক্ষা করিয়াছিলে, তেমনি আজ আমাদিগের সঙ্কটমোচন কর। সমস্ত জগতের ব্যাপক অধর্ম, অনাচার অচিরে নিবারিত হউক—দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি মহোপসর্গ ক্ষান্ত হউক—

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

হে দেবি, দশদিকে কল্যাণ বিকিরণ কর, জনগণের জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ কর; আসুক ভাস্বর দীপ্তি, অপ্রতিহত জয়, বিমল কীর্তি, সকল অশুভের তিরোভাব।

"যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ, সিদ্ধসঙ্কল্প, ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে। এই মহামায়াকে পূজা, প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি ব্রহ্মাদি পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে যান?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃবোধন

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

মাটির দেবতা জাগো
জাগো শুভা শঙ্করি !

ঋত্বিক্ বিহ্বল
লালসার ঝঞ্ঝায় ;
উপচার লুণ্ঠিত
বোধনের সন্ধ্যায় ।
ভাঙো ধ্যান এইবার,
দুর্গতি কেন আর !
চণ্ডিকা, আঁখি মেলো—
হুঙ্কারো অসি ধরি' ।

বঞ্চিত সন্তান
বুকে বুকে ক্রন্দন ;
অসুরের শঙ্কায়
ভুলিয়াছে বন্দন ।
দুঃখের জমা কালো
দূর করি' ভরো আলো,
জননী দুর্গা জাগো
কল্যাণী রূপ বরি' ।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

স্বামী বোধাত্মানন্দ

বর্তমান কালে ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যে সকল পূজা সর্বশ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করে, সকলের প্রাণে নবচেতনা আনিয়া দেয়, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রবাদ, কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ লুপ্ত হইয়াছে। এই দুর্গাপূজাই কলির অশ্বমেধ। অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও ফলের বিশালতা হইতে যে এই প্রবাদের উৎপত্তি তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণ তো বটেই —তাহা ছাড়া মালাকার, বাদ্যকার, নরসুন্দর, কর্মকার প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের লোককে ইহাতে যোগদান করিতে হয়। সমুদ্রজল, পর্বতমৃত্তিকা প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্য এবং অপর বহুবিধ উপকরণেরও আবশ্যক হয়। গৃহস্থকে বহু দিন ধরিয়া এইগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। ভারতের বিবিধ স্থানে দুর্গাপূজা চণ্ডী, নবরাত্র, দশেরা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ও ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ এবং সর্বপুরাতন পুরাণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আমরা শক্তি-উপাসনার উল্লেখ পাই। কিন্তু সেই শক্তির দুর্গানাম, গায়ত্রী ও ধ্যান দেখা যায় কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদে। তথায় দেবীর গায়ত্রী এই ভাবে বর্ণিত আছে—কাত্যায়নায়

শিব-সতী

উদ্বোধন,
আশ্বিন, ১৩৫৯

শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত
এবং তাঁহার অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত

বিদ্মহে, কন্যাকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। ভাষ্যকার সায়ণ দুর্গি-শব্দের অর্থ করিয়াছেন দুর্গা। তথায় উল্লিখিত ধ্যান এইরূপ ঃ—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥

সেই অগ্নিবর্ণা তপোদীপ্তা উজ্জ্বলা কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর আমি শরণ গ্রহণ করি। অনায়াসে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেই তারিণীকে আমি প্রণাম করি। এখানে দুর্গানাম, তাঁর বর্ণ ও কার্য সবই আমরা স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হই। কেনোপনিষদে সেই ব্রহ্মময়ী দেবী দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে নানালঙ্কৃতা হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অবশ্য এসকল দিব্য চিন্ময়ী মূর্তি।

মৃন্ময়ী মূর্তিতে দেবীর পূজাও বহুকালের। কেহ কেহ বলেন, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রথম শ্রীদুর্গার পূজা করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু দেখিতে পাই পঞ্চদশ শতাব্দীর স্মৃতিকার রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে মৃন্ময়ী মূর্তির বিধান দিয়াছেন। তাঁহার পূর্বেও শ্রীনাথাচার্যের নিকট হইতে ঐ বিধান পাওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে বালক ও জীকন মহাস্নান, নবপত্রিকার স্নানাদির বিধান সহিত দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তিতে পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মৃন্ময়ী মূর্তিতে দেবীর পূজা করিয়া স্ব স্ব অভীষ্টবর—রাজ্য এবং মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা মূর্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন কোন পণ্ডিত বলেন ঃ—দক্ষ-কন্যা সতী পরে শিবগেহিনী দুর্গা হইয়াছিলেন —উহা রূপকমাত্র। রাজা দক্ষ অত্যন্ত যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। যজ্ঞবেদী তাঁহার তনয়াস্বরূপা। কালে বেদীস্থ অগ্নি সতীপতি শিবরূপে এবং বেদীর দশদিক দুর্গার দশহাত-রূপে কল্পিত হইয়াছে। নিয়ত যজ্ঞাদি করিতে একদিকে যেমন অর্থশক্তির প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানশক্তিরও একান্ত আবশ্যক। আবার যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ ও সকল বিঘ্ননাশ-পূর্বক তাহার সিদ্ধিসাধনও কাম্য। ঐ ভাবগুলিই ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ-রূপ ধারণ করিয়াছে। হিংসার প্রতীক সিংহ ও পাপের প্রতীক অসুর—উহাদিগকে জয় করিয়াই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাই উহাদের উপরে দেবীর স্থান। ভক্তের দৃষ্টি কিন্তু অন্য প্রকারের। তাঁহার চক্ষে দেবী ঐরূপ জড়বস্তু নহেন, কল্পনার বস্তুও নহেন। জগতের মূলীভূত শক্তি যাহা সাধারণের দৃষ্টিতে জড় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে চৈতন্যের সহযোগে উহা নিত্য চৈতন্যময়ী। সেই স্বরূপ-চৈতন্যকে ত্যাগ করিয়া ঐ শক্তি কদাচ অবস্থান করেন না। সেই ব্রহ্মময়ী মা স্বরূপে নির্গুণা হইয়াও ভক্তের নিকট আবার সগুণা সাকারা। নির্বিকারা হইয়াও ভক্তবৎসলা। ভক্তের প্রাণের পূজা তিনি গ্রহণ করেন। যে ভক্তের হৃদয়ে জগজ্জননীর আবির্ভাব হয় তাঁহার ঐশ্বর্য, জ্ঞান, শক্তি, সিদ্ধি কিছুরই অভাব-বোধ থাকে না। তাহারা যে মায়ের নিত্যসঙ্গী। মায়ের আবির্ভাবে ভক্তের সকল রিপুই বশীভূত। মৃন্ময়ী প্রতিমা-অবলম্বনে ভক্ত সেই চিন্ময়ী মাতার পূজা করিয়া ধন্য হন।

শারদীয়া পূজার মণ্ডপে দেবী যে কেবল মৃন্ময়ী প্রতিমাতেই পূজিতা হন

তাহা নহে। দেবী গণেশজননী গণেশের পার্শ্বে ধান্য, কদলী কচ্বাদি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী নবপত্রিকারূপেও পূজা গ্রহণ করেন। মাতার অনন্তশক্তি এই সব দ্রব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া জীবের শক্তি ও পুষ্টি বিধান করিতেছে, 'কালীবিলাসতন্ত্রে' আছে, নবপত্রিকা (কলাবউ) হইতেছেন সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা স্বয়ং। দাড়িমী, কচ্বী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি। স্নানাদি করাইবার সুবিধার জন্য এই বিধান।

এস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তিকে শুদ্ধচিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ-চিত্তে দৃষ্ট ঐসকল মূর্তির বর্ণনাই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই মূর্তিসকল শাস্ত্রীয় বিধান-অনুযায়ী হওয়া উচিত। পূজা-বিষয়ে আর একটি কথা স্মরণযোগ্য; কেন না, বর্তমানে অনেক প্রকারের পূজা আমাদের দৃষ্ট হয়। বিধিহীন শুধু বাহিরের আড়ম্বর-যুক্ত পূজা তামসিক। বিধিযুক্ত সাড়ম্বর পূজা রাজসিক। যেখানে বাহিরের আড়ম্বর হইতে দৃষ্টি সরিয়া আসিয়াছে এবং যাহার জন্য এত বিধির ব্যবস্থা সেই প্রাণের অনুরাগ যেখানে প্রবল সেই পূজাই সাত্ত্বিক। এইরূপ পূজাস্থলেই দেবীর জাগ্রদ্ভাব অনুভূত হয়।

স্নপন, পূজন, বলিদান এবং হোম এই চারিটি পূজার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু তাহার পূর্বে দেবীর বোধন আবশ্যক। শিবপ্রিয়া শিবানীর শিবপ্রিয় বিল্বতরুই আবাসস্থল। তাই ভক্ত পূজক তথায় গিয়া নিজ জননীকে ব্যাকুল ভাবে আহ্বান করেন। সাধকের দৃষ্টিতে মেরুদণ্ডমধ্যস্থিত সুষুম্নাই বিল্বতরু। তন্নিম্ন দেশে অনন্তশক্তিময়ী মাতা প্রসুপ্তা। একাগ্র ধ্যানেই তাঁহার উদ্বোধন।

নানা নদ-নদী হ্রদ ও সাগরের জল এবং নানাস্থানের বিবিধ দ্রব্য সহযোগে দেবীর স্নানের ব্যবস্থা। দেবী নিত্যশুদ্ধ, সকল স্থান, সকল জল তাঁহার নিকট শুদ্ধ। ভক্ত পূজক এই সকল দ্রব্যে দেবীকে স্নান করাইয়া পরিতৃপ্ত হন, নিজেরই অশুদ্ধ ভাব দূর করেন।

বিবিধ দিনে আবদ্ধ হইলেও আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতেই দেবীর বিশেষ পূজা। মৃন্ময়ী মূর্তিকে নদীতীরে বা জলাশয়-সন্নিকটে লইয়া গিয়া যথাবিধি স্নান করান সম্ভবপর নয়; তাই নবপত্রিকারূপিণী দেবীকে তথায় লইয়া গিয়া স্নান করান হয় এবং পূজাস্থলে দর্পণে দেবীর মহাস্নান বিহিত হয়। ভক্তের যত প্রিয় দ্রব্য, ভোজ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার সব তিনি মায়ের চরণে উৎসর্গ করেন। মহাষ্টমীর দিনে নানা শক্তি-সমন্বিতা দেবীর নানা উপচারে পূজা। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে ঘোরা প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডারূপিণী দেবীর পূজার বিধান। কেননা মা ত কেবল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী নহেন, তিনি যে প্রলয়কারিণীও, সৌম্যাৎ সৌম্য-তরা; আবার ঘোররাবা মহারৌদ্রী। এইভাবে সমস্ত দ্রব্য দিয়া সেই অনন্তশক্তিময়ী মাতার পূজা করিয়াও পূজা পূর্ণ হইল না। দেবী যে রুধিরপ্রিয়া, তিনি চান বলিদান, তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তির নিয়োগ—সমস্ত মনঃপ্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ, এমন কি নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে আহুতি। তবেই বলিদান, হোম পূর্ণ হয় দেবী প্রসন্না হন। তাহার পরেই বিজয়া—বিজয়োল্লাস। পিতৃপক্ষে পিতৃতর্পণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত সাধকের মনে যে মহালয়ার (মহতাং বুদ্ধ্যাদীনাং লয়ো যস্যাম্) অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, পিতৃলোকাদি যাঁহার আংশিক প্রকাশ, আজ নিঃশেষে নিজের সর্বস্ব বলি দিয়া সেই সর্বাধাররূপিণী মহালয়াকে

অন্তরে পূর্ণরূপে পাইয়া বিজয়োল্লাস। পশু প্রভৃতি সেই বলিদানের এবং সিদ্ধি সেই পরম-সিদ্ধির অনুকল্প।

কারণ-সলিল হইতে মায়ের মূর্তি পরিগ্রহণ। তাই আজ পূজান্তে ভক্তগণ সেই মূর্তিকে জলে নিক্ষেপ করেন। সেই জলে মায়ের স্থূলদেহ মিশাইয়া গেল ভাবিয়া পরম পবিত্র জ্ঞানে সেই জল সকলের গাত্রে সিঞ্চন করেন। সকলকেই মায়ের সন্তান জানিয়া প্রেমে আলিঙ্গন করেন।

দেবীর স্বরূপ অনুভূতির বিষয়। তবে শাস্ত্র তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেন। দেবী-উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই সশ্রদ্ধ দেবগণ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কাসি ত্বং মহাদেবি?—হে মহাদেবি, আপনি কে? দেবী উত্তর দিতেছেন, অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী, মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ...। আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আমা হইতেই এই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তেও আমরা দেবীকে জগতের ঈশ্বরী, ব্রহ্মস্বরূপিণীরূপে পাই। 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে' জগতের কারণ এই শক্তিকে ঋষিগণ ধ্যান-সহযোগে ব্রহ্মের সহিত নিত্যসংযুক্তা দেখিয়াছেন—তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্—এইরূপ বর্ণিত আছে। এই সশক্তিক ব্রহ্মই দেবী দুর্গা। শাক্ততন্ত্রে শক্তির ভাব প্রধান, শিবভাব গৌণ; শৈবতন্ত্রে শিব (নির্গুণভাব) প্রধান, শক্তি গৌণ। বর্তমান যুগে শক্তির শ্রেষ্ঠ উপাসক, জগদম্বার প্রিয় সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই শক্তিকে সগুণা এবং নির্গুণা এই উভয় ভাবেই দর্শন করিয়াছেন। শক্তি অন্তর্মুখীন হইলে শিব হন, শিব বহির্মুখ হইলে শক্তি হন। একের দুই ভাব। জীবজগদ্রূপে তিনিই প্রকাশিত।

অনন্তশক্তিময়ী দেবী ধর্মার্থকামমোক্ষদা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমস্ত মানবই এই শক্তিরই আরাধনা করিতেছে। শক্তি-উপাসনার ফলেই মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে যাহা কিছু অধিকার লাভ হইয়াছে। চৈতন্যশক্তিকে ধরিতে না পারিয়াও স্থূল জড়শক্তির উপাসনায় জড়জগতে প্রাধান্যলাভ, বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির উপাসনায় মনোরাজ্যে আধিপত্য-লাভ। চিৎশক্তির উপাসনায় চিন্ময়ীর স্বরূপ উপলব্ধি, জগতের সারাৎসারারূপে জগজ্জননীকে দর্শন। সর্বভূতে সর্বপদার্থে তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা।

* * * * *

নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, বৎস, আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী,—একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী—একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী হয়ে আছি।' চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য সমস্তই; এমন কি, ধ্যান, ধ্যাতা পর্যন্ত। আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি।

—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

নিবেদন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

গোণা ক'টা দিন
শুধিতে হইবে মোর এরি মধ্যে সকলের
ঋণ।
কি করিলে ক'টা দিন ব্যর্থ নাহি হয়
হয় পূর্ণ সফলতাময়,
তারি তরে চিত্ত মোর হয়েছে ব্যাকুল।
আর যেন হয় নাক ভুল।
মনে হয় তোমারেই করি নিবেদন।
তার চেয়ে সার্থকতা কি আছে এমন।
তব কৃপা ছাড়া
এ বিক্ষিপ্ত চিত্ত মোর হবে দিশেহারা।
বল দাও মোরে
নিয়ে চল তুমি হাতে ধ'রে,
নিজে হতে সঁপিব না কভু
এই ক'টা দিন মোর কেড়ে লও
কেড়ে লও প্রভু।
হও তুমি সব চেয়ে প্রিয়,
এ জীবনে দয়া করি কর পরিণাম
রমণীয়।

"আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—মা, এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না। আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

যোগবাশিষ্ঠে সর্বত্যাগের আদর্শ

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

দেবগুরু বৃহস্পতির সুযোগ্য পুত্র মহামনা কচ সর্বপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিলেন। দেবদৈত্য-মানবসমাজে তাঁহার যশ-মান-প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত হইল। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসম্ভোগ্য বিচিত্র বিষয় অপর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্তে শান্তি মিলিতেছে না। কী একটা অনির্বচনীয় অহেতুক বিষাদ যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। তাঁহার বস্তুতঃ কিসের অভাব, তাহাও তিনি ঠিক বুঝিতেছেন না। তাঁহার যে সব বাহ্য ও আন্তর সম্পদ্ অপর সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করে, সে সব কিছুই তাঁহার চিত্তকে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সব সম্পদের মধ্যেই দোষদর্শন করে। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সে সকলই তাঁহার অনুভূতির ক্ষেত্রে অনিত্য অসার অতৃপ্তিকর বলিয়া প্রতিভাত হয়। কী যে তাঁহার নাই তাহাও তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না। তিনি এক ভীষণ সমস্যায় নিপতিত হইলেন; চিত্তে সম্যক্ বিশ্রান্তিলাভের কোন উপায়ই তিনি স্ববিচারে আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

অবশেষে বিষাদগ্রস্ত চিত্ত লইয়া তিনি তাঁহার তত্ত্বদর্শী পিতার সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহার আন্তরিক সমস্যা প্রশান্তচিত্ত পিতৃদেবের চরণে নিবেদন করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি সুপণ্ডিত পুত্রকে অতি সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন যে, সর্বত্যাগই চিত্তে সম্যক্ বিশ্রান্তি-লাভের একমাত্র উপায়। ব্যাকুলচিত্ত কচ পিতার উপদেশ সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রণতিপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃহত্যাগী হইলেন, সকল ভোগসম্পদ্ পরিত্যাগ করিলেন, সর্বপ্রকার স্বপরহিতকর কর্মাড়ম্বর হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, যশমান, পাণ্ডিত্যবিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্র হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন। সর্বপ্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ ও সামাজিক সম্বন্ধ পরিহার-পূর্বক তিনি বিজন অরণ্য ও গিরি-কন্দরে গমন করিলেন, এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করিয়া শান্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী সংন্যাস অবলম্বন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমোচিত সমস্ত কর্তব্য ও ভোক্তব্য বিষয় বিসর্জন দিয়া, নির্জন গিরিকন্দর আশ্রয় করিয়া, মহাপণ্ডিত মুমুক্ষু কচ মনে করিলেন যে, তিনি গুরুবাক্য সর্বতোভাবে পালন করিয়াছেন, সর্ব-ত্যাগী হইয়াছেন, সুতরাং তিনি পরমা শান্তির অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, চিত্তের বিষাদ তিরোহিত হইল না, তাঁহার অন্তরে বিক্ষেপের তরঙ্গ উপশান্ত হইল না, বুদ্ধিতে সংশয়ের দ্বন্দ্ব নিবারিত হইল না, তিনি বহুদিন প্রতীক্ষার পরেও আকাঙ্ক্ষিত শান্তি লাভ করিলেন না।

গুরুবাক্যে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। গুরুবাক্য তাঁহার জীবনে সম্যগ্রূপে প্রতি-পালিত হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে তিনি

পুনরায় সুনিপুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুদেব তাঁহাকে সর্বত্যাগী হইতে বলিয়াছেন; তাঁহাকে ত শুধু সংন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া গিরিগুহাবাসী হইতে বলেন নাই। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমোপযোগী যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে; কিন্তু সংন্যাসাশ্রমোপযোগী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সংশ্রব ত তিনি ত্যাগ করেন নাই। দণ্ড, কমণ্ডলু, কন্থা, কম্বল, কৌপীন, নির্দিষ্ট নিবাসস্থল, এসবও ত ভোগ্য বিষয় বলিয়াই গণ্য। সংন্যাসের অঙ্গীয় বলিয়া এসকল ত নির্জন স্থানেও তিনি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্ভবতঃ এই হেতু তাঁহার ত্যাগও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, তাঁহার চরম শান্তির অনুভূতিও হইতেছে না।

এইপ্রকার বিচার করিয়া মুমুক্ষু কচ বৈরাগ্যের কঠোরতা চরমমাত্রায় অবলম্বন করিলেন। তিনি কন্থা, কম্বল, কৌপীন দণ্ডাদি সবই পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইলেন, নির্দিষ্ট বাস পরিত্যাগ করিয়া অনিকেত হইলেন, বিনা যাচ্ঞায় কেহ আহার প্রদান করিলে স্বল্পমাত্রায় শুধু হাতেই তাহা ভোজন করিতেন, পিপাসার্ত হইলে নদীতে গিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেন, কেবলমাত্র বাতাহারী হইয়াই বহু দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ সুকঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা ও কায়ক্লেশের পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে, তাঁহার সর্বত্যাগ এবার পূর্ণমাত্রায়ই হইয়াছে, শান্তিলাভের সব অন্তরায় নিরাকৃত হইয়াছে, শীঘ্রই পরা শান্তিতে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইবে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অতিবাহিত হইতে লাগিল। কঠোর তপস্যা কঠোরতর হইতে লাগিল। শরীর কৃশ ও দুর্বল হইল। কিন্তু প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত নিরাবিল নির্ভীক নিশ্চিন্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইল না। তিনি আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, সর্ববিধ ভয়ভাবনারহিত এরূপ একটি সরস অনুভূতি হৃদয়ে লাভ করিলেন না। অথচ নিবিড়ভাবে বিচার করিয়াও তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না যে, তাঁহার সর্বত্যাগের আর কি বাকী আছে।

পরমা শান্তির নিমিত্ত ব্যাকুল সাধক তখন নিরুপায় হইয়া পুনরায় গুরুর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কাতর প্রাণে নিজের দুরবস্থা বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন,—

তাত সর্বং পরিত্যক্তং কন্থা বেণুলতাস্বপি।
তথাপি নাস্তি বিশ্রান্তিঃ স্বপদে কিং করোম্যহম্॥

—হে পিতঃ, আমি সবই পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি, কন্থা বেণুলতাদি পর্যন্ত বর্জন করিয়াছি, কিন্তু তথাপি স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ হইতেছে না,—আত্মস্বরূপে নিশ্চলা স্থিতি ও পরা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এখন আমি কি করিব?

সকরুণ ও সস্নেহ বচনে দেবগুরু বলিলেন,—বৎস, হতাশ হইও না, ধৈর্য হারাইও না, এখনো তোমার যথার্থতঃ সর্বত্যাগ হয় নাই, সেই হেতুই স্বপদে বিশ্রান্তিলাভও হইতেছে না। কচ শুনিয়া অবাক্। তাঁহার এমন কি সম্পদ্ আছে, যাহা তিনি ত্যাগ করেন নাই? কি ভোগ্য বিষয় তিনি লুকাইয়া ভোগ করিতেছেন? কোন্ সঞ্চিত অর্থ বা গুপ্ত বাসনা তাঁহার পরা শান্তির পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া আছে? তিনি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। করুণাময় পিতা ও গুরু তাঁহাকে চিন্তামগ্ন ও বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া পুনরায় স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন,—দেখ বৎস, তুমি সর্বপ্রকার বিষয়ভোগ ও বাহ্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ,

সন্দেহ নাই; অন্তরেও তোমার ভোগতৃষ্ণা নাই, তাহাও সত্য; কিন্তু তাহাতেই সর্বত্যাগ হয় না; তাহাতেই যথার্থ সংন্যাস হয় না; তাহাতেই পরা শান্তির অধিকার লাভ হয় না।

তবে সর্বই বা কি, সর্বত্যাগই বা কি? সদ্‌গুরু বৃহস্পতি বলিলেন,—

চিত্তং সর্বমিতি প্রাহুস্তৎ ত্যক্ত্বা পুত্র রাজসে।
চিত্তত্যাগং বিদুঃ সর্বত্যাগং সর্ববিদো জনাঃ ॥

—যাহারা যথার্থ সর্ববিৎ, তাহারা চিত্তকেই সব বলিয়া অভিহিত করেন, এবং চিত্তত্যাগকেই সর্বত্যাগ বলিয়া জানেন। হে পুত্র, তুমি চিত্ত-ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর, চিত্তত্যাগ করিতে পারিলেই বস্তুতঃ সর্বত্যাগী হইবে এবং পরমানন্দ-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান থাকিবে।

চিত্তই যে সংসারের সব, এই রহস্য যুক্তিযুক্ত ভাষায় তত্ত্বদর্শী গুরু তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যকে বুঝাইয়া দিলেন। চিত্তই সংসারের মূল, সংসার চিত্তেরই বহির্বিকাশমাত্র। নিজের চিত্তের স্থূল ও সূক্ষ্ম বাসনা দ্বারাই নিজের সংসার রচিত। চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই বাহ্য সংসার একটা বিরাট আকার ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত বিচিত্র রসের অভিনয় করিতেছে। সংসারে মুহূর্তে মুহূর্তে কত কি সৃষ্টি হইতেছে, কত কি ধ্বংস হইতেছে, কত কি কর্মের আড়ম্বর হইতেছে, কত কি সুখ-দুঃখের ভোগ হইতেছে,—এ সবই তোমার চিত্তেরই খেলা। চিত্তেই বন্ধনক্লেশের অনুভূতি, চিত্তেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। চিত্তই নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, চিত্তই নিজের সৃষ্টিতে নিজে আসক্ত হয়, চিত্তই নিজের সৃষ্টির মধ্যে শোকতাপ বন্ধনক্লেশ অতৃপ্তি বিষাদ অনুভব করে, চিত্তই নিজের সৃষ্টির নেশা হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। সংসারের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত চিত্তেরই বিচিত্র খেলা। সুতরাং চিত্তই সংসারের সব। চিত্তত্যাগ হইলেই সর্বত্যাগ হয়। চিত্ত ত্যাগ না হইলে চিত্তপ্রসূত সংসারের সব পদার্থগুলি ত্যাগ করিলেও, সংসারপ্রসূতি ভিতরে রহিয়াই গেল, সংসারসৃষ্টি পুনরায় চলিতেই থাকিবে, সুতরাং ত্যাগের ফল যে শান্তি, তাহা লাভ হইবে কিরূপে? লোকালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, দিগম্বর ও অনিকেত হইয়া যথা-তথা বিচরণ করিলেও, চিত্তত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত সংসার সাথে সাথেই চলিবে, নূতন নূতন সংসার-সৃষ্টিও হইতে থাকিবে, স্বপদে বিশ্রান্তিলাভেরও অন্তরায় নিজের অন্তরেই বিদ্যমান থাকিবে।

সংসার-রহস্যজ্ঞ গুরু শিষ্যের নিকটে সংসার-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আপনি অন্তর্হিত হইলেন, এবং সংসারমুক্তিপিপাসু শিষ্যও সুতীব্র পুরুষ-কারের সহিত চিত্তত্যাগের জন্য প্রযত্নশীল হইলেন। কিন্তু সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যাহাকে দেখা যায়, ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করাও চলে, তাহাকে সহজে ত্যাগ করাও চলে। কচ চিত্তের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করেন, চিত্তকে কোন প্রকারেই ধরিতে, করায়ত্ত করিতে তিনি সমর্থ হন না। চিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিশেষ বিষয় নয়, সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাকে ধরা যায় না, এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা তাহাকে বর্জন করাও সম্ভব হয় না। চিত্তকে চিন্তার বিষয়রূপে ধরাও কঠিন। কারণ, সব চিন্তাব্যাপারের কর্তারূপে সে সর্বদা চিন্তনীয় বিষয়ের পশ্চাতেই বিদ্যমান থাকে; এবং যতই তীব্রতার সহিত চিন্তা করা যায়, চিত্ত ততই প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে ও চিন্তার ভিতর দিয়া আপনার সত্তার পরিচয় দিতে থাকে। চিন্তাদ্বারা, বিচারদ্বারা বা তপস্যা দ্বারা, যে উপায়েই চিত্তকে বর্জন করিবার প্রচেষ্টা করা যাক না কেন, সেই প্রচেষ্টার ভিতরেই

চিত্ত আপনার রাজত্ব বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত করিতে থাকে। চিত্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই করিতে হয়। সুতরাং চিত্তকে পরাভূত করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। চিত্তকে ত্যাগ করাব অর্থ চিত্তকে চিত্তদ্বারা চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত করা,—ইহা স্ববিরোধী কল্পনা, এবং সম্পূর্ণই অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধকপ্রবর কচ এ সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনার পুরুষকারের সামর্থ্যের উপর আস্থা হারাইলেন, স্বকীয় সাধনার প্রভাবে চিত্তজয়ী হইয়া পরা শান্তির যোগ্যতা অর্জনের ভরসা তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। সাধনার ক্ষেত্রেও তাঁহার যে স্পর্দ্ধা ছিল, যে অভিমান ছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার চিত্তে দৈন্য উপস্থিত হইল।

দীনাতিদীনভাবে তিনি পুনরায় শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইলেন। কাতরচিত্তে আপনার সাধন-সঙ্কট বর্ণন করিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন,—

স্বরূপং ব্রূহি চিত্তস্য যেন তৎ সন্ত্যজাম্যহম্।

—চিত্তের স্বরূপটি আমাকে যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিন, যাহাতে সেই চিত্তকে আমি সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিতে পারি।

শ্রীগুরু শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া তখন চরম রহস্যটি ব্যক্ত করিলেন,—

চিত্তং নিজমহঙ্কারং বিদুশ্চিত্তবিদো জনাঃ।
অন্তর্যোঽয়মহম্ভাবো জন্তোস্তচ্চিত্তমুচ্যতে॥

—চিত্তবিদ্‌গণ নিজ অহংকারকেই চিত্ত বলিয়া জানেন। জীবের অন্তরে এই যে অহংভাব (আমি-বোধ),—যাহা সকলেই অনুভব করে,—তাহাই চিত্তের যথার্থ স্বরূপ। আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, আমি সংসারের নানাবস্তু গ্রহণ ও ভোগ করি, আমি এই সব ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিব, আমি সংসারে বদ্ধ হইয়া আছি, আমি নিজের পৌরুষপ্রভাবে মুক্তিলাভ করিব, আমি এইসব বাহ্য ও আন্তর সম্পদের অধিকাবী, আমি প্রযত্নপূর্বক এই সব বর্জন করিয়া সর্বত্যাগী হইব,—এইপ্রকার সকল ব্যাপার, সকল চিন্তা ও কর্ম, সকল যুক্তিবিচার ও যোগতপস্যার ভিতরেই অহংকারের একটা বোধ প্রবল বা ক্ষীণ আকারে, স্ফুট বা অস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে। এই অহংকাবকে আশ্রয় করিয়া, এই অহংকারকে কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই, চিত্তের সব ব্যাপার পরিচালিত হয়, সব চিন্তা-ভাবনা, সব সাধন-ভজন, সব ক্রিয়াকর্ম, সব ভোগ ও ত্যাগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অহংকাবকে বাদ দিয়া চিত্তেব কোন প্রসার হয় না, চিত্তের কোন সত্তাই থাকে না। সুতরাং অহংকারই বস্তুতঃ চিত্ত, এবং চিত্তপ্রসূত ও চিত্তাশ্রিত যাহা কিছু, সকলেবই প্রসূতি ও ধাত্রী এই অহংকার। অতএব এই অহংকারই সংসারের মূল, এই সর্বজনপরিচিত অহংকার হইতেই কর্মভোগময় সুখদুঃখাদিময় বিচিত্ররসময় বিশ্বসংসারের উদ্ভব, এই অহংকার-হেতুই যত ভেদবুদ্ধি, যত হেয়োপাদেয়-বোধ, যত অভাব ও অভিযোগ, যত ভয় ও উদ্বেগ, যত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ, এবং এই সকল হইতে বিমুক্তির প্রয়াস। বস্তুতঃ অহংত্যাগেই সর্বত্যাগ, সর্ববন্ধনবিমুক্তি, পরা শান্তি, স্বপদে বিশ্রান্তি।

অনেক শান্তিপিপাসু মোক্ষলোলুপ তত্ত্বানভিজ্ঞ সাধক শান্তি ও মুক্তিলাভের সাধনপ্রচেষ্টার ভিতরেই অহম্ভাবকে আরো প্রবল করিয়া তোলেন এবং সাধনার সুফল হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা স্পর্ধার সহিত দেহেন্দ্রিয়মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রয়োজনসমূহ নিগ্রহ করিয়া, বাহ্যতঃ সকল প্রকার কর্ম ও ভোগ বর্জন করিয়া, লোকসমাজের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, সুতীব্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়া, সর্বত্যাগী হইতে প্রয়াস

করেন এবং মোক্ষলাভে প্রযত্নশীল হন। কিন্তু এইরূপ বাহ্যিক ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের অনুশীলন দ্বারা যথার্থতঃ সংসারত্যাগ হয় না। সংসারসৃষ্টির মূলোচ্ছেদ হয় না, অতৃপ্তি ও অশান্তির কারণ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। সাধনা, ত্যাগ ও তপস্যার ভিতরে যতদিন স্পর্ধা ক্রিয়াশীল আছে, অহংকার সজীব আছে, যতদিন আমি-কে কেন্দ্র করিয়াই বাহ্যত্যাগময় উৎকটতপস্যাময় জীবনপ্রবাহ পরিচালিত হইতে থাকে, ততদিন সংসারের নাশ নাই, চিত্তে প্রশান্ততা নাই, পরামুক্তি ও পরা শান্তির অনুভূতি নাই। ততদিন নূতন নূতন চিন্তাভাবনা, নূতন নূতন বাসনা-কামনা, নূতন নূতন সংকল্পবিকল্পের সম্ভাবনা, অর্থাৎ নূতন নূতন সংসারসৃষ্টি ও অনর্থোৎপত্তির সম্ভাবনা,—অন্তরে থাকিয়াই যায়। কোন বৃক্ষের মূল ঠিক রাখিয়া তাহার শাখাপ্রশাখা সুনিপুণভাবে ছেদন করিলেও যেমন বৃক্ষের নাশ হয় না, আবার কালক্রমে সেই মূল হইতেই যেমন নূতন নূতন শাখাপ্রশাখার বিস্তার হইতে থাকে, তেমনি সংসারবৃক্ষের মূলস্বরূপ অহংকারকে বিনষ্ট না করিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কামলোভাদির সংযম দ্বারা বাহ্যতঃ বিষয়সম্পর্ক বর্জন করিলেই তত্ত্বতঃ বিষয়ত্যাগ হয় না, সংসারতরুর বিনাশ হয় না, আত্মা স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ করে না। যতদিন অহংযুক্ত, ততদিনই সংসারী। ভোগী অহং যেমন সংসারী, ত্যাগী অহংও তেমনি সংসারী। কর্মাড়ম্বরনিষ্ঠ অহং যেমন সংসারী, তপস্যাড়ম্বরনিষ্ঠ অহংও তেমনি সংসারী। সন্ন্যাসী তপস্বীর অহংকারও অনুকূল অবস্থার যোগে কর্মভোগমুখী চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্বীয় সংসারের বিস্তারসাধন করিতে পারে। অহংকারই যে বস্তুতঃ সংসার, অহংত্যাগেই যে সংসারত্যাগ ও আত্মার স্বরূপপ্রতিষ্ঠা, এই তত্ত্ব সম্যগরূপে বুঝিলেই শান্তির সাধনা নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে।

বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া তাহার শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্পফলে প্রচুর বারিবর্ষণ করিলেও যেমন সেই বৃক্ষ পুনরায় সজীব ও সতেজ হইতে পারে না, তেমনি সংসারবৃক্ষের মূলস্বরূপ অহংকারের বিনাশসাধন করিয়া সংসারের সর্বপ্রকার কর্ম ও ভোগের সহিত বাহ্য সম্পর্ক রক্ষা করিলেও পুনরায় সংসারবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে না ; নূতন নূতন রাগ-দ্বেষ সংকল্প-বিকল্প প্রভৃতির উদ্ভব হয় না ; ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয় প্রভৃতি আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায় ; দুঃখ-তাপ-বিক্ষোভ-অশান্তির সব কারণও তিরোহিত হইয়া যায়। সম্যগ্‌রূপে অভিমানশূন্য হইয়া এই স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে পারিলে, কোন অবস্থাতেই সর্বত্যাগের হানি হয় না, শান্তির ব্যাঘাত হয় না। তখন—

নির্গ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তো বিভাবনঃ।
অনির্বাণোঽপি নির্বাণশ্চিত্রদীপ ইব স্থিতঃ॥
অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥

—সেই অভিমানশূন্য পুরুষের সমস্ত গ্রন্থি বা বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয়ের জ্বালা প্রশমিত হয়, কোন প্রকার ভাবনা-চিন্তার লেশমাত্রও থাকে না, সংসারে জীবন-ধারণ ও নানা বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিলেও তিনি সর্ববন্ধনবিনির্মুক্ত। চিত্রপটাঙ্কিত দীপশিখায় যেমন দীপশিখার আকারমাত্রই বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে যেমন কোন প্রকার জ্বালা বা উত্তাপ বা ধূম থাকে না, অর্থাৎ দীপত্বই থাকে না, সেইরূপ অহংকারবিনির্মুক্ত মানব বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যবহারিক জগতে জীবভাবে বিচরণ করিলেও,—সাধারণ সংসারী মানুষের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নপানীয়গ্রহণ, ব্যাধিতে ঔষধ-সেবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী পারিবারিক

রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্তব্য কর্মসমূহের যথাবিধি সম্পাদন, জনগণের সুখদুঃখে সহানুভূতি, সেবা প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়োজিত থাকিলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে তাঁহার জীবত্বই থাকে না; তিনি সর্বপ্রকার বিধি ও নিষেধের, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের, ভোগ ও ত্যাগের, উর্ধ্বেই অবস্থান করেন। অশন ও অনশন, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, মান ও অপমান, জীবন ও মরণ,—সবই তাঁহার অহংমমবিরহিত সাক্ষীভূত চেতনায় সমান বলিয়া অনুভূত হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, লাভ ও ক্ষতি, শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া কিছুই তাঁহার বোধ হয় না।

এক হিসাবে আকাশস্থ শূন্য কুম্ভের ন্যায় নিরভিমান পুরুষের অন্তর বাহির সবই শূন্যময়, তাহাতে এক অসীম নিস্তরঙ্গ বৈষম্যরহিত ভেদবিবর্জিত প্রশান্তমহীয়ান্ মহাশূন্যেরই অনুভূতিমাত্র। রাগদ্বেষ, ভয়ভাবনা, অভিমান-মমতা, হেয়োপাদেয়-ভেদবোধ প্রভৃতি মনোজগতের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য তাঁহার অহং-শূন্য অন্তশ্চেতনা হইতে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার অন্তর শূন্যায়িত হইয়া যায়। বহির্জগতের আপাতপ্রতীয়মান সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্যও তাঁহার দৃষ্টিতে অর্থশূন্য হওয়ায়, তাঁহার চেতনায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও শূন্যায়িত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, অন্যহিসাবে সমুদ্রনিমজ্জিত কুম্ভের ন্যায় তাঁহার অন্তর ও বাহির সবই সচ্চিদানন্দরসে পরিপূর্ণ, কোথাও কোন প্রকার অপূর্ণতাবোধের লেশমাত্রও সেখানে নাই। তিনি নিজের অন্তরেও সম্যক্ পূর্ণতা অনুভব করেন, বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়াও সর্বত্রই পরমানন্দস্বরূপের বিচিত্র অভিব্যক্তি দর্শন করেন। অহংকারের আবরণ হইতে মুক্ত হইলেই মানবচেতনা ব্রহ্মচেতনার সহিত একীভূত হইয়া সম্যক্ পরিপূর্ণতার আস্বাদন করিতে থাকে। অতএব অহংত্যাগেই সর্বত্যাগ ও সর্বার্থসিদ্ধি, সর্বক্লেশের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি।

এই মহান্ উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহামতি কচ একদিকে যেমন একটা অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন, সংসারত্যাগ ও পরমার্থসিদ্ধির একটা নূতন রহস্য অবগত হইলেন, অপরদিকে তাঁহার বিচারে এই সাধনায় সফল-মনোরথ হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'অহং' সর্বপ্রকার জ্ঞান, কর্ম, ভোগ ও ত্যাগের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত; অহংকে আশ্রয় করিয়াই সকল সাধনভজন, যোগ-যাগ-তপস্যা। বিশ্বজগৎ যেমন অহং-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায় এবং সুখদুঃখাদির উৎপাদক হয়, তেমনি বিশ্বসংসার ত্যাগ করিয়া স্বপদে বা ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলেও অহং-কেই সাধন করিতে হয়, অহংকেই পুরুষকার-প্রয়োগ করিতে হয়, অহংকেই সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত প্রযত্নশীল হইতে হয়। এই অহং-এর ত্যাগ কচের বিচারবুদ্ধিতে স্ববিরোধী বাক্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। যে ত্যাগ করিবে, সে-ই ত অহম্। অহং নিজেকে নিজে কিরূপে ত্যাগ করিবে? নিজের বিনাশসাধন করিয়া কিরূপে সে শান্তিলাভ করিবে? আত্মত্যাগের বা আত্মবিনাশের চেষ্টার মধ্যে ত অহং পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপ অসম্ভব উপদেশ গুরুদেব কিভাবে করিলেন, এই সন্দেহে দোলায়মান হইয়া কচ বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সদ্গুরু বৃহস্পতি শরণাগত শিষ্য ও পুত্রকে অভয় প্রদানপূর্বক বলিলেন,—

অপি পুষ্পাবদলনাদপি লোচনমীলনাৎ।
সুকরোঽহংকৃতেস্ত্যাগো ন ক্লেশোঽত্র মনাগপি॥

—পুষ্পচয়ন ও নেত্রনিমীলন অপেক্ষাও অহংত্যাগ সহজসাধ্য। ইহাতে বিন্দুমাত্রও

ক্লেশ নাই। পুষ্পচয়ন করিতে বা চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলনে যতটুকু আয়াস আবশ্যক হয়, অহংকারের বিনাশ-সাধন করিতে ততটুকু আয়াসেরও প্রয়োজন হয় না। কারণ,—

অজ্ঞানমাত্রসংসিদ্ধং বস্তু জ্ঞানেন নশ্যতি।
বস্তুতো নাস্ত্যহংকারঃ পুত্র মিথ্যাভ্রমো যথা॥

—যে বস্তু অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই যাহার সত্তা প্রতীতি গোচর হয়, জ্ঞান হওয়া মাত্রই আপনা আপনি সে নষ্ট হইয়া যায়। যাহা বস্তুতঃ নাই, ভ্রান্তি-বশতঃ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে মাত্র, তাহাকে ধ্বংস করিতে আবার প্রয়াসের আবশ্যকতা কোথায়? যেইমাত্র জানা গেল যে সে নাই, অমনি তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। হে পুত্র, অহংকারের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নাই, শুধু অহং-বোধের মধ্যেই ত অহং-এর অস্তিত্ব, এবং এই বোধটিই মিথ্যা ভ্রমমাত্র। যেই বুঝিলে যে, অহংকার-নামক স্বতন্ত্র কোন বস্তুই নাই, অমনি ত সে বোধের কাছেও 'নাই' হইয়া গেল। তাহার আবার ত্যাগই বা কি বিনাশই বা কি, আর 'নাই'—কে 'নাই' করিবার জন্য প্রযত্নেরই বা ক্ষেত্র কোথায়?

কোন একটি রজ্জু যখন দর্শকের অজ্ঞানতাকে আশ্রয়পূর্বক সর্পরূপে প্রতীয়মান হইয়া ভয়, দুঃখ, চাঞ্চল্য প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি করে, তখন সেই সর্পের বিনাশের নিমিত্ত কি কোন অস্ত্রশস্ত্র বা প্রযত্ন আবশ্যক হয়? সর্প যে বস্তুতঃ সেখানে নাই, তাহা জানিলেই প্রাতীতিক সর্প বিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং তৎপ্রসূত ভয়াদি দূরীভূত হইল। রজ্জু যে রজ্জু, তাহা যে সর্প নয়, এই জ্ঞানমাত্রেই সর্পেরও নিবৃত্তি এবং সর্পদর্শন নিমিত্ত সব দুরবস্থারও নিবৃত্তি। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। যে অহংবোধকে যাবতীয় চিত্তব্যাপারের এবং তৎসূত্রে যাবতীয় বিশ্বব্যাপারের মূল উৎস ও আশ্রয় বলিয়া জানিতে পারিয়াছ, সেই অহংএর নিজস্ব কোন সত্তাই নাই। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত নিত্য-শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই সত্য বস্তু, এই আত্মাই অহংএরও যথার্থ স্বরূপ এবং অহ-মাশ্রিত বিশ্ব-সংসারেরও যথার্থ স্বরূপ। এই আত্মা কখনই আপনার স্বরূপ ছাড়িয়া অহং-রূপও প্রাপ্ত হয় নাই, সংসাররূপও প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু কোন এক অনির্বচনীয় কারণ-বশতঃ এই আত্মা অহংকাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অহংবোধরূপ একটা মিথ্যা ভ্রান্তির প্রবাহ চলিয়াছে, এবং এই মূল ভ্রান্তিকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য প্রকার আন্তর ও বাহ্য ভ্রান্তির উদ্ভব হইতেছে। এই অনাত্মধর্মবিশিষ্ট পরিণামশীল পরিচ্ছিন্ন অহংবোধটি যে একটা ভ্রান্তি, একটা অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি, ইহা যে নিজের সত্তায় সত্তাবান্ কোন সত্য বস্তু নয়, ইহা জানা মাত্রই মিথ্যা সর্পের মত ইহার বিনাশ সাধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও ইহার আশ্রয়ে প্রতীয়মান বিশ্বসংসারও 'নাস্তি' হইয়া যায়।

একটি ছায়াপুরুষকে ভীষণ শত্রুবোধে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দীর্ঘকাল আঘাত করিতে থাকিলেও সেই শত্রুর অঙ্গে বিন্দু-মাত্রও আঘাত লাগে না, তাহার বিনাশ-সাধনও হয় না। কিন্তু তাহাকে ছায়া বলিয়া জানিতে পারিলেই সেই কল্পিত শত্রুর বিনাশ আপনা আপনিই সাধিত হয়, আর সে ভয় বা ক্লেশের কারণ হয় না; তাহার আকৃতি, এমন কি, বিকট অঙ্গভঙ্গীও আনন্দোল্লাসের সহিতই সম্ভোগ্য হইয়া থাকে। জ্ঞানের আলোকপাত হইলেই ছায়ার সত্যত্বভ্রান্তি তিরোহিত হয়। যাহার ছায়া, তাহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই ছায়ার মিথ্যাত্ব ধরা পড়ে,

তাহার বিনাশ সংসাধিত হয়। সেইপ্রকার আত্মার ছায়ারূপ অহংকারের বিনাশসাধনের উদ্দেশ্যে যতই তাহার প্রতি বাহ্যিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ-তপস্যাদি অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে তাহার বিনাশ হয় না, বরং অনেক সময় প্রবল হইতেও দেখা যায়। সুতরাং যে জাতীয় সাধনার কথা চিন্তা করিয়া অহং-ত্যাগকে অতিশয় কঠিন বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, অহংত্যাগের সাধনা সে জাতীয়ই নয়।

যে পরম অহং বা পরমাত্মার ছায়ারূপে এই মিথ্যা অহংভাবের প্রতীতি হয় সেই পরম অহং-এর তত্ত্ব জানিলেই এই মিথ্যা অহংভাবের তিরোধান হয়। হে পুত্র, তুমি অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া অনুভব করিতে থাক যে,—

দিক্‌কাল্যাদ্যনবচ্ছিন্নং স্বচ্ছং নিত্যোদিতং ততম্।
সর্বার্থময়মেকার্থং চিন্মাত্রমমলং ভবান্॥

তুমি দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নির্মল নিত্য স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী সর্বার্থময় সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত চৈতন্যৈকরস পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। এক অদ্বিতীয় নিত্য নির্বিকার সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা তোমারও পারমার্থিক স্বরূপ, এই আপাতবৈষম্যসমাকুল বিশ্বপ্রপঞ্চেরও পারমার্থিক স্বরূপ। তুমি উপলব্ধি কর যে, যিনি বিশ্বাত্মা, তিনিই তোমারও আত্মা, তিনিই বস্তুতঃ তুমি।

এক সর্বভাবাতীত সর্বদ্বন্দ্বাতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই স্বকীয়া অচিন্ত্যা মহাশক্তির অনির্বচনীয় বিলাসে আপনাকে আপনি অনাদি অনন্তকাল অসংখ্যভাবে অসংখ্য দ্বন্দ্বের আকারে প্রকটিত করিতেছেন; অসংখ্য কর্তা ও কার্যরূপে অসংখ্য ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে, অসংখ্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন। তিনি তোমারও 'অহং,' আমারও 'অহং,' সকলেরই যথার্থ অহং। আমরা সকলেই সেই অদ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্ন একেরই বিশেষ বিশেষ বিগ্রহমাত্র। যাহা হইতেছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, সবই তাঁহার লীলাবিলাস। যাহাকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু হউক না কেন, সবই তাঁহার, সবই তিনি, সবই আমি।

সুতরাং অহংকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না দেখিয়া সেই নিত্য শুদ্ধ চিদানন্দঘন বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন দর্শন করিলেই, অহং-এর সম্যক্ ত্যাগ হয় অথবা অহং-এর পূর্ণতানুভূতি হয়। এক্ষেত্রে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণতার আস্বাদন একই কথা। এই অহং-ত্যাগেই সর্বত্যাগ হয়, এবং এই সর্বত্যাগে বিশ্বের সর্বত্র সকলেরই ভিতরে এক পূর্ণানন্দস্বরূপেরই আস্বাদন হয়। বস্তুতঃ যথার্থ সর্বত্যাগ ও সর্বপ্রাপ্তি একই কথা। এই সর্বত্যাগ সাধিত হইলেই স্বপদে সম্যক্ বিশ্রান্তিলাভ হয়। তখন ভিতর বাহির এক আনন্দরসে ভরপুর হইয়া যায়। ইহাই জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ।

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

—স্বামী বিবেকানন্দ

চাহি না স্বর্গ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্র কহেন পরম ধনের সন্ধানে হও রত,
সংসার কহে স্বার্থসাধনে মাথা কর অবনত ;
মর্ত্য মানব, স্বর্গবাসের আশা যদি রাখ মনে,
পরিহরি সুখ নিযুক্ত থাক পুণ্য সঞ্চয়নে।

সবারে লইয়া যে সুখ আমার সে-ইত স্বর্গসুখ
পরমধনের আশা করি নাক, ভাগ্য থাক্ বিমুখ,
চাহি না স্বর্গ,—উপসর্গের বালাই লইয়া মরি
বাধা বন্ধন দু'হাতে ছিঁড়িয়া নিজেরে মুক্ত করি ;
জাতি পঙ্‌ক্তির বিভেদ মানি না, মানি নরনারায়ণে
তাহার সেবায় তনুমন যায়, শুধু এই জানি মনে,
সবার উপরে মানুষ সত্য তার বড় কেহ নাই
তার মাঝে যদি দেবতারে পাই প্রণাম জানায়ে যাই।

উপবীতমান ব্রাহ্মণ আজ থাকুন বদ্ধ ঘরে
বীর্যবিহীন যদি ক্ষত্রিয়, দূরে থাক আজি সবে,
বৈশ্যের গৃহে যদি নিঃস্বতা, সে হোক শস্ত্রপাণি
শূদ্র সে আজ জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করি' আনি
অমৃত বিলাক জাতিগুণাতীত ভিখারী আচণ্ডালে
অচ্ছুৎ আসি' সমাদর পাক মোদের যজ্ঞশালে।

মানুষের মন করে বন্ধন, মুক্তিও সে-ই আনে
কাচ নিয়ে মোরা অঞ্চল ভরি মণিকাঞ্চন-জ্ঞানে ;
কবি' সে মনের শুদ্ধিসাধন ; বাহ্যবিচার মিছে,
লাঞ্ছিত অবনমিতের দল তাইত টানিছে পিছে।
অন্তর-শিখা উপবীত করে সকলেরে ব্রাহ্মণ
মিথ্যা বিচারে শ্রদ্ধা জানাই অপাত্রে অকারণ।
জ্ঞানময়ী শিখা ভাস্বর লিখা উপবীত জ্ঞানময়
সূত্র মানুষে দেয় না মুক্তি, আঁধার করে না জয়।
চিন্ময় ধন করিয়া মনন সাধনে সত্য মিলে,
মহাপুরুষেরা নিজের জীবনে তাহার প্রমাণ দিলে।
জাতি পরিচয়ে মহত্ত্ব কোথা ? মানুষের জয়গান
মহাভারতের পাতায় পাতায় মুখরিত অম্লান।
জড় বুদ্ধিতে যে জাতি অন্ধ দেখে না মানুষে চাহি,
ভোগায়তনের মত্ততা মাঝে ডাকে তারা ত্রাহি ত্রাহি।

ত্রাণ করিবার শক্তি কেবল আছে সে ব্রাহ্মণের
যার জাতি নাই, বর্ণহীন যে, অন্তর সাধনের
বর্ণশ্রেষ্ঠ মানুষ সে ইত, মনে দেবতার বাস,
ধ্বংসোন্মুখ এই পৃথিবীরে সেই দিবে আশ্বাস—
নূতন দিনের ; নূতন মানুষ সেই হবে বরণীয়
নর-নারায়ণ নব ব্যাখ্যায় হবে সদা স্মরণীয়।

"পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে ; পরের জন্য এতটুকু ভাবলে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি ; কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যাপতির কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পিএইচ্-ডি

বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'কীর্তিলতায়' তিনি নিজেকে 'খেলন কবি' বলিয়া বালচন্দ্রের সঙ্গে স্বীয় কবিত্বের উপমা দিয়াছেন; আর অতি-বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় জারতুর হইয়া লিখিয়াছেন—

কৈসন কেস কী ভএ বিভচ্ছল বনভরী রাহু কাঠ।
আখি মলমলি কান ন সুনীঅ সুখি গেল তনু আট॥
দান্ত ভরী মুখ থোথর ভএ গেল জনি কমাওল সপ।
ঠাম বৈসলেঁ ভুবন ভরিঅ ঝরী গেল সব দাপ॥
জাহি লগী গৃহচাতর লাওল বুঝল সবে অসার।
আখি পাখী দুহু সমার সোএল জনিত সবে বিকার॥

এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যিনি কবিতা লিখিয়াছেন এবং যাঁহার জীবন সুখদুঃখের তরঙ্গদোলায় পুনঃপুনঃ দোলায়িত হইয়াছে ও যাঁহাকে ১০।১২ জন পৃষ্ঠপোষক রাজার উত্থান ও পতন দেখিতে হইয়াছে তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটা মানসিক ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ কবিতা কখন রচিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না বলিয়া এই ক্রমবিকাশের গতি এতদিন ধরা পড়ে নাই। আমরা সেই ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবার জন্য রাজনামাঙ্কিত পদগুলি যতদূর সম্ভব কালানুযায়ী সাজাইয়া প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য একথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, রাজনামবিহীন সমস্ত পদই কবির বৃদ্ধবয়সের রচনা; তবে একথা ঠিক যে দেবসিংহনামাঙ্কিত পাঁচটি পদ, গ্যাসদীন সুরতান নামাঙ্কিত একটি, হরিসিংহ নামাঙ্কিত একটি, ও শিবসিংহ নামাঙ্কিত ২০২টি পদ একুনে অন্ততঃ ২০৯টি পদ বা অকৃত্রিম পদের শতকরা অন্ততঃ ২৬টি পদ কবির তরুণ বয়সের রচনা। এই পদগুলির বিষয়বস্তু ও ভণিতার সহিত রাজনামবিহীন যে সব পদের বিশেষ বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলিও আমরা বিদ্যাপতির যৌবন-কালের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রহেলিকা পদগুলি একই যুগে রচিত। crossword puzzle-এর সমাধানের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়ার রীতি যখন প্রবর্তিত হয় নাই, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, রাজসভার আবহাওয়ায় কবি রাজারাণী ও সভাসদদের চিত্তবিনোদনের জন্য এগুলি লিখিয়াছিলেন। তেমনি রাজনামাঙ্কিত আটটি পদে সখীদের কৌতুকের পদের সহিত রাজ নামবিহীন ঐ বিষয়ক চারটি পদের ভাব এমন কি স্থানে স্থানে ভাষাও একই প্রকার—সুতরাং এগুলিও কবির জীবনের এক রঙ্গকৌতুকময় অধ্যায়ে রচিত হইয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কবির মনের আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সব পদের রূপ, রস, বর্ণের ইন্দ্রধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। চারিদিকে যেন একটা সুখের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। চপলচঞ্চল গতিতে, তরলিত ভঙ্গীতে কবির পদগুলি নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। কল্পলোকের সমস্ত সৌন্দর্য যেন নায়িকার মধ্যে মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। গগনের চাঁদ চুরি করিয়া লইয়াছে অভিযোগে সখীরা নায়িকাকে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইতেছে; কিন্তু অন্য সখীরা

বলিতেছে, সে কি কথা, চাঁদে কলঙ্ক আছে, সে রাহুর কবলে পড়ে, আর আমাদের সখীর মুখে যে আকাশের চাঁদ আর পাতালের কমল একসঙ্গে বাস করিতেছে। সে নায়ককে বলে, রাহুর ভয়ে চাঁদ আমার নিকট সুধা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে, উহা যেন পান করিও না, আমার উপর চুরির দায় লাগিবে। নায়িকা সখীদের নিকট শিক্ষা পাইতেছে কি করিয়া —

কুন্দভমর সঙ্গম সন্তাসন
নয়নে জগাওব অনঙ্গে।
আসা দএ অনুরাগ বঢ়াওব
ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে॥

এ যুগের লেখা বসন্ত-উৎসবের গানগুলিতে একদিকে যেমন নবপল্লব, শ্বেতপদ্ম ও অশোকপুষ্প দিয়া বসন্তকে বরণ করিবার কথা আছে (১৪০ পদ), অন্যদিকে নায়িকার মনে আশা জাগিতেছে যে, তাহার দয়িত বুঝি ফিরিয়া আসিবে (১৪২); যে নায়িকার মনে সেরূপ আশা নাই সে কর্মফলের দোহাই দিতেছে (১৪৩); আবার কোন নায়িকা গোপনে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া সখীদের সুচতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু শিবসিংহের রাজ্যকালের অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে রুদ্রসিংহনামাঙ্কিত পদে দেখা যায় যে, বসন্তের বিজয়-অভিযানের অন্তরালে যে সব বিরহিণীদের মর্মভেদী ক্রন্দন লুক্কায়িত আছে, তাহার প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—

বিরহি বিপদ লাগি
কেসু উপজল আগি। (২১৮ পদ)

কিংশুক ফুলে চারিদিক লালে লাল হইয়া গিয়াছে, যেন বিরহীদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাজনামহীন বসন্তের পদ তিনটি রাধামাধবের বনবিহার লইয়া লেখা (৪৭৩-৭৭)।

অভিসার ও বিরহ লইয়া যে সব পদ কবি শিবসিংহের যুগে লিখিয়াছিলেন, তাহার সুরের সঙ্গে পরবর্তী কালের ঐ সব বিষয় লইয়া লিখিত পদের পার্থক্য একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ৮৯ পদে নায়িকা করিবর ও রাজহংসকে গতিচ্ছন্দে পরাজিত করিয়া সঙ্কেতগৃহে যাইতেছে; তাহার অন্তরের ভাব-সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না, কেবল তাহার বিভিন্ন অঙ্গের সহিত কমল, চকোর, সফরী, গৃধিনী, বেল, তাল, সিংহ প্রভৃতির উপমা দিতেছেন। অভিসারিকাকে কি ভাবে ও কি সাজে অভিসারে যাইতে হইবে তাহারই সরস বর্ণনা পাওয়া যায় ৯০ হইতে ৯৪ পদে। ৯৫ সংখ্যক পদে নায়িকা প্রথমে সাহস করিয়া বলিতেছে যে, কুলের শঙ্কায় ও গুরুজনের ভয়ে সে প্রিয়তমকে যে কথা দিয়াছে তাহা ভঙ্গ করিবে না; কিন্তু তাহার পরই সে কেমন করিয়া সুকৌশলে নিজেকে সজ্জিত করিয়া শুক্লাভিসার করিবে তাহার বর্ণনা দিতেছে। ৯৭ ও ৯৮ সংখ্যক পদেও ঐ বেশভূষা ও দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা খুব সরসভাবে করা হইয়াছে—যেমন অভিসারের পথে যেন একটি কথাও বলিও না, কেননা তোমার বচন হইতেছে মধুমাখা, যেই কথা বলিবে অমনি গন্ধে গন্ধে ভ্রমর আসিয়া তোমার অধরমধু পান করিবে। বর্ষাভিসারের ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ সংখ্যক পদ কবিত্ব-হিসাবে অতুলনীয়। বিশেষ করিয়া ১০৬ সংখ্যক পদের শব্দঝঙ্কার, ভাব-গাম্ভীর্য ও নায়িকার আকুল প্রার্থনা—"এমন প্রেম কাহারও যেন না হয়" মর্ম স্পর্শ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে কবি অর্জুন-রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া অনুরূপ বিষয়ে যে পদটি লিখিয়াছিলেন—(২০৯ পদ) তাহার আন্তরিকতা যেন আরও বেশী। সখী অভিসারিকাকে বলিতেছে—

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুঅঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুন তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর॥

শুধু যে পথ বিঘ্নসঙ্কুল তাহা নহে, মাঝে আবার দুস্তর নদী, তাহা কেমন করিয়া পার হইবে? সখি, তোমার "আরতি ন করিঅ ঝাপ"—তোমার যে প্রেম কত গভীর তাহা লুকাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার দেহবহ্নি-রূপে পঞ্চশর আছে, তাই তোমার ভয় করে না, আমার কিন্তু হৃদয় কাঁপিতেছে। ইহার মধ্যে—

সুন্দরি কওন পুরুসগুন জে তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার।

কথায় যেটুকু চাপল্য আছে তাহা রাজনাম-বিহীন ৩৩১ পদে অন্তর্হিত হইয়াছে—সেখানে সখী বিস্মিত হইয়া কেবল বলিতেছে—

দুত্তর জঊন নরি সে আইলি বাহু তরি
এতবাএ তোহার সিনেহ।

এরূপ যে দুস্তর যমুনা নদী তাহা কেবলমাত্র বাহুতে ভর দিয়া সাঁতরাইয়া আসিলে—এত গভীর তোমার প্রেম। ৩৩০ পদেও কোনও রাজার নাম নাই; তাহাতে দেখি এমনি এক দুর্যোগের রাত্রে বনমালী চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছেন, গোপী ইহার মধ্যে কেমন করিয়া অভিসারে আসিবে? কবি তাহাকে বলিতেছেন "তোমার চেয়ে সে যে বেশী চতুরা"। এখানে বাহিরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সহিত অন্তরের দ্বন্দ্ব যেমন স্বল্প কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি ভণিতার মধ্যে রাধাবনমালীর প্রতি কবির একটি মমত্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর রাজনামবিহীন ৩৩২ সংখ্যক পদটির মধ্যে ভাবের গাঢ়তার ও অনুরাগের তীব্রতার যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তুলনা রাজসভার আবহাওয়ায় লিখিত একটি পদেও পাওয়া যায় না। এখানে রাধিকা মদনজ্বালায় নহে, মাধবের দৈহিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে নহে, কেবল "তুঅ গুণ মনে গুনি" প্রবল বর্ষণের মধ্যে, মহাভয় ভীমা রজনীতে অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে রমণী দেওয়ালে সাপের ছবি দেখিলেও ভীষণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, সে সাপের মাথার মণি হাত দিয়া লুকাইয়া সস্মিত বদনে তোমার নিকট আসিল (সাপের মাথায় মণি জ্বলে, সেই আলোতে পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে "করে ঝপইত ফনিমনি")। সে—

নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিথম নরি
আঁগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী॥

ইহাতে কবি বিস্মিত হন নাই, কেননা কাম ও প্রেম যখন একমত হইয়া যায় তখন কি না করাইতে পারে—

কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে॥

রাজসভায় বসিয়া কবি শুধু মদনের ও মদন সখার প্রতাপের কাহিনী গাহিতেছিলেন, পরিণত বয়সে প্রেমের চিত্র আঁকিতেছেন। কাম ও প্রেমের পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বেও যে রসিকজনের নিকট বিদিত ছিল তাহার প্রমাণও এই পদে পাওয়া যায়।

শিবসিংহ ও তৎপরবর্তী কালের বিরহের পদগুলির মধ্যেও কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। শিবসিংহের সময়ে লিখিত ৪৮টি বিরহের পদ, অন্য রাজা ও রাজপুরুষের নামাঙ্কিত ৬টি, রাজনামবিহীন পদের মধ্যে নেপালে ও মিথিলায় ১০২টি (৪৬১—৫৬৩ পদ) ও বাংলাদেশে প্রচলিত ৩৯টি (৭১৩—৭৫১), সর্বসাকল্যে ১৯৫টি বিদ্যাপতির রচিত বিরহপদ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতি কেবল সুখের কবি, দুঃখের গান তিনি বড় একটা গাহিতেন না। একথা যে ঠিক নহে তাহা এই সংখ্যার পর্যাপ্ততা হইতে দেখা যাইবে।

শিবসিংহের সময়ের বিরহের পদগুলির অধিকাংশই হয় চিরাচরিত রীতি-অনুযায়ী

(**conventional**) লেখা, না হয় ভাসা ভাসা রকমের। সুখ ও সৌন্দর্যের মধ্যে কবি যেন দুঃখের সুরটি ধরিতে পারেন নাই। ১৭৯ ও ১৮১ সংখ্যক পদে কোকিলের কলরবে কান বন্ধ করা, কুসুমিত কানন দেখিয়া নয়ন মুদিয়া থাকা, বিরহে ক্ষীণতনু হওয়া, চন্দনে অগ্নির জ্বালা অনুভব করা, কখনো সন্তাপ, কখনো শীত বোধ করা প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত বিরহলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ১৮০ সংখ্যক পদে কবি হেঁয়ালি করিয়া বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন—যথা, বিরহ-কাতর হইয়া নায়িকা শরতের শশীকে মুখরুচি, হরিণকে লোচনলীলা, চমরীকে কেশপাশ, দাড়িম্বকে দন্তশোভা ও সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিল। রাজনামবিহীন ৫৫৪ ও ৫৫৬ সংখ্যক পদের হেঁয়ালিও এই সময়ের রচনা মনে হয়। শিবসিংহের নামযুক্ত ১৭০ সংখ্যক পদে বিরহিণী নায়িকার একটি হৃদয়গ্রাহী শব্দচিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন। যথা—

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে গিলি উগিলত মোতি হার॥

কিন্তু ইহার মধ্যে উপমার বৈচিত্র্য ও শব্দের ঝঙ্কার যেন ভাবের গভীরতাকে ফুটিতে দেয় নাই। কেবলমাত্র বাংলাদেশে পাওয়া যায় ১৭৬ সংখ্যক পদটি—উহার চিত্র বেশ ভাবঘন—

বামকরে কপোল লুলিত কেস-ভার।
কর-নখে লিখ মহি আঁখি জলধার॥

দুঃখের দিনে অর্জুন রায়ের আশ্রয়ে বসিয়া কবি যে বিরহের গানটি (পদসংখ্যা ২১০) লিখিয়াছিলেন তাহাতে শব্দ অল্প কিন্তু, ভাব গভীর। চরম দুঃখের সময় কাব্যের স্রোত যে নিরুদ্ধ হইয়া যায় তাহা কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছেন—

সহজ সিতল ছল চন্দ
সবতহ সে ভেল মন্দ।
বিরহ সহাইঅ নারি
জিবৈককে ন হনিঅ মাবি।

যে চাঁদ ছিল সহজ শীতল সে এখন সকল রকমেই মন্দ হইল। নারীকে প্রাণে মারিত যদি, তো অনেক বেশী ভাল ছিল, এ যে মরণের অধিক বিরহযন্ত্রণা সহ্য করাইতেছে।

শিবসিংহের পৌত্রপর্যায়ভুক্ত রাঘবসিংহের নামাঙ্কিত ২০৬ সংখ্যক পদটি কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা। তাহাতে দেখি বসন্ত, মলয়ানিল, চন্দ্র, কোকিল প্রভৃতি বিরহ-উদ্দীপক বাহিরের জিনিষের কোন অপেক্ষা নাই, শুধু রাধিকার মুখের হাসিটি শুকাইয়া গিয়াছে—

জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি
অহোনিস রহইছি জাগি।

তাহার নয়নের নিদ্রা কে হরণ করিয়া লইয়াছে, ডাঙ্গায় পড়িয়া মাছের অবস্থার মতন তাহার দশা হইয়াছে। আর সে বিরহে কি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে ?

"অহনিস জপ তুঅ নামে"।

রাজনামবিহীন ৫৩৭ পদেও এই নামজপের কথা আছে—"অনুখন জপএ তোহরি পএ নাম"; ৫৪৩ পদেও ইহার প্রতিধ্বনি—

সরস মৃণাল কই-এ জপমালী।
অহনিস জপ হরিনাম তোহারী॥

৫৪৮ পদে পাওয়া যায় যে এই বিরহে যখন প্রাণসংশয় হইয়াছে, যখন নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তখন দেখি তাহার চেতনা ফিরাইবার জন্য—

কেহ বোল আএল হরী।
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী॥

৫২৯ পদে নায়িকা দূতী দ্বারা খবর পাঠাইতেছে—

নাম লইতে পেঅ তোর।
সর গদ গদ করু মোর॥

অর্জুননামাঙ্কিত পূর্বোক্ত ২১০ সংখ্যক পদের ভাষার সহিত রাজনামবিহীন ৫৬৩ পদের ভাষার ও ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মতন। দূতী যাইয়া নায়ককে বলিতেছে—

নয়ন তেজয় জলধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনী করয় অনন্দা॥

তুমি তো দূরে চলিয়া আসিয়াছ, তাই বলিয়া কি প্রেমের কথা ভুলিয়া যাইবে? লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কি চাঁদ কুমুদিনীকে আনন্দ দান করে না? "দুরহুক দুর গেলে দো গুণপিরীতি"। নেপাল-পুঁথি হইতে গৃহীত ৫২৬ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা দুঃখের আতিশয্যে বলিতেছেন—

জলউ জলধি জল মন্দা।
যহা বসে দারুণ চন্দা॥

গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত ৫৩৩ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা হৃদয়ভেদী ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন—আমার মোহন কুব্জার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিল, আমার প্রতি স্নেহ ভুলিয়া গেল—

কতদিন তাকব বাট।
হে সখি, শূন ভেল জমুনা ঘাট।

তিনি না হয় মধুপুরেই থাকুন, শুধু একটিবার মাত্র আসিয়া দর্শন দিন—

ওতহু রহথু গয় ফেরি।
হে সখি, দরশন দেথু একবেরি।

গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত আর একটি পদে (৫৪০ পদ) সখীরা উদ্ধবকে বলিতেছেন—

জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নহি জিউতে রে
বধ লাগত কাহে॥

এইকথা শুনিয়া বিদ্যাপতি তাঁহার তনু ও মন দিয়া বলিতেছেন-না, না, রাধার প্রাণহানি হইতে পারে না, আজই হরি গোকুলে আসিবেন—

ভনই বিদ্যাপতি তন মন রে
শুনু গুনমতি নারী।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী।

এখানে বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের পদানুবর্তী কবিদের মতন সখী বা দূতীর অংশ গ্রহণ না করিলেও, শ্রীরাধার বিরহব্যথায় কাতর হইয়া বলিতেছেন আজই হরি গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন। পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু হইতে গৃহীত ৭৩৩ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, কবি গোকুলমাণিকের মথুরাপুরে যাওয়া ব্যাপারটাই বিশ্বাস করেন না—শ্রীরাধার বিরহগাথার উত্তরে কবি বলিতেছেন "কৌতুকে ছাপি রঁহি বহু কাঁথ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে গোকুলে প্রত্যাবর্তনের কথা না থাকিলেও বিদ্যাপতি বিশ্বাস করেন না যে, তাঁহার কৃষ্ণ গোকুল ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নেপালের পুঁথিতে প্রাপ্ত বিরহের একটি পদে (৫৪২ পদ) দূতীর দ্বারা মাধবকে শুনাইয়াছেন—

নদি বহ নয়নক নীর।
পড়লি রহএ তহি তীর॥
সব খন ভরম গেঞান।
আন পুছিঅ, কহ আন॥

এই কথা শুনিয়া হরি পূর্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন –

বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত সুনি সারঙ্গ পানি॥

হরখি চলল হরি গেহ।
সুমরিএ পুরুব সিনেহ ॥

মাধবের গেহ যে গোকুলেই, মথুরা বা দ্বারকায় নহে, পরিণত বয়সে বিদ্যাপতি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বসন্তবর্ণন, অভিসার ও বিরহের শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদগুলির সহিত পরবর্তী কালে লিখিত বিদ্যাপতির পদসমূহ তুলনামূলক রূপে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, কবি প্রথম জীবনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গাররসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলারস গান করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মৈথিল পণ্ডিতেরা এই সহজ সত্যটি মানিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন; তাঁহার হরগৌরী গীতই মিথিলার শিব-মন্দিরে গীত হয়; আর অন্যান্য পদে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গাহিয়া পরস্পরের মনোরঞ্জন করে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর উমেশ মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"মুঝে তো য়হী প্রতীত হোতা হ্যায় কি কবি কেবল শৃঙ্গারিক থা ঔর উস কা জীবন ভী প্রায়ঃ ঐসে হী লোগোঁ কে সাথ রাজসভাওঁ মে ব্যতীত হুআ। য়হ পূর্বমে ভী কহা গয়া হৈ কি কবি রাধা ঔর কৃষ্ণকে সচ্চে স্বরূপ সে অপরিচিত নহীঁ থা; কিন্তু সচ্চা প্রেম (জিসে হম রাধাকৃষ্ণ কী ভক্তি কহতে হৈ) কবি নে অপনী ইন কবিতাওঁ মে কহী নহী দিখায়া। প্রায়ঃ উস কা উদ্দেশ্য ভী য়হ নহী থা। উন দিনোঁ মিথিলা মে ভক্তি কী বিশেষ চর্চ্চা ভী নহী থী জৈসা কি চৈতন্যদেব কে সময় বংগাল মে থী।" (বিদ্যাপতি ঠাকুর, পৃঃ ৮৯—৯০)।

কালানুযায়ী বিদ্যাপতির পদ না সাজাইবার দোষে ডক্টর উমেশ মিশ্রের ন্যায় পণ্ডিতপ্রবরও বিদ্যাপতির চিত্তের ক্রমবিকাশের ধারাটি ধরিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি শিবসিংহের রাজসভার আবহাওয়ায় সত্যই শৃঙ্গাররসের কবি ছিলেন। ঐ সময়ের লেখা রাধাকৃষ্ণ নামযুক্ত পদও প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গাররসের কবিতা। কিন্তু অন্ততঃ দশ বৎসর কাল (লিখনাবলীর রচনা ২৯৯ ল স হইতে ভাগবতের লিপিকাল ৩০৯ ল স) রাজ-বনৌলিতে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ও বিপদের মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময় তাঁহার মনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আসিয়াছিল যাহার ফলে তাঁহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রূপান্তরটিই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ডক্টর মিশ্র ও শিবনন্দন ঠাকুর (মহাকবি বিদ্যাপতি, পৃঃ ১৫৯-১৮১) বলেন যে, বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা সকলে শৈব ছিলেন এবং সমসাময়িকেরাও বৈষ্ণবধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বরের ভ্রাতা গণেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ দত্ত 'গোবিন্দমানসোল্লাস' রচনা করিয়াছেন এবং তাহার মঙ্গলাচরণে নিজেকে 'হরিকিঙ্কর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা বর্ধমান তাঁহার 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

সার্ধং রাধিকয়া বনেষু বিহরন্তস্যাশ্চ কপোলস্থলে
ঘর্মাম্ভোবিসরং প্রসারিণমপাকর্তুং করেণ স্পৃশন্।
তত্র প্রথিতসাত্ত্বিকাম্বুমিলনাদহো জায়মানে জবাদ্-
অব্যাদ্বো বিফলপ্রয়াসবিকলো গোপালরূপো হরিঃ ॥

সেই গোপালরূপ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন যিনি বনে রাধাসহ ভ্রমণ করিবার সময় শ্রীরাধার কপোলস্থলে ঘর্ম দেখিয়া তাহা মুছিবার জন্য করস্পর্শ করিলে শ্রীরাধার সাত্ত্বিকভাবজাত

স্বেদ হ্রাস না পাইয়া আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেইজন্য যে হরি বিফলপ্রয়াসবিকল হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবিদেব রাধাকৃষ্ণ-পদ রচনার সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিলেও বিদ্যা-পতির শেষবয়সের পোষ্টা ভৈরবসিংহের আদেশে যে 'দণ্ড-বিবেক' লেখা হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য না মানিয়া পারা যায় না।

তাহা ছাড়া আমাদিগকে বাহিরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেই বা হইবে কেন? বিদ্যাপতির ৭৬৩-৭৬৫ সংখ্যক প্রার্থনার পদ কয়টিই কি তাঁহার শেষ জীবনের অনুতাপ ও বৈষ্ণবীয় ভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নহে? যৌবনকালে তিনি শৃঙ্গাররসে নিমগ্ন ছিলেন ও সেই বিষয়েই পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"যাবত জনম হম তুয় পদ ন সেবল
যুবতি মতি মঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥" (৭৬৪)

"নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥" (৭৬৩)

কিন্তু শেষ বয়সে একান্ত আত্মসমর্পণের ভাব লইয়া কবি বলিতেছেন—

"মাধব হম পরিণাম নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥" (৭৬৩)

"সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে।" (৭৬৪)
"মাধব বহুত মিনতি কর তোয়
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥" (৭৬৫)

এই পদ তিনটির আন্তরিকতায় কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন কি? অবশ্য মাধবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিবের নিকটও প্রার্থনা জানাইয়াছেন (৭৬৯ ও ৭৭০ পদ); কেননা হরি ও হরের মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্য দেখেন নাই। ৭৬৭ পদে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥"

আর বার্ধক্যের অসহায়তার মধ্যে গাহিয়াছেন—
হরিহর পয় পঙ্কজ সেবহ তে ন রহ অবসাদা॥
(৬০৭ পদ)।

মোর সব কাজে

শ্রীনচিকেতা

ক্লেদাক্ত এ সংসারের পঙ্কিলতা মাঝে—
তোমার শুচিতা যেন রাজে।
জ্বালায়ে রাখিও আলো মহাজ্যোতির্ময়,
ছায় যদি শোক মোহ ভয়।

প্রত্যহের ছোট বড় মোর সব কাজে—
হে সুন্দর, তোমার বীণাটি যেন বাজে।
জীবনের যাত্রাপথে তোমার কল্যাণ হাতখানি—
বর্ষে যেন সঞ্জীবনী বাণী।

ঊর্ধ্বে যেন জেগে থাকে শিব-সত্য সুন্দরের
বিজয় পতাকা—
পূর্ণতার রামধনু আঁকা।

পরলোক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

পরলোক সেই – যেখানেতে লোক
পরের লাগিয়া বাঁচে,
পরের সেবায় সব খোয়াইয়া
পরমানন্দে নাচে।
পরকল্যাণে পরমার্থকে খোঁজে —
'জীব আর জগদীশ এক' ইহা বোঝে।
পরের লাগিয়া হেথা মরে যারা—
তারাও সেখানে রাজে।

২

অজ্ঞাতে নীড়ে কোকিলেরে পালে
এই যে ধরার কাক,
সেখানে তারাও প্রবেশ লভেছে
প্রাতে শোনা যায় ডাক।
প্রবাল কীটের পুণ্য কি ? কেবা জানে ?
তাহারা দিব্য রহিয়াছে সেই স্থানে,
সে পরলোকের হেমদ্যুতির
কান্তি অমরা যাচে।

৩

পরমেশ্বর পর কি রে মন ?
পরমাত্মা কি পর ?
আত্মার যত আত্মীয়দের,
পরলোক হল ঘর।
ত্যাগেই সেখানে লোকে ভোগ করে
সব,
চলে অমৃতের অনন্ত উৎসব
সূর্য চন্দ্র গড়া হয় সেই
ত্যাগ-যজ্ঞের আঁচে।

৪

সাজ বদলাতে বেশী দেরী নাই
জাগো জাগো অনুরাগী।
পরের লাগিয়া কিছু কর—বহু
করেছ নিজের লাগি।
এখনো কি তব কাটে নাই মোহভার ?
পরই তোমার সব চেয়ে আপনার
প্রতি অণু দিতে আলিঙ্গন যে
দাঁড়ায়ে রয়েছে কাছে।

গীতায় মায়াবাদ

অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী মায়াবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা এই প্রবন্ধে করব। দার্শনিক-প্রবর শঙ্করাচার্য অবশ্য তাঁর সুবিখ্যাত গীতা-ভাষ্যে স্বীয় মতানুসারী মায়াবাদ যে গীতারও প্রতিপাদ্য বিষয়, তা' প্রমাণ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শঙ্কর-প্রপঞ্চিত মায়াবাদ গীতার কোনো স্থলেই প্রপঞ্চিত ও প্রমাণিত হয়নি।

গীতায় সর্বসমেত পাচটি শ্লোকে 'মায়া' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (৪।৬)

অর্থাৎ, আমি জন্ম ও বিকাররহিত আত্মা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে স্বীয় মায়াদ্বারা দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই।

শঙ্কর এই শ্লোকটির স্বীয় মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করে বলছেন যে—"প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং, যস্যা বশে সর্বং জগৎ বর্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য, সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া, ন পরমার্থতো লোকবৎ।"

অর্থাৎ, যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশে সমগ্র জগৎ বিদ্যমান এবং যে প্রকৃতির মোহে জীব স্বীয় আত্মাকে জানতে অক্ষম হয়, সেই প্রকৃতিকেই বশ করে আমি যেন দেহধারণ করে যেন জাত হই, কিন্তু এগুলি কিছুই পারমার্থিক দিক্ থেকে সত্য ঘটনা নয়।

এরূপে শঙ্করের মতে এস্থলে 'মায়া'-শব্দের অর্থ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং দু'বার 'ইব'-শব্দ যোগ করে তিনি এই প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন যে, ভগবানের দেহধারণ ও পৃথিবীতে অবতাররূপে জন্ম বা অবতরণ, কোনটিই প্রকৃত সত্য ঘটনা নয়—মিথ্যা মায়াই কেবলমাত্র।

এর পরের সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকেও শঙ্কর একই ভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" (৪।৭)

এস্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা এরূপ—"তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া।" অর্থাৎ ভগবানের অবতাররূপ-ধারণ পারমার্থিক সত্য বস্তু নয়, মায়াজনিত মিথ্যা ভ্রান্তিই মাত্র।

পরবর্তী দুটি শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্পষ্ট বলছেন :

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥'
(৪।৮-৯)

অর্থাৎ, সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জাত

হই। যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যথার্থভাবে জানেন, তিনি দেহান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন।

এস্থলে শঙ্কর অষ্টম শ্লোকে 'সম্ভবামি'-শব্দটির কোনো রূপ ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'মায়ারূপ'-শব্দ যোগ করে তিনি বল্ছেন "তদ্ জন্ম মায়ারূপং কর্ম চ।" অর্থাৎ, ভগবানের জন্ম ও কর্ম মায়ারূপ, সত্যস্বরূপ নয়।

এরূপে শঙ্কর গীতার অবতারবাদমূলক এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে দু'বার 'ইব', একবার 'মায়য়া' এবং একবার 'মায়ারূপ'-শব্দ যোগ করে অতি কষ্টে স্বীয় মায়াবাদ রক্ষার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অধ্যায়ের ৫-৯ শ্লোকে যে অবতারবাদ সুস্পষ্ট ভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে, তা যে কেবল অদ্বৈতবেদান্ত-মতানুযায়ী ব্যাবহারিক দিক্ থেকেই সত্য, পারমার্থিক দিক্ থেকে মিথ্যামাত্র—তার কোন প্রমাণই গীতায় নেই।

(২) গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকেও দু'বার 'মায়া'-শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(৭।১৪)

অর্থাৎ, আমার এই অলৌকিকী গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। যাঁরা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁরাই কেবল এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন।

এস্থলে শঙ্কর 'মায়া'-শব্দের অর্থ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলে গ্রহণ করেছেন, এবং এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(৩) এই একই অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকেও 'মায়া'-শব্দ দৃষ্ট হয়ঃ

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

(৭।১৫)

অর্থাৎ, পাপকারী মূঢ় নরাধমগণ মায়ার প্রভাবে বিবেকজ্ঞানশূন্য ও অসুরস্বভাবাপন্ন হয়ে আমার শরণাপন্ন হয় না।

এস্থলে শঙ্কর 'মায়া'-শব্দের কোনোরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।

(৪) এই একই অধ্যায়ে পুনরায় ২৫ শ্লোকেও 'মায়া'-শব্দ সংযোজিত আছেঃ

"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

(৭।২৫)

অর্থাৎ, যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলে আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। সেজন্য মূঢ় জগৎ জন্ম ও বিকাররহিত আমাকে জানে না।

এস্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা এরূপ—"যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া, অথবা ভগবতশ্চিত্তসমাধানং যোগঃ তৎকৃতা মায়া যোগমায়া।"

প্রথম ব্যাখ্যানুসারে, শঙ্করের মতে 'যোগমায়া'-শব্দের অর্থ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; এস্থলে 'যোগ' ও 'মায়া' এই দু'টি শব্দই সমার্থক ও প্রকৃতি-বাচক। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে ঈশ্বরানুধ্যান 'যোগ' কারণস্বরূপ, এবং 'মায়া' তারই কার্যমাত্র। 'মায়া'-শব্দের এস্থলে কি অর্থ, তা' অবশ্য শঙ্কর কিছুই বলেন নি। এই একই অধ্যায়ের পূর্ব শ্লোকেও (৭।১৪), শঙ্কর 'মায়া'-শব্দকে 'প্রকৃতি' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সেদিক্ থেকে তাঁর প্রথম ব্যাখ্যা সুসমঞ্জস।

(৫) গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১ শ্লোকে শেষবারের মত 'মায়া'-শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

(১৮।৬১)

অর্থাৎ, হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতকে যন্ত্রচালিত

পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করে সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন।

এস্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ— "ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানীব যন্ত্রাণ্যারূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতি ইবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যো, যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ন্ তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ।" অর্থাৎ, যেরূপ এক জন মায়াবী বা যাদুকর মায়া বা যাদুশক্তি-সাহায্যে যন্ত্রচালিত কাষ্ঠপুত্তলিকাগণকে পরিচালিত করেন, সেরূপ ঈশ্বরও সর্বভূতকে যেন যন্ত্রচালিত করে পরিচালিত করেন।

এস্থলে 'ইব'-শব্দ যোগ করে এবং 'মায়া'-শব্দের 'ছদ্ম' অর্থাৎ ছলনা বা প্রতারণা, এই অর্থ গ্রহণ করে শঙ্কর পুনরায় তাঁর নিজস্ব মায়াবাদ প্রপঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। নিপুণ মায়াবী বা যাদুকর তাঁর মায়া বা যাদুশক্তি-প্রভাবে দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে প্রতারিত বা ভ্রান্তিগ্রস্ত করেন, এবং তার ফলে তাঁদের নিকট মিথ্যা বস্তুও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। যেমন, কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রকৃতপক্ষে চলচ্ছক্তিবিহীনা; কিন্তু মায়াবীর মায়াপ্রভাবে দর্শকবৃন্দ তাকে পরিভ্রমণশীলা বা নৃত্যশীলারূপেই দর্শন করেন। একই ভাবে মহামায়াবী ব্রহ্মও মায়াশক্তি-সাহায্যে মিথ্যা জগদ্-ভ্রমের সৃষ্টি করেন, এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জীব সেই জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করে ভ্রান্তিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু গীতার এই শ্লোকেও প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত মায়াবাদের কোনই প্রমাণ নেই। অযৌক্তিকভাবে একটি 'ইব'-শব্দ যোগ করে এবং 'মায়া'-শব্দের অন্বয়-বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেই শঙ্কর যা স্বীয়মতানুসারী ব্যাখ্যা-প্রদানে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন, তা' কোনোক্রমেই গীতার প্রকৃত অর্থ বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদ্যোপান্ত কোনোস্থলেই অদ্বৈতবেদান্ত-প্রপঞ্চিত মায়াবাদের চিহ্নমাত্র নেই; উপরন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট জীবজগৎ যে সত্য বস্তু, তারই প্রমাণ প্রচুর। অবশ্য, এই সংসারকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র করে দেখ্‌লে, অথবা এই সংসারের ভোগে নিমজ্জিত হয়ে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হ'লে, এর সত্য রূপটি আমরা দেখ্‌তে পাই না তা' নিশ্চিত। কিন্তু অপরপক্ষে, সংসারকে ঈশ্বরস্বরূপরূপে উপলব্ধি করলে সে রূপটি যে মিথ্যা নয়, তা'-ও ত সমান নিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, গীতায় 'মায়া'-শব্দের অর্থ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি'—অদ্বৈত-অর্থে মিথ্যা 'প্রকৃতি' নয়, সাংখ্য-অর্থে ঈশ্বরনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র 'প্রকৃতি'ও নয়—কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্মত পরমেশ্বরের অচিৎ-শক্তিরূপা 'প্রকৃতি'। এই প্রকৃতিই তাঁর ব্যক্তরূপ; কিন্তু যে অজ্ঞ জন কেবল সংসারই প্রত্যক্ষ করে, তার কাছে তিনি থাকেন অব্যক্ত। এই শক্তি-সাহায্যেই তিনি করেন জগৎ-সৃষ্টি, এবং অবতাররূপ-ধারণ। এই মায়া বা প্রকৃতির ব্যূহ ভেদ করে শ্রীভগবানের অমৃতস্বরূপ দর্শন করা সাধারণ জনের পক্ষে দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই; কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদধন্য জ্ঞানী ও ভক্তের নিকট তা' অতি সুসাধ্য।

প্রকৃত পক্ষে, ভারতদর্শনসার চিরপূজ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপেক্ষা করে কোনোও দার্শনিক মতবাদই গ্রাহ্য হয় না বলে শঙ্করাচার্যকেও গীতা যে অদ্বৈতবেদান্তমত-পরিপোষক এই অসম্ভব সিদ্ধান্ত-প্রমাণে আপ্রাণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল। সেজন্য ভারতের, তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও নৈয়ায়িক হয়েও শঙ্করকে তাঁর গীতাভাষ্যে অনেক স্থলেই কষ্টকল্পনা ও অহেতুকী শব্দসংযোজনা, প্রসিদ্ধ শব্দের সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ প্রভৃতি নানারূপ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। গীতার মূল দার্শনিক ও নৈতিক প্রতিপাদ্য বিষয় যাই হোক্ না কেন, অদ্বৈতবেদান্ত-মতবাদের কোনো স্থান যে গীতায় নেই, তা' সুনিশ্চিত।* দার্শনিক দিক্ থেকে গীতার ঈশ্বর কোনোক্রমেই অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্ম নন; নৈতিক বা সাধনমার্গের দিক্ থেকেও অদ্বৈতবেদান্তের শুদ্ধ জ্ঞানমার্গ গীতার পন্থা নয়।

* লেখিকার এই সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। —উঃ সঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের জগন্মাতার আবেশ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

আমাদের দেশের আপামর সাধারণ লোকের ধারণা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শক্তিপূজার কোন স্থান নাই। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব অর্ধশতাব্দীর পূর্বেও প্রবল ছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম-সাহিত্যে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত' ও 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র স্থান খুব উচ্চে এবং এই পর্যন্ত ইহার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে সাহসী হন নাই। আমরা প্রধানতঃ এই দুইটি গ্রন্থ হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের জগন্মাতার ভাব ও আবেশের ঘটনা আলোচনা করিব। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কাহিনী শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন শ্রীবৃন্দাবনদাস। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীবাসের দৌহিত্র, অর্থাৎ তাঁহার সহোদরের কন্যা নারায়ণীর পুত্র। বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের পরম কৃপাপাত্রী। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' স্বয়ং বৃন্দাবনদাস তাঁহার মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—নবদ্বীপে প্রবল জনরব যে, শ্রীবাসের গৃহে প্রতিদিন হরিসংকীর্তন হয় সংবাদে পাঠানরাজ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের নিকট গিয়া বলেন—

অয়ে শ্রীনিবাস, কিছু মনে ভয় পাও ?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজ নাও।

তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন যদি ইহা সত্য হয় তবে "মুঞি গিয়া সর্বআগে নৌকায় চড়িমু।" শুধু তাই নয় রাজা হইতে সকল জীবজন্তু প্রাণীকে "সেইখানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।"

রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন নয়নে॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥
সর্বভূত-অন্তর্যামী প্রভু গোরাচাঁদ।
আজ্ঞা কৈলা নারায়ণি, কৃষ্ণ বলি কাঁদ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কাঁদে নাহিক সংবিত॥
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হইল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?

শ্রীবাস উত্তরে বলিলেন, 'স্বয়ং যম এলেও ভয় করি না তোমার নামের বলে। আর এখন তো স্বয়ং ভগবান তুমি সামনে আছ—কাকে ভয় করবো?' উক্ত গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে 'মহা মহা প্রকাশবর্ণন' আছে শ্রীবিশ্বম্ভর মহাভাবের আবেশে তাঁহার ভক্তপরিকরকে অমূল্য রত্ন কৃপা বিতরণ করিতেছেন—সে এক দিব্য দৃশ্য। সেই আবেশের পর তিনি আহার করিলেন, কিন্তু—

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিলা নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে নারায়ণি।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব।

এই নারায়ণী শ্রীগৌরাঙ্গের অশেষ কৃপা পাইয়াছেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥
(চৈ চ, আদি, ১৭পরিচ্ছেদ)

এই পুণ্যবতী নারায়ণীর সন্তান শ্রীমন্নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবনদাস। তাঁহার আসল নাম কি ছিল তাহা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। তাঁহার বৈরাগ্যাশ্রমের নাম—বৃন্দাবনদাস। কবিরাজ গোস্বামী নানাস্থানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসাবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহার 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত'গ্রন্থের বারংবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত' শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সর্বমান্য প্রামাণিক গ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এতটা ভূমিকা করা হইল। বিশেষতঃ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীবৃন্দাবনদাস বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের মাতৃভাব বা শ্রীজগজ্জননীর আবেশ বর্ণনা করিয়াছেন—'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উহার উল্লেখমাত্র আছে, তেমন বিস্তারিত বিবরণ নাই। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে পুনঃপুনঃ লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাস যাহা বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন—তাহা তিনি সংক্ষেপে সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র—

বাল্যলীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপ সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥

এখন দেখা যাক শ্রীগৌরাঙ্গের মাতৃভাব কোথায়, কোন স্থানে হইয়াছিল। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥

আবার আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনি হইলা॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন এস্থলে এখন তাহাই উদ্ধৃত করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পার্ষদবর্গকে লইয়া রুক্মিণীর বিবাহ-অভিনয় করিবেন। মহাপ্রভু "আজি নৃত্য করিবা অঙ্কের বিধানে।" অর্থাৎ নাটকাভিনয় করিবেন। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাচ সজ্জ কর গিয়া।"

শঙ্খ কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী সখী সুপ্রভাত॥
শ্রীবাস নারদ কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।

আজ্ঞামাত্র বুদ্ধিমন্ত খাঁ সব সাজসজ্জা লইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। মহানন্দে

নবদ্বীপে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে এই যাত্রাভিনয় হইবে। স্বয়ং শচীমাতা নিজপুত্রবধূ লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া এই অভিনয় দেখিতে চলিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু লক্ষ্মীর অর্থাৎ রুক্মিণীর ভূমিকায় নৃত্য করিবেন। এদিকে গৃহান্তরে আত্মহারা হইয়া রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইয়া বেশ করিলেন। বৈষ্ণবেরা দেখিয়া 'প্রেমে কান্দে হাসে।' গদাধর নৃত্য করিতেছেন—অভিনয় পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে—চারিদিকে আনন্দকোলাহল—'হরি হরি' ধ্বনি করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতেছেন—

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যশক্তি বেশধর॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাটে প্রেম-রসে ভাসে॥

চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি হইতে লাগিল কিন্তু—

কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অতি অলক্ষিত—বেশ মনোহর॥

বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিতেছেন—

বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই।

কেহ কেহ মনে করিলেন—

সিন্ধু হইতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুনাথ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী॥
কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥

স্বয়ং শচীমাতা—আইঠাকুরাণী তিনি ও তাঁহার নয়নের নিধি গৌরাঙ্গকে চিনিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিতেছেন—

কৃপা জলনিধি প্রভু হইল সভারে।
সবার জননীভাব জাগিল অন্তরে॥
পরলোক হইতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে 'নন্দন সব আপনা' না জানি॥

জগজ্জননী-ভাবে মহাপ্রভু আজ নাচিতেছেন—অদ্বৈতাদি কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু 'জগৎজননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।' অনুচরেরা গীত গাহিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রকৃতি-ভাবে নাচিয়া কখন কখন বলিতেছেন—"বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা?" তখন দর্শকেরা বুঝিলেন ইনি বিদর্ভরাজদুহিতা রুক্মিণী। দুই নয়নে মহাপ্রভুর প্রেমধারায় জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছে—ভাবাবেশে মুখে অট্ট অট্ট হাস, তখন "মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।" ভাববিহ্বল হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ঢুলিয়া ঢুলিয়া মত্তভাবে নৃত্য করিতেছেন, কখনও রাধাভাবে বলিতেছেন, "চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে" কখনও—

বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা-কোটী-যোগেশ্বরী॥

মহাপ্রভু আজ প্রেমসাগর-তরঙ্গে ভাসিতেছেন, দর্শকেরা দেখিয়া শুনিয়া অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছেন—

আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥

অবস্থা দেখিয়া নিত্যানন্দ ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণবেরা কাঁদিতেছেন—চারি দিকে "হুড়াহুড়ি হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।" মহাপ্রভু খট্টার উপরে মহালক্ষ্মী ভাবে উঠিলেন।

সম্মুখে রহিলা সভে যোড় হস্ত করি।
'মোর স্তব পড়' বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
'জননী আবেশ' বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপে সভে স্তুতি—পড়ে প্রভু শুনে॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সভে স্তুতি পড়েন—যাহার যেমন মতি॥

সেই স্তবের ভাব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন বৃন্দাবনদাস তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

"জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যক কে দিবেক সীমা ॥

* * *

সর্বাশ্রয়া তুমি জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়া রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্বজীব-পালয়িতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব-জীবের জীবন।
তোমারে স্মরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥

* * *

তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী, চরণের দিয়া ছায়া ॥

সকলেই এইভাবে স্তুতি করিতেছেন—প্রণত হইয়া বলিতেছেন—

সভে লইলাম মাতা তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন ॥

এইরূপে নরনারী সকলেই প্রেমানন্দে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া নয়নজলে প্লাবিত হইতেছেন—দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল।

এই মাতৃভাবের লীলা বুঝি ফুরাইল—সকলের হৃদয়ে—

'কোটীপুত্র শোকে ও এত দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সর্ববৈষ্ণবহৃদয়ে ॥"

কিন্তু মহাপ্রভু তখনও জগজ্জননীর ভাবরসে গর্গর মাতোয়ারা।

চৌদিগে দেখিয়া সব—বৈষ্ণবক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
মাতাপুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইরূপে সভারে দিলেন পুত্রভাব ॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হইয়া ॥

আজ মহাপ্রভু জগজ্জননী-ভাবে আবিষ্ট—গীতার সেই বাণী সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইল —

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥

'আমিই জগতের পিতা, পাতা, বিধাতা এবং পিতামহ।'

আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তনপান।
কোটী কোটী জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান ॥

স্তনপানে সকলের মনঃক্লেশ দূর হইল। প্রভাতকিরণে শ্রীগৌরাঙ্গের জগজ্জননীভাবের অবসান ঘটিল—তাঁহার পার্ষদ বৈষ্ণব ভক্তনারীরা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই—স্মৃতিটুকু তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন, চন্দশেখর আচার্যের যে ঘরে এই মাতৃভাব—এই জগজ্জনীর আবেশ হইয়াছিল সেখানে—

সপ্তদিন শ্রীআচার্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥
চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহাকুতুহলে ॥

কিন্তু নদীয়াবাসী জনসাধারণের মধ্যে ইহা গোপন রাখা হইয়াছিল।

লোকে বলে কি কারণে আচার্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে, ফুটিয়া যেন পড়ে ?
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥

সন্ন্যাস লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাক্ত শৈব সকলের সঙ্গে মিশিয়াছেন। জলেশ্বরে শিব শিব বলিয়া তিনি নৃত্য করিয়াছেন। বিরজা-ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া একাকী একরাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

যে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সভা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥

সঙ্গীরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না; সকলে নানা দেবালয়ে তাঁহাকে সন্ধান

করিয়া ব্যাকুলভাবে বেড়াইতেছেন। শেষে নিত্যানন্দ প্রভু অপর সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "স্থির হও, ঠাকুর নিভৃতে দেবমন্দির দর্শন করিবেন। আজ আমরা এই খানে ভিক্ষা করিয়া রাত্রি কাটাইব। কাল প্রভুকে এইখানেই পাইব।" শ্রীভুবনেশ্বরে মহাদেবের সম্মুখে 'শিব' 'শিব' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মহাপ্রভু আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিতেছেন—

আপনে ভুবনেশ্বরে গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজদোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

অন্যত্র যে সব বৈষ্ণবেরা শিবকে অবহেলা বা অমান্য করেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

নিজপ্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হইয়া॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেক শঙ্করপ্রিয় সব ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এই সব লীলার বর্ণনা নাই; কোথাও কিঞ্চিৎ নামমাত্র উল্লেখ আছে। কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার ৪র্থ পরিচ্ছদে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—

সহজ বিচিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত তাঁহার 'কড়চায়' মহাপ্রভুর জগজ্জননী ভাবের আবেশ—দ্বিতীয় প্রক্রমের ষোড়শ সর্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'কড়চা'কে অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত এই 'মাতৃভাবের' কথা নিম্নোদ্ধৃত বচনে বলিয়াছেন—

প্রেমভক্তিরসপূরিতকোটি-
মাতৃস্নেহপরিপূরিতোঽভবৎ।
তাং স্ত্রিয়ং প্রমুদিতাঃ পরিণেমুঃ
সংস্তবেন শ্রুতিভিঃ প্রতুষ্টুবুঃ॥
আজ্ঞয়া সকলদেবময়স্য
তস্য হৃষ্টমনসো দ্বিজমুখ্যাঃ॥
তৎক্ষণাৎ পুনরভূদ্ ভগবত্যাঃ
সর্বশক্তিময়তাং তু বহন্ত্যাঃ।
ভাব এব স্বজনা মুদমাপু-
স্তুষ্টুবুঃ স্তবকৃতৈঃ স্তববাক্যৈঃ॥
আসনে সমুপবিশ্য সুক্লিপ্তে
দেবতাপতিকৃতী পুনরাহ।
প্রাবিশন্নটনবীক্ষণকামা
হ্যত্রাগতাস্মি ভবতাং কুতুকেন।
দেহি দেবি তব পাদযুগাব্জে
প্রেমভক্তিমিতি তে পুনরূচুঃ॥

মুরারি গুপ্ত যে প্রত্যক্ষদর্শী তাহা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—

তং কোঽপি সমুবাচ মুরারিং।
দীনমেনমবলোকয় দেবি॥

স্তন্যপানের কথাও 'কড়চায়' বলিয়াছেন "স্তন্যমাশু বিদধে সুরবর্য্যান্"। যে স্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জগজ্জননীর আবেশ হইয়াছিল, সেই স্থানটি প্রচণ্ড দীপ্তিময়—ইহা অন্যান্য মানুষ দেখিতে পাইয়াছিল।

হস্তগৃহীতবরদণ্ড ইবাতিচণ্ড-
রশ্মেঃ শিখের নৃপতির্দদৃশে জনেন।

বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নানাভাবে অপূর্ব লীলা আস্বাদন করেন—কিন্তু তাঁহার এই

জগন্মাতার ভাবাবেশ লীলা বাদ যায় কেন? মহাপ্রভু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই - কখনও শিব-ভাবে, কখনও জগন্মাতার ভাবে, আবার কখনও শ্রীবৃন্দাবনের রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইতেন। স্বরূপদামোদর যথার্থ ই বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠবুদ্ধ্যা যে পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্।
তৈর্দ্দত্তং গৃহ্নীতে সোঽপি তদন্নং পাবনং মহৎ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তানাং ভেদবুদ্ধ্যা পতন্ত্যধঃ।
দুর্বৈরান্ শিক্ষয়ন্তান্ স ভক্তরূপঃ স্বয়ং হরিঃ॥

ভেদবুদ্ধিই অবনতির মূল—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ং হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভাব যখন ম্লান হইল—শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্বে চারিদিকে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব মানুষ ভুলিয়া গেল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার ভাবেরই প্রাধান্য দিয়া গেলেন—মহাশক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া "যত মত তত পথ" নির্দেশ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি—প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।" এই তত্ত্ব দেখাইবার জন্য নবদ্বীপে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ 'জগন্মাতা'-স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

বিপ্লবের প্রেরণা

জনাব রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

বর্তমান যুগ হইতেছে বিপ্লবের যুগ। এ যুগে 'বিপ্লব'-কথাটার সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও পার্থিব সুখ-সুবিধার দাবী নিবিড়-ভাবে জড়িত। আজকাল বিপ্লবী বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায় যাঁহারা সাধারণতঃ রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁহাদের অধি-কারবোধ জাগ্রত করেন। এই যুগের বিপ্লবী বীরগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ কল্পনা করিতে পারেন না যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ব্যতীত আর এক ধরনের বিপ্লবও আছে, যাহা পৃথিবীতে যুগান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছে। মানুষের অধিকার ও সুখ-সুবিধার মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য যে বিপ্লব হইয়াছে তাহা কখনই সম্ভব হইত না, যদি ধর্মের সংস্কারক ও সাধকগণ জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভূত না হইতেন। এই সব মহামানব সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। ইঁহাদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের আদর্শ মানুষের নৈতিক জ্ঞানকে পরিস্ফুট করিয়াছে। আর ইঁহারাই সার্থক ও নিষ্কলুষ বিপ্লবের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। রাজনৈতিক বিপ্লব জীবনের একটা

দিকে একটু আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা মানুষের অন্তরের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চিত্তকে মহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে এক একটা ধর্মবিপ্লব আসিয়াছে, আর মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধের সমস্ত ধারণাকে পরিবর্তন করিয়া নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মবিপ্লব একদিকে যেমন রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চার করিয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে আনিয়াছে মানুষের নৈতিক জীবনের অপূর্ব পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক ভাবে একেবারে নূতন মানুষ, নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রেরণা সাময়িক, ইহার ফলও অস্থায়ী। কিন্তু ধর্মবিপ্লবের প্রেরণা স্থায়ী, ইহা মানুষের সত্যকার কল্যাণসাধন করিয়াছে। পৃথিবীর যুগান্তকারী বিপ্লবগুলি ধর্মবিপ্লব দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। আজ যদি কোন ধর্মধ্বজী ব্যক্তি বিপ্লবের নামে শিহরিয়া উঠেন, তবে বুঝিব তিনি ধর্মের মূল প্রেরণা কি তাহা জানেন না। বিপ্লবকে ধর্ম ভয় করে না। কারণ ধর্মই যুগে যুগে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিপ্লবের নামে নীতিবিগর্হিত কার্যাবলীকে নৈতিক আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ধর্মের সহিত বিপ্লবের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা জানে না বলিয়া একদল লোক মনে করে যে বিপ্লব ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী। আজ অবস্থা এমন হইয়াছে যে, বিপ্লবীরা হইয়া পড়িয়াছেন ধর্মের শত্রু। আর ধর্মধ্বজীরা হইয়াছেন বিপ্লবের শত্রু। কেন এমন হইল? ধর্ম ও বিপ্লব-সম্বন্ধে মানুষের অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ধারণাই ইহার জন্য দায়ী। ধর্মপ্রচার, ধর্মপালন ও ধর্মশিক্ষা এইগুলিই জগতে সত্যকার বিপ্লব আনিয়াছে—এইগুলি না থাকিলে জগতে কোন বিপ্লবই সম্ভব হইত না।

বিপ্লবীরা কি চান? তাঁহারা চান বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমানাধিকারের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িতে। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে status quo তাঁহারা চাহেন না। ধর্মও পুরাতন ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িবার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে। তবে সমানাধিকার অপেক্ষা প্রেম, ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা ধর্মের নিকট সর্বোচ্চ। বিভিন্ন দেশের ধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মের কোন সাধকই প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন না। যে কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, দেশে ও সমাজে তাঁহারাই সর্বপ্রথম বিপ্লবের ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রচলিত সমাজকে চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহারাই নূতন সমাজ গঠন করিয়াছেন। আর তাঁহাদের যুগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজপুরুষগণ, ধর্মান্ধ সমাজপতিগণ, আর বিপথগামী জনসাধারণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়া লড়াই করিয়াছেন। কোন মহাপুরুষ বিনা বাধায় আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম—ইহাদের প্রবর্তকগণকে বিপ্লবী ব্যতীত আর কি বলিব? ইহারা প্রত্যেকেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া মানুষের জন্য উন্নততর সমাজব্যবস্থার আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। ইহাদের পরে যে সব ধর্মবিপ্লব হইয়াছে, সেইগুলিও সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গিবার জন্যই হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব, গুরু নানক, দাদু, কবীর ও পরবর্তী যুগে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই ছিলেন সত্যকার বিপ্লবী। তাঁহাদের সার্থক বিপ্লবের ফলেই দেশে ও সমাজে নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছে।

ধর্মবিপ্লব মানে ধর্মকে ধ্বংস করা নয়—উহার মূল উদ্দেশ্য ধর্মের সত্যকার রূপকে প্রকাশ করা। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস হইতে জাত আচার-বিচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের কবল

হইতে মানুষকে মুক্ত করাই হইল প্রত্যেক ধর্মবিপ্লবের সাধনা। ধর্মকে তাহার আদিম সরলতা ও শুদ্ধতার উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকগণ ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক বিপ্লবিগণ মনে করেন যে, ধর্মদ্রোহিতা না করিলে বিপ্লব হয় না। তাঁহাদের ধারণা যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রামই হইতেছে সত্যকারের বিপ্লব। আর এই ধরনের বিপ্লবই জনগণের কল্যাণসাধন করিবে। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। তাঁহাদের জানা উচিত যে, কতকগুলি অভাব-অভিযোগ ও কতকগুলি সাময়িক সুবিধালাভই যদি বিপ্লবের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার দ্বারা কেবল আড়ম্বর ও হৈ চৈ হইবে—একটি চাঞ্চল্যসৃষ্টি হইবে,—কিন্তু কোন স্থায়ী কাজ হইবে না। এই পথে সমাজের প্রকৃত চেতনা লাভ হয় না। সমাজব্যাধির গভীর ক্ষত নিরাময় হইবে না। বিপ্লব আরও গভীর বিষয়—মানুষের অবনত মনের উন্নতিসাধনই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। সেই বিপ্লব আনিতে পারেন মহামানবগণ।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীপ্রমুখ মহামানবকে আমাদের দেশের একদল লোক 'বিপ্লবী' বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ইঁহারা ভারতের সর্বস্তরে চিন্তাধারার মধ্যে যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন, কয় জন উৎকট উগ্রপন্থী বিপ্লবী তাহা পারিয়াছেন? প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্যবোধ-সম্পর্কে ইঁহারা যে চেতনা সঞ্চার করিয়াছেন তাহার জন্য ইঁহারা চিরকালই বিপ্লবী বলিয়াই সম্মানিত হইবেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিদেশী শাসনের প্রভাবে ভারতের সর্বস্তরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-দেশের অনুকরণ ও তজ্জাত ধর্মহীনতা, নীতি-হীনতা, মনুষ্যত্বহীনতা প্রভৃতি পাপ ভারতবর্ষকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাসাধক আবির্ভূত হইয়া দেশের মধ্যে এমন একটা নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ফলে নূতন যুগের সূর্যোদয় দেখাছিল। "যত মত তত পথ"—এই মহাবাণী প্রচার করিয়া তিনি একদিকে যেমন toleration বা পরমতসহিষ্ণুতার চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ "সবজীবে ভগবান আছেন" এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়া তিনি ধর্মের মূলনীতিকে আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিলেন। পাশ্চাত্ত্যের চাকচিক্যময় মেকী সভ্যতার সামনে তিনি ভারতের কৃত্রিমতা বর্জিত সরল অনাড়ম্বর জীবন-দর্শনের যে আদর্শ স্থাপন করিলেন, তাহা সত্যই দেশের অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দিল। তাঁহারই শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীময় ভারতের মর্মবাণী প্রচার করিয়া দেশের সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। এই ভাবে ইঁহারা ত বিপ্লবের পথেই দেশকে আগাইয়া দিলেন। মহাত্মা গান্ধী জীবনব্যাপী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সাম্যমৈত্রীর আদর্শকেই ত বাস্তব রূপ দিলেন। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লব, অথবা রুশ বিপ্লব যাহা আনিতে চাহিয়াছিল, এই সব মহাপুরুষগণ সত্য ও প্রেমের পথে তাহারই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কার্যকলাপের মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, নরহত্যার বীভৎস লীলা নাই, কিন্তু ইঁহারা নানাভাবে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের উদ্বোধন করিয়া মানুষের সত্যকার কল্যাণ করিয়াছেন। হিংসার পথে যে বিপ্লব আসিয়াছে তাহার প্রভাব অস্থায়ী, আর ইঁহাদের দ্বারা যে বিপ্লব আসিয়াছে তাহার প্রভাব স্থায়ী—এই যা পার্থক্য। অর্থনৈতিক সাম্যবাদের পশ্চাতে যদি নৈতিক সাম্যবাদ না থাকে, তবে তাহা প্রথম প্রথম একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া Reign of Terror বা ভীতির রাজত্বে আবার বিলীন হইয়া যায়। রামকৃষ্ণপ্রমুখ মহামান

নৈতিক সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সমাজে প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যত্বই বড় কথা। মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যতীত অর্থনৈতিক সাম্যের কোনই মূল্য নাই।

একটু প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে প্রথম আলো এই সব সাধকগণ জ্বালাইয়াছিলেন। এ দেশের প্রথম যুগের বিপ্লবিগণ ইঁহাদের দ্বারাই প্রেরণা পাইয়াছিলেন। আর ইঁহারাই সারা বিশ্বে ভারতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রভাবের ফলে দেশের সত্যকার ধর্মবোধ জাগ্রত না হইলে পরবর্তী যুগের বিপ্লবিগণ পথের সন্ধান পাইতেন না। ধর্মব্যাপারেও এই সব সাধক চরম বিপ্লবী ছিলেন। ইঁহারা কেহই ধর্মের মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই, ইঁহারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চিরাচরিত পথ ধরিয়া চলেন নাই। জনসেবা ও জনকল্যাণই যে ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য, এতদ্ব্যতীত কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি আসে না এই কথাটা ইঁহারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই ভাবে ধর্মের সত্যকার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঁহারাই ভারতে নূতন যুগ আনিয়াছেন। আজও ইঁহাদের যুগ অচল হয় নাই। ভারতের বর্তমান যুগের মহাপুরুষগণ সবদাই নৈতিক চরিত্রগঠনের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতে ধর্মসাধনার যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহাই আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদিগকে প্রেরণা দান করিয়াছে। এই ধর্ম-প্রেরণার অভাব থাকিলে রাজনীতি এমন সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিত না।

ধর্ম ও নীতিবিবর্জিত প্রত্যেক আন্দোলনের পরিণতি অরাজকতা। প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে থাকা চাই নৈতিক আদর্শ, অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা, জনকল্যাণের ব্যাপকতর প্রেরণা। নতুবা সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। জনসাধারণের নিকট প্রকৃতিদত্ত জন্মগত অধিকারের কথা বলা খুবই সহজ ব্যাপার, এই সব কথা বলিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করা আরও সহজ। কিন্তু তাহার পরও যদি তাহারা নৈতিক আদর্শ না পায়, যদি তাহাদের হৃদয়ে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ না জাগে তবে তাহারা এমন অপকাণ্ড করিতে থাকিবে, যাহার ফলে তাহাদের নিজেদের কোন উপকার হইবে না। তুমুল উত্তেজনা, হট্টগোল ও ভীষণ অরাজকতার মধ্যেও মহামানবগণের বাণীর জীবন দর্শনের প্রয়োজন আছে। রামকৃষ্ণ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এই সব মহামানব সকল যুগের বিপ্লবের অগ্রদূত। ইঁহাদিগকে বাদ দিলে ইঁহাদের মহান আদর্শকে অগ্রাহ্য করিলে বিপ্লবের কোন সার্থকতা নাই। আজ জগৎ বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। এই দ্বিধাগ্রস্ত বেপথুমতী ধরণীর মানুষের জন্য আশার স্বর্ণ-দীপ জ্বালাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন মহাপুরুষগণ, তাঁহারাই বিশ্বমানবের মুক্তির পথ বলিয়া দিতে পারেন—অন্য কেহ নহে।

মহিষাসুর-মর্দিনী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

দর্পী মহিষাসুর—
শত-বৎসর-ব্যাপী মহারণে জিনিল স্বর্গপুর।
ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি দেবগণ, বঞ্চিত-স্বাধিকার বিচরণ
করিয়া ফিরেন মর্ত্যের সম, বক্ষ বেদনাতুর!

পদ্মযোনির সাথে—
দাঁড়ালেন আসি দুর্গত সবে হরিহর-সাক্ষাতে।
নিদারুণ-ব্যথা নিপীড়িত স্বরে,
শুনায়ে কাহিনী দোঁহার গোচরে,
"পরিত্রাণের কি আছে উপায়" শুধালেন নত মাথে।

অমরগণের বাণী—
শুনিয়া ক্রুদ্ধ হলেন শম্ভু, বিষ্ণু চক্রপাণি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আনন, ভ্রূকুটি-কুটিল রক্ত-বরণ,
প্রচণ্ড রোষ স্ফুরে ধ্বক্ ধ্বক্ দুর্বার তেজ হানি।

সে মহাদীপ্তি সনে—
যুক্ত হইল যাহা ছিল তেজ ইন্দ্রাদি দেবগণে।
ঘোর জ্বলন্ত পর্বত সম, সে তেজপুঞ্জ ক্রমে নিরুপম
নারীর মুরতি লইল, কান্তি ছায় তার ত্রিভুবনে।

শম্ভুর তেজোরাশি—
নিরমিল দেবী-মুখমণ্ডল অপরূপ উদ্ভাসি'।
কৃতান্ত-তেজে কালো কুন্তল,
ঢাকিল ঊর্ধ্ব নীল নভোতল
বিষ্ণু-বীর্যে উপজিল বাহু, মহাবল অবিনাশী।

চন্দ্রমা-চারুকর—
গঠিত করিল স্নেহ-বিনম্র দুই কম পয়োধর!
অগ্নির তেজে লভিল জনম,
ভালে ত্রিনয়ন শোভা অনুপম,
ইন্দ্রের বলে হল উদ্ভূত কটিদেশ মনোহর!

দেবীর রাতুল পদ—
ব্রহ্মার তেজে উঠিল জাগিয়া স্ফুট যেন কোকনদ!
অন্য-দেবতা-জীবন-দীপিকা,
রচিল জঙ্ঘা, উরু ও নাসিকা,
রচিল কর্ণ, দন্ত-পঙ্‌ক্তি সর্ব শোভাস্পদ।

রুদ্র পিনাকপাণি—
নিজ শূলাস্ত্র হতে আকর্ষি দিলেন ত্রিশূলখানি।
দিলেন চক্র দেব নারায়ণ, শক্তি—অগ্নি, দণ্ড—শমন,
কমণ্ডলু ও অক্ষ-মালিকা ব্রহ্মা দিলেন আনি।

ইন্দ্র অশনি-ধর—
দেবীর হস্তে দিলেন ঘন্টা বজ্র ভয়ঙ্কর!
দিব্য শঙ্খ দিলেন বরুণ, দিবাকর দেন তেজ নিদারুণ,
সিন্ধু সঁপেন পঙ্কজ-মালা, পবন—ধনু ও শর!

নগরাজ হিমালয়—
দিলেন সিংহ দেবীর বাহন অমিত বীর্যময়।
ধরণী-ধারণ নাগ-অধিপতি,
দেবীর চরণে জানায়ে প্রণতি
অর্পেন মহা-মণি-মণ্ডিত নাগ-হার অক্ষয়।

দেবতা-সম্মানিতা—
সে মহাশক্তি হিমাদ্রি-বুকে হইলেন উত্থিতা!
অট্টহাস্যে কাঁপে চরাচর, নভ-সমুদ্র-গিরি-প্রান্তর,
সিংহবাহিনী নানা-প্রহরণী অতি-ভীম-রূপ-যুতা!

উঠে ধ্বনি জয় জয়—
মহিষাসুরমর্দিনী মাতা জেগেছে
নাশিতে ভয়!
দেবতাবৃন্দ হরিষান্তর, দেবীর স্তোত্রে বিশ্ব মুখর,
ভক্তি-আনত মুনীন্দ্র যত মাগে পদে আশ্রয়।

সংস্কৃত ঐতিহাসিক চম্পূকাব্য

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত-সাহিত্যে আধুনিক অর্থে ইতিহাস-রচনা বিরল। পুরাণসমূহে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি বিরল নয়, কিন্তু পুরাণসমূহ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়। এই সকল গ্রন্থে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তরাদি ও বংশানুচরিত প্রভৃতির বর্ণন ব্যতীত হিন্দুধর্ম ও সাহিত্য, তথা দর্শনের এবং জাতীয় জীবনের অশেষ তথ্য সন্নিবদ্ধ রয়েছে। যুগে যুগে ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের নৃপতিমণ্ডলী যে সকল প্রশস্তি রচনা ক'রে গেছেন, তার মাধ্যমেও ঐতিহাসিক তথ্য বহুলভাবে বিবৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সকল প্রশস্তিও আধুনিক অর্থে ঐতিহাসিক রচনা নয়।

কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' অনেকাংশে বর্তমান ইতিহাসের পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। কহ্লণের দৃষ্টিভঙ্গীও ঐতিহাসিক। কাশ্মীরের ইতিহাস এই গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বাণের 'হর্ষচরিত', বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহ', পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত,' বিহ্লণের 'কর্ণসুন্দরী' ও 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', 'পৃথ্বিরাজবিজয়', সোমেশ্বর দত্তের 'কীর্তিকৌমুদী', অরিসিংহের 'সুকৃতসংকীর্তন,' শম্ভুর 'রাজেন্দ্র-কর্ণপুর,' জোনরাজ-কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'র পরিশিষ্টাংশ এবং শ্রীবরকৃত 'জৈনরাজতরঙ্গিণী' এবং শুককৃত 'রাজাবলী-পতাকা' প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত শূর্জনচরিত মহাকাব্য গ্রন্থে বুন্দি ও কোটার রাজা শূর্জনসিংহের নিখুঁত জীবন-আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে এবং উক্ত রাজবংশের বহু ঐতিহাসিক কীর্তি-কলাপ বর্ণিত আছে।

উপবিলিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনটি মহাকাব্য, কোনটি বা কাব্য, কোনটি বা নাটক। কিন্তু সংস্কৃত চম্পূগোষ্ঠীর অন্তর্গত রচনা কোনটি নয়। আজ আমরা এই প্রবন্ধে একটি ঐতিহাসিক চম্পূকাব্যের বর্ণনা প্রদান করবো, যে কাব্য রচনাকৌশলে ও বিষয়গৌরবে অতি সমৃদ্ধ। এ কাব্যটি এখনও মুদ্রিত হয়নি; পুঁথির আকারেও এই গ্রন্থের কেবল এক টীকাপুঁথি পাওয়া যায়। এর নাম 'বীরভদ্রচম্পূ', রচয়িতা শ্রীপদ্মনাভ মিশ্র। পদ্মনাভ মিশ্র ছিলেন বলভদ্র মিশ্রের পুত্র এবং গোবর্ধন মিশ্র ও বিশ্বনাথ মিশ্রের ভ্রাতা। পদ্মনাভ মিশ্র 'কিরণাবলী-ভাস্কর', তত্ত্বচিন্তামণিপরীক্ষা,' 'তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকা', 'কাণাদরহস্য', টীকাসমন্বিত 'রাদ্ধান্ত-মুক্তাহার', বর্ধমান-কৃত 'ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ-টীকা,' 'বর্ধমানেন্দু,' 'ন্যায়কন্দলী-টীকা,' 'বেদান্তখণ্ডন-খণ্ডখাদ্যটীকা,' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ব্যতীত 'শরদাগমচন্দ্রালোক-প্রকাশ,' 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকাশ' প্রভৃতি সাহিত্য ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যে বীরভদ্রদেবের জীবন-চরিত রচনোপলক্ষে তিনি 'বীরভদ্রচম্পূ' রচনা করেছিলেন, সেই বীরভদ্রদেবের আদেশেই তিনি

১ প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ৭ম পুষ্প। মহারাজ শূর্জন আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। বিংশ সর্গে পূর্ণ এ মহাকাব্য গ্রন্থের রচয়িতা চন্দ্রশেখর; কবি বাঙ্গালী বৈদ্যবংশসম্ভূত।

'শারদাগম-চন্দ্রালোকপ্রকাশ' নামক মহাদেবপুত্র জয়দেবরচিত 'চন্দ্রালোক'-গ্রন্থের সুললিত টীকা রচনা করেছিলেন। এই বীরভদ্রদেব যে সংস্কৃতবিদ্যায় পারঙ্গত ছিলেন, তাঁর রচিত 'কন্দর্পচূড়ামণি'-নামক গ্রন্থ হতে প্রকৃষ্ট-ভাবে তা প্রমাণিত হয়।[২] 'কন্দর্পচূড়ামণি' গ্রন্থের শেষে বলা আছে যে এ গ্রন্থটি বীরভদ্রের ১৬৩৩ বিক্রমাব্দে অথবা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচনা করে ছিলেন।[৩] কাজেই বীরভদ্রদেবের সমসাময়িক হিসাবে, তাঁরই সভার উজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপে, পদ্মনাভ মিশ্র মহোদয় যে উক্ত সময়ে ভারতবর্ষ সমলঙ্কৃত করেছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বঘেলখণ্ডস্থ[৪] নৃপতি-পরম্পরার সঙ্গে দিল্লী মোগল সম্রাটদের সঙ্গে ছিল পারিবারিক বন্ধুত্ব।[৫] বীরভদ্রের পিতা ছিলেন রামচন্দ্র রামচন্দ্রের পিতা ছিলেন বীরসিংহ, তাঁর পিতা ছিলেন শালিবাহন। রামচন্দ্রের পুত্র বীরভদ্রের যখন জন্ম হয়, তখন মোগলসম্রাট্ আকবর কীদৃশ সম্রাট-জনোচিত বন্ধুত্বের পরিচায়ক স্বরূপ উপঢৌকন রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তার গৌরবময় বর্ণনা মাধবকৃত 'বীরভানূদয়' কাব্যে দৃষ্ট হয়।[৬] এই বঘেলখণ্ড বা বর্তমান রেওয়া-রাজ্যের নৃপতি রামচন্দ্রই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ তানসেনকে মহামতি সম্রাট আকবর বাহাদুরের নিকট বন্ধুত্বের প্রমাণস্বরূপে প্রেরণ করেছিলেন।[৭] এই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব সত্যই কত গভীর ছিল তার একটি প্রমাণ— আকবরের শ্রেষ্ঠ সভাকবি গোবিন্দভট্ট—যাঁকে আকবর আদর করে আকবরীয় কালিদাস-নামে সম্মানাখ্যা প্রদান করেছিলেন, সেই আকবরীয় কালিদাসই রেওয়া-রাজাস্থ নৃপতি রামচন্দ্রের যশোগাথা বর্ণনমূলক 'রামচন্দ্রযশঃপ্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ বিরচন করেছিলেন। ভারতবর্ষের এই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পরম সন্ধিক্ষণে ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন সকলশাস্ত্রারবিন্দ-প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য শ্রীপদ্মনাভ মিশ্র, যাঁর অপূর্ব কৃতি এই বীরভদ্রচম্পূকাব্য।

'বীরভদ্রচম্পূ'র অন্তে লিখিত আছে যে ১৬৩৪ বিক্রমাব্দে বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বীরভদ্রচম্পূ' কাব্য বিরচিত হয়েছিল।

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই এটি অতি সুস্পষ্ট যে, এ গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে বিরচিত। বীরভদ্রদেবের পিতৃদেব রামচন্দ্র নাম থেকেই বোধ হয় কবির মনে বিভীষণ ও মন্দোদরীর মুখে রামচন্দ্র-যশোগাথা বিবৃত করার অভিপ্রায় উদিত হয়েছিল। বঘেলবংশীয় নৃপতি রামচন্দ্রের যশোগাথায় দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত, তাঁরই সৈন্যমণ্ডলীর পাদোত্থিত ধূলিধোরণীতে

২ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালা-সম্পাদক বৈদ্য জাদবজী ত্রিকমজী আচার্য সংশোধিত। বোম্বে, গুজরাতি ন্যূস প্রেস বি. স. ১৯৮১ (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে) থেকে মুদ্রিত।

৩ হরলোচনহরলোচনরসশশিভিরিবিক্রতে সময়ে।
ফাল্গুনশুভ্রপ্রতিপদি পূর্ণো গ্রন্থঃ স্মরস্যৈবঃ॥

৪ ব্যাঘ্রপল্লীর অপভ্রংশ বঘেল। রেওয়ার প্রথম বঘেলরাজ ছিলেন ব্যাঘ্রদেব—তাঁর নামানুসারে ব্যাঘ্র-পল্লীর নামকরণ করা হয়।

৫ এ রাজপরিবারের কীর্তিকলাপের জন্য বর্তমান প্রবন্ধকার-সম্পাদিত আকবরীয় কালিদাসোপনামক গোবিন্দভট্ট-কৃত 'রামচন্দ্রযশঃপ্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের (প্রাচ্যবাণী গোপালচন্দ্র লাহা স্মৃতিসংরক্ষণ গ্রন্থমালা, ৩য় পুষ্প) ভূমিকাংশ দেখুন।

৬ হুমায়ুন বীরভানুকে ভাই বলতেন; তাঁর পুত্র আকবরের সঙ্গে ছিল রামচন্দ্রের ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক। এই সব মনোরম বৃত্তান্তের জন্য 'বীরভানূদয়' কাব্যের দ্বাদশ সর্গ দেখুন।

৭ বীরভানূদয়-কাব্যের দশম সর্গ।

সিংহল পর্যন্ত গগনমণ্ডল যেন মেঘ-সমাচ্ছাদিত। পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের আক্রমণে লঙ্কা-নগরী বিধ্বস্ত হয় এই ভয়ে মন্দোদরী বিভীষণকে ভীতি-বিজড়িতকণ্ঠে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এবং বিভীষণও কৌশলে (বর্তমান) রামচন্দ্র, তাঁর রাজধানী গহোরা, রামচন্দ্র-পুত্র শ্রীবীরভদ্র প্রভৃতির পরিচয়প্রদান ও গুণবর্ণন করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি স্তুতি জানিয়েছেন শ্রীভৈরব এবং শ্রীরামচন্দ্রকে এবং তৎপরেই প্রকৃত ঘটনা প্রারম্ভোদ্দেশ্যে বল্‌ছেন—অনন্তর কোন সময়ে যিনি বিপক্ষভূমিপতিদিগের পীড়ন দ্বারা মনোরথ সফল করেছিলেন, যিনি যাচক-সমূহকে কৃতার্থ করে কল্পবৃক্ষের কীর্তিও ন্যূন করেছিলেন, যিনি বিপক্ষীয় স্ত্রীগণের মানসোদ্‌গত আনন্দসমূহরূপ তেজের উষ্ণতেজঃ, তাদৃশ শ্রীমান্ রামচন্দ্রদেবের পুত্র শ্রীবীরভদ্রদেবের যুদ্ধনির্গমনে সেনানিবাস থেকে উত্থিত ধূলিসমূহ দর্শন করে মন্দোদরী লঙ্কাধিপতি বিভীষণের ক্রোড়-প্রবিষ্টা হয়েও শঙ্কার সঙ্গে বলেছিলেন—প্রিয়, হঠাৎ একি হলো? ধূলিধোরণী ভূলোক থেকে উত্থিত হয়ে দিঙ্মণ্ডল আক্রমণ করে আকাশমধ্যবর্তিস্থান আবৃত করছে? বিন্ধ্য-পর্বত বহুদিন মস্তক অবনত করে থেকে পুনরায় মস্তক উত্তোলন করার চেষ্টা করছেন না তো? আকাশ-পাতাল ছেয়ে কোত্থেকে কেন ছুটে চলেছে এই ধূমযষ্টি? বিভীষণ উত্তরে বলছেন - রামচন্দ্রপুত্র [অর্থাৎ শ্রীবলভদ্রদেব] এ ধূলি-ধোরণীর কারণ—

"ভূমীনায়করামচন্দ্রতনয়েনোত্থাপিতা ধূলয়ঃ"—তখন মন্দোদরী ভয় পেয়ে বলছেন—হায় ভগবান! আবার রামচন্দ্রের পুত্র সেতু নির্মাণ করে লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন? প্রিয়, তুমি তা হলে তাঁকে সত্বর উপঢৌকন প্রেরণ কর। তখন বিভীষণ বল্‌ছেন - ইনি সেই রামচন্দ্র নন্, নি বীরভাস্কর পুত্র বঘেলরাজ,—

শক্ত্যা স্কন্দ ইব শ্রিয়া স্মর ইব খ্যাত্যা
বিবস্বানিব।
স্ফীত্যা শক্র ইবাত্র রাজতি সদা শ্রীরামচন্দ্রো
নৃপঃ ॥

মন্দোদরীর প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ বলছেন যে এঁর রাজধানীর নাম "গহোরা"—

অস্তি প্রশস্তিভিরলংকৃতদিগ্‌বিভাগা
রাজানুরক্তমনুজা নগরী গহোরা।
যস্যাং মদালসগজালিকপোলপালি-
লোলালিবিভ্রমগজাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি ॥ ১৩ ॥
যা পর্বতৈর্বসুমতীব বৃতা সমন্তাদ্-
দম্ভোজিনীব ধৃতশিলীমুখা চ।
রাকেব স দ্বিজপতিঃ করিণাং ঘটেব
দানাবদাতচরিতপ্রথিতা বিভাতি ॥ ১৪ ॥

ঈদৃশ গহোরা নগরীত্যাগ করে কোনও কারণে রাজা সম্প্রতি আছেন, বান্ধবদুর্গ-রত্নে। এঁরি পুত্র শ্রীবীরভদ্র—ইনি যশোদাসূনু। এঁর জননী যশোদাও শ্রীকৃষ্ণ-জননীসমা যশস্বিনী। অতুলনীয় হস্তিনিচয়ের দানের পর কবিরা এঁর উদ্দেশে যে স্তুতি পাঠ করেছিলেন, দেশের ইতিহাসে তা হয়ে আছে অমর। বীরভদ্রজননী দান করবেন অনেক হস্তী। মন্দোদরী তখন প্রসঙ্গক্রমে বলছেন যে, বর্ষাপগমেই হওয়া উচিত ছিল এ দান, কিন্তু বিভীষণ বল্‌ছেন যে তা নয় —গণকেরা বলেছেন, আশ্বিন পূর্ণিমায় চন্দ্রপর্বে হবে এ দান। প্রসঙ্গক্রমে হলো নানা শাস্ত্রালাপন, যার জন্য স্বয়ং বৃহস্পতি এসে হাজির হলেন। কোত্থেকে প্রচণ্ড ধ্বনি হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে বৃহস্পতির মুখে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের উদাত্ত প্রশংসাবলী পরিদৃষ্ট হয় —

পঠন্তু বুদ্ধাগমমেব শাস্ত্রং কুর্বন্ত্বহিংসাভিমুখং
মনশ্চ।
ধর্মেষ্বহিংসৈব পরং প্রধানং শাস্ত্রেষু বুদ্ধাগম
এবমাহুঃ ॥

ইন্দ্র, নারদ প্রভৃতি সকলে এসে শ্রীরামচন্দ্র রেওয়ারাজের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরাই বল্‌লেন যে—এ প্রচণ্ড ধ্বনির জনয়িতা হচ্ছেন শ্রীবীরভদ্রদেব, তাঁর জয়যাত্রার এই তীক্ষ্ণ ধ্বনি। শ্রীবীরভদ্রদেব "নিজজনন্যা সূর্যোপরাগে সঙ্কল্পিতান্ দন্তাবলান্ আশ্বিন্যাং চন্দ্রোপরাগস্য ভাবিত্বাৎ দন্তাকৃষ্টান্ কর্তুং সাম্প্রতং সোদ্যোগঃ॥" অর্থাৎ তিনি স্বীয় জননী কর্তৃক সূর্যগ্রহণে সঙ্কল্পিত হস্তি-সমূহ আশ্বিনী পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণের ভাবিত্ব-হেতু দণ্ডাকৃষ্ট করার জন্য উদ্যুক্ত। তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই প্রচণ্ড ধ্বনি। বীরভদ্রচম্পূর প্রথম উচ্ছ্বাসের অন্ত্যভাগে মন্দোদরীকে সম্বোধন করে বিভীষণ বল্‌ছেন, এই বঘেলনৃপতির প্রস্থান সময়ে সুনিপুণ অভিঘাত-নিমিত্ত নিরন্তর উত্থিত তীক্ষ্ণ ধ্বনিসমূহ দ্বারা জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত হলে সমুদ্রও হয় ক্ষোভপ্রাপ্ত, পবতও হয় স্খলিত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উচ্ছ্বাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূখণ্ডের অবস্থাবর্ণন। চতুর্থ উচ্ছ্বাসে শ্রীরাম চন্দ্রের প্রশংসাকথন। পঞ্চম উচ্ছ্বাসে প্রয়াগ তীর্থ ও শ্যামাবট-বর্ণন; তৎপর গঙ্গাযমুনার তীরদেশে অবস্থিত অলর্কনগরীর বর্ণন। এই অলর্কনগরীর বর্ণনপ্রসঙ্গে কবি পদ্মনাভ মিশ্র বলেছেন যে, সেখানে এইরূপ রবিকিরণ দ্বারা সুগতাদি উক্তিরূপ গাঢ়ান্ধকার দূরীভূত হয়েছে, এবং এরূপে শ্রৌতমার্গে বিচরণ করে ব্রহ্মবিদ্যা নির্ভয়ে শোভা পাচ্ছে। বৈশেষিকাদির সহিত মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ফণিমতাবলী অধ্যাপনকারী বিধ্বস্তমোহ সুমতি পণ্ডিতগণের জয়পতাকা সেখানে উড্ডীয়মান—

যস্যাং তর্কার্কভাসা প্রতিহতসুগতাদ্যুক্তিগাঢ়ান্ধকারে
শ্রৌতে মার্গে চরন্তী বিগতভয়মসৌ ব্রহ্মবিদ্যা চকাস্তি।
সার্ধং বৈশেষিকাদ্যৈরপি চ সুমতয়ো যত্র বিধ্বস্তমোহা
মীমাংসাসাংখ্যপাতঞ্জলফণিভণিতীঃ পাঠয়ন্তো জয়ন্তি॥

অতঃপর গগনপথে বিন্ধ্যাচল-বর্ণন। তৎপর বিন্ধ্যাচল-বন্ধুবান্ধব-নামক পর্বতের বর্ণনা। সেখান থেকে রেওয়া পর্যন্ত পথের বর্ণনা। তৎপর রেওয়ারাজ রামচন্দ্রের যশোবর্ণনা, যিনি "ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ড-ভাণ্ডোদরবিপুলদরীপূরণৈকঃ সমর্থঃ।"

অতঃপর ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে রামচন্দ্রতনয় শ্রীবীর ভদ্রদেবের বর্ণনা। এই উচ্ছ্বাসে রেওয়ারাজ-বংশের তাৎকালিক শ্রীসম্পদের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, জয়দ্রথ নিধনোদ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে সাত্যকি ও ভীমসেন সহায়তা করেছিলেন, তেমনি বীর বীরভদ্রদেবেরও সহায়ক ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব ও উদয়ভানুদেব—

"প্রতাপরুদ্রোদয়ভানুদেবৌ দৃষ্টৌ তথা
পার্শ্বগতাবমুষ্য।
যথোদ্যমে সৈন্ধবনিগ্রহস্য কিরীটিনঃ
সাত্যকিভীমসেনৌ॥ ৬

অতঃপর বীরভদ্রের মন্ত্রী অতুলশ্রী রসভদ্রের এবং বর্তমান বঘেল বীরগণের বর্ণনা। সমস্ত দেশের যুদ্ধবিশারদগণ—যথা, তোমর, চৌহান সেনাগণ, সোহেমনামক ভ্রাতৃসমন্বিত রত্নসেন প্রভৃতি সকলেই বীরভদ্রের পার্শ্ববর্তী। তুলারাম-নামক মন্ত্রিপ্রবর এবং স্বীয় ধাত্রীপুত্র কপূর সর্বদা বীরভদ্রের সেবায় রত।

বীরভদ্র-দেবের পরিবারের বর্ণনপ্রসঙ্গে কবি বল্‌ছেন যে, শ্রীমান বীরভদ্রদেবের পিতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রদেব; তাঁর পিতা বীরভানুদেবের সহোদর ছিলেন যামিনীভানুদেব। যামিনীভানু দেবের পত্নী ভীষ্মদেবী। তাঁদের পুত্র ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব ও উদয়ভানুদেব। বীরভদ্র ও উদয়ভানুদেবের মিত্রতা নর-নারায়ণের ন্যা ক্রিয়াফলপর্যবসায়িনী ছিল। প্রতাপরুদ্র উদয়ভানুর পুত্রদ্বয় ছিলেন যথাক্রমে সূর্যভানু চন্দ্রভানু।

অতঃপর সপ্তম উচ্ছ্বাসে রত্নপুরের বর্ণন

তৎবর্ণনপ্রসঙ্গে কবি বলছেন যে, মহারাজ-কুমারের উত্তরদেশ গমনে বিলম্ব আছে। সুতরাং দেশে খানিকটা শান্তভাব বিরাজমান। রাজপুত্র বহু কর উত্তোলন করে এখন স্বীয় ভবনে রাজা রামচন্দ্রের আদেশে বাস করছেন। গ্রন্থের অন্তে কবি স্বভাবতই প্রার্থনা করছেন যেন তাঁর গ্রন্থ বীরভদ্রদেবের সুধাসোদরী কীর্তি চিরকাল প্রকটিত করতে সমর্থ হয়—

"যাবন্মূর্ধ্নি পুরদ্বিষো বিধুকলা, বেদা মুখে বেধসো
লক্ষ্মীর্বক্ষসি শার্ঙ্গিণঃ সুরধুনী যাবচ্চ দেবালয়ে।
তাবদ্দিশন্তবীরভদ্রনৃপতেঃ কীর্তিং সুধাসোদরীং
গ্রন্থোঽসৌ প্রকটীকরোতু জগতি খ্যাতো গুণৈঃ কেবলৈঃ॥

'শ্রীবীরভদ্রচম্পূকাব্য' পণ্ডিতধুরন্ধর পদ্মনাভ মিশ্রের কেবল রচনাবৈশিষ্ট্যে নয়, পরিকল্পনায়ও অভিনব। ইতিহাস-পুরাণের চরিত্রাবলীর বদন-নিঃসৃত এই সরস মধুর চম্পূকাব্য রচনাপদ্ধতি ও বিষয়বস্তুতেও অভিনব। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পৌরাণিক ব্যক্তিবৃন্দের মুখে বিবৃতি একদিকে যেমনি রোমাঞ্চকর, অন্যদিকে বর্ণনাগৌরবে ও ভাষাপারিপাট্যেও চিত্তবিনোদনশীল। আজ ভারতের সেইদিন এসেছে—যখন মধ্যযুগের এ সব অনবদ্য রচনা জগৎ-সমক্ষে সম্যক্ প্রচারিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সব গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে সুবিদিত হলে সংস্কৃত-সাহিত্যে ইতিহাসের অভাব অনেকটা দূরীভূত হবে, নিঃসন্দেহ।

নির্লিপ্তের ব্যথা

শ্রীচিত্ত দেব

আমারে আমি রাখিনি ঢেকে
বাহির হতে।
যাওয়া-ও-আসা সকল কালেই
সকল পথে॥

আমারে আমি বাঁধিনি মিছে
জগৎ-সনে।
ফুলের গন্ধ লেগেছে তবু
ক্ষণে ক্ষণে॥

আমারে আমি আঁকিনি কভু
ছবির মতো।
তবুত এ-ছবি হয়েছে আঁকা
অনবরত॥

আমারে আমি রাখিনি মনে
তবু-ত এই।
কথায় কথায় জাল-বোনা থেকে
মুক্তি নেই॥

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর্-এস্

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা বলছি। ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আশ্রমে বৈকালিক উপাসনায় প্রাচীন ঋষিদের প্রার্থনা সমবেত জনকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ত্যাগের দ্বারা ভোগ, অর্জনের দ্বারা নয়, মারামারি কাটাকাটির পথে ভোগ নয়, ত্যাগের দ্বারা ভোগ; কেন? পৃথিবীতে যা কিছু নড়ছে চলছে সবই যে তাঁর আচ্ছাদন, সবের মধ্যেই যে তিনি। কিন্তু এ ভাবা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? নিত্য এই ভাবের অনুচিন্তন করতে বলেছেন; কিন্তু ভাব-অনুযায়ী কর্ম কি হয়, না হয়েছে কখনও?

তিন শ বৎসর আগের কথা ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিল। ছত্রপতি শিবাজী, তখনও তিনি ছত্রপতি হন নাই। সমর্থ রামদাস স্বামীর দর্শনলাভ করেছেন। তাঁকে এক বৎসর দিনের পর দিন দেখে তাঁর ত্যাগ, জ্ঞান ও সমদৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে শিবাজী তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ করলেন। ভিক্ষার জন্য গুরু চলেছেন পথ দিয়ে, শিবাজী ভাবলেন, একি প্রমাদ, আমার গুরু যাচ্ছেন ভিক্ষার জন্য, আর আমি বসে আছি সিংহাসনে! রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা'র মধ্যে 'প্রতিনিধি' কবিতায় সুন্দর উপাখ্যানটি বর্ণনা করেছেন। শিবাজীর নির্দেশে বালাজি রাজ্যের ত্যাগপত্র নিয়ে গিয়ে গুরুর ভিক্ষার ঝুলিতে রেখে এলেন। গুরু সেই দক্ষিণার অমর্যাদা করেন নাই। শিষ্যকে অনুচর করে নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন—

"এই আমি দিনু করে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-শাসন করবে, এ তোমার নিজের রাজ্য নয় মনে রাখবে, আর আমার আশীর্বাদ হবে আমারই গৈরিক গাত্রবাস—"বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"—গৈরিক পতাকা তাই শিবাজীর পতাকা, ত্যাগের পতাকা, প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন।

ছত্রপতি গুরুর আদেশে আবার তাঁর আপন পথে চলতে লাগলেন, কিন্তু কুশলী কূটবুদ্ধি অসমসাহসী শত্রুনিসূদন গোব্রাহ্মণনারী-রক্ষায় ব্রতী শিবাজীর মনে সদা জাগ্রত ছিল ত্যাগের মন্ত্র। সেই মন্ত্রের পরিচয় আবার পাই যখন দেখি তুকারামের দর্শনলাভের, তাঁর কীর্তন শুনবার জন্য তিনি লালায়িত। অশ্ব ছত্র কর্মচারী পাঠিয়ে দিলেন তুকাকে আনতে। তুকা ফাঁপরে পড়লেন তিনি তো প্রতিষ্ঠাকে বিষের মত বর্জন করে এসেছেন। তবে কেন প্রভু তাঁকে এরূপ বিপদে ফেললেন? তিনি চারটি শ্লোক—মারাঠী অভঙ্গ—লিখে সেই কারকুনের হাতে পাঠিয়ে দিলেন রাজা সেই কবিতাগুলি পেয়ে এবং তুকা অপার্থিব সত্ত্বা উপলব্ধি করে মন্ত্রী ও অমাত্যদে

নিয়ে চললেন সেই গাঁয়ে। তুকার দর্শনে রাজা স্বয়ং তুলসীমালা দিয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন, স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ এক পাত্র তাঁর সামনে ধরলেন। কিন্তু তুকারামের তো তা দেখে খুশি হওয়ার কথা নয়—তিনি যে ওসব বিষবৎ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি তো বিঠলদেবকে চান, আর কিছু তাঁর কাম্য নেই। তাঁর ভগবদ্গত প্রাণের পরিচয় পেয়ে, তাঁর কীর্তন শুনে শিবাজীর মনে আবার বৈরাগ্যের জোয়ার এলো। তিনি বনের মধ্যে নিভৃত দেশে চলে গেলেন, তাঁর কাছে আসা লোকের নিষেধ, এমন কি প্রধান মন্ত্রীরও। শিবাজী সারাদিন নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যায় আসেন কীর্তন শুনতে। রাজ্যের প্রধান কর্মচারীরা প্রমাদ গণলেন। জীজাবাইয়ের শরণাপন্ন হলেন। জীজাবাই ছুটে এলেন তুকারামের পায়ে, প্রণাম করে বললেন, প্রভু উপায় করুন। তুকারাম তো পূর্বেই বলেছিলেন, শিবাজী, তোমাতে আমাতে বিস্তর ভেদ। তুমি ছত্রপতি, আমরা পত্রপতি—গাছের পাতাই আমাদের বসন-ভূষণ। রামদাস স্বামী তোমাকে পথ দেখিয়েছেন, সেই পথে চল—তুমি প্রতিনিধি, তোমার নিজের কিছু নেই, সে কথা মনে রেখো। শিবাজী রাজ্যে ফিরে এলেন।

ওয়ার্ধার মাধ্যমে গান্ধীজী আমাদের বিত্তবান লোকদের সেই কথাই, উপনিষদের সেই প্রাচীন বাণীরই প্রচার করেছেন। পরমহংসদেব সেই কথা কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে বলে গেছেন, ধুনুরীর 'তুঁহু' 'তুঁহু' শব্দের অনুরণনে, "দাস আমি" নিত্য এই বোধের অনুশীলনে। এক শ বছর আগে জন্ রাসকিন্ ইংলণ্ডে অত দূর নয়, কিন্তু মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য ক্ষুদ্র পরিমাণে অনুরূপ কথা বলে গেছেন—শ্রমিককে মালিক যেন দেখেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত করে, তাদের অভাব-অনটনে মালিক যদি তাঁর অর্জিত ধন তাদের কাজে না লাগান, তবে কিসের মালিক? সামাজিক বৈষম্য অর্থের দিক হতে দূর করবার জন্য গান্ধীজী বলেছিলেন, মালিককে মনে রাখতে হবে যে সে 'অছি', 'ট্রাষ্টী', 'প্রতিনিধি'-মাত্র। লোকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি তো বলেন, বিত্তবান ব্যক্তি হবে বিত্তহীনের আত্মীয়, বিত্তবানের বিত্ত লাগবে বিত্তহীনের সেবায়। কথাটা তো ভাল, কিন্তু সে রকম লোক কই? আপনি কি একজনও সে রকম লোক দেখেছেন? উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনি অন্ততঃ একজনের নাম বলতে পারেন, যার সত্যই হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে, যে মনে করে যে তার অর্থ তার নিজের ভোগবিলাসের জন্য নয়; এবং এমনি এক জনকে যখন দেখতে পেয়েছেন, তখন বোঝা যাচ্ছে যে পথ খোলা রয়েছে। হৃদয়ের পরিবর্তন ধনীদের মধ্যে অসম্ভব নয়। যাঁরা যমুনালাল বাজাজের সঙ্গে মিশেছিলেন, তাঁরা এই আপাত অসম্ভব যে ঘটেছিল তা স্বীকার করেছেন। যুগে যুগে মানুষের পরিবর্তনের দরকার হয়, প্রাচীন কথার নূতন প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই, প্রয়োগ সম্ভব হলেই বুঝতে পারি জীবন সচল হয়ে উঠেছে।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। আর্থিক অসমতার ফলে দেশে দৈন্য-দুর্দশার অন্ত নেই। কোথায় এর প্রতিকার? গ্রীক পুরাণে বলে, Procrustes নামে এক দস্যু ছিল। সে অসতর্ক পথিকদের ডেকে এনে তার নির্জন গৃহে আশ্রয় দিতো, নানা প্রকার খাদ্যের দ্বারা তাদের তুষ্ট করতো। তারপর তার একটি বিছানা ছিল, সেখানে আদর করে ডেকে শোয়াতো। পথিকের আকার শয্যার চেয়ে দীর্ঘ হলে সে অমনি কুঠার দিয়ে পথিকের হাত-পা কেটে ফেলতো। বিছানার মাপে দেহ হওয়া চাই; আবার যদি অতিথি হতো খর্বকায়, তবে তাকে সেই বিছানায় শুইয়ে জোর করে সাঁড়াশী দিয়ে তার হাত-পা টেনে বিছানার সমান মাপের করে নিত। ফল তো উভয়তই এক, বুঝতে পারা যাচ্ছে। জোর করে, আইন করে শাস্তি দিয়ে আমাদের সমাজের অসমতা দূর করে দিতে হলে এই হবে তার পরিণতি। নিজেরা বাঁচতে হলে এবং সমাজকে বাঁচাতে হলে আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে—সে এই প্রাচীন পথ—

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"

শূন্যবাদ

স্বামী সুন্দরানন্দ

বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন ও তাঁহার মতানুগামী আচার্য আর্যদেব প্রভৃতি, বৌদ্ধধর্মপ্রসিদ্ধ শূন্যবাদের প্রধান প্রচারক। এই মতবাদ পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ তথা অজাতবাদই ইহার পরোক্ষ ভিত্তি। তবে উভয় সিদ্ধান্তে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে; অজাতবাদ-মতে ব্রহ্ম নাম-রূপের অতীত 'সদসৎপরং' অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের বাহিরে হইলেও অস্তিস্বরূপ, কিন্তু শূন্যবাদ-মতে শূন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকলের বহির্দেশে একেবারে নাস্তিস্বরূপ। তবে নাগার্জুনের পরবর্তী অনেক মহাযান-সম্প্রদায়ে শূন্য অস্তিস্বরূপে উপাসিত। কিন্তু হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে, শ্রীবুদ্ধ বিভিন্ন শিষ্যকে অধিকারভেদে বিভিন্ন উপদেশ দিলেও মহাশূন্যত্বে লয়প্রাপ্তিরূপ নির্বাণমোক্ষই তাঁহার সকল উপদেশের একমাত্র মুখ্য সিদ্ধান্ত।

আচার্য নাগার্জুন শূন্যের সংজ্ঞানির্দেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সৎ অসৎ আদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক, অখণ্ড, নির্বিকল্পক, নিষ্প্রপঞ্চ, আকাশবৎ নির্লিপ্ত, অসঙ্গ, বাক্যমনাতীত সত্যই শূন্যপদবাচ্য। এই সত্য অনুৎপন্ন অনিরুদ্ধ অনুচ্ছেদ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। ইহাই পারমার্থিক সত্যরূপ মহাশূন্য। এই সত্যের আর একটি স্বরূপ সংবৃতি (এক প্রকার বুদ্ধি-বিশেষ)। ইহা দ্বিবিধ, যথা—তথ্য-সংবৃতি ও মিথ্যা-সংবৃতি। প্রতীত্য-সমুৎপন্ন ঘট-পটাদি বস্তুর স্বরূপ যে সময়ে অদুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেই সময়ে লৌকিক দৃষ্টিতে উহাদিগকে সত্য বলিয়া মনে করা হয়। ইহাই তথ্য-সংবৃতি। পক্ষান্তরে, মায়া-মরীচিকা প্রতিবিম্বাদি প্রতীত্যজাত হইলেও যখন দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণদ্বারা অনুভূত হয়, তখন লৌকিক দৃষ্টিতে উহাদিগকে মিথ্যা বলা হয়। ইহাই মিথ্যা-সংবৃতি। মাধ্যমিক শাস্ত্রে এই সংবৃতি অবিদ্যা মোহ বিপর্যয় প্রভৃতি নামে সংজ্ঞিত। 'আর্যশালিস্তম্বসূত্রে' এই সংবৃতি অপ্রতিপত্তি মিথ্যাপ্রতিপত্তি অজ্ঞান প্রভৃতি নামে আখ্যাত। 'আর্যসত্যাবতার' ও 'পিতাপুত্রসমাগম' গ্রন্থে এই দুইটি সংবৃতি শ্রীবুদ্ধের প্রমুখাৎ বাক্য এবং জ্ঞেয় সত্য বলিয়া প্রচারিত। শেষোক্ত গ্রন্থে আছে যে, বুদ্ধদেব উভয় সত্যকেই শূন্যরূপে প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছিলেন।

মাধ্যমিক শাস্ত্রমতে সম্যক সম্বোধিই এই শূন্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অর্জনই ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা। শূন্যবাদিগণ বলেন, শুষ্ক প্রজ্ঞাদ্বারা সম্বোধি হয় না। পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার হইতে প্রকৃত প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। দীর্ঘকাল দান শীল ক্ষান্তি প্রভৃতি অভ্যাসের প্রভাবে পুণ্যসম্ভার এবং সমাধি-সাধনের ফলে জ্ঞানসম্ভার জন্মে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হইলে অবিদ্যার অপগমে শূন্যত্ব ও সংবৃতির স্বরূপ সাধকের নিকট স্বতই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এইভাবে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে প্রজ্ঞাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা নির্বাণমোক্ষকামী সাধকের পক্ষে অপরিহার্য। সাধন-প্রজ্ঞা ক্রমে শ্রুতময়ী চিন্তাময়ী ভাবনাময়ী-রূপে প্রকাশ পায়।

এই অবস্থায় সাধক অধিমুক্ত-চরিত নামে আখ্যাত হন। অতঃপর অপরোক্ষজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যোগীর প্রজ্ঞা ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমিকায় উপনীত হইয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়।

মহাযানের অন্তর্গত অন্যান্য মতবাদিগণের ন্যায় শূন্যবাদিগণের মতেও মহাশূন্যে বিলয়-প্রাপ্তিরূপ নির্বাণমোক্ষ লাভ করিতে হইলে সাধককে যথাক্রমে প্রমুদিতা বিমলা প্রভাকরী অর্চিষ্মতী সুদুর্জয়া অভিমুখী দুরঙ্গমা অচলা সাধুমতী ও ধর্মমেঘ এই দশভূমিকা অতিক্রম করিতে হয়। সংক্ষেপতঃ প্রথম ভূমিকায় দানপারমিতা, দ্বিতীয় ভূমিকায় শীলপারমিতা, তৃতীয় ভূমিকায় ক্ষান্তি-পারমিতা, চতুর্থ ভূমিকায় বোধিপক্ষ ধর্ম ও বীর্য-পারমিতা, পঞ্চম ভূমিকায় প্রজ্ঞাপারমিতা অভ্যাস করিতে হয়। ষষ্ঠ ভূমিকায় প্রতীত্যসমুৎপাদ (কার্য-কারণের স্বরূপ) জ্ঞান জন্মে। সপ্তম ভূমিকাতে যোগী রাগাদি পঞ্চক্লেশাবরণ ও পঞ্চজ্ঞেয়াবরণ-নাশে বোধিসত্ত্ব লাভ করেন। এই ভূমিকায় ইচ্ছা করিলে সাধক মহাশূন্যস্বরূপ অদ্বয় বুদ্ধভাবে লীন হইতে পারেন বটে, কিন্তু মহাযানিগণের মতে তিনি তাহা না করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণসাধনে রত থাকেন। অষ্টম ভূমিকায় যোগী অনুপপত্তিক ধর্মক্ষান্তি প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় দেবশরীরী অর্থাৎ সম্ভোগকায় বুদ্ধগণ আসিয়া সাধককে অনন্ত জ্ঞানলাভ ও জগতের কল্যাণসাধনের সামর্থ্য দান করেন। নবম ভূমিকায় বিশ্বহিত-সাধনের আরও শক্তিলাভ হয়। সর্বশেষ দশম ভূমিকায় যোগী দিব্য উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যোতির্ময় দেহনিঃসৃত রশ্মি-প্রভাবে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং তিনি অসংখ্য নির্মাণকায়-বুদ্ধ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সকলকে নির্বাণমোক্ষ-লাভের উপদেশ দেন। এই দশ-ভূমিকা অতিক্রম করিলে যোগীকে দশভূমীশ্বর বলা হয়। ইহাই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার চরম উৎকর্ষ-স্বরূপ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। শূন্যবাদিগণ বলেন, ইহা সর্বধর্মশূন্যতাধিগম ও নির্বিকল্পক অবস্থা। এই সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইলে যোগীর সর্ববিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় এবং তিনি সকল ধর্মবিভাবহীন হন। ইহাই শূন্যত্বপ্রাপ্তি। বুদ্ধত্বে উপনীত না হইলে ইহার যথার্থ মর্ম উপলব্ধ হইতে পারে না।

শূন্যবাদ-সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়ও মনে হয় যে, বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্মকে নামাদি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিয়া যেন অনুভব করিবার অন্যতম উপায়-রূপে এই মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। বেদান্ত-প্রচারিত শুভেচ্ছা বিচারণা তনুমানসা সত্ত্বাপত্তি অসংসক্তি পদার্থ-ভাবনী তুর্যগা এই সপ্তজ্ঞান-ভূমিকার সঙ্গে মহাযান-পন্থিগণের দশভূমিকার পার্থক্য কেবল অস্তি ও নাস্তি-ভাবগত। বেদান্তের সপ্তজ্ঞান ভূমিকার মধ্যে প্রথম হইতে তৃতীয় ভূমিকা পর্যন্ত ভেদ-সত্যত্বজ্ঞান বা দ্বৈতবুদ্ধি থাকে। চতুর্থ ভূমিকাতে ভেদ বা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সাধকের উপলব্ধি হয়। মহাযানোক্ত দশভূমিকার সপ্তমভূমিকাতেও যোগীর প্রায় ঐরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। পার্থক্য এই যে, বেদান্ত যে সর্বোচ্চ অবস্থাকে অস্তি বা পূর্ণ বলিয়াছেন, শূন্যবাদিগণ সেই অদ্বয় অবস্থাকেই নাস্তি বা শূন্যনামে অভিহিত করেন।

—

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, নাগার্জুনের পরবর্তী কালে মহাযানের অন্তর্গত মন্ত্রযান বজ্রযান তন্ত্রযান কাল-চক্রযান মনোযান সহযান প্রমুখ অনেক সম্প্রদায়ে শ্রীবুদ্ধ শূন্যব্রহ্ম, শূন্যমহাপ্রভু, মহাশূন্য আদিবুদ্ধ, মহাশূন্য ধর্মকায়বুদ্ধ, শূন্যরূপী নিরঞ্জন প্রভৃতিরূপে উপাসিত হন। রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা' এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'Early

History of Bengal and Orissa' নামক গ্রন্থে এই সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। অধিকাংশ মহাযান-শাস্ত্র বলেন যে, জগতের সকল কারণের কারণস্বরূপ মহাশূন্যরূপী এক সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু আদিবুদ্ধ হইতে পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ এবং এই বুদ্ধগণ কর্তৃক পঞ্চবোধিসত্ত্ব সৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য নির্বাহিত হইতেছে। এই আদিবুদ্ধ গৌতমবুদ্ধের কারণ-শরীর, ধর্মকায়-বুদ্ধ প্রভৃতি নামে এবং দেবশরীরী অলৌকিক বুদ্ধ বা সম্ভোগকায়-বুদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত। মন্ত্রযান বজ্রযান প্রমুখ মহাযানী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তির স্থলে মহাশূন্যরূপী অলৌকিক আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তিরূপে শূন্য-মাতা প্রজ্ঞাপারমিতা উপাসিত। নেপালে প্রচলিত মহাযান-মতে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র মহা-শূন্যই ছিলেন, তিনি অরূপ হইলেও মহাবিষ্ণু-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চবিষ্ণু সৃষ্টি করেন। এই বিষ্ণুগণ প্রত্যেকে আবার এক একজন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপর সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের ভার দিয়া মহাশূন্যরূপী মহাবিষ্ণুতে লয়প্রাপ্ত হন। এইরূপে অনেক মহাযান সম্প্রদায়ে বহুবিধ ভাবে অস্তিস্বরূপে শূন্যের উপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে।

বহ্নি-চয়ন

ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য

জীবনবহ্নি জ্বালাবার তরে মহাকাল নাচে তাতাথৈ;
শিখাহীনদীপে আগুন লাগাও, আয়াস বিনাশি নিত্যই।
অনাগত আসে—দীপ্ত ভিখারী, আঁধার ভেদিয়া নিকটে;
অলসতনুর শয়ালু আভাস, এখনো নিঝুম প্রাবৃটে!

ডমরু বাজায়ে শিবে জাগা ওরে, দম্ভোলি-নাদে শকতি;
স্বার্থবোধের নির্মোক খোল্, উন্মুখ কর্ প্রকৃতি।
কি হবে রাখিয়া জীবনের সাড়া, "আমি"র খাপেতে ভরিয়া?
ঝলকে ঝলসি তলোয়ার তোল্, ক্লিন্ন-কলুষ নাশিয়া।

যোগমায়া-ঘেরা কৃষ্ণ সবাই, পাঞ্চজন্য বাজারে;
অর্জুনে তোর ক্লীবতা ঘোচায়ে যুদ্ধের তরে জাগারে।
মুঠি-মুঠি দে রে জীবন ছড়ায়ে, সেবার শিবিরে যুদ্ধে,—
জীবনেতে রাঙা মরণের হোলি, নির্বাণ লভি বুদ্ধে।

মহান শকতি রূপে রূপে তাঁর প্রকাশাত্মক ভঙ্গী।
স্থির প্রজ্ঞার সাক্ষী সবাই মহাকাল-স্রোতে সঙ্গী।
এষণা তাঁহার, স্পন্দনে জাগে,—বিশ্বের তাই সৃষ্টি;
মহাভারতের অমোঘবাণীর তর্পণে জাগা কৃষ্টি।
দান প্রতিদান এ নহে তোমার সার্থক হোক্ মন্ত্র;
তুইত জানিস্—আত্মা অনাশী—মরণবিজয়ী তন্ত্র।
প্রেমিক আমরা সকলের তরে সবটুকু দিতে এসেছি—
কৃপণতাধনে আবেশে আঁকড়ি, হতে কি পারিবি দধীচি?
বিচার-বিহীন প্রতিজীবে প্রেম তাঁরি সেবা করা তত্ত্ব
জগদ্ধিতায় আত্মমুক্তি—বিস্ময়কর সত্য!

কাব্য-যোগ

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত এম্-এ, পিএইচ্-ডি

(১)

আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? শ্রুতি বলেন,—আত্মলাভ অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি,—'আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে।' আমাতেই আমার পরম বিশ্রাম ও চরম প্রতিষ্ঠা। আত্মার স্বরূপ কি? শ্রুতি বলেন,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, জ্ঞানময় শুদ্ধানন্দ বা পরমানন্দ। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রও কাব্যপাঠের শ্রেষ্ঠফল ঐ একই আনন্দ—পরমানন্দ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন,—কাব্যের আত্মা যে রস, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'স্বসংবিদানন্দে'র প্রকাশমাত্র, মনস্বী মম্মট-ভট্ট বলেন,—কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন—সদ্যসদ্য পরমানন্দ লাভ, 'সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে'। কবিরাজ বিশ্বনাথ কাব্যানন্দকে বলেন 'অখণ্ড-প্রকাশানন্দচিন্ময়' ও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'। কোন কোন উৎসাহী আলঙ্কারিক বাগ্‌ধেনুর রসদুগ্ধকে যোগিগণের অনুভূত তত্ত্বরসের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন পণ্ডিতগণও কাব্যপাঠের প্রায় একই রূপ ফলের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—ভাব-সমুথ আনন্দ, বিশুদ্ধ ও ঊর্ধ্বভূমির আনন্দ ('an emotional delight, a pure and elevated pleasure') অথবা পরমানন্দ ('supreme happiness')ই কাব্যের ও সকল-প্রকার সুকুমার কলার উদ্দেশ্য। ক্রিষ্টোফার কডওয়েলের ন্যায় আধুনিকপন্থী সমালোচকগণও আত্মা বলিতে যাহাই বুঝুন, মানুষের আত্মোপলব্ধি ('man's realisation of himself') যে আর্টের এক বড় লক্ষ্য, তাহা বলিতে দ্বিধা করেন নাই।

বিশুদ্ধ আত্মানন্দের ন্যায় এই কাব্যানন্দও অ-লৌকিক। ইহা বিষয়ানন্দ নয়, বিত্তলাভ, যশোলাভ বা পুত্র-লাভ রূপ লৌকিক আনন্দ ইহা নয়। তৎকালের নিমিত্ত পরিবার-পরিধি বা প্রচলিত পরিবেশ বিস্মৃত হইয়া দেশকালের এবং পরিমিত ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে ভাবলোক অতিক্রম করিয়া কাব্যের এই আনন্দ-লোকে প্রবেশ হয় না। কাব্যপাঠের আনন্দও তাই লোকোত্তর দিব্য আনন্দ, তাহা আনন্দময় আত্মস্বরূপেরই এক আশ্চর্য উপলব্ধি।

আলঙ্কারিকগণ তাই ভণিতা করিয়া বলেন, দুয়ো বিধাতার সৃষ্টি,—সেখানে আমরা সুখে উল্লসিত হই, দুঃখে কাঁদিয়া মরি, অথবা মোহে জড়ীভূত হইয়া যাই, বিমল আনন্দের স্পর্শ পাই না কখনও। ধন্য কিন্তু কবির সৃষ্টি, শব্দে সমর্পিত এই কাব্যজগৎ! এখানে সুখদুঃখ, ভয়-বেদনা নবনবরূপে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াও সহৃদয় রসিকচিত্তে জাগায় এক অনির্বচনীয় আস্বাদ, আমাদের ব্যক্তিত্ববোধের অবসান ঘটাইতে পারিলে চিত্তে আনে এক আনন্দসত্তার বিপুল-স্পর্শ।

তাই জিজ্ঞাসা—আত্মোপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক জগতে যেমন জ্ঞান-যোগ, ভক্তি-যোগ বা কর্ম-যোগের কথা বলা হয়, সেইরূপ এই লৌকিক জগতে ঐ একই আত্মোপলব্ধি বা আনন্দোপলব্ধির জন্য কাব্য-যোগ বা শিল্প-যোগ

শব্দের প্রয়োগ একান্তই অসঙ্গত কি? আমাদের মনে হয়, যে সহৃদয় রসিকপুরুষ মন্তব্য করিয়াছিলেন —সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটি মাত্র মধুর ফল, একটি কাব্যামৃত-রসাস্বাদ, অপরটি সাধুজনের সহিত মিলন, তিনি বড় ভুল কথা বলেন নাই। তিনি কাব্যামৃত-রসাস্বাদকে প্রথমে স্থান দিয়াও কোনও ভুল করেন নাই। কারণ উহাই অপেক্ষাকৃত সুলভ, সংসারে অপরটি একান্ত দুর্লভ।

বিষয়টি একটু সবিস্তরেই আলোচনা করা যাইতেছে।

(২)

শ্রুতি বলেন,—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ, ২।১।১)

বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্বয়ম্ভূ হিংসা করিয়াছিলেন, সেইহেতু জীব বহির্বিষয়সমূহকেই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। কোন কোন ধীর পুরুষ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারা অমৃতের অভিলাষী হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া লন।

আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত এখানে পরিস্ফুট। স্বয়ম্ভূপুরুষ জীব সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায়— এখানেই তাঁহার লীলা—ইন্দ্রিয়গুলি রূপরসাদি বহির্বিষয় লইয়াই মত্ত রহিল, অন্তরে আর সন্ধানী দৃষ্টি গেল না। ধীর পুরুষ আত্মলাভের জন্য দুইটি কার্য করিলেন, —

(১) বিষয়ে অনাসক্ত নির্লিপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে প্রত্যাহৃত করিলেন; (২) অমৃতের অভিলাষী হইয়া অর্থাৎ তীব্রসংবেগযুক্ত হইয়া মনকে হৃদয়গুহায় প্রেরণ করিলেন।

তিনি দূরে নহেন। দূর হইতে অতিদূরে মনে হইলেও তিনি নিকটে এই দেহেই চেতনজীবগণের হৃদয়গুহাতেই নিহিত আছেন,—'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।' (মুণ্ডক, ৩।১।৭) তিনি এখানেই আমাদের অন্তরের অন্তরে বর্তমান। আমরা না জানিয়াও তাঁহাকে অনুক্ষণ স্পর্শ করিয়া চলিয়াছি। নতুবা কে বাঁচিয়া থাকিত, কেই বা প্রাণনক্রিয়া করিত? আমাদের প্রত্যেক দুইটি চিত্তবৃত্তির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালব্যাপী চিত্তের বৃত্তিনিরোধও আছে। এই নিরোধের মুহূর্তও এক আত্মোপলব্ধির মুহূর্ত সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উঠিয়া পরমুহূর্তেই সমুদ্রে মিলাইয়া যায়, তার পরের মুহূর্তেই আবার স্পন্দন উঠে। বেদান্ত বলেন, আমাদের অন্তরস্থ চিৎ বা সংবিৎ স্বপ্রকাশ। মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় মায়ার আবরণে তাহা ঢাকা। কোন প্রকারে সেই আবরণ ভাঙ্গিয়া গেলে বা অপসারিত হইলে চিৎপ্রদীপের প্রকাশ হয়। পরমাত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও আমাদের নিকটে তখন অভিব্যক্ত হ'ন, সৃষ্ট বা উৎপন্ন হ'ন না। চিদাবরণভঙ্গ ও অভিব্যক্তিবাদ অতি সংক্ষেপে ইহাই।

কাব্যানন্দের উপলব্ধিতেও ঐ একই অভিব্যক্তিবাদ, অনেকটা একই প্রক্রিয়া দেখা যায়। লৌকিক জগতের বস্তু কবিপ্রতিভা-বলে, শব্দার্থে সমর্পিত হইয়া অলৌকিক কাব্যজগতে বিভাব ও অনুভাব নামে পরিচিত হয় এবং ঐগুলি সহৃদয় পাঠকচিত্তে প্রবেশ করিতে থাকে। ক্রমে ঐগুলির সহিত সাধারণীকরণের ও তন্ময়ীভবনের ফলে পাঠকের চিত্তে নিজ জীবন ও জগৎসম্বন্ধে নির্লিপ্ত ভাব আসে এবং তাহার পরিমিত প্রমাতৃভাব তৎকালের নিমিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। একই সময়ে পাঠকের চিত্তে বাসনালোক হইতে বিভাবাদির অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদির অনুরূপ স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। পাঠকের চিত্ত ক্রমে

রজস্তমোমুক্ত হইয়া সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। স্থায়ী ভাব অতিসম্পন্ন হইতে হইতে চিত্ত স্থির হইয়া যায় এবং তখনই চিদাবরণ ভঙ্গ হইতে থাকে ও আত্মানন্দের প্রকাশ ঘটে। অপর ভাষায় বলা চলে—নির্লিপ্ত শান্ত ও স্থির চিত্তে স্বরূপানন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশ হয়। এই আনন্দের প্রকাশই রসের উপলব্ধি। রস কাব্যগত নয়, রস একান্ত ভাবেই পাঠকের চিত্তগত।

আলোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্য এখন মাত্র দুইটি বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হইতেছে। প্রথম—পাঠক-চিত্তের নিজ জীবন ও জগৎসম্বন্ধে নির্লিপ্ত ভাব ও সাধারণীকরণ এবং ফলে পরিমিত প্রমাতৃভাবের বিগলন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ বা কর্মযোগের সাধনায় ইহারই প্রয়োজন সর্বাধিক ও সর্বপ্রথম। পাঠক যে পরিমাণে স্বকীয় মর্ত্যলোক বিস্মৃত হইয়া লৌকিক নানা অবস্থার সংঘাতে সঙ্কুচিত চিত্তকে বাধাহীন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি কাব্য বা নাট্যলোকে প্রবেশ করিয়া কাব্য বা নাট্যরস সম্ভোগের অধিকারী হইবেন। নিজ জীবন ও জগৎসম্পর্কে এই নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ফলে কাব্যবর্ণিত ভাব বা বস্তুর সহিত পাঠক-চিত্তের একীভবন বা তন্ময়ীভবন সম্ভবপর হয়। ইহাই সাধারণীকরণ। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই নানা বিষয়ে অ-সাধারণ, স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট। এই অ-সাধারণত্বময় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বা ভাবের সহিত একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের নামই সাধারণীকরণ। ইহারই ফলে আমাদের পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধ যাহাকে ইংরেজীতে বলে sense of finite personality—তৎকালের জন্য বিগলিত হইয়া যায়। এই নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব না হইলে যে আর্টের ও সৌন্দর্যের বা আনন্দের উপলব্ধি হয় না, আধুনিক বা প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করেন। যেমন—বার্গসোঁ বলেন,—"The aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality, and so to bring us to a state of perfect docility in which we sympathise with the emotion expressed ; .... "

অস্কার ওয়াইল্ড বলেন,—"The only beautiful things are things that do not concern us." কাণ্ট বলেন,—"What is beautiful artistically is the object of delight apart from any interest." মহাভারতের শকুনি, অথবা চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্ত, কিংবা ওথেলো নাটকের আয়াগো কাব্যে বা নাটকে বর্ণিত দেখিলে চমৎকার লাগে, কারণ, আমাদের বাস্তব জগতে বা জীবনে উহারা নাই। কিন্তু উহারাই যদি আমাদের সমাজে থাকিয়া আমাদের প্রতিবেশী হয়, তবে অবস্থা হয় সম্পূর্ণ অন্যরূপ, আমাদের সমস্ত আনন্দ ভয়ে ও বিষাদে পরিণত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইতেছে—স্থায়ী ভাবের অতিসম্পন্নতা ও চিত্তের স্থিরতা। চিত্তের ভাবময় একতানবৃত্তিপ্রবাহ না হইলে আত্মানন্দের প্রতিফলন হয় না এবং রসেরও প্রকাশ ঘটে না। চিত্ত তখন রসলোকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভাবলোকে হাবুডুবু খাইতে থাকে। অনেক কবির রচনা রসলোকে উত্তীর্ণ হয় না, ভাবলোকেই মজিয়া থাকে। আবার অনেক পাঠকও সহৃদয়তা ও নির্লিপ্ততার অভাবহেতু রস স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভাবচঞ্চল অবস্থাকেই পরমাবস্থা বলিয়া মনে করে। এ যেন অশ্বত্থামার দুগ্ধপান। শুদ্ধ কাব্যানন্দের আস্বাদন হইলে মনে হয়,—"উহা যেন পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হইতেছে, যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, যেন সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে,

অন্য সকলই যেন তিরোহিত করিতেছে, যেন ব্রহ্মাস্বাদ অনুভব করাইতেছে, অলৌকিক চমৎকারী এই রস।" (মম্মটভট্ট) মনস্বী বেনেডেটো ক্রোচে 'pure poetic joy' বা বিশুদ্ধ কাব্যানন্দের প্রকাশ বুঝাইতে গিয়া 'Passage from troublous emotion to the serenity of contemplation' দ্বারা ভাবচঞ্চল অবস্থা অতিক্রম করিয়া শান্ত রসস্বরূপে স্ফূর্তিই লক্ষ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের আরও অনেক পণ্ডিত ও কবিও সাধারণীকরণ ও এই ভাবচঞ্চল অবস্থা নিজেদের মত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য আলোচনার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বেই এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সুস্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, দেখা যায়।

আনন্দের ভিখারী মানুষ। এ আনন্দ আত্মানন্দই, বাহিরের বস্তু অবলম্বনমাত্র। মানুষ নিজেকে জানিয়াও জানে না, পাইয়াও পায় না, তাহার চিদাবরণ ভাঙ্গে না। গোপন প্রকাশের এ এক আশ্চর্য লীলা। তাই তো নিজেদের স্বরূপাবরক কোষগুলি খসাইবার জন্য মানুষের এত চেষ্টা। পরিচিত পরিবেশের সীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া অসীম ভূমায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই যে দিনের অশ্রান্ত খাটুনির পর কাব্যাস্বাদনের ইচ্ছা, কীর্তন, সঙ্গীত, নৃত্য বা মজলিসের জন্য, অথবা অভিনয় বা ছায়াচিত্র—দর্শনের জন্য মানুষের এত ব্যগ্রতা, অর্থব্যয় ও ক্লেশস্বীকার; ইহার মূলে রহিয়াছে সাক্ষাৎ ভাবে আনন্দলাভের প্রেরণা। সে তাহার পরিমিত ব্যক্তিসত্তাকে বিস্মৃত হইয়া অন্তরের আনন্দময় সত্তায় জাগ্রত হইতে চায়। সহজে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে কাব্যযোগ বা শিল্পযোগ দ্বারা।

তথাপি এ কথা বলা আবশ্যক, দুই এক নয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ-সাধনা এবং লৌকিক কাব্যযোগ-সাধনা, অথবা বিশুদ্ধ আত্মানন্দ ও বিমিশ্র কাব্যানন্দ এক নয়। দুই-এর প্রভূত সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই-এর পার্থক্য প্রচুর। যে নির্লিপ্তি বা নিরাসক্তির কথা বলা হইল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহা সাধকগণের চরিত্রগত স্থায়ী ধর্ম হওয়া আবশ্যক এবং তাহার সাধনাও চলে শ্রদ্ধাতিশয়-সহকারে নিরন্তর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। কাব্যের ক্ষেত্রে নির্লিপ্তি তৎকালের নিমিত্ত আত্মবিস্মৃতি, প্রবৃত্তিগুলিকে নির্মূল করা নয়, ঘুম পাড়াইয়া রাখামাত্র এবং তাহার জন্যও পাঠককে মন শূন্য করিতে হয় না, বিচিত্র বিষয়ান্তরে সন্নিবেশ করিতে হয়। অধ্যাত্মযোগের ন্যায় কাব্যযোগের সাধনায়ও পতন আসে এই দৃঢ় আসক্তি হইতে, সর্বত্রই সেখানে ভয়। এই আসক্তি সাময়িক ভাবেও লুপ্ত না হইলে ভাবলোকেই থাকিতে হয়, রসলোকে আর প্রবেশ হয় না।

অধ্যাত্মসাধনার প্রাপ্তি সাধারণতঃ পূর্ণ প্রাপ্তি ও অক্ষয় প্রাপ্তি। কাব্য-সাধনায় শুদ্ধানন্দ বা শুদ্ধরসের প্রকাশ হয় কদাচিৎ। সেখানে রসের পশ্চাতে স্থির ভাব থাকে—, কারণ ভাব-হীন রস নাই, অবশ্য রস-হীন ভাবও নাই। তুলনায় বলা চলে—দুইই ভাল হইলেও একটি নির্মল সলিল, অপরটি আবিল বারি; একটি স্থিরপ্রভ জ্যোতিষ্ক, অপরটি অস্থির বিদ্যুৎ। বিষয়বস্তু একান্ত অপ্রধান বলিয়া শিল্প-সাধনার মধ্যে গানের সাধনাই শ্রেষ্ঠ, কেবল সুর অবলম্বন করিয়া মন ঊর্ধ্বে উধাও হয় সহজে। এই জন্যই বলা হয় গান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই,—গানাৎ পরতরং ন হি।

(৩)

কাব্যের নিকটে অধ্যাত্মসাধকগণের বড় কম নয়। বৈষ্ণব-সাধনার কথাই প্রথমে বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণব-সাধনা ভক্তি

সাধনা, বৈষ্ণব-সাধনায় হৃদয়বৃত্তির চর্চার ভাব বা রস-বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অপূর্ব তন্ময়তা জন্মিলে রসস্বরূপ ভগবানের পরম রস প্রকাশ পাইয়া থাকে। পদ্ধতি ও প্রকার একই রূপ। বৈষ্ণবাচার্যগণের আলোচনা, আস্বাদন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অলঙ্কারাচার্যগণের অনুরূপ। অলঙ্কারাচার্যগণের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রাণময় সাধনার দ্বারা ভক্তি-তত্ত্বকে রসায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন, আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের ভক্তীকরণ বা ভক্তিভাবতা আপাদন করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্র পণ্ডিত শ্রীবোপদেব গোস্বামীর 'মুক্তাফল' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বৈষ্ণব ভক্তিরসের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। বোপদেব নিজ মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার কৃত 'কৈবল্যদীপিকা' টীকায় ভরতমুনি হইতে মম্মট ও হেমচন্দ্র পর্যন্ত অলঙ্কারাচার্যগণের অভিমত নানা ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভরতমুনিই রসতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যাতা, তাঁহার আবির্ভাবকাল কেহ কেহ বলেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী।

কেবল বৈষ্ণব-সাধনা কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসাধনায় কাব্যকে কত রূপে যে আশ্রয় করা হইয়াছে তাহা এক পৃথক প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়। রামায়ণ ও মহাভারত তো বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ঘোষণায় কাব্যই। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ কাব্যধর্মেই সমুজ্জ্বল। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রমালার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য কাব্যচ্ছন্দঃ, কাব্যালঙ্কার, ও কাব্যবাগ্‌ভঙ্গী আশ্রয় করিয়াই পরিস্ফুট। শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্রসমূহকেই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতার আরম্ভ ও শেষাংশে আশ্চর্য কাব্যের প্রকাশ। বাইবেলের ভাষা কাব্য বলিয়াও অধীত হয়। সোলেমনের **'Song of Songs'**, গুরু নানকের ভজন, মীরাবাঈয়ের সঙ্গীত কাব্য-সাহিত্যেরও মধ্যমণি। অধ্যাত্ম-সাধনায় কাব্যের রূপ, প্রতীক, উপমান, অলঙ্কার, ছন্দ ও গুণ প্রভৃতি আশ্রয় করা হয় কেন? কাব্যের নির্ভর মুখ্যতঃ বিষয়বস্তুর উপর নয়, বিষয়বিন্যাস ও বাচনভঙ্গীর উপর। সেই সকল না হইলে বাক্যাশ্রিত কোন বিষয়ই সুষ্ঠু রূপে গ্রহণযোগ্য হয় না। আবার সমুন্নত জ্ঞানোপলব্ধি বা ভাবানুভূতি যে ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা। কাব্যের রূপ ও ভাষা-মানুষের সহজ সম্পত্তি। যেখানেই স্ফুটবাক্ ও সুষ্ঠুবাক্ সেখানেই কাব্যের প্রকাশ। কাব্য-যোগ তাই যেমন স্বতন্ত্রযোগ, তেমনই সকল যোগের আশ্রয়-ভূত এক সাধারণ যোগ।

গান

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

(তুমি) অলখে বসিয়া পলকবিহীন
　　আঁখি মেলি নিতি চাহিছ হে,
মোর হৃদয়ের বীণাটি বাজায়ে
　　নিজ গানখানি গাহিছ হে।

আমি এই ভব-পারাবারে আসি
　　দুখ-সুখ-দোলে যতই না ভাসি
(মোর) জীবন-তরীর হালখানি ধরি,
　　তুমি যে আড়ালে বাহিছ হে!

আমার সকল বেদন-অশ্রু
　　তোমারি অঙ্কে ঝরে,
তুমি যে আকুল পরশ বুলাও
　　নিভৃতে আপন করে;

মোর ভাবনার কিছু নাহি আর
　　তুমি আছ, তুমি আছ যে আমার
আপন সোহাগে চির অনুরাগে
　　নিজ কাছে নিতি চাহিছ হে।

জড়, শক্তি ও চেতনা

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই বিরাট ভৌতিক জগৎ যে শক্তিরই (Energy) রূপান্তর এই ধারণা আনিয়া দর্শনের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহার মতে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর নির্মাতা যে পরমাণু সেগুলি চরম বিশ্লেষণে শক্তিপুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুমহান্ হিমালয়, অসীম বারিধি বা বায়ুমণ্ডল, অথবা অগণন তারকারাজি বা নীহারিকাপুঞ্জ—সবই শক্তির খেলা, শক্তির পরিণাম। এক সীমাহীন শক্তি এই সব রূপ ধরিয়া এবং ইহাদিগকে ব্যাপিয়া, ইহাদের অন্তর-বাহির পূর্ণ করিয়া, ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, রূপান্তরিত করিতেছে। কিন্তু ইহা জড়। এত যে করিতেছে এগুলি করা নয়; এগুলি সব হওয়া—সব কর্মকর্তৃবাচ্য।

সাধারণতঃ চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম প্রভৃতিকে যে আমরা জড় বলি তাহার অর্থ উহারা 'নানা' হইতে পারে না, বাড়ে না, কমে না। প্রাগুক্ত 'শক্তি' কিন্তু নানা হয়, বাড়ে, কমে। তথাপিও উহাকে আমরা জড় বলি, এই অর্থে যে ইহার প্রাণ নাই। গাছ, পিঁপড়া বা ফড়িং প্রাণী, কারণ ইহারা নিজের ইচ্ছামত জিনিষ গ্রহণ বা ত্যাগ করে, গ্রহণ করিয়া নিজের শরীরের উপাদানে পরিণত করে, এবং সর্বোপরি নিজ জাতির বিস্তার সাধন করে। জড়শক্তির মধ্যে এই সকল প্রাণধর্ম দেখা যায় না।

তবে প্রাণশক্তি কি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ? ইহা অবশ্যই বিশ্ব-প্রকৃতির বাহিরকার কোন বস্তু হইতে পারে না। কারণ সুদূর নীহারিকাপুঞ্জের অস্তিত্বকে পর্যন্ত ব্যাপিয়া যে শক্তি বর্তমান তাহার বাহিরে কোন বস্তু থাকিলেও আমাদের এই জগতে তাহার আগমন ও স্থিতির সম্ভাবনা অল্পই। অতএব প্রাণ আমাদের এই সর্বব্যাপী শক্তির ভিতরকারই বস্তু। ভিতরে থাকা দুই ভাবে হইতে পারে—জলমগ্ন কলসীর ন্যায় 'তদপর' বা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া, অথবা 'তদংশ' বা 'তন্ময়' হইয়া। প্রথম ভাবে হইতে পারে না। কারণ কলসীর মৃত্তিকা জলের যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তথায় জল নাই; জলের প্রবেশাধিকার নাই। প্রাণ কিন্তু এই শক্তির সহিত ওতপ্রোত রূপে জড়িত; ইহাকে বাদ দিয়া প্রাণকে কোথাও দেখা যায় না। তাই ইহা কলসীর ন্যায় 'অপর' নহে।

ইহা 'তদংশ' বা 'তন্ময়'? গাছ বা ফড়িঙের কোন অংশে প্রাণ? ফড়িঙের প্রাণশক্তি অপেক্ষা বাঘের প্রাণশক্তি লম্বা-চওড়ায় কয় বর্গফুট অধিক বা প্রাচুর্যে কত 'ওয়াট' বা 'হর্স্-পাওয়ার' বেশী? কম-বেশী বা অংশাংশীর প্রশ্ন যখনই আমাদের মনে উঠে, তখনই লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, আমরা আমাদের পরিচিত জড়-শক্তি বা তাহার বাহক শরীরের কথা ভাবিতেছি। প্রাণশক্তি দেহের সকল অংশ ব্যাপিয়া থাকে এবং জোরের তারতম্য শরীরের মাংসপেশী প্রভৃতির জন্য হয়। শরীরে প্রাণ আছে বলা অপেক্ষা শরীর প্রাণময় বলা ভাল। মৃত্যুর সময় যাহা বাহির হয় তাহা শ্বাস বা বায়ু, যাহা জড়। অতএব প্রাণকে আমরা জড়শক্তির 'অপর' হিসাবে তো দেখিই না, অংশ হিসাবেও দেখিতে পাই না, প্রমাণ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গোচর

যাহা হয়, প্রমাণের বিষয় যাহাকে করিতে যাই তাহা আমরা হতাশ হইয়া দেখি, আমাদের তথাকথিত জড়শক্তি বা তাহার কার্য। খাদ্য বা পানীয় হিসাবে যাহা আমরা এই শরীর-যন্ত্রের ভিতরে দিই তাহা আমাদের প্রাণকে সক্রিয় করিয়া শরীর পুষ্ট করে। এই দিক দিয়া দেখিলেও এই খাদ্য-পেয়কে প্রাণের কারণ বলিতে হয়।

একই শক্তি অবস্থাবিশেষে প্রাণরূপে বা ভূত-ভৌতিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রাণী প্রাণহীন হইল বা প্রাণহীন হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইল। আসলে কিন্তু একভাবে ক্রিয়াশীল প্রাণশক্তি স্তব্ধ হইল, সুযোগ পাইলে—আর সুযোগ পাইয়াই থাকে—তাহা অন্য এক বা অনেক ভাবে পুনরায় প্রকাশ পাইবে। যে শ্বাসাংশ বাহির হইয়া যায় তাহাও একটা অসাধারণ ক্রিয়া নয়। প্রাণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপেই যাওয়া-আসা করিতেছিল, অর্থাৎ ঐ ভাবে প্রাণ সক্রিয় ছিল। কোন এক সময় তাহা অক্রিয় বা স্তব্ধ হইল। ঠিক অক্রিয় বা স্তব্ধ নয়, তাহার ঐ বিশেষ ক্রিয়া বন্ধ হইল। কারণ অসীমের সহিত তাহার লেন-দেন তখনও চলিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

যুক্তি বলিতে বাধ্য করিতেছে যে এই ভূত বা জড়শক্তি এবং প্রাণশক্তির মধ্যে পার্থক্য ইচ্ছাকে লইয়া। পাহাড়-খনিও বাড়ে, পোকা-মাকড়ও বাড়ে; পার্থক্য ইচ্ছায়। হিমালয় বিশাল কিন্তু প্রাণহীন, কারণ ইচ্ছা নাই, পোকাটি অতি ছোট কিন্তু প্রাণবান্, কারণ ইচ্ছা রহিয়াছে। গাছেরও সুখ-দুঃখবোধ আছে, ইচ্ছা আছে—জিরাইতে চায়, অবসন্ন হইয়া পড়ে, খাদ্যপানীয় চায়, পাইলে প্রসন্ন হয়, অন্যথায় নিস্তেজ হইয়া যায়। ইহা কবিকল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত। অতএব সেই এক সর্ব-ব্যাপী ভূতশক্তিতে যখন ইচ্ছা বা বোধের বিকাশ দেখি, তখন তাহাকে আমরা প্রাণশক্তি বলি—জিনিষ এক, কার্যবশতঃ নামভেদ।

'বোধ' ও 'ইচ্ছা'—এই দু টি কথা ব্যবহার করা হইল। অন্যায় কিছু হয় নাই। কারণ উহারা এক বস্তুর দুইটি মুখ—যখন অন্তর্মুখীন তখন বোধ, যখন বহির্মুখী তখন ইচ্ছা, নিজা-স্বাদনে বোধ, পরের উপর ক্রিয়ায় ইচ্ছা। একই শক্তি যখন জানিতেছে, অনুভব করিতেছে, তখন বোধি, সাত্ত্বিকী, যখন পরের উপর ক্রিয়াশীল তখন প্রাণনী, রাজসী; যখন স্তব্ধ (পর-) ভোগ্য তখন ভৌতিকী, তামসী।

আবার এই তিন প্রকার শক্তির কোন একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকে না। যখন আমাদের থাকে বলিয়া মনে হয়, তখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিব তাহারা একই বোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ (?) হিসাবেই রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে 'অ্যাটম্' লইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং মনে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতেছেন, ও অপরকে বুঝাইয়া দিতে সতত প্রস্তুত যে, তিনি কেবল জড়শক্তির বিকাশ লইয়াই কারবার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার বোধশক্তি তাঁহাকে এক যুক্তি ও পদ্ধতি হইতে অপরে লইয়া যাইতেছে, তাহাদের টুকরাগুলিকে একত্র করিতেছে, স্মৃতিরূপে তাহাদিগকে গাথিয়া রাখিতেছে; তাঁহার প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে বোধের নির্দেশে কার্যে নিযুক্ত করিতেছে, এবং যন্ত্রাদি জড়শক্তি ও ভৌতিক 'অ্যাটম্' প্রভৃতি জড়শক্তিকে ইচ্ছামত কার্য করাইয়া লইতেছে। এখানে এই তিন প্রকার শক্তির একটির অভাব হইলে পর্যবেক্ষণ-কার্য অচল হইবে। বিচার করিয়া দেখিলে আমরা সর্বত্র এই তিন যমজ ভগিনীকে একত্র দেখিব—যমজ বলি কেন, ইহারা একোদর পৃথগ্‌গ্রীবা। এই তিন প্রকার শক্তিই

বৈজ্ঞানিকের বোধে বিধৃত। তবে কোথাও কখন একের প্রাবল্য; কোথাও কখন অপরের —এই মাত্র ভেদ।

প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সত্যই কি এক? আর একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। (১) মশা কামড়াইলে আমরা হাত নাড়িয়া মারিতে যাই। এখানে হাত নাড়াটি বুদ্ধিপূর্বক হইল এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য হইল। তাই উহা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া। (২) আমি বন্ধুর সহিত কথা কহিবার সময় অনর্থক পা নাড়িতেছি। এখানে পা-নাড়া কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে না; কিন্তু প্রথমে বুদ্ধিপূর্বক বলিয়া মনে না হইলেও বিচার করিলে দেখা যায় উহা ঐরূপ বটে। কারণ উহা বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ করি, বুদ্ধিপূর্বক শিখিয়াছিলাম, এবং এই বুদ্ধি যখন কার্যকরী না থাকে, যেমন স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে, তখন পা নড়ে না। আমরা বলিয়াও থাকি, ইহা অভ্যাসে হইতেছে। অভ্যাসটি অবচেতনার কার্য। অর্থাৎ উহা বুদ্ধিপূর্বকই হয়, তবে বুদ্ধিটি সজাগ নহে, আধ-ঘুমন্ত, যেমন আধ-ঘুমন্ত শিশু স্তন্যপানের আশায় হাত বাড়ায় বা কাঁদে। আর পা-নাড়াটা বাস্তবিকপক্ষে অনর্থকও নয়। কারণ যখন পা নাড়িতে শিখি তখন উহা সার্থক ছিল, পা নাড়ায় এখনও সেই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে। তবে বন্ধুর সঙ্গে কথা-কহার সহিত উহার মুখ্য যোগ নাই। আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা শরীর খাটাইয়া খান তাঁহাদের অনর্থক অঙ্গ-সঞ্চালন হয় না। যাঁহারা বসিয়া বসিয়া মস্তিষ্ক খাটান তাঁহারাই বৃথা অঙ্গ নাড়েন। অঙ্গ বেচারীর উহা প্রয়োজন। অনেক সময় আবার চিন্তাবেগ তাহার বহির্গমনের দ্বার ঐভাবে খুঁজিয়া লয়। অবশ্য একদল লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আর এক অভ্যাস দ্বারা এই ক্রিয়া বন্ধ করিয়া ঐ রুদ্ধশক্তিকে উচ্চতর কার্যে লাগাইয়াছেন। আসলে কিন্তু প্রাণের এই ক্রিয়াটি সহজ ও সার্থক। (৩) হৃদয় ধুক ধুক্ করে। এই ধুকধুকানি প্রাণের ক্রিয়া, এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্বক নয় বলিয়া মনে হয়। এখানে এই মনে হওয়ার বাহাদুরি আছে বলিতে হইবে। কারণ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, বুদ্ধি নাই—ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হয় বলা হোক উদ্দেশ্যবিহীন, নয় বলা হোক সবুদ্ধিক। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন বলিবার উপায় নাই। এইজন্য মানিয়া লইতে হইবে যে উহা বুদ্ধিপূর্বক। তবে ঐ বুদ্ধি অবচেতনার স্তরে ক্রিয়াশীল, তাই উহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। এইরূপ সবক্ষেত্রেই দেখিব, প্রাণকে ইচ্ছা হইতে পৃথকভাবে দেখিতে পাই না, প্রাণ ও ইচ্ছা এক।

এই পর্যন্ত মানিতে তত কষ্ট না হইলেও জড়জগৎও প্রাণ বা ইচ্ছার খেলা—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সবং প্রাণ'* এজতি নিঃসৃতম্"—ইহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব, ইহা নিছক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই তথাকথিত জড়জগতের সর্বত্র আমরা উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ দেখিতে পাই কি না। যদি পাই, তবে স্বীকার করিতে হইবে এই সারা বিশ্ব প্রাণ বা ইচ্ছাশক্তির লীলামাত্র। আর ইচ্ছা ও বোধ এক বলিয়া ইহা বোধময়ী; চিন্ময়ী। তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে: চিন্ময় মন, চিন্ময় প্রাণ, চিন্ময় জগৎ।

* কঠ উপ, ২।৬।২। এখানে পূজনীয় ভাষ্যকার 'প্রাণ' অর্থে 'পরব্রহ্ম' গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ গ্রহণ করি। কিন্তু 'প্রাণ'কে 'প্রাণশক্তি' হিসাবে গ্রহণ করিলেও সুন্দর অর্থ পাওয়া যায়, যাহা ভাষ্যকার-অনুমোদিত অর্থের পূর্ণ অনুকূল।

বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে (এই বৎসর, ১৯৫২ সালে) একমাস ধরিয়া মেক্সিকো দেশ দেখিয়া আসিবার সুযোগ হয়। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া নগরে সাড়ে পাঁচ মাস অবস্থান করিবার পর ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিমান-যোগে মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো-নগরীতে পহুছাই। মেক্সিকো নগরী হইতে আশে পাশে কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়া আসি। পরে ১লা মার্চ মেক্সিকো হইতে বাহির হইয়া মোটর বাসে Puebla পুয়েব্লা শহরে যাই, সেখান থেকে রেলযোগে ২৬০ মাইল দূরে অবস্থিত Oaxaca ওয়াথাকা শহরে উপস্থিত হই ২রা মার্চ। ওয়াথাকা মধ্য-মেক্সিকোর প্রাচীন সুসভ্য জাতি Zapotec সাপোতেক্‌দের কেন্দ্র। দুই রাত্রি ওয়াথাকায় থাকি, এবং ওয়াথাকার নিকট-বর্তী প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ Monte Alban মন্তে আল্‌বান্ আর Mitla মিৎলা নামে দুইটী স্থানে দেখিয়া আসি। প্রাক্-কলোম্বাস্ যুগের আমেরিকার সভ্যতার এবং বাস্তুশিল্পের অদ্ভুত বিস্ময়কর এবং অতি মনোহর নিদর্শন এই দুই স্থানে আছে। ওয়াথাকা হইতে পরে ৪ঠা মার্চ এক টানা ১৫৩ মাইল পথ মোটর বাসে করিয়া Tehuantepec তেহুআন্‌তেপেক সংযোজকের রাজধানী তেহুআন্‌তেপেক্ শহরে যাই। এই শহরও সাপোতেক্ জাতির আর একটী কেন্দ্র।

ওয়াথাকা থেকে তেহুআন্‌তেপেক—এই সুদীর্ঘ যাত্রা হইয়াছিল Pan-American Highway অবলম্বন করিয়া। Pan-American Highway অর্থাৎ সমগ্র আমেরিকা-রাজবর্ত্ম সারা আমেরিকা মহাদেশকে জুড়িয়া দিবা এক করাইবার জন্য সংযুক্ত-রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় গঠিত পৃথিবীর দীর্ঘতম রাজপথ। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার Alaska আলাস্কা প্রদেশ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার পাদদেশে Tierra del Fuego তিয়েররা-দেল্ ফুয়েগো পর্যন্ত সমগ্র আমেরিকাখণ্ডকে এক রাজপথ-পাশে নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এই রাজপথ সম্পূর্ণ হইলে। যেখানে যেখানে এই রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে সেখানেই টানা মোটর-গাড়ীতে এই সুদীর্ঘ ও সুগঠিত রাজপথে ভ্রমণ করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার অর্থানুকূল্য আছে, আমেরিকার বাস্তুকার ও যন্ত্রবিৎদিগের সহায়তা আছে, এবং বিভিন্ন দেশের রাজশক্তিরও সহায়তা আছে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে সারা মেক্সিকো দেশে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত এই রাজপথ এখন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। মেক্সিকোর দক্ষিণের দেশগুলিতে এখন ইহার তৈয়ারী চলিতেছে। সমতল-ভূমি, পাহাড়-পর্বত, মরু-ভূমি, জলা, নদী, সব অতিক্রম করিয়া যতদূর সম্ভব সোজা এই পথ গিয়াছে। চওড়া কংক্রীটের রাস্তা, দুই খানি বড় মোটর বা লরী পাশাপাশি যাইতে পারে। মাঝে মাঝে পথের ধারে পেট্রোলের দোকান আছে। সারাদিন এই রাস্তায় সরকারী বেসরকারী গাড়ী ও বাস চলাচল করিতেছে। ওয়াথাকা হইতে এই Pan-American Highway-তে বাসে করিয়া তেহুআন্‌তেপেক যাইবার জন্য প্রাতঃকালে ৮টায় রওনা হইলাম। বেশ বড় বাস্, কিন্তু যাত্রীও যথেষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় আর নূতন যাত্রীর স্থান নাই। বেলা একটার

দিকে আমরা Salina Cruz সালিনা-ক্রুস্ বন্দর হইয়া তেহুআন্তেপেক-এ পৌঁছিব।

বেশ চমৎকার আমাদের বাস চলিল। মেক্সিকোর এই অঞ্চলটা পাহাড়ে ভরা—পর পর বহু সুন্দর পাহাড়িয়া দৃশ্য, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বাস মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে যে-সব ছোট বড় শহর পড়ে এবং বড় গ্রাম পড়ে, সে গুলিতে থামিতেছে। আবশ্যক-মত যাত্রীরাও নামিয়া পথের পার্শ্বে রেস্তোরাঁয় গিয়া পান ভোজন করিতেছে। ফেরিওয়ালারা—ইহাদের বেশীর ভাগই হয় মেয়ে না হয় ছোট ছেলে—নানাবিধ ফল এবং মেক্সিকান মিষ্টান্ন যাত্রীদের বিক্রয় করিতেছে। বেশ খানিকক্ষণ মোটরে চলিয়া একটু করিয়া বিশ্রাম, মোটর হইতে নামিয়া একটু করিয়া হাঁটা ও গ্রামের বা নগরের প্রবহমান জীবনের একটু ঝাঁকি-দর্শন, মন্দ লাগিতেছিল না। সকালে বেশ ভাল করিয়া ওয়াথাকার হোটেলেই প্রাতরাশ সারিয়া লইয়াছিলাম, বেলা একটা দেড়টা পর্যন্ত আর কিছু না খাইলেও চলিবে। তবুও কোথাও একটা কমলালেবু, কোথাও একটা বরফের মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা করা কমলালেবুর পানা বা রস—অরেঞ্জেড বা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ—খাওয়া আমাদের এই অবতরণের অঙ্গ ছিল।

আমাদের বাসের যাত্রী প্রায় সকলেই মেক্সিকো-দেশীয়। সব শ্রেণীর মেক্সিকান্ চলিয়াছে—রাজার জাতিরূপে যাহারা সেদিন পর্যন্ত মেক্সিকোতে সম্মানিত হইত সেই খাঁটী স্পানীয় ছিল, আবার ওদিকে বিশুদ্ধ আমেরিণ্ডিয়ান জাতির মেক্সিকোর কৃষক ও শ্রমিকও ছিল; আর ছিল মেক্সিকোর জনসাধারণ যাহাদের লইয়া, দেশের অধিবাসীদের মধ্যে অনুপাতে যাহারা শতকরা ৬৫, সেই মিশ্র মেক্সিকান-স্পানীয় জাতির লোক—Mestizo মেস্তিজো যাহাদের বলে। সকলেই স্পানীয় ভাষা জানে ও বলে, এবং এই ভাষাতে কথার গুঞ্জন সারা ক্ষণ শোনা যাইতেছিল। এ ছাড়া, দুইজন আমেরিকান্ অর্থাৎ সংযুক্ত-রাষ্ট্রের লোকও ছিল—একটী মেয়ে আর একটী পুরুষ। এই পুরুষটী গাড়ীর মধ্যে পিছন দিকে একজন মেক্সিকান্ ভদ্র-লোকের সঙ্গে বসিয়াছিলেন, এবং মহিলাটী গাড়ীর সামনের দিকে, আমার আসনের পাশেই প্রায় বসিয়াছিলেন। পুরুষটী মাঝে মাঝে আসিয়া এই মহিলাটীর পাশেই বসিতেছিলেন, এবং তখন দুই জনেই ইংরেজীতে কথা কহিতেছিলেন। বিস্তর আমেরিকান যাত্রী প্রতি বৎসর মেক্সিকোতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যের সূত্রেও অনেকের আগমন হয়। সুতরাং রাজধানী হইতে সুদূরে মফঃসল অঞ্চলে আমে-রিকান্দের গতায়াত দুর্লভ ব্যাপার নহে। ইহারা দুইজনে যে আমেরিকান্, সেইটুকু আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মেক্সিকো দেশে ইংরেজী-জানা লোক আমেরিকার সান্নিধ্য হেতু প্রচুর পাওয়া যায়, তবুও আমার অনভ্যস্ত স্পানিশ ভাষার দেশে দুই জন ইংরেজী ভাষা জানে এমন লোককে পাইয়া, তাহাদের সম্বন্ধে একটু কেমন যেন একটা আত্মীয়তার ভাব আমার মনে আসিয়া গিয়াছিল।

যখন আমরা আমাদের যাত্রার প্রায় চৌদ্দআনা পথ শেষ করিয়াছি, তখন একটা ছোট গ্রামে আমাদের গাড়ী থামিল। অন্য যাত্রী অনেকেই নামিল, আমেরিকান্ ভদ্রলোকটী এবং মহিলাটীও নামিলেন, আমেরিকানের সঙ্গী মেক্সিকান্ ভদ্র-লোকটীও নামিলেন। রাস্তার ওধারে ওয়াথাকা-গামী কতকগুলি লরী দাঁড়াইয়া আছে, সেগুলির উপরে কাঠের রেলিং দেওয়া বড় বড় খাঁচার মতন, তাহাতে গোরু যাইতেছে, গোরুগুলিকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া খাঁচায় পোরা হইয়াছে, বেচারীদের নড়িবার শক্তি নাই। এ ধরণের নির্বোধ নিষ্ঠুরতা আমার ভাল লাগে না, আমে-রিকান মহিলাটীও এই বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত

করিয়া জীবজন্তুদের প্রতি অজ্ঞতা- বা ঘৃণা-প্রসূত নিষ্ঠুরতার সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন। আমি তাহার পরে রাস্তার ধারেই ছোট একটী রেস্তোরাঁয় গেলাম। এটী একাধারে ভোজনাগার, পানশালা, মুদিখানা, মণিহারী জিনিসের দোকান এবং ডাকঘর। মেক্সিকান যাত্রীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই নানা খাদ্য কিনিয়া খাইতেছে—ইহাদের একটী খুব প্রিয় খাদ্য হইতেছে ভুট্টার আটার চাপাটী, নন্নী-পাক করা, ভিতরে মুর্গীর মাংসের পুর। একটা বিরাট খোলা কাঠের বাক্স, সেটা ভাঙ্গা বরফে ভরা, বরফের মধ্যে নানারকম পানীয়ের বোতল রাখা হইয়াছে—অরেঞ্জ-স্কোয়াশ, লেমনেড, কোকাকোলা, জিঞ্জারেড এবং বিয়ার। আমি রেস্তোরাঁর ভিতরে গিয়া, চকিতের দৃষ্টিতে সব দেখিয়া লইয়া, একটা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ পানের জন্য চাহিলাম। আমাকে বাক্স হইতে রুচি-মত যে কোন পানীয় উঠাইয়া লইতে বলিল। পরে হোটেলের মালিক এক জন গাট্টা-গোট্টা চেহারার মেক্সিকান, গায়ের রংটা একটু ময়লা, আমার কাছ হইতে বোতলটা লইয়া তাহার ছিপি খুলিয়া দিল। আমি পান করিয়া খালি বোতল টেবিলের উপরে রাখিয়া দাম দিতে গেলাম। দোকানদার দাম লইতে চাহিল না। আমি আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্পেনিশে বলিলাম, দাম দিতে চাই, কত দাম বলো। তখন আমেরিকান ভদ্রলোকটী যিনি সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহযাত্রী সঙ্গী মেক্সিকান ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি বলিলেন, দোকানীও বলিল—একজন ইংরেজীতে অন্যজন স্পেনিশে—দাম দিতে হইবে না, দাম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শুধাইলাম, কে আমার হইয়া দাম দিল? তখন দোকানী বলিল, ঐ Senor Prado সেঞর প্রাদো দিয়াছেন। ততক্ষণ আমেরিকানের সঙ্গী মেক্সিকান ভদ্রলোকটী দোকান-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় নামিয়া গিয়াছেন—দোকানীর কথায় বুঝিলাম, তাঁহার নামটি হইতেছে সেঞর (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত) প্রাদো। আমি দোকানের বাহিরে আসিলাম। আমেরিকান ভদ্রলোকটীও আসিলেন, তাঁহাকে আমি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি? আমি একজন অপরিচিত বিদেশী, ভদ্রলোক খামখা আমার হইয়া আমার পানীয়ের দাম এই ভাবে আগে-ভাগেই দিয়া দিলেন কেন? আমেরিকান ভদ্রলোকটী বললেন, মশাই, সেঞর প্রাদো এ অঞ্চলের এক জন বড়লোক, মস্ত ব্যবসায়ী, ওয়াখাকা, সালিনা ক্রুস, তেহুআন-তেপেক, Juchitan খুচিতান এই সব জায়গায় এঁর কারবার, ওয়াখাকার বরফের কলের মালিক, উনি বড়ই ভদ্র আর বিনয়ী, আপনাকে বিদেশী দেখিয়াছেন, তাঁর দেশে আপনি আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁর যেমন স্বভাব, আপনাকে এই ভাবে সামান্য এক বোতল অরেঞ্জ-স্কোয়াশ খাওয়াইয়া একটু আতিথ্য দেখাইতে চাহেন—He wants to do you as a stranger the honours of the place. ভদ্রলোকটী এইরূপে অযাচিত ভাবে বিদেশীর সঙ্গে হৃদ্যতা করিতে চাহেন, মন্দ লাগিল না। দেখিলাম, লোকটী বড় লাজুক প্রকৃতির এদিকে। রাস্তায় নামিয়া আসিয়া সেঞর প্রাদোকে আমেরিকান মহিলাটির সঙ্গে কথা বলিতে দেখিলাম, স্পেনিশেই উভয়ে কথা বলিতেছিলেন। আমি হাত বাড়াইয়া তাঁহার করমর্দন করিয়া সেঞর প্রাদোকে অভিনন্দন করিলাম, এবং আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্পেনিশে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। বলিলাম, আমি সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি, তাঁহার দেশে তীর্থযাত্রীর ভাবেই আসিয়াছি, প্রাচীন কীর্তি দেখিতে এবং আধুনিক মেক্সিকোর সংস্কৃতি আস্বাদন করিতে ও মেক্সিকোর লোকেদের সঙ্গে

সৌহার্দ স্থাপন করিতে। ভদ্রলোক বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, কেবল বলিতে লাগিলেন যে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বড়ই খুশী, তাঁহার বাড়ীঘর তাঁহার সময় সবই আমার সেবায় তিনি নিয়োজিত করিতে পারিলে সুখী হন, খুচিতানে তাঁহার নিজ বাড়ী, সেখানে আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন। খুচিতান তেহুআন্তেপেক থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। আমি তখন আমার পরিচয়পত্র তাঁহাকে দিলাম—একদিকে দেবনাগরীতে ছাপা, অন্যদিকে ইংরেজী অক্ষরে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানিয়া তিনি আরও খুশী হইলেন।

আমেরিকান মহিলাটী আমাদের কথা শুনিতেছিলেন। যাই তিনি বুঝিলেন আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি, অমনি হঠাৎ আমার সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল বাড়িয়া গেল। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—অ্যাঁ—আপনি ভারতীয়? আপনার চেহারা দেখিয়া আমার একটু সন্দেহ হইতেছিল। ইতোমধ্যে আমাদের বাস ছাড়িবার ডাক শুনিলাম, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়া বাসের মধ্যে উঠিয়া যে যাহার স্থানে বসিলাম। বাস ছাড়িয়া দিতেই মহিলাটী, আমার পাশে স্থান খালি ছিল, সেখানে উঠিয়া আসিয়া বসিলেন। বিশেষ ভদ্র শিক্ষিত চেহারার প্রৌঢ়া। তিনি আমার পাশে বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ভারতবর্ষের লোক, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে আপনি পরিচিত? এই সুদূর মেক্সিকোর এক অজ পাড়াগাঁ অঞ্চলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচয় রাখেন এমন আমেরিকান মহিলাকে বাসে সহযাত্রিণী হিসাবে পাইয়া আমিও ততোঽধিক আশ্চর্যান্বিত হইলাম। বলিলাম—হাঁ, নিশ্চয়ই জানি, এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিজ স্থান কলিকাতা হইতেই আসিতেছি। আমার কার্ড আর একখানি আমি তখন বাহির করিয়া ইঁহাকে দিলাম। দেবনাগরী অক্ষর দেখিয়া তিনি পুলকিত-বিস্মিত হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—এ যে সংস্কৃত ভাষা দেখিতেছি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি তো সংস্কৃত পড়িতে পারি না। কার্ডের অন্য পিঠে রোমান অক্ষরে আমার নাম ও পরিচয় ছিল। নাম পাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, Chatterji! তাহা হইলে কি আপনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আত্মীয়? সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে তিনি তো ছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায় বা চ্যাটার্জি! ভদ্রমহিলা তো বেশ ওয়াকিফ-হাল তাহা হইলে! আমি বলিলাম, আমরা একই গোত্রের—same clan—পরমহংসদেবের আর আমার পূর্বপুরুষ বোধ হয় ৩২।৩৩ পুরুষ পূর্বে এক ব্যক্তিই ছিলেন।

আমি বিশেষ উৎসুক হইয়া তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এত সংবাদ রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা ফ্রান্সেস্ ওয়েনার (Mrs) Frances Wenner; বাড়ী আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে—কালিফর্নিয়ার সান ফ্রান্সিস্কোতে। বহু বৎসর পূর্বে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়িয়া বেদান্তমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে কালিফর্ণিয়ায় লস-এঞ্জেলেস আর অন্যত্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার-কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আমেরিকায় মিশনের কাজে বহুকাল ধরিয়া তিনি আত্মনিয়োজিত হন। বেলুড় মঠ হইতে প্রেরিত মিশনের প্রায় তাবৎ সন্ন্যাসী ও কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত—অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দ প্রভৃতি আমেরিকাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইঁহার জানা-শোনা আছে; কারণ কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি মিশনের কার্য

বিশেষ আগ্রহের সহিত করিতেন। ইনি বিবাহিত, একটী কন্যা আছে। স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গে মিলিতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন লস্-এঞ্জেলেস হইতে ইংরেজী পত্রিকা একখানি বাহির করিতেন। উপস্থিত মিশনের সহিত পূর্বেকার সংযোগ আর রাখেন নাই, তবে বেদান্ত-দর্শনের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি পূর্ববৎ শ্রদ্ধা আছে, তৎসম্বন্ধে আকর্ষণ আছে, আস্থা আছে। সন্ন্যাসীদের কাহারও বা কাহাদেরও সঙ্গে কোনও বিষয়ে বোধ হয় ইঁহার মতদ্বৈধ ভাব হইয়াছিল, সেই জন্য আর পূর্বেকার মত সংযোগ রাখিতে পারেন নাই। মতভেদ হইলেও অশ্রদ্ধার ভাব একটুও দেখিলাম না। তাহা হইলে আমায় ভারতীয় বলিয়া জানিতে পারিয়াই এতটা আত্মীয়তার সঙ্গে কথা কহিতেন না।

মহিলাটীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা বিশেষ লক্ষণীয়। উপস্থিত তিনি মেক্সিকোতে সুদীর্ঘকাল ছুটীর মত কাটাইবেন স্থির করিয়া সংযুক্ত-রাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন। তেহুআন্-তেপেক-এর আরও দক্ষিণে সাগরতীরবর্তী একটা ছোট শহরে গিয়া থাকিবেন। সেখানে খরচ-পত্র খুব কম লাগিবে। পরে তিনি যখন আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে পুনর্বার যোগ দিবেন কিনা বিবেচনা করিবেন।

একটী জিনিস ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম। ভারতীয় দর্শন এবং ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্য হইতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কতটা ইনি পাইয়াছেন জানি না, তবে মনে হইল, যুক্তিযুক্ততার দিক হইতে অন্ততঃ তিনি ইহাতে গ্রহণযোগ্য অনেক কিছু পাইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইউরোপ আর আমেরিকার শিক্ষিত-জনের নিকটে ভারতীয় দর্শনের প্রথম আবেদন হইতেছে উহার বিচারনিষ্ঠ যৌক্তিকতা। এটী পশ্চিমের জগতের বহু প্রচলিত ধর্মমতে এখন পর্যন্তও সুলভ নহে।

মহিলাটী তাঁহার ঠিকানা দিলেন, ঠিকানাযুক্ত আমার কার্ডও রাখিলেন। ভবিষ্যতে পত্র-ব্যবহার হইবে, তখন আমরা উভয়তঃ স্থির করিয়াছিলাম—পাঁচ মাসের অধিক হইয়া গিয়াছে, কাজের চাপে চিঠি লেখা আর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু যতক্ষণ আমরা ঐ বাস্‌যাত্রায় আলাপ করিতেছিলাম, আমাদের ভাব-সাম্যের আধারে ততক্ষণ আমাদের পরস্পরকে যেন হঠাৎ-পাওয়া আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। সালিনা-ক্রুস্ বন্দরে মহিলাটী ও তাঁহার স্বদেশীয় সঙ্গী অবতরণ করিলেন। পরস্পরের প্রতি যথোচিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও "পুনর্দর্শনায়" বলিয়া আমাদের বিদায় সম্ভাষণ হইল।

মেক্সিকোতে ভ্রমণকালে হঠাৎ এই ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিদেশিনী কর্মিমহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া হয়তো এমন কোনও অদ্ভুত ব্যাপার নহে, কিন্তু একটী বিষয় প্রণিধান করিবার। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ যে দীপ জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কল্যাণে সে দীপ এখনও আমেরিকা ও ইউরোপখণ্ডে নিবে নাই। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি, জ্ঞানের পথে যদি কোথাও বিদেশে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে সে মুখ্যতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারাই হইয়াছে ও হইতেছে। অবশ্য, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং ভারতীয় অন্য ভাষা, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং আলোচনা হইয়া থাকে। খুব উচ্চশ্রেণীর বহু পণ্ডিত ও গবেষক ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমস্ত বিভিন্ন দিক্ লইয়া আত্মনিয়োজিত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধারণতঃ বক্তব্য কেবল মুষ্টিমেয়

ছাত্রের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁহাদের আলোচনার একটী দর্শন বা বিচার-পদ্ধতিকে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া ধরিবার বা দেখিবার এবং দেখাইবার আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সত্য বটে, বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংস্কৃতজ্ঞ বা ভারতবিদ্যাবিৎ ভারতীয় দর্শনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতীয় দর্শন তাঁহাদের কাছে একমাত্র সারবস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার মনের মধ্যে সংস্কৃত বইয়ের বোঝা বহিয়া বেড়ান এমন পণ্ডিতেরও দেখা পাইয়াছি, যাঁহাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সত্যকার প্রবেশ হয় নাই, জীবনের গভীরতম বস্তু সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল বা উপলব্ধি দুইয়েরই অভাব। রামকৃষ্ণ মিশন সৌভাগ্যক্রমে বিদেশে সত্যকার পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী অনেকগুলিকে পাঠাইয়াছেন, এবং ইঁহাদের দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহারা সংস্কৃত মূল গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও প্রচার করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশে ব্যাখ্যান ও পাঠনের দ্বারা মূল তত্ত্ব ও তথ্য, কৌতূহলী সাধারণ শিক্ষিত জনের গোচরে আনিয়া দিয়াছেন এরূপ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যে সংস্কৃতভাষা অথবা ভারতীয় বিদ্যার আলোচনা করিবেন, সে সম্ভাবনা কম। ইঁহাদের সস্নেহ আহ্বানে আমেরিকায় একাধিকবার ইঁহাদের আশ্রমে আমাকেও যথাজ্ঞান ভারতের বাণী সম্বন্ধে বলিতে হইয়াছিল। স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দ এবং আরও অনেকে, আমেরিকায় বিশেষ লক্ষণীয় কাজ করিতেছেন। পণ্ডিত এবং লেখক ও বক্তা বলিয়া সকলেরই সুনাম রহিয়াছে দেখিলাম, ধর্মগুরু ও উপদেষ্টা হিসাবে ইঁহাদের লোকপ্রিয়তার ও জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হইবার অন্য দিক্ও আছে। তেমনি দক্ষিণ-আমেরিকায় আর্জেন্তিনা দেশে Buenos Aires বুএনোস-আইরেসতে স্বামী বিজয়ানন্দ আছেন, তিনি স্পেনিশ ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর-আমেরিকার মেক্সিকোর পাঠক-সমাজেও তাহার চাহিদা যে আছে তাহা দেখিয়া আসিলাম। এদিকে পারিসে বারো বৎসরের অধিককাল ধরিয়া অবস্থান করিয়া স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ভারতীয় চিন্তার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমার নিজের সৌভাগ্য হইয়াছিল—পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Sorbonne সরবন কলেজে বেদান্ত-সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার ভাষণ শুনিয়াছি—কিরূপ আগ্রহের সঙ্গে প্রায় ৩।৪ শত ফরাসী যুবক যুবতী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে, নোট লইতেছে এবং প্রশ্ন করিতেছে তাহাও দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই সাধারণ বক্তৃতা ছাড়া, পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয়বিদ্যা-বিভাগের আমন্ত্রণে ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের উপনিষদ্ আলোচনার ক্লাসেও উপস্থিত ছিলাম—মূল সংস্কৃত ধরিয়া তিনি উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, ছাত্র-ছাত্রী এত অধিক জমা হইয়াছিল সেদিন যে অনেককে বসিবার চেয়ার না পাইয়া খবরের কাগজ পাতিয়া মেঝের উপরে বসিতে দেখিয়াছিলাম। এই দিনের ক্লাসে, পুরাতন সৌহার্দ ও স্নেহের কারণ স্বামীজী আমাকেও হিন্দুসংস্কৃতি-সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্রদের কিছু বলিতে অনুরোধ করেন—মিনিট পনেরো ধরিয়া আমার পুরাতন অধ্যয়ন-স্থান সরবন-এর এই সংস্কৃত দর্শনের ক্লাসে স্বামীজীর উপস্থিতিতে ইংরেজী আর ফরাসী মিশাইয়া কিছু বলি। তেমনি নিউইয়র্ক-এ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দেরও আহ্বান আসিয়া থাকে, স্বামী

ব্রহ্মময়ানন্দকেও নিউ-ইয়র্কের বাহিরে বক্তৃতা দিবার জন্য যাইতে দেখিলাম; এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যেখানে যেখানে বেদান্ত-সমিতি বা রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে সেখানে শিক্ষিত ও পণ্ডিত সমাজে ইঁহাদের শ্রদ্ধার আসন দেখিয়া আসিয়াছি। প্যারিসের কাছে Grex বলিয়া একটা গ্রামে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেখানে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া যাই, অন্য অভ্যাগতদের মধ্যে একজন খুব বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত ও দার্শনিককে দেখি, এবং স্বামীজীর ও এই পণ্ডিতটীর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখিয়া আমি সেদিন যেরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত।

পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলিতেন, এই যুগ হইতেছে বিশ্বসভ্যতার উপরে বাঙ্গালা দেশের এবং ভারতবর্ষের ছাপ পড়িবার যুগ। একথা সত্য যে মানবপ্রেমী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ঋষিকবি বিশ্বমানবিকতার পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক বাগ্মী রাধাকৃষ্ণন্, এই তিন জনের চেষ্টায় এখন ভারতের বাণী বিশ্বমানব-সভায় নূতন শক্তির সহিত পঁহুছিয়াছে ও দেশের একটী প্রভাবশালী যদিও ক্ষুদ্র বিচারশীল পণ্ডিত ও লেখক-গোষ্ঠী কর্তৃক এই বাণী তাহার বিশ্বজনীনতার দিক্ হইতে স্বীকৃত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রচারিত হইতেছে। হয় তো অদূর ভবিষ্যতে তাহার কার্যকারিতা বা অপরিহার্যতা পশ্চিমের দেশসমূহের মণীষিদিগের দ্বারা যুগোপযোগী করিয়া লইয়া স্বীকৃত হইবে। এই ভাবে বিশ্বমানবের সেবায় ভারতের অর্ঘ্যকে নিবেদন করার কার্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা যে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে করিতেছে, ও ভগবানের অভিপ্রেত হইলে আরও করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই॥

শরৎপ্রাতে

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

বর্ষা হ'ল গত,
আমার বুকের বাষ্প-জমাট বিষাদভাবের মতো—
সঙ্গে ল'য়ে কৃষ্ণ মেঘের দল,
অবিশ্রান্ত ধারা বৃষ্টি, বিদ্যুৎ চঞ্চল,
দিন-রাত্রির চিহ্ন-লোপী নিবিড় অন্ধকার,
ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-নিনাদ, প্লাবন দুর্বার।
ধীরে ধীরে উন্মেষিল শরৎ—
ধনে-ধান্যে, হরিৎ শ্রীতে ভরতে আজি মরৎ,
বর্ষাবাদল-মন্থনান্তে যেন
আর্দ্র চিকুর প্রসন্নমুখ লক্ষ্মীদেবীর হেন
দিগজোড়া ঐ সবুজ ধানে, লতায়-পাতায়, ঘাসে
আমার মনের সোনার স্বপন রৌদ্র হ'য়ে হাসে।
শুভ্র লঘু মেঘ-ভাসা ঐ স্বচ্ছ সুনীল আকাশ,
শীতল হাওয়া মনরে আমার কেমন করে উদাস।
দোয়েল-শ্যামার প্রাণকাড়া ঐ শিসে
হঠাৎ আমার করলো কী যে, বোঝাই বলো, কিসে
অমল ধবল দোদুল কাশের গুচ্ছ
আজকে আমার কাজের জগৎ করলো কেমন তুচ্ছ
শিশির-ভেজা শিউলিফুলের গন্ধে ভ্রমরসম
গুন্‌গুনিয়ে পরাণ কাঁদে মম!
জগন্মাতার আমন্ত্রণীর বার্তা করুণ সুরে
সানাই যে ঐ ছড়ায় নভে স্বর্ণাভ রোদ্দুরে
আমার প্রাণের হাসি-কান্নার মুগ্ধ মূর্ছনাতে—
আজকে মধুর বিধুর শান্ত স্নিগ্ধ শরৎ-প্রাতে।

রাজপুত-চিত্রকলা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

রাজপুত-চিত্র হইল রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড এবং হিমালয়ের অন্তর্গত পাঞ্জাবের চিত্র। এই চিত্রের কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে: রাজস্থানী (রাজপুতানা এবং বুন্দেলখণ্ড) ও পাহাড়ী। পাহাড়ী রীতির আবার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে, জম্মু ও কাংড়া। জম্মু শতদ্রুর পশ্চিমে পার্বত্য রাজ্য; আর কাংড়া হইল উক্ত নদীর পূর্বভাগের জলন্ধর-প্রদেশের পার্বত্য রাজ্য। সিমলার পূর্ব দিকের পার্বত্য রাজ্য গাড়োয়ালের চিত্র কাংড়ারীতির সঙ্গে যুক্ত। গাড়োয়ালের চিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কাংড়া পদ্ধতি হইতে উদ্ভূত। কাংড়া-চিত্রের সঙ্গে শিখ-চিত্রেরও সম্বন্ধ আছে। মহারাজা রণজিৎ সিং ও শের সিং-এর আমলে (১৭৯০-১৮৪৩ খৃঃ-এর মধ্যে) লাহোরে ও অমৃতসরের শিখ-চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল।

রাজপুত ও মোগল-চিত্র সমসাময়িক, এ দুয়ের পার্থক্য বোঝা দরকার। সাধারণতঃ অঙ্কিত বিষয় এবং অঙ্কনরীতি হইতে এই পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। মোগল-চিত্রের বিষয় হইল ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেজন্য এখানে 'প্রতিকৃতি-ও মোগল-দরবারের ঘটনা-বিষয়ক চিত্র প্রাধান্য পাইয়াছে। মোগল-চিত্র ব্যক্তিপ্রধান বলিয়া এখানে শিল্পীদের নাম পড়িয়া যায়; শতাবধি মোগল চিত্রকারের নাম পাওয়া গিয়াছে। অপরপক্ষে রাজপুত-চিত্র **impersonal** বা নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ ব্যক্তি-প্রাধান্য ইহাতে স্থান পায় নাই। ছয় সাতের অধিক রাজপুত-শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না। "Mughal painting is academic, dramatic, objective and eclectic; Rajput painting is essentially an aristocratic folk art, appealing to all classes alike, static, lyrical, and inconceivable apart from the life it reflects." আকবরের সময়ের চিত্রের লিরিক্যাল গুণ ছিল; তাহা তখন পারস্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে তাহা হইতে সরিয়া আসিয়াছে। আকবরের পরে মোগল-চিত্রে আর কাব্যের আরোপ দেখা যায় না।

রাজকুমার দানিয়েল (জাহাঙ্গীর) পারস্যের সঙ্গীতে ক্লান্তি বোধ করিয়াছিলেন, তিনি আর ফরহাদ ও সিরিনের কাহিনী শুনিতে চান না, হিন্দুস্থানে যাহা আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায়, সে সম্বন্ধেই তিনি লিখিতে ও পড়িতে উপদেশ দেন।

অপরপক্ষে রাজপুত-চিত্র মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী; কৃষ্ণলীলা, সঙ্গীত ভারতীয় প্রণয়লীলা না জানা থাকিলে ইহা বোঝা যায় না।

মোগলচিত্রে বায়ুমণ্ডল এবং বর্ণের কোমলত্ব আছে, এবং আলোছায়ার খেলাও আছে। দুই চিত্র—মোগল ও রাজপুত—রেখাপ্রধান হইলেও রাজপুত রেখা সুনির্দিষ্ট (definite), মোগল-রেখা প্রবহমান এবং ক্যালিগ্রাফিক (flowing and calligraphic)। চীনের ক্যালিগ্রাফির প্রভাব পড়িয়াছে পারস্যের চিত্রের উপর, পারস্যের ভিতর দিয়া ক্যালিগ্রাফি মোগলচিত্রে আসিয়াছে। মোগলচিত্র যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি

ক্যালিগ্রাফি কমিয়া আসিয়াছে। রাজপুত চিত্রের সঙ্গে ক্যালিগ্রাফির কোনো সম্বন্ধ নাই। কোনো কোনো শিল্পসমালোচক মোগল ড্রয়িংকে জার্মান চিত্রকর হলবাইনের (১৪৯৭-১৫৪৩) ড্রয়িংএর সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। মোগল-চিত্র প্রধানতঃ মিনিয়েচার পেন্টিং, রাজপুত-চিত্র হইল ছোট করিয়া ফ্রেস্কো-চিত্র আঁকা। রাজপুত-চিত্রকে যদি বড় করিয়া আঁকা হয়, তাহা বৃহদাকার প্রাচীরচিত্রে পরিণত হইবে। রাজপুত-চিত্রের বর্ম সমতল, তাহাতে গ্রেড্ নাই, রাত্রির চিত্রও দিনের মত আলোকময়, শুধু প্রদীপ বা মশালের অস্তিত্ব দ্বারা রাত্রি প্রমাণিত হয়। বলা যায়, মোগল-চিত্র হইল মডার্ণ এবং রাজপুত-চিত্র মধ্যযুগীয়।

১৬শ শতাব্দীর প্রাচীনতম রাজপুত-চিত্র 'কৃষ্ণলীলা'-চিত্রে ১৫শ শতাব্দীর গুজরাটী চিত্রের প্রভাব দেখা যায়। কৃষ্ণ রাধার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, একটির মাথায় আর একটি আঁকা (superscription); কোনো প্রকার পার্সপেক্টিভ-এর চেষ্টা করা হয় নাই।

রাজপুত-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে রাগমালা-চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আঁকা; রং ও রেখার জড়ানোভাব লক্ষণীয়। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। রাগমালা-চিত্র অ্যাবষ্ট্রাক্ট্; শিল্পী দর্শকের কল্পনা ও ইমোশনের উপর বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষয়-বিন্যাস খুব পরিমিত; খুব অল্প কথায় সব বুঝান হইয়াছে।

পুরাতন ট্রেডিসন অনুসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতেও একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। জয়পুরে উনবিংশ শতাব্দীতেও রাজপুত ট্রেডিশন লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়পুরের রাসলীলা সিরিজের চিত্র উল্লেখযোগ্য। ইহা বৃহদাকার চিত্র; এই সকল রাসলীলা-চিত্রের কার্টুন বহু যাদুঘরে রক্ষিত আছে। কয়েকটি রাজপুত প্রাসাদে প্রাচীরচিত্রের নিদর্শন আছে; যথা—দাতিয়া, ওটা, উদয়পুর, বিকানীর। এমন কি অনেক আধুনিক অট্টালিকার বহির্ভাগে প্রাচীর-চিত্র দেখা যায়।

মোগলচিত্র যেমন প্রতিকৃতি-অঙ্কনে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, রাজপুত-চিত্র তেমন করে নাই। জয়পুর-রীতিতে অঙ্কিত কয়েকটি প্রতিকৃতি দেখা যায়। মোগল-চিত্রের মত ইহা ব্যক্তিত্ববোধক নহে—ইহা নৈর্ব্যক্তিক এবং আদর্শবোধক। রাজপুত-প্রতিকৃতিতে শেড্‌লাইট নাই; একেবারে সমতল।

অযোধ্যায় এক প্রকার মিশ্রিত রীতি (mixed style) দেখা যায়। এখানে শেষ যুগের মোগল-রীতির (late Mughal) সঙ্গে রাজপুত-রীতির সংমিশ্রণ হইয়াছে (অষ্টম শতাব্দী)। রাজপুত-বিষয় মোগল-পদ্ধতিতেও আঁকা হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে জম্মু-চিত্রের উদ্ভব হয়। জম্মু হইল পাঞ্জাব হিমালয়ের ডোগ্‌রা পার্বত্য রাজ্য। লঙ্কা-আক্রমণ প্রভৃতি রামায়ণের বিষয় জম্মু শিল্পীরা আঁকিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা-চিত্রও দেখা যায়। জম্মু-চিত্রে প্রতিকৃতি-অঙ্কন একটা বৈশিষ্ট্য। প্রতিকৃতি-অঙ্কনের কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী।

পাহাড়ী স্কুল—কাংড়া, গাড়োয়াল এবং তার অপর অংশ শিখ স্কুলের কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক্ পর্যন্ত। কাংড়া-চিত্রের বিশেষ উন্নতি হয়, কাংড়ার শেষ বড় কাটোচ শাসনকর্তা রাজা সংসারচাঁদের আমলে (১৭৭৪-১৮২৩)। বিয়াস নদীর তীরে সুজানপুরে তিনি সুরম্য উদ্যান-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদে

রাজা যখন বাস করিতেছিলেন তৎকালের নিদর্শন অনেক চিত্র সূচনা করে। বহু যুদ্ধের অবসরে তিনি এই প্রাসাদে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞের সম্মিলনে সময় কাটাইতেন। তাঁহার সংগ্রহে কৃষ্ণ-বলরামের পরাক্রম, অর্জুনের শক্তিমত্তা এবং মহাভারতের কাহিনী-বিষয়ক চিত্র ছিল।

রাজপুত-চিত্রের শেষ পরিণতি হইল কাংড়া অথবা কাটোজ স্কুল (Katoch School)। অল্প সময়ের মধ্যেই কাংড়া স্কুলের বহু উন্নতি লক্ষিত হয়। এই পদ্ধতির বহু চিত্র আছে। কাংড়া চিত্রের বিষয় কৃষ্ণলীলা, নায়কনায়িকা-ভেদ (বিশেষতঃ অষ্ট নায়িকা)—"The **classification of heroines in accordance with the temperament, age and circumstances, following the works of rhetoricians.**"—অর্থাৎ, মনোবৃত্তি, বয়স, এবং অবস্থানুযায়ী আলিঙ্কারিক-সম্মত নায়িকাদের শ্রেণীবিভাগ, শাক্ত বিষয়, প্রণয়াত্মক পৌরাণিক কাহিনী যেমন নলদময়ন্তীর উপাখ্যান, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এবং প্রতিকৃতি। রাগমালা-চিত্রের নিদর্শন কাংড়াচিত্রে নাই। অনেক চিত্রের সঙ্গে নাগরি অক্ষরে কবিতা লেখা আছে; বেশীর ভাগ কবিতাই হিন্দী কবি কেশবদাসের রচনা। অনেক চিত্রেই দেখা যায় বিপাশা নদীর তীরে সুজানপুরের উদ্যানপ্রাসাদের দৃশ্য। বরফে ঢাকা হিমালয়ের চিত্র খুব কমই চোখে পড়ে। রাজপুত-দরবারের চিত্র, নলদময়ন্তী, দৈহিক কৌশল, ভোজন, প্রণয়-চিত্র প্রভৃতি এই সিরিজে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাজপুত-চিত্র হইতে কাংড়া-চিত্রে বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজপুত-চিত্র **schematic** বা আলঙ্কারিক, কাংড়া চিত্র **realistic** বা সাদৃশ্যাত্মক। কাংড়াচিত্রে মোগলপ্রভাব এমন কি ইউরোপীয় প্রভাবও লক্ষিত হইবে। বিশেষ করিয়া রাত্রির দৃশ্যে আলোছায়ার খেলায় ইহা লক্ষণীয়। কাংড়াচিত্র নারীদের মূর্তিতে এক সুকোমল কমনীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। কাংড়া-চিত্রকে বলা চলে **feminine type**-এর চিত্র, আর রাজপুত-চিত্র **masculine type**-এর চিত্র।

গাড়োয়াল-চিত্রের উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। গাড়োয়াল-চিত্রের সঙ্গে মোগল-চিত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার সেলিম বিতাড়িত হইয়া গাড়োয়াল-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন শিল্পীও আগমন করেন। এই মোগল দরবারের শিল্পীদের কাছে গাড়োয়ালের শিল্পীরা শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই সকল শিল্পীদের পঞ্চম পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী মোলারাম (১৭৬০—১৮৩৩)। মোলারাম গাড়োয়াল স্কুলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। গাড়োয়ালের চিত্রপদ্ধতি কাংড়ার নিকটতম।

পাঞ্জাবের শিখস্কুলের কাল হইল ১৭৭৫ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। শিখ-সংস্কৃতিতে ট্রেডিশন বা পৌরাণিক কাহিনী নাই। কাজেই তাঁহাদের চিত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারই পরিস্ফুট হইয়াছে। শিখচিত্রে দেখা যায় গুরু, সর্দ্দার প্রভৃতির প্রতিকৃতি এবং দরবারদৃশ্য। বিষয়-নির্বাচন হিসাবে ইহা মোগলচিত্রের সমতুল্য, কিন্তু অঙ্কন-রীতিতেও ইহাতে পাহাড়ী পদ্ধতির সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিখচিত্রের বিশেষ কিছু মৌলিকতা নাই। ধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের চিত্রের সম্বন্ধ নাই বলিয়া প্রতিকৃতি-অঙ্কন বৈশিষ্ট্য পাইয়াছে। তাঁহাদের চিত্রে শিখটাইপ এবং তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যাইবে। *

* লেখকের আসন্নপ্রকাশ 'শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত' নামক পুস্তকের একাংশ।

ঠাকুর ও কৃপাবাদ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ধর্মের একটা আনুষ্ঠানিক দিক আছে। মালা জপা, শাস্ত্র পড়া—এ সব আনুষ্ঠানিক দিক।

"তুমি কলকাতায় যাওনা—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খান্‌কি পর্যন্ত!"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থভাগ)
শাস্ত্রপড়া-সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে?"

পুঁথিকে ঠাকুর খুব বেশী মূল্য দিতেন ব'লে মনে হয় না। বলতেন "শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না, তাঁকে ডাকতে হয়।"

যুগমানব যাঁরা তাঁরা আসেন যার যা মূল্য পাওয়া উচিত তাকে সেই মূল্য দিতে। ঠাকুর মূল্য দিলেন ভক্তিকে। বললেন ঃ

"ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এসব খপরে কাজ কি?"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থভাগ)

নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই ভক্তিকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে।

ওঁ তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।

ভক্তির সাধনা করো, ভক্তিরই সাধনা করো।

কেন?

ওঁ যৎ লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি। ভক্তিলাভ করলে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়।

এই যে ভক্তি—একে সহজের রাস্তায়, আরামের রাস্তায় পাওয়ার কোনই উপায় নেই। কেন? ঠাকুর বললেন ঃ

"কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্‌লে ছড়ানো মন কুড়ান দায়।" ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনকে যুক্ত রাখা ভাবি কঠিন। কেন? কারণ মায়া হচ্ছে দৈবী। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" মায়া (ঠাকুরের ভাষায় কামিনী-কাঞ্চনই মায়া) ঈশ্বরের তৈরী, শয়তানের তৈরী নয়। দৈবী ব'লেই মায়া দুর্লঙ্ঘ্য।

কামিনীকাঞ্চনের জন্য বিপুল আসক্তি যখন মনকে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে, তখন অনাসক্ত হতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আসক্তিকে জয় করবার, মায়ার পারে যাবার উপায় কি? শাস্ত্র পুনরায় বল্‌ছে ঃ

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

এই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করতে পারে তারাই যারা তাঁর শরণাগত হয়েছে। অহঙ্কার থাকলে মায়াকে কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না। এই জন্যই ঠাকুর বারে বারে বলতেন, নাহং, নাহং, তুঁহু তুঁহু। ঈশ্বরের কৃপা চাই —নইলে অনাসক্ত হওয়া যাবে না।

মায়াকে অতিক্রম করবার জন্য এই যে কৃপার প্রয়োজন—এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি পৃথিবীর সেরা সেরা সাহিত্যেও আমরা দেখতে পাই। ঠাকুরের জীবনী লিখেছেন পাশ্চাত্ত্যের খ্যাতনামা মনীষী রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland)। রোলাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর (John Christopher) নায়ক তার পরমহিতৈষী জীবনদাতা বন্ধুর পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত

হয়েছে। মন ভ'রে উঠেছে দুঃসহ আত্মগ্লানিতে। কিন্তু ক্রিস্তফ্ কিছুতেই নারীমায়াকে অতিক্রম করিতে পারছে না। কামনার পঙ্কিল বন্যার আঘাতে সংযমের বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন পাগল সমুদ্রের সেই জলোচ্ছ্বাসকে শান্ত করা তো সহজ কথা নয়! তখন জলের দেবতা বরুণের শরণাগত হওয়া ছাড়া পথ কোথায়? রোলাঁ সেই জায়গায় লিখেছেন ঃ

"The sea has burst its bounds. Who shall turn it back into its bed? Then must a man appeal to a mightier than himself. To Neptune, the god of the tides."

সাগর ভেঙে ফেলেছে তার বাঁধ। কে তাকে ফিরিয়ে দেবে তার স্বস্থানে? মানুষকে তখন অবেদন জানাতে হবে এমন কারও কাছে যে তার চাইতেও শক্তিমান। বরুণের কাছে—সমুদ্রের যিনি ঈশ্বর।

শেষপর্যন্ত ক্রিস্তফ্ রক্ষা পেয়েছে দুরন্ত কামনার রাহুগ্রাস থেকে। জয়ী হয়েছে সে সংগ্রামে—নিজের সঙ্গে নিজের নিদারুণ সংগ্রামে। এতদিনে ক্রিস্তফের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হোলো। সে বুঝতে পারলো, অহঙ্কারের মতো মিথ্যা আর কিছু নেই। সে জান্‌তে পারলো ঃ

"To fight the fight it is not enough to will....Human will can do nothing without God's. One second is enough for Him to obliterate the work of years of toil and effort. And if it so please Him, He can cause the eternal to spring from dust and mud."

"কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে সংগ্রাম করা চলে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া মানুষের ইচ্ছার দাম কতটুকু? তাঁর যদি ইচ্ছা হয় ধূলা থেকে, কাদা থেকে অনন্তকে তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন। আবার আমাদের জীবনব্যাপী সাধনার ও তপস্যার ফলকে নিমেষে তিনি নিশ্চিহ্ন করেও দিতে পারেন।"

জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষতবিক্ষতচরণে ক্রিস্তফ্ সত্যের শিখরদেশে পৌঁছে দেখতে পেলো কৃপার আশ্চর্য ক্ষমতা। ঈশ্বরের করুণা যার স্পর্শে আমাদের আত্মা জেগে উঠে নবজীবনের অরুণালোকের মধ্যে; ভগবানের দয়া যা আমাদের জীবনকে নির্মল ক'রে দেয়; কৃপা যার ছোঁয়া লেগে খুলে যায় আমাদের অন্তরের চোখ, অচেতন চিত্তে জাগে নূতন প্রাণের স্পন্দন!

জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ একদিন জানতে পারে যে, মানুষের অহঙ্কার মিথ্যা। ঈশ্বরের করুণাই শুধু মানুষকে মায়ার পারে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। এই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পার্‌বো তোমার চরণ ছুঁতে?"

কিন্তু কৃপা লাভ করা যাবে কোন্ পথে?

"নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন!"

নিজনে প্রার্থনার উপরে ঠাকুর বারম্বার জোর দিয়েছেন!

"শাস্ত্রে আভাসমাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভালো।"

নির্জনে বাস করতে হ'লে কামিনী-কাঞ্চন ছাড়্‌তে হয়। তাই নিজনে তাঁকে ডাকতে পারা ত্যাগের পথেই সম্ভব। এই ত্যাগের ক্ষুরধার দুর্গমপথে চলার কথাই ঠাকুর বারংবার বলেছেন। শাস্ত্র পড়ার আর মালা ঘোরানোর, গঙ্গাস্নানের আর গুরুকরণের উপরে ঠাকুর তেমন জোর দেন নি।

কথামৃতের পাতায় পাতায় জোর দেওয়া হয়েছে নির্জনতার উপরে।

"ডুব দাও—উপরে ভাসলে কি হবে? দিন-কতক নির্জনে, সব ছেড়ে ষোল আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাকো।"

ইংরেজ দার্শনিক Whitehead বলেছেন:

"Religion is what the individual does with his solitariness."

ধর্ম হ'চ্ছে নির্জনতার ব্যাপার। ভোগের মধ্যে থেকে, জনতার মধ্যে থেকে আনুষ্ঠানিক ধর্মপালন করা যায়, এপথে ঈশ্বরকে অন্তরের গভীর উপলব্ধি করা কঠিন। তার জন্য নির্জনতা অপরিহার্য।

রোলাঁর জঁা ক্রিস্তফেব মধ্যে আছে—"No man is surely master of himself. A man must watch." অহংকারে স্ফীত হয়ে একটু চোখের পাতা বুজেছো তো মরেছো! মানুষকে অতন্দ্র হ'তে হবে। ঠাকুর পুরুষ ভক্তদের কেউ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করলে বল্‌তেন, 'বেশী যাস্ নাই, পড়ে যাবি!' মেয়ে ভক্তদের বাৎসল্যভাব-সম্পর্কে বল্‌তেন, 'ঐ বাৎসল্য থেকেই আবার একদিন তাচ্ছল্য হয়!' তখনও ফ্রয়েডী যুগ আরম্ভ হয়নি। কথামৃতে আদর্শবাদের আর বাস্তববাদের আশ্চর্য প্রকাশ! পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

কাঞ্চনের ব্যাপারেও এই রকম অতন্দ্র দৃষ্টি! এই রকমের সতর্কতা! "সিঁতির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছ্‌লো—আমি জান্‌তে পারি নাই। রামলাল বল্লে পর, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কাকে দিয়াছে? সে বল্লে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে, না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে! ও মা! খানিক রাত্রে ধড় মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—'তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?' সে বল্লে 'না'। তখন তাকে বল্লাম, 'তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!' রামলাল তার পর দিন টাকা ফিরিয়ে দিলে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ)

ঠাকুর এই রকম করেই আমাদের শিখিয়ে গেছেন: "No man is surely master of himself. A man must watch." অহঙ্কার কোরো না। সর্বদার জন্য সতর্ক থাকো। একটু ঘুমিয়েছো তো ভেসে যাবে, তলিয়ে যাবে ধ্বংসের অতলস্পর্শী গুহায়!

শরৎ-শ্রী

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, বি-টি, কাব্যতীর্থ-শাস্ত্রী।

বর্ষণরত গগনের যত
অশ্রুমুকুতা ধার,
সোনার বরণী ধরণী রেখেছে
গাঁথিয়া শোভন হার।

শ্যাম সুষমায় বন-প্রান্তর
রচিল রঙিন বাস;
কার আগমনে, দিগ্‌বধূগণে—
অধরে মধুর হাস।

তড়াগে তড়াগে নবনীল আঁখি,
সরমে জাগিয়া আজ,
শরৎরাণীর 'বোধনের' বাণী।
ঘোষিছে জগত মাঝ।

নলিনে ভৃঙ্গ গুঞ্জনরত,
মধুপ মধুরে শোভে।
বিচ্ছেদহত সন্তান শত
মাতৃচরণ লোভে।

তাপসী টেরেসা

শ্রীমতী আশা দেবী, এম্-এ

পাশ্চাত্ত্য জগতে ভগবৎপ্রাণা সাধ্বিকাগণের মধ্যে সেণ্ট টেরেসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পেনের এক গৌরবময় যুগে টেরেসার আবির্ভাব হয়। তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্যময় উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বদেশের ধর্মানুরাগী নরনারীর মনে অনুপ্রেরণা দান করে।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ স্পেনদেশে আভিলার এক দুর্গ-গৃহে ধনী ও অভিজাত-বংশে টেরেসা জন্মগ্রহণ করেন। টেরেসার পিতা ডন্ আলান্জোর ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি ছিল। মাতা বিয়েট্রিজ ছিলেন পরমা সুন্দরী; তাঁহার স্বভাবটিও ছিল খুব নম্র ও স্নেহশীল। শৈশব হইতে পিতামাতার প্রতি টেরেসার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অতি গভীর ছিল। তাঁহাদের সকল মহৎ গুণেরই তিনি অধিকারিণী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি যে গৌরবময় ধর্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহার সূচনা তাঁহার বাল্যকালেই পাওয়া গিয়াছিল। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া টেরেসা দৈনন্দিন প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেন। সন্ত (Saint)-গণের জীবন-কাহিনী শুনিয়া তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে জীবন আহুতি দিবার বাসনা অতি অল্পবয়সেই তাঁহার হৃদয়ে জাগিত। এমন কি একবার, মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি গৃহ হইতে ঐ উদ্দেশ্যে পলায়ন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার এক খুল্লতাত তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে কয়েক জন আত্মীয়ের প্রভাবে টেরেসার সরল ঈশ্বরানুরাগী চিত্ত সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতন হইয়া উঠেন। সাজসজ্জার প্রতি প্রবল অনুরাগ, ও অপরের নিকট নিজেকে সুন্দর করিয়া দেখাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিত। পিতাকে গোপন করিয়া মাতার প্রশ্রয়ে তিনি রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কাল আত্মজীবনীতে টেরেসা অনুতাপের সহিত এই দুর্বলতার কথা অকপটে লিখিয়া গিয়াছেন।

মাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে টেরেসা শিক্ষালাভার্থ অগাষ্টিনিয়ান কনভেণ্টে প্রেরিত হন। সহসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে ব্রতধারিণীগণের মধ্যে আসিয়া টেরেসা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কন্ভেণ্ট্‌এ কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম আটদিন অত্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিলে ধীরে ধীরে টেরেসা কনভেণ্টের জীবন প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ঐ কনভেণ্টের বৃদ্ধা তাপসী ডোনা মেরিয়া টেরেসার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চারে সহায়তা করেন। ডোনা মেরিয়ার কাছে তিনি শুনিলেন,—"অনেকেই আহূত হয়, কিন্তু কম সংখ্যকই মনোনীত হয়, ...যে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তাহাকে তিনি পুরস্কৃত করেন।" বোধ করি তিনি "মনোনীত" হইবেন এবং ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন বলিয়াই এই কথাগুলি তাঁহার প্রাণে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত ত্যাগের জীবন অবলম্বনের কথা মনে না উঠিলেও কনভেণ্টের ব্রতধারিণীগণের

জীবনের প্রভাব টেরেসার চরিত্রে অলক্ষ্যে পড়িয়াছিল। চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীর সংযত ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন।

কনভেন্টে দেড় বৎসর কাটাইবার পর টেরেসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। আরোগ্য লাভ করিবার পর পিতৃ-গৃহের সকল দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িল। পিতৃসেবা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সংসারের অপরাপর নানা ব্যাপারেও টেরেসার অপূর্ব কর্মকুশলতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু সংসারের যথাযোগ্য পরিচালনা করিতে থাকিলেও টেরেসা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন—জীবনের পরম সত্য—সংসারের অনিত্যতা। ক্রমে ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। পিতার নিকট অনুমতি চাহিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনিলেন—'অন্ততঃ আমার জীবদ্দশায় কিছুতেই নহে'। টেরেসার জীবনে বৃহৎ সংকট দেখা দিল। একদিকে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল পরম স্নেহময় পিতা যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা মনে হইলে টেরেসার অন্তর বেদনায় মথিত হইয়া উঠে; অপরদিকে প্রেমময় অন্তর্দেবতার আহ্বান ও দুর্নিবার আকর্ষণ! আকুল হৃদয়ে টেরেসা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনমাস ধরিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁহার কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। অবশেষে মন স্থির করিয়া পিতার অনুমতি না লইয়াই ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে টেরেসা গৃহত্যাগ করিলেন এবং আভিলাস্থিত 'কারমেলাইট' সম্প্রদায়ের একটি স্ত্রী-মঠে যোগদান করিলেন। তপস্বিনীগণ টেরেসাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং পিতার সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাকে বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটি কক্ষ দিলেন।

এখন হইতে টেরেসার প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ হইল। তিনি কার্মেলাইট সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট বেশ ধারণ করিয়া এখন একান্ত ভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কার্যের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। আশ্রমের নিয়মানুযায়ী একবৎসর novice বা প্রবর্তক হইয়া থাকিতে হইত। সেই একবৎসর টেরেসাকে বহু মানসিক দ্বন্দ্ব ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল কিন্তু শ্রীভগবান সর্বদাই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সঙ্ঘের ইতিহাস পাঠ, সমবেত প্রার্থনায় যোগদান, মৌনাবলম্বন, নির্জন কক্ষে বাস, নীরব প্রার্থনা প্রভৃতি মঠের দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি টেরেসা প্রাণপণে পালন করিতেন। কখনও কখনও নানা কঠোরতায় তাঁহার অন্তর বিদ্রোহ করিত, কিন্তু গভীর আদর্শপ্রীতির বলে ঐ সকল বিরসতা কাটাইয়া উঠিতেন। একবৎসর পরে, ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর, বিশেষ আড়ম্বরের সহিত টেরেসাকে পূর্ণ ত্যাগের জীবনে অভিষিক্ত করা হইল। তিনি সঙ্ঘের ব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন।

শীঘ্রই তিনি পুনরায় খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় পুনরায় তাঁহাকে কিছুকাল পিতৃগৃহে যাইতে হইয়াছিল। চিকিৎসকগণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আরোগ্য লাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে টেরেসা সেন্ট জোসেফের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার কৃপায় অলৌকিক উপায়ে, অনেকটা সুস্থ হইলেন। অপরিসীম রোগ যন্ত্রণা তিনি পরম ধৈর্যের সহিত ও অতি শান্ত চিত্তে বহন করিতেন। রোগ শয্যাতেও তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও সরস কথাবার্তা সকলকে আনন্দ দান করিত।

অসুস্থতার জন্য তিনি যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না কেবল এই চিন্তা তাঁহাকে অশান্ত করিয়া তুলিত।

তাঁহার অন্তর নির্জনে ভগবদুপাসনায় দিন কাটাইবার জন্য মাঝেমাঝে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

আধ্যাত্মিক জীবনে সংগ্রাম পদে পদে। টেরেসার মধুর স্বভাব সহজেই সকলের চিত্ত জয় করিত। সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার যে দুর্বলতা তাঁহার ছিল সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একদিকে টেরেসা যেমন বিদুষী, মার্জিতরুচি ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্না ছিলেন, অপরদিকে তেমনই প্রিয়ভাষিণী, হাস্যময়ী ও কৌতুকপ্রিয়া ছিলেন। মঠ-দর্শনার্থিগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় টেরেসার বহু সময় কাটিত, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন এই সকল সাংসারিক লোকের সংস্পর্শ তাঁহাকে প্রেমময়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পবিত্র মন বলিয়া উঠিত,—"ঈশ্বরের পথ ও সংসারের পথ বিভিন্ন।"

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে টেরেসার জীবনে একটি বিশেষ পরিবর্তন আসে। কোন উৎসব উপলক্ষে আনীত যীশুখ্রীষ্টের এক নূতন মূর্তি টেরেসার প্রাণে নবপ্রেরণা সঞ্চার করিল। উহার পদতলে পড়িয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। সরস বাক্যালাপের প্রতি অনুরাগ অন্তর্হিত হইল। তাঁহার হৃদয় যেন প্রেমময় ভগবানের বিহারের উদ্যানরূপে পরিণত উঠিল। নিরন্তর দিব্য ঐশ ভাবে তাঁহার অন্তর পূর্ণ থাকিত। উপাসনা কালে যীশুখ্রীষ্টের জীবনের বহু ঘটনাবলী তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইত এবং তিনি যীশুর সহিত নিজেকে একাত্ম বোধ করিতেন। একদিন যীশু অনিন্দ্য সুন্দর বালক মূর্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া ধন্য করেন। জগৎত্রাতার কণ্ঠস্বর তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। টেরেসা বলিয়াছেন, "আমি কানে কিছু শুনি নাই কিন্তু কথাগুলি অতি স্পষ্টরূপে আমার চেতনার উপর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।" টেরেসার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বহু অনুভূতির পরিচয় তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

একবার মঠের একজন ব্রতধারিণী গান করিতেছিলেন—গানটি ঈশ্বরের অদর্শনে বিরহী আত্মার। ঐ সঙ্গীত শ্রবণে টেরেসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া যায়। আর একদিন তিনি দেখিলেন, কোন স্বর্গদূত একটি স্বর্ণদণ্ডের দ্বারা তাঁহার হৃদয় কয়েকবার বিদ্ধ করিলেন। দণ্ডের লৌহমুখ অগ্নিময় ছিল। ফলে তাঁহার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে জ্বলিয়া উঠিল। বেদনায় অধীর হইলেও তাহার সহিত এমন অনির্বচনীয় মাধুর্য মিশ্রিত ছিল যে, সেই বেদনার উপশম তিনি চাহেন নাই। এই প্রেমাগ্নি ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা ভিন্ন কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিরহ যন্ত্রণা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবেই এবং ইহাই তাঁহার কাম্যও ছিল। ঘড়ির কাঁটা এক এক মুহূর্ত অতিক্রম করিত আর টেরেসা এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতেন যে ঈশ্বরের সহিত চরম মিলনের ব্যবধান আরও একটু কমিল। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন ঈশ্বরময় হইয়া গিয়াছিল। তিনি পরবর্তী কালে Teresa of Jesus, যীশুর টেরেসা এই নামে অভিহিত হইতেন।

টেরেসার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক জীবন এবং বাস্তব জীবনের গভীর সামঞ্জস্য। তিনি সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ পূর্বক নিজের প্রতি চিন্তা ও কর্মের কঠোর সমালোচনা করিতেন এবং নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিতেন। অনেকেই মস্তিকের দুর্বলতা হেতু মনে করিত তাঁহাদের নানাপ্রকার দর্শনাদি হইতেছে এবং ঐ সকল দর্শনাদিকে ঐশ্বরিক আবেশ ভাবিয়া প্রতারিত হইত। টেরেসা কখনও তাঁহার অলৌকিক দর্শনাদি নির্বিচারে মানিয়া লন নাই। তিনি নিজের দর্শনাদির অলৌকিক অংশ যথাসম্ভব পরিহার পূর্বক বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা গ্রহণ করিতেন এবং নিজের অনুভূতি-সমূহ অপরাপর সাধকের জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতেন। তাঁহার দিব্য দর্শন ও অনুভূতির সত্যতা-সম্বন্ধে বহু কঠোর সমালোচনা উঠে। অবশেষে **St. Peter of Alacanter**এর মধ্যস্থতায় উহা নিরস্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের কতকগুলি অপূর্ব মাধুর্য এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণাপূর্ণ ঘটনা দুর্গোৎসবের সহিত জড়িত। শারদীয়া পূজার সমাগমে সেইগুলির স্মৃতি আমাদিগকে প্রচুর উদ্দীপনা দিবে সন্দেহ নাই। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবক ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলাস্থিত শিওড় গ্রামের নিজ-বাটিতে দুর্গাপূজা করিতে মনস্থ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজার সময় তথায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়রামের বাটীতে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু ক্ষুণ্নমনা ভাগিনেয়কে উৎসাহ ও সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিতেছিস্ কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখতে যাব, আমাকে অপর কেহ দেখতে পাবে না কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রেখে নিজে আপনাব ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপোস না করে মধ্যাহ্নে দুধ, গঙ্গাজল ও মিছরির সরবৎ পান করিস্। এইরূপে পূজা করলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।"* বাটীতে আসিয়া হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে দুর্গাপূজার যাবতীয় আয়োজন করিলেন এবং নিজেই পূজাকার্যে ব্রতী হইলেন। সপ্তমীপূজা শেষ করিয়া রাত্রিতে আরাত্রিক করিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং জ্যোতির্ময় দেহে মা দুর্গার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয়রাম প্রতিদিন এইরূপে আরতি ও সন্ধিপূজার সময়ে মা দুর্গার পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া আনন্দিত ও ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া হৃদয়রামকে ইহাও বলিয়াছিলেন, "তুই তিন বৎসর দুর্গাপূজা করিবি।" তাঁহার কথা সত্য হইয়াছিল, কারণ হৃদয়রাম তিন বৎসরই যথাবিধি সোৎসাহে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সত্যসংকল্প শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্থবার পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া হৃদয়রাম এমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসমূহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পরিশেষে অনুতপ্তচিত্তে বাধ্য হইয়া পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরাবতার ও ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষগণের কথা কখনও নিরর্থক হয় না, তাঁহাদের বাক্য অব্যর্থ ও অমোঘ—

'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।'

একবার রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের কলিকাতা জানবাজারের বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর নিরন্তর ভাবাবেশে তন্ময় থাকিয়া প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব অনুভব করিতেন। একদিন সন্ধ্যায় মার আরতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ শরীরের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন—কথায় ও আচরণে কেবলই প্রকাশ করিতে লাগিলেন তিনি যেন জন্মে জন্মে মা দুর্গার দাসী বা সখী—মার সেবাপূজার জন্যই তাঁহার দেহধারণ এবং মা-ই তাঁহার 'তন-মন-ধন।' ঠাকুরের এরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া মথুর-পত্নী

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি 'বাবা'কে (শ্রীরামকৃষ্ণ) পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের নিকট বার বার বলিতে লাগিলেন, "বাবা চল; মার যে আরতি হইবে; মাকে চামর করিবে না?" মথুরের স্ত্রীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মথুর-পত্নীর সহিত পূজামণ্ডপে পৌছিলেন। আরতির সময় ঠাকুর মহিলাগণ-পরিবৃত হইয়া চামরহস্তে দুর্গাপ্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু প্রমুখ পুরুষগণ পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না কে মাকে চামর করিতেছেন—তাঁহারা ভাবিলেন হয়ত কোন নিমন্ত্রিতা ধনি-গৃহিণী বীজন করিতেছেন।

মথুর পরে তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আছোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানিলেন এবং অবাক হইয়া বলিলেন, "মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় পরিলে 'বাবা'কে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে 'বাবা'কে চেনে কার সাধ্য!"

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীপূজা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য উপস্থিতিতে পরমানন্দে অতিক্রান্ত হইল। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের সময় উপস্থিত হইলে মাকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া যাইবার জন্য পুরোহিত গৃহকর্তা মথুরবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাকে বিসর্জন দিতে হইবে ভাবিয়া মথুরবাবু অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিসর্জনের সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিলেও মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া পুরোহিত ও বাড়ীর অন্যান্যকে বলিয়া পাঠাইলেন; "আমি মাকে বিসর্জন দিব না। এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গিতে পারিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমি মা-র নিত্য পূজা করিব।" মথুর-পত্নী কর্তার এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর উন্মনা, গম্ভীর ও বিষণ্ণ মথুরের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ, মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে—এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাক্‌তে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনও থাক্‌তে পারে? এ তিনদিন বাহিরে দালানে বসে মা তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।" ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ কথায় ও দিব্য স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন, মা-দুর্গার শ্রীমূর্তি তাঁহার হৃদয়কন্দরে অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি বিমল আনন্দে ভরপুর হইয়া প্রতিমা রক্ষা করিবার জিদ পরিত্যাগ করিলেন। যথারীতি নির্বিঘ্নে প্রতিমা বিসর্জন হইয়া গেল।

১৮৮৪ খৃঃ ১৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার মহাষ্টমী দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ সশিষ্য ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও অধর সেনের বাড়ীতে মা-দুর্গাকে দর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের গৃহে ঠাকুর মার নামগুণ কীর্তন করিতে করিতে আনন্দে আত্মহারা এবং পুনঃ পুনঃ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অধর সেনের বাড়ীতে মা দুর্গাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই বৎসর নবমী-পূজার দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্বক মাতৃভাবে গর্গর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বলিতেছিলেন, 'জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে সহজানন্দ, সহজানন্দ!' ভক্তগণ দেখিলেন ঠাকুর যেন ঠিক একটি বালক—কোমরে কাপড় নাই, মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে

নাচিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সেদিন গাহিয়াছিলেন—

বলরে শ্রীদুর্গানাম। (ওরে আমার আমার
আমার মনরে)
নমো নমো নমো গৌরি, নমো নারায়ণি !
গোলকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যেবা পথে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥

১২৯০ বঙ্গাব্দ, ৩রা বৈশাখ (১৮৮৩ খৃঃ, ১৫ই এপ্রিল) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে অন্নপূর্ণা পূজোপলক্ষে মা-কে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার সিমলা ষ্ট্রীটে ভক্ত সুরেন্দ্র মিত্রের ভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে তিনি প্রতিমার দিকে হস্ত নির্দেশে গৃহকর্তা সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "আহা মা যেন আলো করে বসে আছেন! এরূপ দর্শন করলে কত আনন্দ হয়! ভোগের ইচ্ছা, শোক—এসব পালিয়ে যায়। তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন করচ আর আনন্দ পাচ্ছ!"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ যখন কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ১৮৮৫ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর বিজয়া দশমী দিবস ভক্ত সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কাল (নবমী-দিবস) ৭টা। ৭।৷০ টার সময় ভাবে দেখ্‌লাম তোমাদের দালান। ঠাকুরপ্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেমন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মাঝে বইছে—এ বাড়ী আর তোমাদের সেই বাড়ী।" সুরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি তখন ঠাকুরদালানে মা মা বলে ডাকছিলুম; আমার মনে উঠিয়াছিল—মা বল্লেন, 'আমি আবার আসবো'।"

ভক্ত বৈষ্ণবচরণ-গীত এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেন:

শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
তুফানেতে কি করিবে শ্রীদুর্গানাম যার তরী।
অবশ্য পাইবে কুল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী॥
ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকতারিণী।
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি॥

তোমার দেখা

'বৈভব'

তোমার দেখা পেয়েছি সখা সন্ধ্যা আকাশে
তোমার দেখা পেয়েছি সখা মলয় বাতাসে।
তোমার দেখা পেয়েছি সখা অরুণ আলোতে
তোমার দেখা পেয়েছি সখা সকল ভালোতে।

তোমার দেখা চাই গো সখা তিমির আকাশে
তোমার দেখা চাই গো সখা প্রলয় বাতাসে।
তোমার দেখা চাই গো সখা অমা'র আলোতে
তোমার দেখা চাই গো সখা সকল কালোতে।

সতীতীর্থ কনখল[১]

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

কনখল একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। হরিদ্বারের এক মাইল দক্ষিণে ও গঙ্গার পশ্চিম কূলে ইহা অবস্থিত। পরপারে গাছপালা, লতাপাতা-সমন্বিত হিমালয়স্থিত সবুজবর্ণের নীল পর্বত। পাদদেশে পতিতপাবনী গঙ্গার একটি শাখা নীলধারা নামে হর্‌ হর্‌ শব্দে প্রবাহিতা। হিমালয়ের শান্ত ও নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যেও ঐ ধ্বনি অহর্নিশ পরব্রহ্মকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পর্বত-শিখরে চণ্ডী ও অঞ্জনাদেবীর মন্দির। কনখল হিমালয়ের পাদদেশ। মুনি-ঋষিদের প্রাচীনতম তপোভূমি। এখনও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এই পবিত্র স্থানে তপস্যাদি করিয়া আপ্তকাম হইতেছেন। এই স্থানে বর্তমানে সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া, আশ্রম বা আস্তানা আছে। মন্দিরাদিও অনেক আছে। সকাল-সন্ধ্যায় দেবতার আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে চারিদিক্‌ মুখরিত হইয়া উঠে। ঐ মধুর ধ্বনি প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সহিত মিলিত হইয়া মানবের হৃদয়ে ভগবচ্চিন্তা জাগাইয়া দেয় এবং এমন এক অপূর্ব আনন্দলহরীর সৃষ্টি করিয়া থাকে যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। রাস্তা-ঘাটে ও আস্তানায় সাধুসন্ন্যাসীরা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' উচ্চারণে পরস্পরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেই নারায়ণের স্বরূপ এই জ্ঞানে অভিবাদন করা হয়। কনখল হইতে হিমালয়ের অপূর্ব মনোহর শোভা দৃষ্ট হয়। এই কনখলেই প্রজাপতি দক্ষের রাজপুরী ছিল। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির ও সতীকুণ্ড এই স্থানের প্রধানতীর্থ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, এই দক্ষঘাটে বা গঙ্গায় অবগাহন করিলে তত্ত্বজ্ঞান এবং দক্ষেশ্বর শিবের দর্শন ও পূজাদি করিলে মুক্তি লাভ হয়।

একদা কয়েক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দক্ষেশ্বরে শাস্ত্রাদি-আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় ধর্মকেতু নামে জনৈক খল ব্যক্তি পণ্ডিতদের অর্থাদি অপহরণ-মানসে আসে। ব্রাহ্মণদেব শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করিয়া তাহার চৈতন্য হয়। নিজকৃত অপকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনাপূর্বক বলিল, 'হে পণ্ডিতগণ, আমি এক জন দুশ্চরিত্র, হীনপ্রবৃত্তি নরাধম। কি উপায়ে আমার সদ্গতি হইবে বলিয়া দিন।' তাঁহারা বলিলেন, 'এই দক্ষঘাটের গঙ্গায় অবগাহন করিয়া জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর শিবের অর্চনা কর তাহা হইলেই তোমার সর্বপাপ দূরীভূত হইবে ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ধর্মকেতু পণ্ডিতদের আজ্ঞা পালন করিয়া মুক্তি লাভ করিল। 'কো ন খলস্তরতি' অর্থাৎ কে এমন খল আছে, এই তীর্থে স্নানাদি করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় না? এইরূপ মাহাত্ম্যের প্রভাবে এই স্থানের নাম 'কনখল' হইয়াছে।

এই দক্ষেশ্বর মন্দিরের অর্ধমাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সতীকুণ্ড। প্রবাদ এই যে, এই স্থানেই সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এই কুণ্ডের নাম হয় 'সতীকুণ্ড'। আজকালও এই তীর্থে ভাদ্র শুক্লা দশমী তিথিতে মেলা হয়। ঐ দিন ভক্তিমতী নারীগণ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। উপবাস করিয়া সতীকুণ্ডে তাঁহারা অবগাহন করেন এবং তীরস্থ মন্দিরে সতীর অর্চনা করেন। মনোগত বাসনা সতীর মত পতিব্রতা হইয়া যেন মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

পুরাকালে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ মহামায়াকে কন্যারূপে লাভ করিবার মানসে কঠো-

তপস্যায় রত হন। মহামায়া তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষকে বলিলেন, 'আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কী বর চাও?' তখন দক্ষ বলিলেন—

"জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম।
তদা মম সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবাধুনা॥"

(কালিকাপুরাণ ৮।৩০)

হে জগৎস্বরূপা মহামায়া, আপনি যদি আমাকে বর প্রদান করিতে চান, তবে আমার কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়া শিবজায়া হউন।'

দেবী বলিলেন—'হে প্রজাপতি, অচিরে তোমার কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়া অতপরঃ শিবপত্নী হইব। পুনঃ যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, তখন অবিলম্বেই তনুত্যাগ করিব। তোমাকে এইবর প্রদান করিলাম।' (কালিকাপুরাণ, ৮।৩২-৩৪)

দক্ষ এই বর লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হইলেন। কিছু কাল পরেই মহামায়া দক্ষের ও তৎপত্নী বীরণতনয়া অসিক্লীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহামায়া তনয়ারূপে আসিয়াছেন দক্ষের ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। দক্ষ মহামায়ার শুভাগমনে দক্ষপুরীতে বিরাট আনন্দোৎসব করেন। দক্ষালয়ে কন্যা সর্বগুণ-সম্পন্না হইয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। দক্ষ কন্যার সদ্বৃত্তি ও সৎকর্মাদি দেখিয়া 'সতী' নাম রাখিলেন।

সতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা ব্রহ্মা ও নারদ দক্ষালয়ে আসিয়া সতীকে বলিলেন, তুমি যে জগদীশ্বর মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে মনস্থ করিয়াছ, তিনিই তোমার পতি হউন। তিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই, করিবেনও না। এই বলিয়া তাঁহারা স্বস্থানে গমন করিলেন। সতী পূর্ণযৌবনা হইয়াছেন দেখিয়া দক্ষ কন্যাকে শিবের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন।

এদিকে শিব অহর্নিশ ব্রহ্মধ্যানে রত। অচিরেই সৃষ্টিলোপ হইবে ভাবিয়া সাবিত্রী সহ ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মী সহ নারায়ণ শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবন, আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে, নচেৎ অচিরেই সৃষ্টিলোপ পাইবে।' শিব বলিলেন, 'আমি সদাই ব্রহ্মধ্যানে রত, আমার বিবাহে প্রবৃত্তি নাই। যদি আপনাদের এরূপই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যে রমণী আমি যোগযুক্ত হইলে যোগিনী হইবেন এবং কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবেন, আমি পরব্রহ্মের চিন্তায় সমাধিমগ্ন হইলে যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না, তিনিই আমার ভার্যা হইবেন।' (কালিকাপুরাণ, ৯।৪৯-৫০) ব্রহ্মা বলিলেন, প্রজাপতি দক্ষের সতী নামে এক কন্যা আছেন। তিনিই সর্বগুণ-সম্পন্না এবং আপনার সর্ববিষয়ে সহায়িকা হইবেন; তিনি পতিরূপে আপনাকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া শিব বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা দক্ষের নিকট আসিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবতাগণ সহ দক্ষালয়ে আসিয়া নির্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহের মধ্যে বিবাহাদি কার্য সমাপন করিলেন। বিবাহের পর তাঁহারা পরস্পরানুরাগী হইয়া মহানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। শিব তখন তপস্যাদি ভুলিয়া গেলেন। সতীর সন্তোষ-বিধানই ক্রমশঃ তাঁহার একমাত্র ধ্যান হইয়া দাঁড়াইল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নয়াদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনের কার্যবিবরণী হইতে ইহার ক্রম-বর্ধমান কর্মপ্রসার লক্ষ্য করিয়া আনন্দ হয়। এই দুই বৎসরে মিশনের প্রচার ও সংস্কৃতিমূলক কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবিবাসরীয় আলোচনা-সভা দিল্লীর সংস্কৃতিমান্ সমাজে বিশেষতঃ ছাত্র-গোষ্ঠীতে খুব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে জন্মাষ্টমী, খৃষ্টজন্মোৎসব, বুদ্ধ-জয়ন্তী এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে স্বামিজী-সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৪৭৫ ও ৪০৫ জন ছাত্র যোগদান করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লীর কয়েকটি পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে জন-সভার অধিবেশন হয়।

মিশনের লাইব্রেরীর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে। বর্তমানে ইহার পুস্তকসংখ্যা ৪০৪৩। লাইব্রেরী-সংলগ্ন পাঠাগারও ক্রমশই জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

মিশনের দাতব্য ঔষধালয়ে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যথাক্রমে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ৮,৩১৬ এবং ৭৯৭৮। যক্ষ্মা-চিকিৎসা-কেন্দ্রে ঐ দুই বৎসরে যথাক্রমে ১০৭৪ এবং ১১৪৯ জন নূতন যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গাগত দুঃস্থ শরণার্থী এবং ভূকম্পবিধ্বস্ত আসামবাসিগণের সেবাকল্পে দিল্লী মিশন যথাক্রমে ৪৩,৭৯০৷৷/০ ও ৪,০৬৩৸৶০ জনসাধারণ হইতে সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। অন্ধ্র ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবার জন্যও দিল্লী মিশন ৫,৫৬০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের বিশাখাপত্তনম্ কেন্দ্রে পাঠাইয়াছিলেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—আমরা এই আবাসিক বিদ্যালয়ের ১৯৫১ সনের বিবরণী পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। বাল্যকালে আদর্শ পরিবেশে শিক্ষা লাভ করার উপর স্বামী বিবেকানন্দ সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। স্বামীজির শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এখানে চতুর্থশ্রেণী হইতে ছাত্র গ্রহণ করা হয়। এই বৎসরে ১৯৮টি ছাত্র বিদ্যাপীঠে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্ন আবাস, নিয়মিত শরীরচর্যা ও সর্বোপরি ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য। প্রার্থনা, ভজন ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মাদর্শের অনুশীলন বালকগণকে উচ্চভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার শিক্ষার জন্য বিদ্যাপীঠের বালকগণ গণতন্ত্রসম্মত প্রতিনিধি-সমিতি ও সেবকমণ্ডলী গঠন করিয়াছে। তাহাদের একটি বিচারালয়ও আছে। সাহিত্য-সমিতির মারফত বালকগণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক আলোচনা, বিতর্ক-সভা এবং হস্তলিখিত মাসিকপত্র পরিচালনা করে। এই বৎসর ছাত্রগণ সুন্দররূপে একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে। নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও সমবায়সমিতি-পরিচালন, বাগানের কাজ, দর্জির কাজ, চিত্রাঙ্কন ও চামড়ার কাজেও বালকগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতেও তাহারা সমধিক উৎসাহী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয় পরিদর্শন—গত ২রা ভাদ্র সন্ধ্যায় পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক রামবাগান বস্তিতে পরিচালিত বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের নিকটে বস্তিবাসীদের তৈরী বাঁশ ও বেতের শিল্পদ্রব্যের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়।

রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দরিদ্রের দুঃখকষ্ট ও সমস্যা আজ অবহেলার বস্তু নহে। দুঃস্থের অভাবমোচনের জন্য দেশের ধনিকশ্রেণীকে অধিকতর তৎপর হইতে তিনি আহ্বান জানান।

দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য—দক্ষিণভারতের রায়লসীমায় ৬টি কেন্দ্রে এবং ২৪পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে ১০টি কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য চলিতেছে। এখনও অনেকদিন এই সেবাকার্য চালাইতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

ভারত-সেবকসমাজ—জাতির উন্নয়ন-পরিকল্পনায় দেশের জনসাধারণ যাহাতে সক্রিয় সহযোগিতা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে গত মে মাসে 'ভারত-সেবকসমাজ' নামে যে একটি সর্বভারতীয় অরাজনৈতিক সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সূত্রপাত হইয়াছিল, গত ২২শে আগষ্ট দিল্লীতে ইহার উপদেষ্টৃ-সংসদ পরিকল্পনাটিকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে ভারত-সেবকসমাজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক মেহতা, শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক রঙ্গ, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি সঙ্কল্পিত প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ এবং কর্মপ্রণালী-সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা, রোগের প্রতিষেধ, জনগণের প্রমোদ-ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য কতকগুলি শহরেও ভারত-সেবকসমাজ সংগঠনের আলোচনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই দেশহিতকর বৃহৎ কল্পনাটি যাহাতে সফল হয়, সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ—ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে কলিকাতায় এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম জন্মতিথি উদযাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটি সভায় বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, অবনীন্দ্রনাথের বাসভবনের দক্ষিণের বারান্দাটি পৃথিবীর মনীষীদের এক সময়ে তীর্থক্ষেত্র ছিল। স্বদেশী যুগের বহু বিপ্লবী বীর, ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাচ্য প্রতীচীর বহু গুণী শিল্পানুরাগী ঐ দক্ষিণের বারান্দাটিতে সমবেত হইয়া পৃথিবীর গৌরবময় সাংস্কৃতিক অধ্যায়-সৃজনে তাঁহাদের স্ব স্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। আজও আমাদের নিকট ঐ বারান্দাটি পবিত্র তীর্থভূমি। মনুষ্যত্বের মধ্যে বিপদসঙ্কুলতা, নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অবনীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য আমাদের আলোচনা করা দরকার। * * ভারতের শিল্পক্ষেত্রে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের মহান্ ঐশ্বর্যশালী রূপরেখায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার মহাবাণী আমরা সারা পৃথিবীতে প্রচার করিব।

ভারতীয় সাহিত্যসংসদ—ভারতের রাষ্ট্রভাষা তথা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সম্প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্যসংসদ গঠনের পরিকল্পনা-সম্বন্ধে গত ৯ই ভাদ্র সর্দার কে এম পানিকর নয়াদিল্লীতে বেতার বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, উর্দু, এবং দক্ষিণ ভারতের ভাষাচতুষ্টয়—ইহাদের প্রত্যেকেরই অতি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ব্যাপক ও সুসমৃদ্ধ সাহিত্য রহিয়াছে। হিন্দীকে জাতীয় ভাষারূপে প্রথম স্থান দেওয়া হইলেও একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐ সকল ভাষা কখনই অপসারিত হইবে না। ভারতের সংস্কৃতি এবং সৃজনীপ্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিবে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্য দিয়াই।

পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ—বাংলাদেশে সংস্কৃতশিক্ষার এই বহুবিশ্রুত প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ৭৪তম বার্ষিক সমাবর্তন-অনুষ্ঠান গত ৮ই ভাদ্র ঢাকা জগন্নাথ কলেজহলে পূর্ববঙ্গের গভর্নর মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকির সভাপতিত্বে সম্পন্ন

হইয়া গিয়াছে। গভর্নর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় সংস্কৃতের সম্প্রসারের জন্য একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

আনন্দমোহন বসু-স্মরণে—গত ৪ঠা ভাদ্র, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বাংলার কৃতী সন্তান আনন্দমোহন বসুর স্মৃতিসভানুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, ধর্মকে বাদ দিয়া জাতির কল্যাণ হইতে পারে একথা আনন্দমোহন কোনদিনই মনে করেন নাই। ধর্মের আলোকে জাতির চরিত্র যাহাতে আলোকিত হয় তাহারই জন্য তিনি চেষ্টিত ছিলেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত-পরিষদের সমাবর্তন-উৎসব—গত ১৬ই ভাদ্র, কলিকাতার রাজভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বঙ্গীয় সংস্কৃত-পরিষদের সমাবর্তন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় কৃতী ছাত্র ও ছাত্রীগণকে পদক ও উপাধিপত্র বিতরণ করেন। রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু, শিক্ষাধিকর্তা ডক্টর পরিমল রায় এবং পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার-সম্বন্ধে সুচিন্তিত উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন। পরিষদের ৫০টি কেন্দ্র হইতে (তন্মধ্যে ৩৫টি বাংলার বাহিরে) প্রতিবৎসর ৬।৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সংস্কৃত-পরীক্ষা দিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে টোলের সংখ্যা এক হাজার।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু—গত ২২শে ভাদ্র ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে ১২৬তম জন্মদিবস প্রতিপালন-অনুষ্ঠানে সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু বলেন, ঋষি রাজনারায়ণকে তাঁহার দেশবাসী কেবল শিক্ষাব্রতী, জাতীয়তাবাদী ও সমাজসংস্কারক হিসাবেই স্মরণ করিবে না, পরন্তু চিরকালের মানুষ বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

উক্ত গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

আমেদবাদ শ্রীবিবেকানন্দমণ্ডলী পাঠচক্র—এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব গত ৩০শে ও ৩১শে শ্রাবণ স্থানীয় প্রেমভাই হলে সম্পন্ন হইয়াছে। আবৃত্তি, ভাষণ এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল। শ্রীহরিদাস অচরতলাল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জপানন্দ হিন্দীতে, শ্রীযশোধর মেহতা গুজরাটী ভাষায় এবং বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় শ্রীসাইমণ্ডলীর অধ্যক্ষ শ্রীবামনরাও পি প্যাটেল 'আমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা' বিষয়ে প্রবচন দেন।

স্বদেশে ডক্টর তারকনাথ দাস—বাংলার বিপ্লবীযুগের অন্যতম দেশকর্মী মনীষী তারকনাথ দাস ৪৭ বৎসর পরে কিছুকালের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল বিদেশে থাকিয়াও ভারতের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি-প্রচারের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি বক্তৃতাদি দিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতিভবন এবং বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরেও তিনি ভাষণ দিয়াছেন। স্বতন্ত্র ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যাসমূহ-সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা দেশবাসীকে প্রভূত আলোক ও উদ্দীপনা দিবে, সন্দেহ নাই।

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ কে?

ন কদাচিজ্জগত্যস্মিন্ তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্॥
ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ॥
যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতা।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ॥
বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ॥
(অষ্টাবক্রসংহিতা, ১৭।২-৫)

অহো তত্ত্বজ্ঞানের কী মহিমা! এই পৃথিবীতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিষণ্ণ হন না—কেননা, তিনি জানেন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, (আত্মস্বরূপে) তিনিই তাহা হইয়াছেন। (তাঁহা ছাড়া অপর কিছু নাই—অতএব তাঁহার চিত্তপ্রসাদের ব্যাঘাত জন্মাইবে কিসে?)

সুমিষ্ট সল্লকী (বাবলা) পত্র খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলে হস্তীর যেমন আর কটু নিম্বপত্র আস্বাদনে রুচি থাকে না, সেইরূপ যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়াছেন তাঁহাকে বিষয়-সুখ কখনও হর্ষান্বিত করে না।

ভুক্ত বিষয়ে যাঁহার স্পৃহা নাই, অনাস্বাদিত ভোগ্য-বস্তুতেও যিনি নিরাকাঙ্ক্ষ, এইরূপ স্থিরচিত্ত তত্ত্বজ্ঞপুরুষ জগতে সত্যই দুর্লভ।

এই সংসারে কেহ বা জাগতিক ভোগসুখের জন্য ব্যাকুল, কেহ আবার মুক্তির জন্য অস্থির, কিন্তু ভোগ ও মোক্ষ দুইটিরই প্রতি উদাসীন—এমন পরমসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কচিৎ কখনও দেখা যায়।

কালী ও কৃষ্ণ

কার্তিকী অমাবস্যায় হিন্দুবঙ্গ দীপান্বিতা কালীপূজা-উৎসবে মাতিয়া উঠিবে—আবার এক পক্ষ পরে কার্তিকী পূর্ণিমায় আসিবে রাসযাত্রা—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অতি-মানব প্রেম-লীলার স্মরণোৎসব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই দুটি উৎসব বিশেষতঃ দীপালী, জনগণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার করে, যদিও বাংলার বাহিরে উহা কালীপূজার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার ধর্ম ও সামাজিক জীবনে এই উৎসবদ্বয়ের প্রভাব অনেক বেশী ব্যাপক। কালী-মাতা এবং রাস-নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে বাঙ্গালী যতটা স্বীকার, গ্রহণ এবং সম্মান করিয়াছে অ-বাঙ্গালী বোধ করি ততটা করে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম-মনীষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত-প্রতিভা এবং হৃদয়-মাধুর্য মুকুলিত এবং বিকশিত হইতে কালী এবং কৃষ্ণ এই দুই দেবতার আখ্যান ও আরাধনা বহুতর সহায়তা করিয়াছে।

কার্তিকী অমাবস্যা এবং কার্তিকী পূর্ণিমা—একই মাসের স্বল্প-ব্যবহিত এই পুণ্য-তিথিদ্বয় আমাদের চিত্তে জাগ্রত করে দুটি ভিন্ন ধরনের আবেগ। অমারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারের পটভূমিতে আমরা স্মরণ করি কালিকার বরাভয়দায়িনী স্নেহময়ী মাতৃপ্রকৃতির সহিত তাঁহার "করালবদনা, নরমালা-বিভূষণা, নিমগ্নারক্তনয়না" চণ্ডমুণ্ডনাশিনী ভীষণ সংহারমূর্তিও। পরমাশক্তি শুধু সৃজন এবং পালনকারিণী নন্, তিনি প্রলয়-বিধায়িনীও—অভিব্যক্তি এবং পরিপুষ্টির ন্যায় মৃত্যুও জগন্মাতার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ—এই সত্য আমরা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে, কার্তিকী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে আমাদের সকল হৃদয় নাচিয়া উঠে সেই কত শতাব্দী পূর্বেকার 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রিতে' যমুনাতটে 'গোপললনা-পরিবেষ্টিত গোপাল-চূড়ামণির' 'যোগ-মায়া-উপাশ্রিত' নর্তন-বিলাসের দিব্য স্মৃতিতে। এখানে একটুও ভীষণতা নাই—আছে শুধুই মাধুর্য। আবেগ এখানে আদৌ শঙ্কা-গম্ভীর নয়—একেবারেই প্রেম-নির্ভীক।

এমন এক সময় ছিল, যখন এই বিভিন্ন-আবেগ-ধর্মী উপাসনা-দ্বয়কে মানুষ তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া দেখিত। দুই শ্রেণীর উপাসক উপাসনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য শুধু যে ধর্ম-সাধনাতেই পরস্পর দূর হইয়া গেল তাহা নয়, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও একে অপরের সম্মুখে তুলিয়া দিয়াছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর—শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রাচীন কলহ। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অনর্থকর ব্যবধান দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন:

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজো বাবুর* কাছে আনালুম। সেজোবাবু খুব যত্ন-খাতির করলে, রূপার বাসন বা'র করে জল খাওয়ান পর্যন্ত। তারপর সেজোবাবুর সামনে বলে কি—'আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না!' সেজোবাবু শাক্ত। মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

"শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!'

"শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য।'"

* রাণী রাসমণির সেজ জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস।

"এই রকম বৈষ্ণব-শাক্তদের ভিতর রেষারেষি।... এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বেও বাংলা দেশে এই কলহের নিষ্ফলতা প্রতিপাদনের চেষ্টা যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা পাই বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধসাধকগণের রচিত ভজনসঙ্গীতে। যথা :—

কালী হলি মা রাসবিহারী (নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—)
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥
... ...
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল-কানু, শ্যাম-শ্যামা-তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥
(রামপ্রসাদ)

কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বর্ণনা পড়ি, ঠাকুর ভাববিভোর হইয়া জনৈক পূর্বতন সাধকের এই গানটি গাহিতেছেন—

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি—
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা॥

শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে একবার গোপবধূগণের নিকট কালীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন এই পৌরাণিক কাহিনীও কৃষ্ণ এবং কালীর ঐকাত্ম্য-বুদ্ধিকে সাধকগণের চিত্তে সুস্থির করিতে কম সহায়তা করে নাই। শাক্ত-বৈষ্ণবের রেষারেষির সমান্তরালে তাই, উভয়ের মধ্যে একটি তাত্ত্বিক সম্প্রীতির ধারাও যে বাংলার পাঁচ শত বৎসরের ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষীণভাবে হইলেও বহিয়া আসিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বার্তাবহ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেই সম্প্রীতির স্রোত সুস্বচ্ছ ও প্রবলতর হইয়াছে। আজ যদি কোন বৈষ্ণব শাক্তগণকে 'কেশবমন্ত্র' লওয়াইবার প্রস্তাব করেন অথবা কোন দেবী-উপাসক শ্রীকৃষ্ণকে 'মা রাজরাজেশ্বরীর' কর্মচারীর পদবীতে বসাইতে চাহেন তাহা হইলে ধর্মীয় জনমতের নিকট উভয়েই সমানভাবে উপহসিত হইবেন। আজিকার ধর্ম-সংস্কৃতি কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এবং পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত উৎসবদ্বয়ের বিপরীত আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্যের সন্ধান পাইয়াছে। একই ব্যক্তি, যে উৎসাহে কালীপূজার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনায় নিজকে উন্মুখ করিয়া রাখে, সেই উৎসাহেই সে যদি রাসপূর্ণিমার কীর্তনে-নর্তনেও মাতিয়া যায়—তাহা হইলে আজ আমরা বিস্মিত হই না।

বহুবিচিত্র কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতিরাশি-দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার সম্ভাবনা ও আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার সমন্বয়বার্তার অর্থ শুধু ইহাই নয়, প্রত্যেকটি মত ধর্মের উচ্চতম লক্ষ্যে পৌছিবার পথ-বিশেষ, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহ্য কর, আপন আপন পথে চলিতে দেও। সমন্বয়ের গভীরতর তাৎপর্য নিশ্চিতই ইহাও যে, কেহ যদি 'আপন পথের' মধ্যে একাধিক পথকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চায় তাহা বাঞ্ছনীয়ই—যেমন, কেহ যদি একসঙ্গে একাধিক অস্ত্র নিপুণভাবে চালাইতে সমর্থ হয় তাহাকে আমরা বাহাদুরই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে যুগপৎ শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন, আবার ব্রহ্মবাদী ছিলেন; উত্তরকালের সাধককেও তিনি ইঙ্গিত

করিয়া গেলেন, তোমরাও নিজস্ব ধর্মসাধনাকে এইরূপই সমৃদ্ধ কর। দূর হইতে মৌন সম্মতি দেওয়া মন্দ জিনিস নয়, কিন্তু কাছে গিয়া প্রেমালিঙ্গন দিয়া আপনার বলিয়া গ্রহণ আরও ভাল জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় শুধু সম্মতি নয়, সানুরাগ আলিঙ্গনও। তাইতো দেখিতে পাই, তিনি পদাবলী-কীর্তনের আসরে উপস্থিত ব্রাহ্মভক্তগণকে সাশ্রুলোচনে মিনতি করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—

"রাধাকৃষ্ণ মানো আর না মানো এই অনুরাগটুকু নাও।...আহা, সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়!"

আবার ব্রাহ্ম নরেন্দ্র যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভব-তারিণীর মন্দিরে গিয়া কালী-বিগ্রহের সম্মুখে মা, মা বলিয়া ব্যাকুলভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে যেন আনন্দের বন্যা উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ ধর্মপ্রচারকের বিধর্মীকে স্বীয় ধর্মাবলম্বী করিবার বিজয়োল্লাস নয়—সমর্থ অধিকারীর অধ্যাত্ম-সাধনার সমৃদ্ধি অনুভব করিয়া উদার জগদ্গুরুর স্বার্থবুদ্ধি-বিরহিত পরিতৃপ্তি।

একটি শঙ্কা উঠে। ধর্মসাধনায় বহু ভাব অবলম্বন করিলে ভাবের গভীরতা কমিয়া যায় না কি? উহা কি এক প্রকারের পল্লবগ্রাহিতা নয়? ইষ্টনিষ্ঠা বলিয়া যে একটি বস্তু আছে তাহা কি এইরূপ করিলে ব্যাহত হয় না? আজ কালীপূজার মণ্ডপে মা মা বলিয়া কাঁদিলাম; কাল রাসযাত্রা দেখিয়া আহা, আহা করিলাম—ইহাতে কি ভাব জমাট বাঁধে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সম্মুখে না থাকিলে এই শঙ্কার বোধ করি কোন সদুত্তর দেওয়া চলিত না। তাঁহার জীবন দেখিয়া আজ আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রাখিয়াও (উহা বজায় রাখা অতিশয় প্রয়োজনীয়ই) ধর্মজীবনে একাধিক ভাব সুসমঞ্জসরূপে অবলম্বন ও অনুভব করা যায়। যুগপৎ শাক্ত ও বৈষ্ণব হওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষারই যেমন একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী ও ক্রম আছে, সাফল্যলাভের কৌশল আছে, আধ্যাত্মিক জীবনে বহুভাবসাধনাও তেমনি অভিজ্ঞের নিকট শিখিতে হয়—উহাকে সার্থকতায় পরিণত করিবার সঙ্কেত গুরুমুখে জানিয়া লইতে হয়।

আরও একটি প্রশ্ন জাগে। যদি 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্' উপদেশ-অনুসারে হরিনাম করিয়াই পরমা গতি লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আবার কালী কালী করিতে যাই কেন? কালীপূজা করিয়াই প্রাণ যদি ভরিয়া যায় তবে আবার রাসলীলার মাধুর্য উপভোগ করিবার উদ্যম করি কেন?

ইহার উত্তর বোধ করি এই—একদা মানুষ কেবল হাঁটিয়াই দূরত্বকে জয় করিত; ক্রমে সে গোশকট, অশ্বরথ আবিষ্কার করিল—পরে আসিল সাইকেল-রেলগাড়ী-মোটরকার—পরিশেষে এখন আমরা বাস করিতেছি বিমান-যুগে, এক ঘণ্টায় অনায়াসে দুইশত মাইল উড়িয়া চলিতেছি। ইহার পরে আসিতেছে রকেটের যুগ, এবং হয়তো পরে আণবিক পরিবহনের যুগ। হয়তো দূরত্ব অতিক্রমের ইতিহাস তখনও শেষ হইবে না। দূরত্বজয়-রূপ লক্ষ্যটি অপরিবর্তিতই রহিয়া যায়—তাহার উপায়ে ঘটে ক্রম-বিকাশ, ক্রম-বৈচিত্র্য, ক্রম-সমৃদ্ধি। অনন্ত-সম্ভাবনা-যুক্ত মানব-মনীষার জয়যাত্রার ইতিহাসই এই। সে শুধু প্রয়োজনের কাহিনী নয়—সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টির সার্থকতার কাহিনী। আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও সাধনার ক্ষেত্রেও ঐ একই ইতিহাসের নজির যদি দেখানো যায়, খুব অন্যায় হয় কি? অবিপরিণামী অবিনাশী শাশ্বত সত্য চিরকালই এক। কিন্তু পৌঁছিবার বাহন—ধর্মের সাধনা যুগে যুগে ক্রম-বর্ধিত, বৈচিত্র্য-অলঙ্কৃত হইতে পারে, হয়ত, নিছক প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশের দিক দিয়া নয়,

স্রষ্টা' মানুষের শক্তি-বিকাশের দিক্ দিয়া, তাহার সৃজন-প্রতিভার সার্থকতার দিক্ দিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ঃ—

"আমি একঘেঁয়ে হতে ভালবাসি না।"

"আমি সব নিই।"

*　　*　　*　　*

এ সংসারে কোন কিছুই চিরকাল একরূপ থাকে না—দিনের পর রাত্রি আসে, উত্থানের পর পতন, আলোকের পশ্চাতে মলিনতা এবং বোধ করি অমৃতও এক সময় বিষে রূপান্তরিত হয়। জগৎ-চক্রের এই চিরন্তন নিয়মে ধর্মসাধনাও যদি কাল-প্রভাবে তাহার গতি-বেগ, আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা হারায় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আবার কোন শক্তিমান ধর্মাচার্য আসিয়া উহাকে সতেজ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান। তান্ত্রিকী দেবী-আরাধনায় এবং বৈষ্ণবভক্তিতত্ত্বের মধুরভাব-সাধনায় বাংলার ধর্মচেতনা এক সময়ে বিপুলভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। উভয়ক্ষেত্রেই বড় বড় সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাদের বিশুদ্ধ, ভাগবত চরিত্র এবং প্রাণপ্রদ শিক্ষা দ্বারা বাংলার নরনারীর ধর্ম-জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের ধর্ম-ইতিহাসে ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে কাল-বিধান হইল সক্রিয়। শক্তির ব্যাপকতা যখন অতিশয় বর্ধিত হইল উহার গভীরতা কমিয়া আসিতে লাগিল। শাক্তাচারে ঢুকিল প্রাণহীন অনুষ্ঠান-বাহুল্য—ক্রমে, দেবতার নামে নানাবিধ উৎকট উচ্ছৃঙ্খল আচার; রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অতিলৌকিক ঊর্ধ্বভূমি হইতে নামিয়া আসিল মাটির মানুষের সাংসারিক আবিল ভালবাসায়। অনধিকারীর হাতে শস্ত্র পড়িলে যেমন অনর্থের সম্ভাবনা থাকে, তেমনি অজিতেন্দ্রিয় ভোগাসক্ত সাধকগণ কার্তিকী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে ইন্দ্রিয়োন্মাদনায় পর্যবসিত করিয়া ফেলিলেন।

চাকা ঘুরাইয়া দিবার দিন যে আসিয়াছে তাহার প্রমাণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীতেই।

মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ মাতৃভাব—শিশুর সারল্যে ঐকান্তিক ব্যাকুলতাভরে জগজ্জননীকে মা—মা বলিয়া ডাকা। ইহাই মুখ্য। মন্ত্র-যন্ত্র-ন্যাস প্রাণায়াম-অভিষেক-পুরশ্চরণ হোম গৌণ।

"মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে, কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।"

"মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফলমূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জলা একাদশী।

"এই মাতৃভাব—সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।

"বীরভাবে—অর্থাৎ স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন বড় কঠিন।

"কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন। তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ। সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। ছাদে উঠবার সময় হেলুতে দুলুতে নাই। হেলুলে দুলুলে পড়বার সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত)

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার জনৈক শিষ্যের নিম্নোক্ত কথোপকথনটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ—

স্বামিজী। বৃন্দাবনলীলা ফীলা এখন রেখে দে; গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামিজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশি বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই

মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধিসহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা কি সত্য নহে?

স্বামিজী। তা কে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।·········দুই একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকী সব জানবি ঘোর তমোভাবাপন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্ত সতর্কবাণীগুলি বাংলার ধর্মসাধনায় বহুপ্রচলিত দুটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীকে সময়োপযোগী পরিশোধিত করিয়া লইতে প্রচুর সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। আমরা যেন মনে রাখি, ভবিষ্যতের ধর্মসাধনা এক দিকে হইবে যেমন সমন্বয়-সমৃদ্ধ—অন্যদিকে হইবে স্বচ্ছ, গভীর, প্রাণপ্রদ।

মন-পতঙ্গ

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

অমা-তমসার বক্ষ বিদারি' রূপের দীপান্বিতা
দিকে দিকে ঐ দেখি যে প্রজ্বলিতা।
দেহ-দেহলীতে প্রাণের পঞ্চ-প্রদীপের মুখে মুখে—
হৃদয়ের স্নেহে, কী যে অন্ধ সুখে
লক্ষ চেতনা, বাসনা যে জ্ব'লে উ'ঠে
গ্রহে-তারকায়, গিরি-নদী-নভে, জীবে-উদ্ভিদে ফুটে
হয় অতি অপরূপ
বহু বিচিত্র রূপ!
মন-পতঙ্গ মোর
সে-রূপবহ্নিচ্ছটায় মুগ্ধ ভোর।
কী যেন গভীর টানে
মন-পতঙ্গ উড়ে চলে মোর সে-রূপের সন্ধানে।
জ্যোতির স্বচ্ছ কাচ-আবরণে শিখাটি তাহার ঢাকা—
মন-পতঙ্গ যত না ঝাপটে পাখা,
তবু আবরণ করিতে পারে না ভেদ—
শুধু পোড়ে পাখা, বেড়ে চলে তার রূপের তৃষ্ণা, খেদ।
শুধু মরে মাথা কুটে—
তবু সে রূপের অগাধ অপার রহস্য নাহি টুটে।
বক্ষে তাহার নিত্য জাগিয়া রয়
শুধু চির-তৃষা, শুধু চির-বিস্ময়॥

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়

(চার)

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যে মেয়েরা থাকিত, তাহাদের চালচলন মা খুব লক্ষ্য করিতেন। একটি ঘটি বা বাটি জোরে ফেলিলেও মা খুবই বিরক্তি-প্রকাশ করিতেন, বিনা কারণে কাহারও সঙ্গে কথা বলিবারও আদেশ ছিল না। একদিন রাধারাণী উপর হইতে খুব জোরে নামিতেছে, তাহার পায়ে মল ছিল, উহার শব্দ শুনিয়া মা এমনি ভাবে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাধু আসিতেই মা বলিতে লাগিলেন, রাধি, তোর লজ্জা নেই? নীচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে পরে উপর থেকে দৌড়ে নাব্‌ছিস, ছেলেরা কি ভাব্‌বে বল্‌তো? তুই পায়ের মল এখুনি খুলে ফেল্‌। এখানে ছেলে মেয়ে যারাই আছে তারা তামাসা করার জন্যে আসেনি, সকলেই ভজন-সাধন করছে, এদের ভজনের ব্যাঘাত ঘটলে কি হবে জানিস্‌?

এই সব বলিতেই রাধু পায়ের মলগুলি খুলিয়া মায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভয় নাই, কিন্তু আমরা সকলে ভয়ে অস্থির হইলাম। আর একদিন রাধু স্নানের পর চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াইয়া একখানা গামছার চাপ দিয়া চুলের পাতা নামাইতেছে। ইহা দেখিয়া মা বলিতেছেন; ওসব কি করছিস্‌? ওসব করলে তোরা ভাবিস্‌ খুবই সুন্দর দেখা যায়; তা নয়, আমার কাছে ও বিশ্রীই লাগে। আমি তো জীবনে চুলই বাঁধি নি। গৌরদাসী এসে আমাকে কথনো কথনো চুল বেঁধে দিত, তাও আমি বেশী সময় রাখতে পারতুম না, খুলে ফেলতুম। এখন তোদেরই দেখ্‌ছি অন্য রকম। গোলাপ মা কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যে মা মুক্তকেশী, তাই খোলা রাখবে না তো কি করবে?

একদিন এক মুন্‌সেফের স্ত্রী মার ওখানে আছেন। তখন মহাযুদ্ধের আলোচনা হইতেছে। ঐ মেয়েটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, সকলেই বলে এই যুদ্ধ নাকি এখানে পর্যন্ত এসে পৌছুবে, তা হ'লে আমাদের দশা কি হবে, মা? মা বলিলেন, ওসব কিছু না, এখানে কি করতে আস্‌বে? সেখানেই যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটি হয় নি, আবার এখানে আস্‌বে কেন? ইহার পর অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। মা যেন একটু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

দেশে খুব দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে অনেক সাহায্য করা হইতেছে। একদিন মা এমনভাবে দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে লাগিলেন, কোথায় কত দুরবস্থা—মিশন হইতে কত টাকা ঐ কার্যের জন্য দেওয়া হইতেছে—ছেলেরা কত খাটিতেছে ইত্যাদি—যেন মনে হইল, জগতের সব দুঃখ তিনি আপন প্রাণে অনুভব করিতেছেন।

আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মী-দিদির ওখানে যাইতাম। লক্ষ্মীদিদি আমাকে গোপনে প্রায়ই বলিতেন, মাকে বলিস্‌ আমি এখানে থাক্‌ব না। এই যে আমার ভাইএর মেয়েরা আমার সেবাযত্নের জন্যে রয়েছে, এরা কোন ভক্তের আসা পছন্দ করে না। যেখানে ভক্ত

নেই সেখানে আমি থাকতে পারবো না। মাকে বলিস্ আমি বৃন্দাবনে চলে যাব, তোকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি সব কথা মাকে বলিলাম। মা বলিলেন, দেখ বৌমা, ভক্ত দেখলেই লক্ষ্মী একেবারে পাগল হয়ে যায়। সেজন্যই ঐ মেয়ে দুটি ভক্ত এলে বিরক্ত হয়; তাদের দোষ নেই বাছা। লক্ষ্মীকে বলো, আমি একদিন যাব। আর, তোমাকে তার সঙ্গে কোথাও যেতে হবে না। সে রাস্তায় যদি কোন ভক্ত দেখে, তবে সেখানেই সাত দিন থেকে যাবে। তাকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সঙ্গে লোক থাকৃতে হয়। সে বৃন্দাবনে থাকতে চায়; ওখানে যেরূপ বানরের উপদ্রব ও কি থাকৃতে পারবে? আমি সকল কথা লক্ষ্মীদিদিকে বলিলাম। আরও বলিলাম, তোমার যা অবস্থা তাতে অন্যত্র তোমাকে পাঠাতে হলে বিশেষ বন্দোবস্ত করে পাঠাতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের যা হত তোমারও নাকি তাই হয়। বলিতেই লক্ষ্মীদিদি আমাকে বকিতে লাগিলেন। বলিলেন, ঠাকুরের যা হ'ত তা কি মানুষের হয়? আমার কি এক ব্যাধি হয়েছে, আমি ভাই কোথাও যেতে পারি না। লক্ষ্মীদিদি নিতান্ত ছেলে মানুষের মত হইয়া গিয়াছিলেন।

একদিন কম্বল বিক্রি করিবার জন্য এক জন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। নলিনদিদি কম্বল রাখিবার জন্য দর করিতেছে। কম্বলওয়ালী দাম ১।০ আনা চাহিতেছে। নলিনদি ১৲ টাকা বলিতেছে। মা দূর হইতে শুনিয়া নলিনদিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি এর সঙ্গে কি নিয়ে দাম কসাকসি করছ? সে বলিল, আমি কম্বলের দাম এত বলি, সে এত বলে। অমনি মা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি চার আনা পয়সার জন্য তার সঙ্গে এতক্ষণ যাবত্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ করছ? ছিঃ, সে দু'পয়সা পাওয়ার জন্যই মাথায় করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। আর তুমি কিনা সামান্য পয়সার জন্য এতখানি সময় ওকে আটকে রেখেছ। বিশেষ, তোমার কম্বলের দরকারই বা কি? সবই তো তোমার আছে, তবু কিনতে গিয়েছ। (আমাকে দেখাইয়া) বরং বৌমাকে একখানা দিলে ভাল হত। ও কম্বল ছাড়া অন্য জিনিস ব্যবহার করে না, তাও একখানা মাত্র কম্বল। এত শীতে সে এই নিয়ে থাকে, তবু কারুর কাছে চায় না। দুখানা কাপড়ের বেশী বোধ হয় জীবনে তিনখানা কাপড় পরে নি। তবু এতেই বেশ আনন্দে আছে, লোকের ভাল জিনিসটি তোদের চোখে পড়ে না। আমি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, কম্বলের কথা, বা কাপড়ের কথা একদিনও তো মাকে বলি নাই, মা এতটা খবর রাখেন! আমাদের মা যে সত্যকার মা, ইহা কতবারই না তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন! স্থূল দেহের অন্তরালে গিয়া মা আমার এখন আরও বেশী করুণা বিতরণ করিতেছেন! মাকে এখন যাহারা ডাকে অমনি যামিনী তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন। আগে মার কাছে যাইতে হইলে কত যোগাযোগের দরকার হইত—এখন মনঃ-প্রাণ ঢালিয়া ডাকিলে এক জায়গায় বসিয়াই পাওয়া যায়। মায়ের সন্তান যাহারা, তাঁহারা বিপদে পড়িলে তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনি যেন নিজের দরকারেই আসিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন—এইরূপও কত ঘটনা শুনিতে পাইয়াছি।

একবার দেশ হইতে ঠিক সপ্তমী পূজার দিনে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। আমার শরীর তখন নিতান্ত খারাপ, জ্বর হইতেছিল, সেই জ্বর লইয়াই মাকে পূজা করিব, সেই ভরসায় মনোমত কয়েকটি ফুল সহ মায়ের কাছে গিয়াছি। কিছুদিন আগে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দেহ গিয়াছে। সেবার, মঠে দুর্গাপূজা হইবে না। ৺কাশীর মঠে পূজা

হইবে। আমি মায়ের কাছে যাইয়া মাকে পূজা করিলাম। মা আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বাছা আমার কেমন হয়ে গেছে। প্রেমানন্দ মহারাজের জন্যও দুঃখ করিলেন। বলিলেন, আজ রাত্রেই তুমি কাশীতে রওনা হও। এখানের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী কয়েক জনও কাশী যাবে। তোমার শরীর নিতান্ত খারাপ হয়ে গেছে, কাশীতে মাস খানেক থাকিও। বলিলাম, সেখানে যেয়ে কি হবে? আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে। মা বলিলেন, বল কি? সেটা হ'ল ৺বিশ্বনাথের ধাম। বলিলাম, এটাও অন্নপূর্ণার ধাম। মা হাসিয়া বলিলেন, তা হলেও কিছুদিন সেখানে থাকলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিছু তেঁতুলের আচার দেশ হইতে নিয়া গিয়াছিলাম। অনেক লোক দেখিয়া ভাবিলাম, এত ভিড়ে আচারই বা কোথায় যাইবে, মায়ের সেবায় লাগিবে কি না। অন্তর্যামিনী মা আমার, গোলাপ মাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই আচার টুকু যত্ন করে রাখ, পরে খাওয়া যাবে; তোমাকে কিছু ফল রাস্তার খাওয়ার জন্যে দিয়ে দাও। উহা দেওয়া হইল। আমরা রওনা হইলাম। তখন কাশীতে ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা। সেখানকার মহারাজগণ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, এখন যেরূপ ব্যাধির আক্রমণ কাশীতে দেখা দিয়েছে, এতে আপনি সুস্থ হবেন এ তো দূরের কথা, না জানি এই রোগেই আবার কাতর হয়ে পড়েন। মায়ের আদেশে আসিয়াছি, যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সেবার নলিন দিদি প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। তাঁহারা পূজার পরই অন্যত্র চলিয়া গেলেন, আমি কাশীতেই রহিলাম। আমি রামামহলে থাকিতাম। কিছুদিন পরে আমার সেই ব্যাধি হইল। তখন মহারাজগণ ডাক্তার ও ঔষধ পাঠাইয়া আমাকে খুবই সাহায্য করিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখি, মা আসিয়া বলিতেছেন, কোন ভয় নেই, আমি আছি। আমি তোর যত্ন নেব। পরদিন হইতেই ভালর দিকে চলিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। একমাস পূর্ণ হইতেই পুনরায় কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। মা আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাঁচা গেল বাবা। যা অসুখ তোমার হয়েছিল, ভালর জন্য পাঠিয়ে মন্দ হতে চলেছিল।

আশা

অনিরুদ্ধ

বার বার অন্ধকার ঘিরিছে আমায়
সূচিতে কি সমুখের ধ্রুব জ্যোতির্লোক—
বার বার বেদনার আঘাতে হৃদয়
অবশেষে একদিন হবে বীতশোক?

বার বার পরাজয় নিষ্পেষিয়া মোরে
আনিবে কি একদিন বিজয় প্রভাত—
বার বার আলিঙ্গিয়া কঠিন মৃত্যুরে
লভিব কি অমৃতের চির আশীর্বাদ?

বার বার নিরাশায় ভগ্ন দেহমন
জগতে জীবনে শুধু ধ্বনিছে ধিক্কার—
বার বার তবুও কি পথ নিরীক্ষণ
করি যাব অনাগত অনন্ত আশার?

শিক্ষা ও ধর্ম

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

ইংরেজ আমলের শেষ দিকের কথা। স্বাধীনতা-সূর্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথচূড়া পূর্বদিগন্তে তখনও সুস্পষ্ট দেখা দেয় নি সত্য—কিন্তু, পাণ্ডুর আকাশের পটভূমিতে আলোকশিশুর আবির্ভাব নিঃসংশয়ে সূচিত হয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার আশু পরিবর্তন-আশায় জনমানসে চাঞ্চল্য জেগেছে, নূতন পথের সন্ধানে পা বাড়িয়েছে নবযুগের অকুতোভয় অভিযাত্রিকদল। আর, তারই প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রও বিচিত্ররূপে আন্দোলিত হতে সুরু করেছে। উদ্দেশ্য ও অভিলাষের নব কলেবরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন প্রণালী ও ব্যবস্থার সঙ্গে ভাবী কালের বিচ্ছেদ আবশ্যক এবং আসন্ন হয়ে উঠেছে। অনিশ্চিত বিহ্বলতায় দেশবাসী বিশেষভাবে তখন আচ্ছন্ন। বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধের সে-সব অনিশ্চয়তার দিনে,—.৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে, তৎকালীন ব্যবস্থাপরিষদের একটি অধিবেশনে জনৈক মুসলমান সদস্য 'বিদ্যায়তনে ধর্মশিক্ষা'-বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

সরকারী এবং আধা-সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন হবে কিনা অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির জন্য সে-বিষয়ে সরকার চিরদিন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থাক্‌বেন—তাই সে-প্রশ্নের মূলকথা ছিল, বোধ করি বা অন্তর্নিহিত অভিযোগও ছিল। তদুত্তরে সেদিনকার ভারত-সরকার যে-কথা বলেছিলেন দীর্ঘকালান্তরে তারই সারাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—শুদ্ধমাত্র ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিকে কতকাংশে অনাবৃত করবার জন্য :

তাঁরা বলেছিলেন,—"ভারত সরকার তাঁদের এতাবৎকালের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন। আবার, এ-সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি বাধানিষেধ কোন শিক্ষায়তনের উপর চাপিয়ে দেওয়াও সরকারের অভিপ্রেত নয়। সতর্কতার নীতি (policy of caution) সরকার এ-ক্ষেত্রে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ, ধর্ম শিক্ষাবিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার জোরজুলুমেরও যেমন গভর্নমেণ্ট বিরোধী, অনুকূল পরিবেশে কোন শিক্ষায়তন সাধারণ ভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলে তার অনুমোদনেও গভর্নমেণ্ট তেমনি আগ্রহান্বিত।"

তারপর, সে-উক্তির সূত্রানুসরণ করে তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার (অন্য প্রদেশের কথা সঠিক আমাদের জানা নেই) দু'একবার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্মশিক্ষা-বিষয়ে অভিমত প্রকাশের জন্য লিপিপ্রেরণ করেছিলেন এবং শিক্ষাবিদ্‌গণও তার স্বপক্ষে বিপক্ষে নিজেদের যুক্তিবদ্ধ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে-সকল মতামতের বাস্তব রূপায়ণ শেষ পর্যন্ত আর কিছু ঘটেনি এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও অল্প কিছুদিন খানিকটা লেখা-লেখি, আলাপ-আলোচনার পর স্তব্ধ নীরবতার অন্তরালে সমগ্রব্যাপারটিই সমাহিত হয়েছিল।

কিন্তু আজকের কথা বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বাঙলায়, তথা ভারতবর্ষের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, আজ শিক্ষার নব নব পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের

রিপোর্ট-অনুসারে কলেজী শিক্ষার সংস্কার আসন্ন এবং সামাজিক শিক্ষাও ধীর পদবিক্ষেপে পথচারী। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার-সাধনোদ্দেশ্যে অতিসম্প্রতি গঠিত হয়েছে মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন। সুতরাং বর্তমান সন্ধিক্ষণে শিক্ষা ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিদ্যায়তনে ধর্মের স্থান বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ দু'একটি কথা এ-নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করতে আমরা অগ্রসর হয়েছি।

*　　*　　*

শিক্ষার প্রগতি-ইতিহাসে যুগে যুগে ধর্মের উপযোগিতা ও প্রাধান্য কোন-না-কোন ভাবে স্বীকৃত হয়েছে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেই। ইউরোপে,—প্রাচীন গ্রীক ও রোমকযুগের কাল থেকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিক্ষা-আইন-প্রণয়নের সময় পর্যন্ত, দীর্ঘ-বিসর্পিত পথে স্থানে স্থানেই ধর্মের চরণচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে—স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট সীমা-রেখার মধ্যে। গ্রীসদেশের 'লিবারেল এডুকেশনের' উদ্দেশ্য-অভিলাষের অন্তরালে প্রকৃতধর্মের সারবস্তুর স্পর্শ বর্তমান ছিল। রোমক শিক্ষার আদর্শেও দেখা যায়—"The Roman youth was to be pious, grave and reverential, courageous, manly, prudent and honest."

আবার, পরবর্তী মনাষ্টিসিজমের যুগে কিংবা রেনেসাঁস্ বা সংস্কারের যুগে, এমন কি 'বাস্তবধর্মী শিক্ষা'র যুগেও (realistic education) মার্টিন লুথার, মনটেইন্, কমেনিয়াস্ প্রমুখ মনীষিগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষপ্রভাবে ধর্ম কোন-না-কোন অভিব্যক্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। শিক্ষার আদর্শপ্রসঙ্গে এ কথা উক্ত হয়েছিল যে,—"The ultimate end of man is eternal happiness with God." বলা হয়েছিল,—"This life is but a preparation for eternity." তারপর, দীর্ঘকালের ব্যবধানে —একেবারে আধুনিক যুগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে—রুশো, ফ্রুবেল, পেষ্টলজি প্রমুখ প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের অভ্যুদয়ে 'আধুনিক শিক্ষার' যে অরুণ রাগ ইউরোপের বিস্তৃতক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা করেছিল, মনোবিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারের সূত্রাবলম্বনে শিশুকেন্দ্রিকতার নবতম আদর্শে শিক্ষাকে যে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলবার প্রয়াসে সে লিপ্ত হয়েছিল—তার মধ্যেও ধর্মপ্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল হয়েছে। সকল দেশের প্রচেষ্টা স্বভাবতই এক পরিণতির দিকে একইভাবে অগ্রসর হতে পারেনি, কিন্তু অন্ততঃ ইংলণ্ড প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট দেশসম্পর্কে আমাদের উক্তির সত্যতা যে অনস্বীকার্য, ইতিহাস তার অভ্রান্তলিপিতে সে-কথা সপ্রমাণ করছে। বস্তুতঃ, একথা আজ আর কারু অবিদিত নেই যে, ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে ইংলণ্ডের সর্বজাতীয় বিদ্যায়তনের সকল স্তরেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যদিয়েই বিদ্যায়তনসমূহের দৈনন্দিন কার্যের সূত্রপাত করতে হবে। সেখানকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের অনেকের মতে—

"The study of Bible, already justifiable on literary grounds, has other claims for recognition in the curriculum. Since no boy or girl can be counted as properly educated unless he or she has been made aware of the existence of a religious interpretation of life."

কাজেই, সে মহাগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে রাখতে হবে।

আর আমাদের এ-ভারতবর্ষে—যেথায় স্মরণাতীত যুগ থেকে 'আত্মানং বিদ্ধি'-রূপ মহান

সূত্রে সমগ্রজীবনদর্শন গ্রথিত, যেখানে শাস্ত্র-মুখে ভূয়োভূয়ঃ এ-তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে যে—

"The individual's supreme duty is to achieve his expansion into the Absolute, his self-fulfilment, for he is potentially divine."—সে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মানুশীলনের স্থান যে অতি উচ্চে নির্দিষ্ট থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? আবার শুধু স্মরণাতীত প্রাচীন যুগেই নয়—পরবর্তী সূত্রযুগ, মহাকাব্যের যুগ, এমনকি বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধোত্তর যুগেও সে-আদর্শ বহুলাংশে অপরিবর্তিতরূপেই অনুসৃত হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রয়াসের সার্থক ফল—যে-সব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ক্রিয়াশীল ছিল, দেশ-বিদেশের অগণ্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদ্গণ যাদের গৃহচ্ছাদতলে অশেষ আয়াসে সমবেত হতেন জ্ঞানলাভের জন্য, শিক্ষালাভের জন্য—নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রমুখ সে সব বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠানের অক্ষয় আখ্যায়িকায় ও অবিনশ্বর শিলালিপিতে ধর্মানুশীলনের অনবদ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু বিগত অতীতের এ-সব ধারার সঙ্গে আধুনিক কালের কর্মনীতির কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই। প্রবন্ধারম্ভে সে-কথা আমরা উল্লেখ করেছি। বিদেশী শাসক রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির মারফৎ তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতার নিরাপদ নীতি অনুসরণ করেছিল—প্রথম থেকেই। তা ছাড়া, যুক্তিপ্রধান বর্তমান বৈজ্ঞানিকযুগের তথাকথিত প্রগতিবাদ অপধর্মকেই ধর্ম আখ্যা দিয়ে সর্বত্র তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে অগ্রসর হয়েছিল এবং এ-দেশের অদ্ভুত, সংক্রামক আব্‌হাওয়ায় উৎকট সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ফলে, হয় শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে ধর্ম এযাবৎ সম্পূর্ণ নির্বাসিত ও বর্জিত ছিল অথবা উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত করবার শক্তিশালী যন্ত্রস্বরূপ সে ব্যবহৃত হচ্ছিল নানা প্রতিষ্ঠানে।

মনস্বী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি সাম্প্রতিক উক্তি উদ্ধৃত করি। তিনি বলেন,—যে-কোন মানুষের জীবনের ক্রম-বিকাশের পথে, ত্রিবিধ সংযোগ অপরিহার্য। নিসর্গের মুক্ত আঙিনায় মাতৃগর্ভ থেকে যে-মুহূর্তে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত থেকে শেষ নিঃশ্বাসের দিনটি পর্যন্ত - প্রকৃতির শতবিচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে থাকে। দিনে-রজনীতে যে বৈষম্য, ঋতুতে ঋতুতে যে নৈসর্গিক বিভিন্নতা, অক্ষাংশের বিভিন্ন স্তরে শীতাতপের যে পার্থক্য নিত্য বর্তমান—তাদের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষাকল্পে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভূগোলবিজ্ঞান প্রমুখ শাস্ত্র মানবশিশুকে শিক্ষাদান করে থাকে। যে-কোন দেশের পাঠ্য তালিকায় তাদের উপযোগিতা স্বীকৃত এবং আয়োজন ক্রমশঃ বর্ধিতই হচ্ছে।

আবার, জন্মাবধি আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশী থেকে সুরু করে—অনাত্মীয় ও বিদেশী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহারানুগামী কত সহস্র নরনারীর সঙ্গেই না তার সংযোগ ঘটে! সে-সংযোগকে সুন্দর ও সার্থক করবার জন্য বিরাট মানবসমাজের শত বিচিত্র সংস্কৃতিধারার অন্তরালে যে ঐক্যসূত্র ফল্গুপ্রবাহে নিয়ত বহমান—তাকে উপলব্ধি করবার জন্য – সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এদেরও বিশিষ্ট স্থান অবিসম্বাদী ভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

কিন্তু মানুষ দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে স্বকীয় মনোজগতে যে অদ্ভুত উপপ্লাবনের সম্মুখীন হয়, ভিন্নমুখী বৃত্তিসমূহের আঘাত-সংঘাতে

প্রতিনিয়ত তার জীবনে যে সমস্যা জটিলমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—তাকে নিয়মিত করবার জন্য, 'master of one's ownself'—হবার জন্য কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় দেখা যায় না। যে-মনের সুস্থ ও সংহত অবস্থার উপর মানুষের সকল শান্তি, সফলতা নির্ভরশীল, বৈষ্ণব-কবির ভাষায়—গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হলেও যে 'একে'-র দয়া বিনে জীব ছারেখারে যায় সেই এক-স্বরূপ মনটিকে উন্নত ও পবিত্র করবার জন্য—শান্ত, প্রশস্ত ও দৃঢ় করবার জন্য কোন সিলেবাস আমাদের পাঠ্য-তালিকায় গৃহীত হয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এ-উক্তি পাশ্চাত্যদেশগুলির পক্ষে যতটা সত্য, বোধ করি ভারতবর্ষের পক্ষে আজ তার চাইতেও অধিক তাৎপর্যে সত্য হয়ে উঠেছে।

ফলে, আমাদের বিদ্যায়তনসমূহের প্রাঙ্গণতল থেকে যে আশিষ্ঠ, দ্রঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ নবনারীর উদ্ভব হবে বলে একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ—তার বাস্তব রূপায়ণ দূর বা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে প্রতীত হচ্ছে না। যে দিকেই চোখ ফেরান যায়, দেখা যায়—অসাধুতায় আচ্ছন্ন হয়েছে দেশ, স্বাধীনতার নামে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ প্রকাশে বিপর্যস্ত হচ্ছে সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারীরা পর্যন্ত মুহূর্তে অতি সামান্য প্রলোভনের কাছে আত্মবিক্রয় করছেন নিরুদ্বিগ্ন মনে। কোন তথাকথিত প্রগতিবাদ কিংবা রাজনৈতিক অতি-চেতনার আত্মপ্রসাদ জাতীয় জীবনের এ অতি-দ্রুত অধোগতিকে নিবারণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সমর্থ হবেও না।

সুতরাং, এ-কথা অতি দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে—আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেরূপই হোক, ধর্মসম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকুক আর নাই থাকুক—শিক্ষাব্যবস্থার অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্মের স্থান সুনির্দিষ্ট হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন, শিক্ষানিকেতনের ভিত্তিমূলে প্রকৃত ধর্মের অমৃত-রসধারা সিঞ্চন করবার দুরূহ সাধনা শিক্ষাব্রতী-দিগের পক্ষে অপরিহার্যরূপে গৃহীত হওয়া সঙ্গত। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্মশিক্ষার পথ আমাদের দেশে খুব নিষ্কণ্টক নয়। এর সঙ্গে বিবিধ সমস্যা জড়িত রয়েছে, নানাধরনের বিঘ্ন-বিপত্তি এর পথকে আবৃত করে দণ্ডায়মান। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ খণ্ডিত হবার পরও যে ভারতবর্ষ জন্ম নিয়েছে, সেটিও বহুধর্মাবলম্বীর নিরাপদ বাসভূমি। কাজেই, পূর্বেরই মত এখনো এদেশের শিক্ষায়তনগুলির অধিকাংশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীগণ একত্রে বসে বিদ্যালাভ করছে এবং ভবিষ্যতেও সেরূপ করতে থাক্‌বে। অতএব, এ-সকল মিশ্রিত বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার পথ কখনও খুব সুগম বা ঋজু হতে পারবে না। দেওঘরের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, কলকাতার হিন্দুস্কুল, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল কিংবা মুসলমানদের মাদ্রাসা—যেথায় একই ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণই শুধু অধ্যয়ন করে, সেখানে অবশ্য ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অন্যান্য অসুবিধাপীড়িত বিদ্যায়তনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। সর্বভাবে উদার ও অসাম্প্রদায়িক, দেশ-জাতি-নির্বিশেষে যেটি নিত্য সুত্য—সেই 'মানবধর্মে'র, চিরন্তন মর্মকথা ভিন্ন আর কিছুই সেখানে ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তু হতে পারবে না। সে সকল বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম, অবস্থা-বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে, গৃহীত হতে পারে কিনা—সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা সে-বিষয় চিন্তা করে দেখ্‌তে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি ঃ

(১) প্রতি সপ্তাহের প্রথমদিনে সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে অথবা হলঘর থাক্‌লে, হলঘরে - সমবেত হয়ে নীরবে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করতে পারে। একটি উদার অসাম্প্রদায়িক প্রার্থনা-সঙ্গীতে এ-জাতীয় আরম্ভ সূচিত হলে ভাল হয় এবং দেশ-বিদেশের মহাপ্রাণ মনীষিগণের জীবনী ও বাণী সম্বলিত ক্ষুদ্রভাষণে এর সমাপ্তি হতে পারে।

(২) অধুনা বহু বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়াদির উৎকর্ষের জন্য আবাসিক-প্রথা বা হাউস-সিষ্টেমের প্রচলন হয়েছে। তাদের মধ্যদিয়েও ধর্মশিক্ষার আংশিক ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়। সপ্তাহে একদিন, একেবারে শেষ ঘণ্টায়, বিভিন্ন আবাসগুলি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সমবেত হতে পারে এবং তথায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ পূর্বপরিকল্পিত কার্যক্রমানুসারে মহাপুরুষদের জীবনী, বাণী ও সদ্‌গ্রন্থাদি থেকে পাঠ ও আলোচনা করতে পারেন। একথা মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি বিদ্যায়তনের লক্ষ্যবস্তু নয়, শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করাই তার সাধনা, উন্নত আদর্শের প্রতি অনুরাগ-সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য।

(৩) কখনো কখনো সুযোগ-সুবিধামত, বিশেষ করে, মহাপুরুষদের জন্মবার্ষিকী-দিনসমূহে উদারমতাবলম্বী সুধী সজ্জনকে আমন্ত্রণ করে উৎসব এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করলেও যথেষ্ট ফললাভ সম্ভব হতে পারে।

(৪) বেতারকেন্দ্রসমূহ থেকে মধ্যে মধ্যে ধর্মের সার্বভৌম ভাবগুলি মনোরম গল্প, নাটিকা, গান, আবৃত্তি প্রভৃতির মধ্যদিয়ে পরিবেশন করলেও যথেষ্ট কাজ হবে – অন্ততঃ যে সব বিদ্যালয়ে রেডিও আছে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তো বটেই।

(৫) বিদ্যালয়-সমূহের গ্রন্থাগারে সদ্‌গ্রন্থাদির প্রাচুর্য বাঞ্ছনীয়।

(৬) 'স্বামীজী', 'বিদ্যাসাগর', 'সেণ্টবার্ণাডাটে' প্রভৃতির মত চলচ্চিত্রের বহুল প্রচারেও উচ্চ আদর্শ-জীবনের দিকে তরুণ মন আকৃষ্ট হতে পারে। সুতরাং, ঐ জাতীয় চলচ্চিত্র আরও প্রস্তুত হোক এবং প্রাচীন ভারতের আশ্রম-বিদ্যালয় ও নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রমুখ বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের আখ্যায়িকা নিয়ে সুদৃশ্য ছায়া-চিত্রাদি প্রস্তুত হোক। যথার্থ ধর্মশিক্ষার পথ তাতেও সুগম হবে।

সর্বোপরি শিক্ষকদের নিজেদের নিষ্কলঙ্ক, উদার জীবন ও বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি - ধর্মশিক্ষার সর্বোত্তম উপাদান বলে মনে রাখা কর্তব্য। ধর্মকে জাগ্রত ও জীবন্ত পদার্থবলে মহাপুরুষগণ যুগে যুগে বর্ণনা করেছেন। অনুভূতিলব্ধ যে-ধর্ম, পবিশুদ্ধ আচরণ ও সংযত তপস্যায় যার উদ্বোধন ঘটে—মানবজীবনে তার প্রভাব অমোঘ ও অনতিক্রম্য।

এক একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে দু'একজন শিক্ষকও যদি ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্যে ব্রতী হন, 'আপনি আচরি ধর্ম'—অপরকে চালিত করবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, তবেই 'ম্যান্‌-মেকিং' শিক্ষার বুনিয়াদ এদেশে গ্রথিত হতে পারবে। তবেই; যে-নৈরাশ্য আজ আমাদের চারদিকে ঘনকুয়াসার আকারে পুঞ্জীভূত হয়েছে—শ্রদ্ধাহীন, শৃঙ্খলাহীন, অবিশ্রাম পর-দোষান্বেষী আমাদের বংশধরগণ অপচয়ের যে গোলক-ধাঁধায় আজ আবদ্ধ হয়েছে, তা-থেকে মুক্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির প্রশস্তবর্ত্মে পদ বিক্ষেপের সুযোগ লাভ করবে এবং আমাদের ধূলিধূম-সমাকীর্ণ গৃহের বাতায়নপথে পরিচ্ছন্ন, নির্মেঘ আকাশের নির্মলবায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবে।

অশুভ-দুঃখ

শ্রীদ্বারকানাথ দে, এম্-এ, বি-এল্

শুভ সকলেই চায়, অশুভ কাহারও কাম্য নয়। তথাপি এ সংসারে অশুভ-অমঙ্গলের অন্ত নাই, দুঃখের সীমা নাই। রোগ মানুষের নিত্য সহচর; কেহ কেহ অসহ্যযন্ত্রণাদায়ক ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল বা আজীবন ক্লেশ-ভোগ করেন। দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে কত লোক নিষ্পেষিত হইতেছেন। বহু লোকের পারিবারিক জীবন নিরানন্দ ও অশান্তিময়। দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান রাখিয়া জননীর মৃত্যু, নিঃসহায় বৃদ্ধ পিতামাতা রাখিয়া যুবকপুত্রের অকাল-মরণ, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুত্রকন্যা রাখিয়া পরিবারের একমাত্র উপার্জক ও রক্ষক পুরুষের কালগ্রাসে পতন—ইত্যাদি দৈবনিগ্রহমূলক পারিবারিক বিপদ্ অহরহ সংসারে ঘটিতেছে। ঝটিকা, জলপ্লাবন, ভূকম্পন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নানাবিধ আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহুলোকের এককালীন প্রাণহানি ও অন্যবিধ প্রভূত ক্ষতি অনেক সময় ঘটিতেছে। সর্বোপরি হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হইয়া মানুষ মানুষের কতই না কষ্টের কারণ হইয়াছে!

এই সব দেখিয়া মনে স্বতই প্রশ্ন উঠে—মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে এত অমঙ্গল কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আছে কি?

যদি কেহ বলেন যে, পৃথিবীতে যতপ্রকার অমঙ্গল সে সব ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, শয়তানের সৃষ্টি, তাহা হইলে ঈশ্বরনিরপেক্ষ এবং তত্তুল্য বা তদধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অপর এক শক্তির অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বর স্বীকার করিয়া এরূপ শয়তানের অস্তিত্ব গ্রহণ করা যায় না।

বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর মঙ্গলময় বটেন কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাহারই নিজ মন্দ কর্মের শাস্তি। অবশ্য কোনও কোনও স্থলে যে স্বকীয় মন্দকার্য বা আচরণের ফলে মানুষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় তাহা আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সকল স্থলে মানুষের দুঃখকষ্টের মূলে তাহার স্বকৃত কার্য বা আচরণ দৃষ্ট হয় না অথবা সঙ্গতভাবে অনুমিতও হয় না। বিশেষতঃ দৈবনিগ্রহমূলক, নৈসর্গিক বা আকস্মিক দুর্ঘটনা-জনিত অমঙ্গলের পশ্চাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের কৃত কোনপ্রকার মন্দ কার্য বা আচরণের সম্পর্ক পাওয়া যায় না। যাহারা জন্মান্তরবাদী তাহারা হয়ত এ প্রকারের অমঙ্গল উপরোক্ত ব্যক্তিগণের পূর্বজন্মকৃত কোনও না কোনও অন্যায় কর্ম হেতু ঘটিয়া থাকে বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা অনেকেরই মনঃপূত হয় না। যাহা হউক যদি ধরিয়াই লই যে মানুষের সর্বপ্রকার অশুভের হেতু তাহার ইহ কিংবা পূর্বজন্মকৃত মন্দ কর্ম, তথাপি এ প্রশ্নটি থাকিয়াই যায় যে, মন্দ কর্মে মানুষের প্রবৃত্তি কেন হয় এবং সে প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল এবং কে সৃষ্টি করিল? শেষ পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণ করিলে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, মানুষের মনে যে মন্দ প্রবৃত্তি রহিয়াছে, উহার সৃষ্টি ঈশ্বরই করিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে,

শুভাশুভ, ভালমন্দ, দুঃখকষ্ট—এই সমস্তেরই সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর। যদি তাহাই হইল, তবে কি হেতু তিনি মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলেরও সৃষ্টি করিলেন তাহা না ভাবিয়া আমাদের উপায় নাই।

যাঁহাদের ভগবানে দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস, তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা বুঝিতে না পারিলেও সর্বপ্রকার অশুভ-অমঙ্গলের অন্তরালে গূঢ়ভাবে তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই বিশ্বাস-বলে তাঁহারা এ সংসারের সর্ব-প্রকার দুঃখ-কষ্ট অমঙ্গল ধীরভাবে গ্রহণ করেন, অন্ততঃ সেরূপ চেষ্টা করেন। তাঁহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে "ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য"। ইহা তাঁহাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং ইহাতে যুক্তিতর্কের স্থান নাই। বস্তুতঃ ভগবানের বিধান মানিতে গেলে সে বিধান অভ্রান্ত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত। কিন্তু যাঁহাদের একপ প্রবল স্বতঃ বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের পক্ষে বিচারমূলে প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতে হইবে। নিম্নে আমরা তাহারই চেষ্টা করিব।

দুঃখকষ্ট মানুষকে নিপীড়িত করে বটে, কিন্তু অনেক সময় তাহার সুপ্ত শক্তি জাগরিত করে। বাধা-বিপত্তি, আপদ্-বিপদের সহিত সংগ্রামের ফলেই মানুষ আজ পৃথিবীতে এত উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন। অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে স্বর্ণ বিশুদ্ধতা লাভ করে না। দুঃখের আঘাতে মনের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। অবিচ্ছিন্ন সুখ মানবমনের জড়ত্ব আনয়ন করিত। দুঃখ, কষ্ট, অমঙ্গল মানুষকে তৎপ্রতিকারের চেষ্টায় প্ররোচিত করে এবং ফলে মানুষের জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে। জরা ব্যাধি ও শোকের দৃশ্যে মর্মাহত হইয়াই কপিলবাস্তুর রাজপুত্র রাজৈশ্বর্য ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিকারের উপায়-আবিষ্কারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘ ও কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বিষয়টি অপর এক দিক্ হইতেও বিবেচনা করা যাক্। মনে হয় এ সংসারে অমঙ্গলের প্রয়োজন আছে। অশুভ না থাকিলে শুভ আনন্দপ্রদ হইত না, দুঃখ না থাকিলে সুখ সুখকর হইত না। দুঃখের অভাবে সুখের মূল্য নাই, অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। অন্ধকার না থাকিলে জ্যোৎস্নার আদর কে করিত? অমাবস্যার অভিজ্ঞতা-হেতুই পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের নিকট এত মনোরম। দুঃখকষ্ট না থাকিলে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত হইত না। সুখের স্পৃহার মূলে রহিয়াছে দুঃখ।

সুখদুঃখ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। যেখানে একটির অস্তিত্ব আছে, সেখানে অপরটির অভাব হইতে পারে না। এই সত্য আমরা উপলব্ধি না করিয়া দুঃখ-পরিত্যাগের ও সুখলাভের নিমিত্ত ধাবিত হই। কিন্তু দুঃখকে এড়াইয়া সুখলাভ করিতে আমরা কখনই পারিব না। সুখ ও দুঃখ উভয়ের অতীত না হইলে দুঃখের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

এ সংসারে দুঃখের বাস্তব কারণ যে কখনও দূর হইবে সে আশা আমাদের নাই। অবশ্য মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি ও চেষ্টার বলে এ পৃথিবীতে অনেক পরিমাণে অশুভ-দুঃখ দূর বা হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে অনেক অসাধ্য সাধিত হইয়াছে এবং অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে লোকের সুখ-সুবিধার বৃদ্ধি হইয়াছে। বুদ্ধি ও চেষ্টাবলে মানব-সমাজের অনেক কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার স্থলে সুব্যবস্থা হইয়াছে। তথাপি দুঃখকষ্ট এখনও বহুল পরিমাণে আছে এবং কতক কতক দুঃখ-কষ্টের উপশম হইলেও নূতন নূতন দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব হইয়াছে। বহুরোগের ঔষধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইলেও নূতন নূতন রোগ দেখা দিয়াছে

এবং পূর্বাপেক্ষা বরং অধিক পরিমাণে লোক রোগে কষ্ট পাইতেছে। যে সব দেশে রোগে বা অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে সে সব দেশে আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছে ও মোটের উপর মৃত্যুর হার বরং বাড়াইয়াছে। বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার এক দিকে যেমন সুখসুবিধা-বৃদ্ধিকারক হয়েছে, অপরদিকে তেমনই ধ্বংসের ভয়াবহ অমোঘ অস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বকালে যুদ্ধ হইত দুই দেশের মধ্যে এবং সেই যুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু বর্তমান সময়কার যুদ্ধ পৃথিবীর সকল দেশকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জড়িত করে এবং তাহার ধ্বংসলীলা যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হয়। জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনুষ্যসৃষ্ট দুঃখ-কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালের অভাব নাই ও হইবে না এবং তাহা হইতে মানুষের পরিত্রাণ নাই। সব দিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে এ সংসার হইতে দুঃখ, অশুভ-মন্দ কখনই একেবারে নিঃশেষে নির্মূল করা সম্ভবপর হইবে না।

অতএব শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় যে, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ ও শুভ-অশুভ বলিতে আমরা যাহা বুঝি এই পরস্পরবিরোধী বস্তুর যুগপৎ অস্তিত্ব বরাবর যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। ইহাই জগতের বিধান এবং হয়ত বিধাতার উদ্দেশ্য। তবে কি আমরা চিরকাল অশুভ-মন্দের দাস হইয়া থাকিব? তাহা কখনই নয়। মন্দের সহিত, অশুভের সহিত মানুষকে সংগ্রাম করিতেই হইবে, কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ সংগ্রাম বিধি-নির্দিষ্ট। ভয়ে ইহা হইতে বিরত থাকা কাপুরুষতা। অশুভের সহিত সংগ্রামেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং জীবনের সার্থকতা ও আনন্দ। যে দিন এ সংগ্রাম হইতে মানুষ বিরত হইবে, সে দিন মানুষের—মানবজাতির—মৃত্যু।

ভ্রান্তি

শান্তশীল দাস

সুন্দর আসে ঃ কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়
পথের ধূলায় ঝরে তার আঁখিজল ;
মানুষ ছুটেছে কোথা কার ছলনায়,
শূন্য যে ওই দেবতার বেদীতল।

সাথে লয়ে তার অতুল বিভবরাশি
মানুষের দ্বারে সে যে আসে প্রতিদিন ;
প্রার্থী সে নহে, সে তো নহে প্রত্যাশী ;
সব আছে তার ; সে নহে বিত্তহীন।

মানুষের পরে অশেষ করুণা তার,
বারে বারে তাই আসে মানুষের দ্বারে ;
ভরে দিতে চায় রিক্তের ভাণ্ডার,—
সম্পদ তার লুটায় পথের ধারে।

সুন্দর কাঁদে ঃ মানুষ ফিরে না চায়,
কোথায় সে ছোটে কোন মরীচিকা পানে ;
বেদনা তাহার কবে শেষ হবে হায়,
কবে সাড়া দেবে দেবতার আহ্বানে।

সতীতীর্থ কনখল

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

দক্ষ শিবের শ্বশুর, কাজেই শিবের পূজ্য, এই এই অহঙ্কার তাঁহার ছিল। একদা নৈমিষারণ্যে বিশ্বস্রষ্টাগণের যজ্ঞস্থলে প্রধান প্রধান দেবতা ও ঋষিগণ স্বস্ব অনুচরবর্গ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে প্রজাপতি দক্ষযজ্ঞস্থলে উপনীত হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ব্যতিরেকে সকল দেবতাই আসন-পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শিব আসনত্যাগ না করায় দক্ষ অত্যন্ত অপমান-বোধ করিলেন এবং ঐ বিরাট যজ্ঞস্থলেই ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ, আমি অজ্ঞান বা মাৎসর্যপরতন্ত্র না হইয়া কেবল সাধু পুরুষদিগের চরিত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্যই যাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে সভ্য-গণ, এই নির্লজ্জ শিব হইতে লোকপালদিগের যশ নষ্ট হইল; কারণ এই ব্যক্তি কর্তব্য কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ-পূর্বক সাধুজনাচরিত পন্থাকে দূষিত করিয়াছে। সে ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমক্ষে আমার বালহরিণনেত্রা সাবিত্রীতুল্যা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। অতএব শিব একপ্রকার আমার শিষ্য, আমি ইহার গুরু। এই হেতু আমার প্রতি সম্মানার্থ ইহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করা উচিত, কিন্তু এই মর্কটলোচন বাক্য দ্বারাও আমার সম্মান করিল না। অহো! আমার কি দুর্ভাগ্য! এ ব্যক্তি ক্রিয়াহীন, অশুচি, অভিমানী এবং সাধুদিগের মর্যাদা-ভেদী। ইহাকে জামাতা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি শূদ্রকে বেদ-শিক্ষাদানের মত আমি ইহাকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছি।" দক্ষ আরও বলিলেন—"এ অতি ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগণকে সঙ্গে লইয়া বিকীর্ণকেশ হইয়া নগ্নবেশে কখন হাস্য, কখন রোদন পূর্বক শ্মশানে শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। চিতাভস্মে ইহার স্নান হয়, ইহার গলদেশে প্রেতের মালা এবং শবাস্থিই ইহার ভূষণ, এ নামে মাত্র শিব, বস্তুতঃ অশিব। এ নিজে উন্মত্ত এবং উন্মত্ত ব্যক্তিরাই ইহার প্রিয়পাত্র। অধিকন্তু যে প্রমথগণ তমোরূপাত্মক, এই ব্যক্তি তাহাদেরই পতি এবং উন্মাদ-নামে যে ভূতবিশেষ আছে সে তাহাদের অধ্যক্ষ। হায়! আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় এই অপবিত্র দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে আমার সাধ্বী কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছি।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।২।১৩-১৫)

দক্ষ এইরূপ নিন্দাবাদ করিয়াও বিরত হইলেন না। অভিশাপ দিয়া বলিলেন, "শিব দেবতাদের অধম; সুতরাং দেবতাদিগের সহিত সে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না।" শিব শান্ত ও ধীরচিত্তে সবই শ্রবণ করিলেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও রুষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। নন্দী ক্রোধান্বিত হইয়া দক্ষকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, "যিনি শিবনিন্দা করিয়াছেন, তিনি আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া পশুতুল্য হউন এবং তাঁহার মুখ ছাগের ন্যায় হউক।"

এই ভাবে শ্বশুর ও জামাতার বিবাদে বহুকাল অতীত হইল। দক্ষের গর্ব উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার পরাক্রমে কেহ যজ্ঞ করিতে সাহস করিলেন না। কারণ, করিলেই যজ্ঞ শিবহীন করিতে হইবে। যজ্ঞ এক প্রকার লোপ পাইতেছে দেখিয়া দক্ষ নিজেই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন—'সেই প্রচেতোনন্দন দক্ষ পূর্বে মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায় পূর্বের শত্রুতা-নিবন্ধন গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।' (কূর্মপুরাণ, ১৫।৫) হরিদ্বার ও কনখল এই উভয় স্থানকেই গঙ্গাদ্বার বলা হয়। কনখলেই দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল।

দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শিব ও প্রিয়তনয়া সতী ব্যতীত সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করা হইল। যজ্ঞের বিরাট আয়োজন। দক্ষালয়ে দেবতাদের আগমনে আনন্দের হাট বসিল। সতী পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, পিতা শিবহীন যজ্ঞ করিতেছেন। পিতৃগৃহে যাইবার জন্য সতী শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিব বলিলেন, "হে দাক্ষায়ণি, দক্ষ তোমার পিতা হইলেও তাঁহাকে দর্শন করা তোমার উচিত হয় না। তাঁহার মতানুযায়ীরাও তোমার দর্শনযোগ্য নন। বিশ্বস্রষ্টাগণের যজ্ঞে তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া গমন কর, তাহা হইলে তোমার অমঙ্গল হইবে। বন্ধুদিগের অপমান মানী ব্যক্তির মরণসদৃশ।"

সতী শিবের সহানুভূতি না পাইয়া অতীব উৎকণ্ঠা এবং ক্রোধের বশবর্তিনী হইয়া একাকিনী পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন দেখিয়া শিবানুচরগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। সতী দক্ষালয়ে আসিলে দক্ষ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করা দূরের কথা, কেবলই নিন্দাবাদ করিলেন। যজ্ঞস্থলে আসিয়া সতী দেখিলেন, সকল দেবতাই উপস্থিত, তাঁহারা আপন আপন আসনে উপবিষ্ট। কেবলমাত্র 'সংসারে যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, সুতরাং কাহারও সহিত যাহার বিরোধ হয় না এবং যিনি প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়তম ও আত্মস্বরূপ' সেই দেবাদিদেবেরই আসন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দক্ষ ক্রোধভরে বলিলেন, 'শিব অশিব; সে দেবতাগণের অধম; কাজেই যজ্ঞে তাহার স্থান নাই' বলিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। সতী পিতৃমুখে স্বীয় পতির নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহতা হইয়া বলিলেন—

"দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।৪।১২)

'হে দ্বিজ, আপনার ন্যায় অসূয়াপরবশ ব্যক্তিরা অন্যের গুণ বর্তমান থাকিলেও দোষই গ্রহণ করে, গুণ গ্রহণ করে না; আর কাহারও দোষ এবং গুণ দুইই থাকিলে দোষমাত্র গ্রহণ না করিয়া যাহারা দোষ ও গুণ যেমন থাকে ঠিক তেমনি বিবেচনা-পূর্বক গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু ব্যক্তি কেবল গুণই গ্রহণ করেন, কখনও দোষগ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ দূরে থাকুক প্রত্যুত অতি তুচ্ছ সামান্য গুণ দেখিলেও তাহাকেই বহুল পরিমাণে মনে করেন, তাঁহারা মহত্তম। আপনি সেই মহত্তম পুরুষের (শিবের) প্রতি পাপ কল্পনা করিলেন।'

সতী আরও বলিলেন, "আপনি গর্বভরে পূর্বস্মৃতি সবই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আমার প্রতি মন্দাদর প্রকাশ করিয়াছেন; আর জগদ্বরেণ্য দেবাদিদেব মহাদেবের নিন্দা করিয়াছেন, কাজেই

আপনা হইতে যে আমার এই দেহের উদ্ভব হইয়াছে তাহা আর আমি ধারণ করিব না।" দেহত্যাগ করিবার পূর্ব মুহূর্তে বলিলেন—

"নিরঙ্কুশ মানবগণ যেস্থানে ধর্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, যদি নিন্দিতের স্ত্রী নিন্দাকর্তাগণকে সেখানে বিনাশ করিতে অসমর্থ হয়, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক তথা হইতে অন্যস্থানে প্রস্থান করিবে, কিন্তু যদি সামর্থ্য থাকে তবে অকল্যাণ-বচন-প্রয়োগকারী সেই দুরাত্মার জিহ্বা বলপূর্বক ছেদন করিবে, তাহার পর আপনিও প্রাণত্যাগ করিবে, তবেই সাধ্বী স্ত্রীর পাতিব্রত্য রক্ষা করা হয়। তুমি ভগবান শিতিকণ্ঠের নিন্দাকারী, তোমা হইতে আমার এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না। অশুদ্ধ অন্ন মোহবশতঃ ভক্ষিত হইলে উহা বমন করিয়া ফেলিলেই উদ্ধার পাওয়া যায়; অতএব তোমা হইতে উদ্ভূত আমার শরীরের পরিত্যাগ ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই।"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।৪।১৭-১৮)

পরে সতী শিবের স্মরণ ও মনন করিয়া হোমানলে নিজেকে আহুতি দিয়া সমাধিতে দেহত্যাগ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া দেবতাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। ইতোমধ্যে নারদ কৈলাসে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। এই সংবাদে শিব অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং ক্রোধভরে নিজের জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ঐ জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভো, আমাকে কী প্রয়োজনে সৃষ্টি করিয়াছেন?" শিব বলিলেন, "যাও, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর।"

রুদ্র এই কথা বলিয়া তৎকালে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সুরগণসহ প্রজাপতির যজ্ঞস্থল কনখল-তীর্থে গমন করিলেন। এদিকে মহাপরাক্রম বীরভদ্র দক্ষালয়ে উপস্থিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ও দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন। পরে শিবের কৃপায় দক্ষের ছাগমুণ্ড হয় এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শিবের স্তুতি করেন। এইজন্য এই স্থানের শিবের নাম হয় 'দক্ষেশ্বর'।

সতী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শিবানুমতি না পাওয়ায় ক্রোধে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ হইতেই মহাকালীর উৎপত্তি হয়। তিনিই ভদ্রকালীরূপে কোটি যোগিনীসহ বীরভদ্রের সহযোগে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৮৪ অঃ)

শারদীয়া শ্রীদুর্গা-পূজাতে এবং বাসন্তী দুর্গাপূজাতে দেবীর মূলমন্ত্রে এই ঘটনারই উল্লেখ আছে—

"ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী-কোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী মহাভয়ঙ্করী কোটিযোগিনী-পরিবেষ্টিতা ভদ্রকালী দুর্গাকে নমস্কার।

(বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ)

শিব সতীর বিরহে মুহ্যমান হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধারণপূর্বক ত্রিভুবনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিবের স্পর্শে মৃতদেহ পচিয়া যায় নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীর মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐসব দেহাংশ যে সকল স্থানে পড়িয়াছে সেই সেই স্থানেই এক একটি পীঠস্থান হইয়াছে। শিব সেই সেই স্থানে লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

(কালিকাপুরাণ)

রমণীর পক্ষে পতির নিন্দাবাদ শ্রবণ করা অকল্যাণকর ও পাতিব্রত্যের হানিকর। মহামায়া সতীরূপে কনখলে দক্ষালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সতী পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনিয়া পাতিব্রত্য-রক্ষার্থ কনখলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এই ঘটনাশ্রয়ে কনখল 'সতীতীর্থ কনখল' বলিয়া পরিচিত।

সংঘের গণতন্ত্র

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্-এ

(পালি-বিনয়-মহাবগ্গের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়-অবলম্বনে লিখিত)

বোধিবৃক্ষতলে পরম ও চরম তত্ত্ব লাভ করিবার পর ভগবান বুদ্ধদেব দেখিলেন যে, তাঁহার এই বহু-আয়াসলব্ধ ও সুগভীর-ধ্যান-প্রসূত বোধিজ্ঞান জনসাধারণের ধারণার এবং আয়ত্তের সম্পূর্ণ অতীত। দুঃখনিরোধ বা নির্ব্বাণ বা বাসনা-রাহিত্যলাভ সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। যে তীব্র আশাপোষণ করিয়া তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই আশা পূর্ণ হইবার অন্য উপায় দেখিলেন না। তিনি ত কোন নূতন ধর্ম্ম জগতকে দেখাইবার জন্য গৃহত্যাগ করেন নাই, তিনি ভিখারী সাজিয়াছিলেন জগতের দুঃখমোচন করিবার উদ্দেশ্যেই; অতি আদরে, যত্নে এবং নিরতিশয় বিলাসিতার মধ্যে পালিত হইয়াও সেই রাজপুত্র সর্বদা ভাবিতেন, "হায়, সংসারে সকলি অনাত্মক, সকলি নশ্বর, সকলি দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই?"

তাঁহার প্রদর্শিত 'চতুরার্য্যসত্য', 'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' এবং 'লক্ষণত্রয়'গুলিকে আমরা মোটামুটি তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহাদের যথাযথ ব্যাখ্যা বহুস্থলে বহুবার বহুরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ কোন দেহবহির্ভূত শক্তির শরণ গ্রহণ করেন নাই। মানবকে তাহার নিজের শক্তির বলে ও চেষ্টায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইবে। আপনার পবিত্রতা ও মহত্ত্বে আস্থাবান হইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে 'ধর্ম্ম ও বিনয়' গ্রহণ করিয়া মোক্ষের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হইতে হইবে। তাহার চিন্তার ধারা নিয়মিত হইবে ধর্ম্মে এবং দৈহিক কার্য্য-সকল নিয়ন্ত্রিত হইবে বিনয়ে। বুদ্ধদেব সারা জীবন ধরিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা-দান করিয়া আসিয়াছেন।

ভগবান তথাগত বুঝিয়াছিলেন, মানুষকে তাহার মহত্ত্বের কথাই শুনাইতে হইবে। সে যে অনন্তশক্তির আকর তাহা না জানিলে সে কখন অমৃতস্বরূপ নির্ব্বাণের অধিকারী হইতে পারিবে না। সেইজন্য তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে বলিয়াছেন:

তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা।
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা॥

'হে বীরগণ, তোমরাই স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা আপনাদের মোক্ষ সাধিত করিবে। তথাগত বুদ্ধ সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা-মাত্র। যাহারাই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।' কিন্তু এই কর্ম্মের আদর্শ জগতে দেখাইবেন কে? সংঘ। এই সংঘ-সৃষ্টিই বুদ্ধ-দেবের ভারতে অতুলনীয় কীর্ত্তি।

তাঁহার ষষ্টি-সংখ্যক শিষ্যকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিবার সময় তিনি বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া আমার বাণী দিকে দিকে প্রচার কর। ইহাতে দেব-মানব সকলের মঙ্গল হইবে। জানিও তোমাদের বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইবে না।'

তখনকার দিনে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাঁহার কাছে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। এই নবপ্রেরিত শিষ্যবর্গও দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে দীক্ষাপ্রার্থিগণকে বুদ্ধদেবের নিকট আনিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাদের গমনাগমনের জন্য বহু ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া পরে নিয়ম করিলেন যে, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের নাম ও শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যবর্গই অতঃপর সেই সেই প্রদেশে প্রার্থিগণকে দীক্ষিত করিতে পারিবেন। তিনি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্তা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি নিজে ও তাঁহার শিষ্যবর্গ স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। গণতন্ত্রমূলক সংঘের ভিত্তি এইরূপে প্রথম ভারতে স্থাপিত হইল।

বুদ্ধের সহিত ধর্ম্ম ও সংঘের সমত্ব দর্শাইয়া ত্রি-শরণের প্রবর্ত্তন হইল। দীক্ষার সময় আগন্তুক হৃদয়ের শ্রদ্ধার সহিত বলিতেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি'। যদিও তিনটি বস্তু এক নহে তথাপি পরমার্থের দিক দিয়া দাঁড়াইল, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের মধ্যে প্রভেদ নাই, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধ তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই সংঘ। এই সংঘ যে কোন সংঘ নহেন। ইনি হইতেছেন একতায় আবদ্ধ, ভেদবুদ্ধিরহিত, পরম পরাক্রমশালী, দৃঢ়নিষ্ঠ এবং পরাজ্ঞান-নির্ব্বাণাভিযাত্রী অকিঞ্চন ভিক্ষুবর্গ। কি নিয়মে তিনি এই সংঘকে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সমতুল্য সৃজন করিয়াছিলেন তাহার আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। প্রধানতঃ তিনটি মুখ্য কার্য্যের দ্বারা তিনি সংঘ-গঠন আরম্ভ করিলেন; তাহা যথা-ক্রমে :—(১) শৃঙ্খলার মাধ্যমে বিদ্যার্জ্জন। (২) সংঘের সর্ব্ববিধ কার্য্যে ভিক্ষুদিগের সমানাধিকার এবং (৩) সংঘের বাহিরস্থিত জনসমাজের সহানুভূতি-অর্জ্জন।

সংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রথমা-বস্থায় দুই জন প্রবীণ (থের) ভিক্ষুর অধীনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিতে হইত। প্রথমে যিনি সংঘে প্রবিষ্ট করাইতেন এবং প্রব্রজ্যা দিতেন তিনি উপাধ্যায় নামে আখ্যাত হইয়া নবাগত ভিক্ষুকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন এবং দ্বিতীয়তঃ যিনি অপর শিক্ষাগুরু হইতেন তিনি সেই নবাগত ছাত্রভিক্ষুকে বিনয়শিক্ষা দিয়া আচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপে পঞ্চবৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিবার পর ছাত্র সংঘের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া অপর ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, অন্যথায় তাঁহাকে বরাবরই ছাত্র হইয়া থাকিতে হইত। শিক্ষকগণ আপনাদের জ্ঞানানুশীলন ও বয়সের তারতম্যানুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পর্য্যায়ে অভিহিত হইতেন। যাহারা দুঃশীল বা রাজকর্ম্মচারী বা বিকলাঙ্গ, সংঘের মধ্যে তাহাদের স্থান ছিল না।

এইরূপে সংঘ শীঘ্রই একটি সবল সন্ন্যাসি-গণের বসবাসযুক্ত শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইয়া জনসাধারণের জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক হইয়াছিল। ইহাতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল অতি সুন্দর। ব্যায়াম ও পরিচর্য্যার মধ্য দিয়া থের-ভিক্ষু বক্তৃতাচ্ছলে বক্তব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিতেন এবং সেইগুলির যথাযথ তথ্য ছাত্র উপলব্ধি করিল কি না তাহা প্রশ্ন ও উত্তরচ্ছলে জানিয়া লইতেন। পরা ও অপরা বিদ্যা উভয়েরই অনুশীলন হইত। শিক্ষার শ্রেণীগুলির নাম ছিল 'গণ' এবং গণগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া ও গণগুলির সংখ্যা স্থির করিয়া সংঘ-মধ্যে কত জন ভিক্ষু আছেন নির্ণীত হইত; কারণ তাহার বাহিরে কোন ভিক্ষু থাকিতে পারিতেন না। ছাত্রদিগের গুরুভক্তি এবং শিক্ষকগণের সন্তান-বাৎসল্য তাঁহাদের পরস্পরের ব্যবহারের

মধ্যে সঞ্চারিত থাকিয়া সংঘকে শ্রীপূর্ণ করিয়া রাখিত।

বিদ্যামন্দিরে পরিণত হইবার অল্পদিন-মধ্যে সংঘ স্বকীয় কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করিবার জন্য পাক্ষিক 'উপোসথ'-সম্মেলনে সকল ভিক্ষুর যোগদান নিয়মবদ্ধ করিলেন। কিন্তু শিক্ষার শ্রেণীগুলিস্থিত এই ছাত্র এবং শিক্ষকের পার্থক্য-ভাব উপোসথ-সম্মেলনে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইত। সংঘের ভিক্ষু হিসাবে তাঁহারা সকলেই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতেন। সংঘগঠনের সহিত ধর্ম্ম এবং বিনয় সর্ব্বস্থানে আলোচিত হইতে লাগিল। অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত মধ্যপন্থারূপে বুদ্ধদেবের এই নব-প্রচারিত ধর্ম্ম অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার শিষ্যবর্গ হৃদয়ঙ্গম এবং তৎসহিত বিনয়-অন্তর্ভুক্ত শীল ও আচারগুলি অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। নিষেধসূচক নিয়মগুলি শীল ও বিধিমূলক আদেশগুলি আচার-নামে অভিহিত হইল। 'উপোসথ'-সম্মেলনে এই উভয়বিধ নিয়মই পালিত হইত।

বিধিমূলক আদেশগুলির অনুকূলে উপোসথ-সম্মেলন গঠিত হইত এবং এই সম্মেলনে নিষেধাত্মক পাতিমোক্ষনামীয় শীলগুলি সংঘের প্রধান থের-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইত। সেইগুলি শ্রবণানন্তর ভিক্ষুগণ আপন আপন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যদি দেখিতেন, গর্হিত কোন কার্য্য করিয়াছেন তাহা হইলে কোন শুদ্ধ ভিক্ষুর নিকটে তাহা ব্যক্ত করিয়া নিষ্পাপ হইতেন এবং ভবিষ্যতে তাহা হইতে বিরত থাকিতেন। তাঁহারা সকলে নিষ্পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলে সংঘের কর্ম্মসূচী আরম্ভ হইত।

প্রথম অবস্থার পাক্ষিক অধিবেশনের এই বিশেষত্ব ছিল যে, সংঘের সমস্ত ভিক্ষুরই উহাতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। একটি মাত্র ভিক্ষুও অনুপস্থিত থাকিলে এই সম্মেলন অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত এবং এই অবস্থায় তথায় কোন কার্য্যনির্ব্বাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। সংঘের প্রধান থের যে বিহারে থাকিতেন সেইটিকে কেন্দ্র করিয়া ৩ যোজন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পরিধি টানিয়া যে প্রদেশটুকু সীমাবদ্ধ হইত তাহাকে সংঘের 'আবাস' বলা হইত এবং এই আবাসের মধ্যস্থিত যাবতীয় ভিক্ষুকেই সংঘের ভিক্ষু বলিয়া ধরা হইত। পাক্ষিক উপোসথ-অধিবেশনে এই সমস্ত ভিক্ষুরই সমবেত 'ছন্দে' (vote) কার্য্য পরিচালিত হইত। যখন স্থানীয় থের ভিক্ষুকে কেন্দ্র করিয়া বহু 'আবাস' গঠিত হইল তখন এক 'আবাস' হইতে অপর 'আবাসে' গমনাগমন ও অবস্থান সকল ভিক্ষুর পক্ষেই সুগম-সুখদায়ক করা হইল। যে সকল ভিক্ষু বিহার ভিন্ন অন্যস্থলে, যথা নির্জ্জনে, বনে, পাহাড়ে, নদীতটে, উপত্যকায় বা গুহায় বাস করিতেন তাঁহাদেরও পাক্ষিক উপোসথে আসা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাঁহারাও আসিয়া আপন আপন 'ছন্দ' জ্ঞাপন করিয়া সংঘকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। যিনি অসুস্থতা-নিবন্ধন আসিতে অক্ষম হইতেন তিনি আপন ছন্দ অন্য ভিক্ষু দ্বারা জ্ঞাপন করাইতেন।

সংঘগঠনের দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই যে, ভিক্ষুগণের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সংখ্যাধিক্যের মতামতের উপর সংঘক্রিয়া নির্ভর করিত। কোন ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিতেন না এবং তাহা করিলে উহার ভাষা এইরূপভাবে মার্জ্জিত করিতে হইত যাহাতে অভিযুক্ত ভিক্ষু অবমানিত বোধ না করেন। এক আবাস হইতে অন্য আবাসে আগত বিভিন্ন প্রদেশবর্ত্তী ভিক্ষুগণ মার্জিত পালি ভাষায় পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতেন। এইরূপে পাতি-

মোক্ষ নিয়মোক্ত দোষগুলি হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ ভিক্ষুগণ শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই একতায় আবদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রমতে আপনাদের সমস্ত সংঘ-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের সকলের শীর্ষস্থানে থাকিয়া কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাল কি মন্দ বলিয়া দিতেন মাত্র। একটি সামান্য ভিক্ষু পর্য্যন্ত জানিতেন যে, তাঁহার মতামতের মূল্য আছে এবং তাহা উপেক্ষিত হইবে না।

এই গণতন্ত্রমূলক সংঘে সাধারণের স্থান ছিল কোথায়? কারণ কোন গৃহীর বা সংঘভুক্ত নহেন এরূপ সন্ন্যাসীর পাক্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অধিকার ছিল না, 'ছন্দ' দেওয়া ত দূরের কথা! মহাবগ্গের নিয়মগুলিতে দেখিতে পাই যে 'বর্ষাবাস' পালন করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারে না থাকিয়া স্বজন বা মিত্রবর্গের মধ্যে থাকিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইত। বিহারে বসবাস ঐ তিন মাস বর্ষাকালে নিষিদ্ধ না হইলেও বিহারের বাহিরে বিশিষ্ট গৃহস্থগণের পরিচর্য্যায় থাকিতে আদিষ্ট হইয়া ইহার শেষ দিবসে 'প্রবারণায়' কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে তাঁহারা সেই আদেশ হইতে মুক্তি পাইতেন।

বর্ষাবাসের শেষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে যে 'প্রবারণ'রূপ উৎসব হইত তাহাতে দৃষ্ট হইত, গৃহস্থরা আপন আপন শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ নানাবিধ উপহারে বিহার-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতেন। তাঁহারা ভিক্ষুগণকে নিকটে রাখিয়া বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী জনসাধারণেরই কল্যাণে অনুষ্ঠিত হইত। সংঘের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে, কোন ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে অন্যায়ভাবে মনোবেদনা প্রদান করিলে তাঁহাকে ঐ গৃহস্থের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার শাস্তি লইতে হইত।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে, সংঘের গণতন্ত্র শুধু ইহার শাসন-পদ্ধতির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; ইহার দৈনিক ক্রিয়া-কলাপে, ভিক্ষুদিগের আহারে, বিহারে, শয্যায় এবং নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রেও লক্ষিত হইত। প্রত্যেক শিক্ষক এবং ছাত্রনামীয় ভিক্ষুর একই প্রকার দৈনিক কার্য্যতালিকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ঠিক একইরূপ বসিবার এবং শয়ন করিবার ব্যবস্থা করা হইত এবং সমস্ত ভিক্ষুর নিকট হইতে যাবতীয় ভালমন্দ ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য একত্র করাইয়া বিহারের প্রত্যেককেই সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তাহাদের নিজস্ব দ্রব্য বলিতে বুঝাইত: ৩ চীবর, ১ কায়-বেষ্টনী, ১ পাত্র, ১ জল ছাঁকনি, ১ সূচ এবং ১ ক্ষুর; মোট এই আটটি মাত্র দ্রব্যের তাঁহারা প্রত্যেকে অধিকারী ছিলেন; আর মঠ, তলস্থভূমি, বাটিকা, উদ্যান, গৃহ, প্রাঙ্গণ, গৃহ-মধ্যস্থ তৈজসপত্র ইত্যাদি সমস্ত সংঘরূপ সমষ্টির, প্রকারান্তরে জনসাধারণের অধিনায়কত্বে ছিল।

সমস্ত বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সংঘ প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছা ও সহানুভূতিকে শিরে ধারণ-পূর্ব্বক এক সুমহান উদ্দেশ্যের দিকে প্রথম হইতেই ধাবিত হইয়াছিল। ইহার অঙ্গভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের অধিকারী করিয়া সংঘ শীঘ্রই এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হইয়া এবং ভারতের বনভূমি-নিবদ্ধ ঋষিগণের অপূর্ব্ব জ্ঞানরাশি বিশ্ববাসীর নিকট অকাতরে মুক্ত করিয়া ভারতকে জগতের শীর্ষ-স্থানে স্থাপিত করিয়াছিল। এই সংঘই বুদ্ধদেবের নিজস্ব সৃষ্টি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

স্বামী বাসুদেবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ভগবানের দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।" অনেকে বলেন, উপনিষদে শুধু জীবের উপাসনার প্রযত্নই দেখা যায়, ব্রহ্মের সাড়ার কোনো নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু "ত্বং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা" —(তৈঃ উঃ, ১।৪।৩)—'হে ভগবন্, আমি যেন তোমাতে প্রবিষ্ট হই। হে ভগবন তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হও। হে ভগবন্, (গঙ্গার ন্যায়) সহস্র শাখায় তুমি বিস্তৃত, আমি যেন তোমাতে পাপক্ষালন করতে পারি।' এই মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হয়, জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর অভিমুখীনতা ভিন্ন উভয়ের ঐক্য সিদ্ধ হয় না,—এ তথ্যটি ঋষিরা জানতেন। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রুতি নির্দেশ করছেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মুণ্ডক উঃ, ৩।২।৩)—ব্রহ্ম যাঁকে বরণ করেন, তাঁর দ্বারা এই ব্রহ্মবস্তু লভ্য। সন্ত অগাস্তিন (Saint Augustine, বলছেন, "My weight is my love"—যেমন গুরুত্ব আছে বলেই ত পৃথিবী আমাকে আকর্ষণ না কোরে পারে না। এক-হার্টের উক্তি, "God needs man"—শ্রীভগবানের ভক্তের দরকার। "In the book of hidden things it is written, 'I stand at the door and knock and wait…thou needst not seek Him here or there…Thy opening and his entering are but one moment" —(Pred. iii)। তিনি তোমার হৃদয় দুয়ারে দাঁড়িয়ে। অনন্ত তাঁর ধৈর্য, অনন্তকাল ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কবে তুমি তোমার বদ্ধ দুয়ার খুলবে এবং সাদর সম্ভাষণে হৃদয়াসনে তাঁকে বসতে দেবে। তোমার চাইতে তাঁর যে তোমাকে প্রয়োজন অনেক বেশী, তিনি যে ভক্তবিরহ সহ্য করতে না পেরে চীৎকার কোরে ওঠেন, "তোরা কে কোথায় আছিস আয় রে আয়" (শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ)। লেডী জুলিয়ানের অন্তর-বাতায়ন হতে এইরূপ কথাই ভেসে আসে, "For our natural will is to have God, and the good will of God is to have us; and we may never cease from longing till we have Him in fulness of joy".—(Revelations of divine love, Chap. vi)। Apocryphal বাইবেলের Acts of John-এতে যে Hymn of Jesus দেখতে পাওয়া যায়, তাতে লেখকের হৃদয়ের এইটাই হলো মর্মকথা। এটা ভক্ত (soul) ও ভগবানে (Christ—Eternal Logos) কথোপকথন রূপে গ্রথিত হয়েছে—

"ত্রাণ পেতে চাই প্রভু"
"ত্রাণ আমি করিব তোমায়—স্বস্তি (amen)"
"মুক্ত হতে চাই প্রভু"
"মুক্ত আমি করিব নিশ্চয়—স্বস্তি"
"মর্ম স্পর্শ কর মোর প্রভু"
"মর্মে স্পর্শ করিব তোমায়—স্বস্তি"

"তোমাতে জনম মম হোক"
"আমি তোমা করিব ধারণ –স্বস্তি"
"তোমারে স্বাদিতে যেন পারি"
"পাবে মোরে সদা আস্বাদিতে—স্বস্তি"
"শ্রুতি যেন তব বাণী বয়"
"মম বাণী শুনিবে নিশ্চয় – স্বস্তি"

* * *

"তুমি আমাকে দেখ দেখ, তাই তোমার চক্ষে প্রদীপ আমি"
"তোমার মুখেতে আমি দর্পণ, আমাকে দেখিবে বলে"
"তোমার সম্মুখে আমি মহাদ্বার, তুমি যে আঘাত কোরে খুঁজিছ আমায়"
"আমি যে তোমার চলার পথ, হে পথিক!"

সুফী জালালুদ্দিনের ছন্দের ভিতরও ঐ তথ্যের একই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

"প্রেমিক চায় শুধু প্রেমেতে মিলিতে
প্রেমও ফিরে সদা প্রেমিক-সন্ধানে
প্রেমিকের আকর্ষণে প্রেমভার-নত
প্রেমোন্মত্তা প্রেমিকে করে লিপ্সক সুন্দর;
জেনো স্থির, প্রেম পূর্বাভাসে হয় বিনিময় –
(হে জীব! তারে কি বাসিতে পার ভাল
যদি সে না ভালবাসে তোমা ?)
যদি সে তড়িল্লেখা হৃদে কভু স্ফুরে
নিঃসন্দেহে জেনো ধরা, দেছে প্রেমময়,
হৃদি নীলিমায়,-- তোমারে বেসেছে সেও ভাল !"

(Wisdom of the East Series, Jalaluddin Rumi by F. Hadland Davis P. 77)

উপনিষদ বলছেন, "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু –(সামবেদীয় শান্তিপাঠ)—আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁর সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁর নিত্য অবিচ্ছেদ থাকুক।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই একমাত্র মানুষেরই সচ্চিদানন্দে ফিরে যাবার সজ্ঞান আদর্শ বিকশিত হয়, কেবল তারাই শুনতে পায় অনন্তের অনাদি আহ্বান। দেহের ও মনের যে ক্ষুদ্রানন্দ তা এই ব্রহ্মানন্দের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিব্যক্তি। তথাপি ব্রহ্মানন্দ যাবতীয় দেহ ও মনে অনুস্যূত হয়ে আছে এবং অনন্তরূপে তাদের অতিক্রম করেও আছে। উপনিষদের স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি নৈতিকতার সার্থকতা এই ব্রহ্মানন্দের অনুসন্ধানে —নইলে স্বতন্ত্র ভাবে তাদের কোন সার্থকতা নেই—এ হিসাবে শঙ্করের ব্যাখ্যারও মূল্য আছে—"যমেব পরমাত্মানমেবৈষ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি তেন বরণেনৈষ পরমাত্মা লভ্যো নান্যেন সাধনান্তরেণ'—(মুণ্ডক উ, ৩।২।৩ শং ভাঃ) —যে পরমাত্মাকে এই বিদ্বান বরণ করেন অর্থাৎ পেতে চান, তাঁর সেই আত্মবরণের দ্বারা পরমাত্মা লভ্য, সাধনান্তরের দ্বারা নয়। এই মন্ত্রটির দ্বারা শ্রীরামানুজাচার্য ব্যাখ্যা করলেন ভগবৎকৃপা, আর শ্রীশংকর ব্যাখ্যা করলেন পুরুষকার। আর শ্রীবিবেকানন্দ উভয়ের সংযোগ ঘটালেন। সব পুরুষকার বা পুরুষ-প্রযত্নের উদ্দেশ্য শ্রুতি বলছেন, সেই প্রেমানন্দের আস্বাদ—"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি" —(কঠ উ, ১।২।১৫)—সব বেদ যে পরমপদ-সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন, সমস্ত তপস্যা যাঁকে উদ্দেশ্য কোরে, যাঁকে ইচ্ছা কোরে ব্রহ্মচর্য-পালন—তিনি সেই ওঁকার —পরমানন্দ।

অনেকে উপনিষদের নৈতিক জীবন-সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরে থাকেন যে সবই যদি এক হয়, তা

হলে পরস্পরের সহিত নৈতিক সম্বন্ধটা কি হবে? যদি ব্রহ্মসত্তা ইতঃপূর্বেই পরিপূর্ণ হ'য়ে আছেন, তা হলে আত্মস্বরূপকে পূর্ণ করার সাধন বা জানার প্রচেষ্টাটা ত পুনরুক্তির কৌতুকমাত্র হয়ে পড়ে। এর উত্তরে ঔপনিষদ দার্শনিকেরা বলেন যে, যদি লাইব্‌নিজীয় "Monads"এর মত আমাদের আত্মার স্বভাবে "exclusiveness" ও "difference" থাকত, তা হলে মানবপুত্র কখনও কি একথা বলতে পারতেন, "Love your enemies, bless them that curse you"—N. T. St. Matt., Ch. V. 44), তা হলে তাঁকে বলতে হোত "Love they neighbour and hate thy enemy." (Ibid 43; O. T., Lev. XIX 18), অথবা বড় জোর বলতে পারতেন "Have mercy upon thy enemies." পরন্তু উপনিষদ বলছেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার আত্মার প্রীতির জন্য—"আত্মনস্তু কামায" (বৃ উঃ, ২।৪।৫)। পাশ্চাত্য মনে সন্দেহ ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপ্রেমে যেমন সুস্পষ্ট, বদান্যতার উপদেশে তেমন সুস্পষ্ট নন্, যেমন তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ (Ramakrishna, Ch. IX, Romain Rolland)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁর আত্মা সর্বব্যাপী, সেই জন্য তাঁর প্রেমও ছিল সর্বব্যাপী। তিনি স্বার্থপর ব্যক্তিগত মোক্ষের অহংকারকে দৃঢ় স্বরে নিন্দা করেছিলেন—"তুই ত বড় বোকা! আমি ভেবেছিলুম বটগাছের মত তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় নেবে।" ধর্মসমন্বয় ও মূল-সূত্র অদ্বৈততত্ত্বটি বের করতেই তাঁর শীর্ণ দেহের অলৌকিক শক্তি আর অন্য চিন্তার সময় পেত না। মা ভবতারিণী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সর্বদা আলুলায়িত কুন্তলে জগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে তাঁর কাছ থেকে ঢেকে রাখতেন, (অবশ্য, মাঝে মাঝে একটু আধটু আস্বাদও করিয়ে আবার ভুলিয়ে রাখতেন), কিন্তু যখন সর্বসাধনায় সিদ্ধি এলো, তখন মা তাঁকে সমগ্র জগতের সমবেত দুঃখ একেবারে দেখালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "এর প্রতিকারে হাজার জন্ম নেব মা!" তিনি অখণ্ড ধ্যানী প্রিয়তম নব ঋষিকে আকর্ষণ করলেন এবং তাঁকেই স্বীয় হৃদয় ও অনুভূতির উত্তরাধিকারী কোরে গেলেন। তখন শিষ্যের মধ্যে এলো স্বার্থপর মুক্তি-প্রীতিকে দূর কোরে এক সর্বগ্রাসী সহানুভূতি, বেদনা, আবেগ, উৎসাহ ও কর্ম-শক্তি। ঔপনিষদ এই ভূমা আত্মপ্রীতিতে শত্রু মিত্র এবং ব্যক্তি-আত্মা প্রিয় ও অন্তরতম পরমাত্মায় একীভূত হয়ে যায়। উপনিষদের আত্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত শুধু transcending exclusiveness নয়—শুধু "পূর্ণমদঃ" নয়, পরন্তু "পূর্ণমিদম্"—"all-inclusiveness" এবং এই তত্ত্বটি কেবল কল্পনায় নয়, ব্যবহারিকেও এর প্রয়োগ দেখাতে হবে সেবায়—"আত্মনঃ প্রাতিকূল্যানি পরেষাং ন সমাচরেৎ"—বিষ্ণুধর্ম, ৩।২৫৫।৪৪) "আত্মবৎ সর্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"—(আপস্তম্ব) "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" (মহাভারত)।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
(গীতা, ৬।৩২)

হে অর্জুন, সেই যোগী সর্বপ্রাণীতে নিজের উপমার দ্বারা সুখ বা দুঃখকে সমান দেখেন, তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥
(গীতা, ১৩।২৮)

যেহেতু সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন কোরে তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সেই হেতু তিনি শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন। ঋষি খৃষ্ট এরই প্রতিধ্বনি করেছেন, "And as ye would that man should do

to you, do ye also to them likewise." (N. T., St. Luke, 6. 31.)। ক্ষুদ্র অক্ষুদ্র হয়ে যায় যখন সে আত্মস্বরূপকে ভালবাসে; এই ভালবাসাটা পরিস্ফুট হয় কেবল মানবসমাজের ভেতর দিয়ে নয়, চেতন-অচেতন যাবতীয় পদার্থের ভেতর দিয়ে। কালো মেঘে বলাকার শ্রেণী, নীলাকাশে বিহগের চমৎকারিণী গতি ও ধ্বনি যখন আমরা নিস্পন্দ হয়ে অনুভব করি, তখন আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রেম দেহকে অতিক্রম কোরে ঐ আনন্দ-জগতের সহিত ঐক্য লাভ করে; গোলাপ ও পদ্মকুট্মলের স্ফীতি, জবার অনুরাগ, বনানীপটে পলাশ ও শিমুলের রূপসম্ভার, ওষধি-পুষ্পের কারুকার্য, চন্দ্রালোকে রজনীগন্ধার পবিত্রতা, উদীয়মান উদধিবক্ষে সবিতার গম্ভীর অভিব্যক্তি, যখন আমাদের নয়নদ্বারে হৃদয়ানন্দকে আকর্ষণ করে, সমুদ্রের তরঙ্গনৃত্য আকাশের অপূর্ব শান্ত সুদূর চিত্রলেখা যখন আমাদের মুগ্ধ করে, তখন আমরা দেহাতীত হয়ে যাই। কেন? —"Hush ! the spirit is there." (Wordsworth)—"পূর্ণমিদম্"—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—

"অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥" (মুণ্ডক উঃ, ২।১।৯)

সেই ব্রহ্ম হতে সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত উৎপন্ন হয়েছে।• তাঁ হতে বিচিত্রগতি নদীসকল প্রবাহিত হয়, এঁ হতে সর্ব ওষধি ও রস সৃষ্টি হয়, যে মহাভূতে এই অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত।

"যো দেবো অগ্নৌ যোহপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"
(শ্বে উ, ২।১৭)

যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সমগ্র ভুবনকে ব্যাপ্ত কোরে রেখেছেন, যিনি ওষধি এবং বনস্পতিতে বিদ্যমান সেই দেবকে নমস্কার, নমস্কার।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা
কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ॥"

"নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥"
(শ্বে উ, ৪।৩-৪)

হে দেব! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমি দণ্ড হস্তে বৃদ্ধ, তুমি জাত হয়ে বিশ্বরূপে লীলা কর। তুমি নীলবর্ণ ভ্রমর, তুমিই হরিদ্বর্ণ লোহিতচক্ষু শুক, তুমি তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতুসকল এবং সমুদ্র। তুমি অনাদি এবং বিভুরূপে বর্তমান, যা হতে বিশ্বভুবন জাত হয়েছে। প্রত্যেক দৈশিক এবং কালিক অভিব্যক্তিই হচ্ছে "Bethlehem", যার মাধ্যমে "The Eternal Life" The Word", "The Logos, "The Christ"—অন্তরাত্মা "Coming to flesh," শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "কোথায় রাম নেই, যে অযোধ্যায় যাবে?"

কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মার স্বরূপ যদি পূর্ণ হয়, তা হলে নৈতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন কোথায়। বেদান্ত বলেছেন প্রতিবিম্ব জানে না তার স্বরূপ সূর্যবিম্ব অচল স্বয়ংপ্রকাশ; সে তার জলের দোলনের বিকৃতিটা নিজস্বরূপে আরোপ করেছে। "The God in man is a task as well as a fact, a problem as well as a possession." জীবপ্রতিবিম্ব dust and deity যুগপৎ; প্রতিবিম্বের ইষ্ট হচ্ছে সসীম জড়ের দর্পণটি ভেঙে

to blend in love and perfect union with the divine principle. পূর্ণ লীলায় অপূর্ণবৎ ক্রীড়া করছেন, আবার সাধনছলে যেন পূর্ণতা ফিরে পাচ্ছেন। উপনিষদের স্মষ্টিতত্ত্বটি ঈশ্বরের কোন কৃচ্ছ্রতা নয়, এ হলো তাঁর স্বাভাবিকী প্রেমময়ী লীলা। নইলে যদি ব্রহ্ম স্বীয় প্রযত্ন এবং সংগ্রাম দ্বারা তাঁর সংকুচিত মহত্ত্বকে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ দেন, তা হলে তিনি পূর্ণতা লাভ করেও আবার যে তাতে সংকোচ ভাব আসবে না, তার প্রমাণ কি? শ্রীবুদ্ধ জন্মমাত্র সপ্তপদ অগ্রসর হয়ে বল্লেন, "আমি সেই সনাতন আদি বুদ্ধ।" আবার লীলায় বল্লেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি॥

প্রত্যাবৃত্ত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সারা হয়নিক সব কাজ মোর
যেতে হোত ফেলে রেখে,
তাই কি আমারে ফিরালে হে প্রভু,
মৃত্যুর পথ থেকে?
আবর্তময় এই মায়া-সংসার,
কোনদিন হায় মিটিবে না দাবি তার।

এক কাজ যাবে, রক্তবীজের মত
প্রসব করিবে কাজ ও অকাজ শত।
এ কথা ত তুমি জানো,
তবে কেন তুমি মহাপথ হ'তে
সংসারে পুন টানো।

জানি না তোমার কি বাসনা আছে মনে,
প্রস্তুত হতে পাঠালে কি অভাজনে
পারের কড়ির যোগাড় হয়নি বলি?
খেয়াঘাট হ'তে ফিরালে কি মোরে
পূর্ণ করিতে থলি?

হোক বা না হোক পারের কড়ির
যোগাড়, আমার মতি
তোমাপানে থাক, তুমি অগতির গতি।
যে ক'দিন তরে ফিরিয়া আবার
পাইলাম ইহলোক,
সে ক'দিন প্রভু আর কারো নয়
তোমারি কেবল হোক্।

তাপসী টেরেসা

শ্রীমতী আশা দেবী, এম্-এ

(দ্বিতীয়ার্ধ)

১৫৬২ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট স্পেনের ধর্মজীবনের একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া টেরেসা আভিলাতে সানজোসি নামক স্থানে প্রথম নারী-আশ্রম স্থাপন করেন। সেন্ট জোসেফের নামে ইহার নামকরণ হয়। এই আশ্রমে তের জন সাধিকাসহ তিনি বাস করিতেন। তপস্বিনী-জীবনের সকল আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অতি যোগ্যতার সহিত তিনি আশ্রম পরিচালনা করেন। আশ্রমের প্রত্যেক ব্রত-ধারিণীর গতিবিধি ও কর্মের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। একাধারে তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করুণায় সকলকে অভিষিক্ত করিতেন ও অপরদিকে আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু বা পথ-প্রদর্শিকারূপে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেন, আবার বন্ধুর মত সপ্রেম ব্যবহারে ও কৌতুকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্দ দিতেন। আশ্রমের প্রাত্যহিক কর্মধারা অতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।

টেরেসা পূর্বে যে আশ্রমে থাকিতেন সেখানে সঙ্ঘের ব্রতগ্রহণপূর্বক সাধিকারূপে গৃহীত হইবার পর বিশেষ কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইত না। ইহার ফলে বাহিরের বহু লোকের সংস্পর্শে আসায় মানসিক বিপ্লব ঘটে ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি হয় ইহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং টেরেসা এখন নিজে যে আশ্রম-স্থাপন করিলেন সেখানে বাহিরের জগতের সহিত আদানপ্রদান-ব্যাপারে কঠোর নিয়ম-প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন।

বিলাসিতা ও প্রাচুর্য আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী। সুতরাং টেরেসা কর্তৃক স্থাপিত আশ্রমে ব্রতধারিণীগণকে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিতে হইত। তাঁহারা নগ্নপদে থাকিতেন, ভিক্ষার দ্বারা তাঁহাদের আহারাদি চলিত। তবে কৃচ্ছ্রসাধন আদর্শ হইলেও দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলিকে অবহেলা করা হইত না।

স্বাধ্যায় তিনি আশ্রম-জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। প্রতি ব্রতধারিণীর যাহাতে পাঠে অনুরাগ জন্মে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আশ্রমাধ্যক্ষার অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন।

আশ্রমিকাগণের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তিনি নিজের দর্শন ও অনুভূতি সহজে স্বীকার করিয়া লন নাই। উহা মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত ভ্রান্তিমূলক অথবা শয়তানের প্রলোভন বা ছলনা হইতে পারে আশঙ্কায় বারবার কার্মেলাইট ও জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মাধ্যক্ষগণের নিকট বিবৃতি দিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং আশ্রমের কোন সাধিকা তাঁহাকে দর্শন বা অনুভূতির কথা বলিলে তিনি প্রথমেই তাহাকে মুক্ত বায়ু সেবন, পুষ্টিকর আহার গ্রহণ এবং ধ্যান-প্রার্থনাদি একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার উপদেশ দিতেন। ফলে সে শীঘ্রই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিত।

পূর্বে যাঁহারা পূর্ণ ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিতেন,

তাহাদের পিতাকে আশ্রমে কন্যার ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ, ভূমি সম্পত্তি দান করিতে হইত। টেরেসা আশ্রমে যোগদান করিলে তাহার পিতা ডন আলানজোকেও তাঁহার জন্য পণ (dowry) দিতে হইয়াছিল। টেরেসাই সর্বপ্রথম যথার্থ অধ্যাত্মজীবনে অনুরাগিণী দরিদ্রের কন্যাকে আশ্রমে যোগদান করিতে দেন।

টেরেসা বলিলেন, সাধিকার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি যেন সর্বদা ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়। কোন কারণেই পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও আদর্শকে কোনমতেই খর্ব করা চলিবে না।

১৫৬২ হইতে ১৫৮২ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর টেরেসার কর্মজীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৫৬৭ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট তিনি মেদিনা দেল ক্যাম্পোতে দ্বিতীয় আশ্রম স্থাপন করেন। পরে ভাল্লাদ্য লিদ, তলেদো, মেগোভিয়া, ভালেন্স, বাগ ম্যালাগান প্রভৃতি স্থানে নারী আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল আশ্রম স্থাপন করিতে তাঁহাকে বহু বাধাবিঘ্ন ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। বহু সময়ে তিনি ধর্মাধ্যক্ষগণের নিকট হইতে আশ্রমস্থাপনের অনুমতি সহজে পান নাই। রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতের মধ্যে নগ্নপদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগের অনুমতি ও জনমত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অনেকে তাঁহার এই কার্য নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ও নামযশলাভের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। বারবার অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়। বার্ধক্য হেতু অপটু এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতেন। প্রকৃত তাঁহার জীবনে গভীর সাধনা ও বিরামহীন কর্মের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। স্পেনের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। বহু সাধিকা ও ধর্মপিপাসু নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া বহুলোক প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পাইয়াছে। বংশের কোনও সন্তান সন্ন্যাসী হইলে বলা হয় "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" টেরেসা সত্যই তাঁহার কুল ধন্য করিয়াছিলেন। টেরেসার প্রভাবে তাঁহার পিতা শেষজীবনে ঈশ্বর-আরাধনায় দিনযাপন করেন। তাঁহার অন্যতমা ভগিনী ডোনা জুয়ানা সাধনজীবন গ্রহণ করেন এবং বহু আত্মীয়-আত্মীয়া তাঁহার নিকট উপদেশ-শ্রবণে ভগবজ্জীবনে উন্নতিলাভ করেন।

স্পেনের বাহিরেও টেরেসা নারী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার প্রভাবে পুরাতন আশ্রমগুলিও নবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। খৃষ্টান সন্ন্যাসবাদে টেরেসার অনুভূতি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সমগ্র স্পেন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় টেরেসার মহিমময়ী মূর্তি দর্শন করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে। প্রচারিকারূপে তিনি অসীম আগ্রহের সহিত আশ্রমগুলি এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। স্পেনের সর্বত্র তিনি 'মাদার টেরেসা' এই নামে অভিহিত হইতেন।

বাল্যকাল হইতে টেরেসা পাঠে অনুরাগিণী ছিলেন। পিতার বিপুল গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। পরবর্তী কালেও অধ্যাত্ম ও ভক্তিমূলক গ্রন্থ তিনি প্রত্যহ পাঠ করিতেন। কনফেসারদিগের অনুরোধে তিনি নিজ আধ্যাত্মিক বিকাশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন। টেরেসার এই আত্ম-জীবনী বাস্তবিক আধ্যাত্মিক মার্গে সহায়তা এবং অনুপ্রেরণা দান করে। তাঁহার রচিত অন্যান্য পুস্তক এবং উপদেশপূর্ণ অসংখ্য পত্র সাহিত্য-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শরীর ভাঙিয়া গেলেও যীশুগত-প্রাণা টেরেসার প্রভুর মহিমা-প্রচারে

আগ্রহ এতটুকু কমে নাই। ১৫৮২ খৃঃ ১৮শে এপ্রিল আরলাঁজো নদীর তীরে দেল মেনসিনোতে টেরেসা শেষ আশ্রম স্থাপন করেন। তখনও পর্যন্ত বহু কার্য তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার পৃথিবীতে থাকার দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। ১৭ই মার্চ তিনি সেভিল মঠের অধ্যক্ষকে এক পত্রে লেখেন, "আমার আর কিছুই করিবার নাই। আমি কিরূপ বৃদ্ধ এবং অকেজো হইয়া পড়িয়াছি দেখিলে তুমি আশ্চর্য বোধ করিতে।"

২০শে সেপ্টেম্বর তিনি আলবা পৌঁছিলেন। আশ্রমে প্রিয় ত্যাগব্রতধারিণী কন্যাগণকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেও নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলে তাঁহার কণ্ঠ হইতে ক্লান্ত স্বর ধ্বনিত হইল, "প্রভু, আমি কি ক্লান্ত, ২০ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম আমি এত শীঘ্র শয়ন করিতে যাইতেছি।"

তথাপি কয়েকদিন ধরিয়া তিনি আশ্রমের সকল কার্যে নিয়মিত যোগ দিলেন। অবশেষে সেন্ট মাইকেলের উৎসব-দিনে তিনি শয্যা লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আগ্রহে তাঁহাকে এমন একটি কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল যেখানে জানালা দিয়া তিনি সমবেত প্রার্থনা শুনিতে পান। সারাদিন আচ্ছন্ন ভাবে কাটিল। একবার একটু সজাগ হইয়া ফাদার এন্টনীর সংবাদ লইলেন। ফাদার এন্টনী তাঁহাকে অনুনয় করিলেন তিনি যেন তাঁহাদের ছাড়িয়া না যান। টেরেসা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।" আশ্রমের কন্যাগণকে ডাকিয়া টেরেসা শেষ উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশগুলি লিখিয়া লওয়া হইল। সহসা তাঁহার আনন যেন দিব্য আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হে আমার প্রভু, প্রিয়তম, এই বার সেই বহুপ্রতীক্ষিত মুহূর্ত আসিয়াছে। তোমার নিকট যাইবার লগ্ন আসিয়াছে। শান্তিতে আমাকে যাইতে দাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। নির্বাসিত জীবন ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবার সময় এতদিনে আসিল।"

তিনি যে তদানীন্তন খৃষ্টধর্মসঙ্ঘের কন্যারূপে গৃহীত হইয়াছেন শেষের কয়দিন এই স্মৃতি তাহাকে সান্ত্বনা দিত।

৩রা অক্টোবর সারারাত্রি তিনি বাইবেলের ধর্মসঙ্গীত (Psalms) হইতে বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ৪ঠা অক্টোবর সেণ্ট ফ্রান্সিস উৎসবের দিন ৬৭ বৎসর বয়সে টেরেসা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মুখ অপূর্ব সুন্দর ও জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি পরম শান্তির সহিত নীরবপ্রার্থনায় রত ছিলেন। তিনবার অস্ফুট কাতরশব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তে তিনি প্রভুর সহিত চির-মিলিত হইলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় তীব্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। টেরেসা তাঁহার জীবিত অবস্থায় স্পেনের সর্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সেন্টজ্ঞানে পূজা করিতেন।*

টেরেসার অনুভূতি ও দিব্য বাণী আজিও ধর্মপিপাসু-মাত্রকেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করে।

* ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ ২৪শে এপ্রিল পোপ তাঁহাকে সেন্ট বলিয়া ঘোষণা করেন।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' অধ্যাপক শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস 'বাক্‌বিভূতি' নামক প্রবন্ধে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক জন জার্মাণ মনীষীর কতকগুলি অমূল্যবাণী মূল জার্মাণ হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া পাঠকপাঠিকাবর্গকে উপহার দিয়াছেন। মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিগুলি সুন্দর আলোক-সম্পাত করে। হরগোপাল বাবু প্রবন্ধটির শেষে লিখিয়াছেন—"খাঁটি কথা কতদূর সবল ও প্রাণবান হতে পারে, এগুলি তার উদাহরণ।·· এই বাণীগুলি শুনে আমার কবি-বন্ধু দিনেশ দাশ সোৎসাহে ব'লে উঠলেন 'ওদের দেশে এই সকল ঋষিতুল্য ভাবুক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করাতে আধুনিক কালে ওদের মধ্যে কোনও ধর্মগুরুর আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় নি। আমাদের দেশে এইরূপ বলিষ্ঠ চিন্তানায়কের অভাব হওয়াতেই প্রত্যহ নতুন নতুন ধর্মগুরুর প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হচ্ছে।' কথাটি ভেবে দেখবার মতই বটে !"

অধ্যাপক শ্রীহরগোপাল বিশ্বাসের কবি-বন্ধুর মন্তব্যটি আমাদের খুব ভাল লাগিল। সত্যই আজ আমরা গভীর চিন্তাশীলতার অভ্যাস ভুলিয়া গিয়াছি। যুক্তি, বিচার, প্রমাণ—এ সকলের প্রসঙ্গ তুলিলে আমাদের মাথা ধরিয়া উঠে। তাই, যে কেহ লম্বাচওড়া দু-একটি বুলিসহ মনোরম কল্পনায় মুড়িয়া নূতন একটি মত আসরে উপস্থিত করিলে আমরা অতি সহজেই বাহবা দিয়া উহার ঝাণ্ডা বহিয়া চলি। ধর্মের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইতেছে। এই কলিকাতা শহরেরই অলিতে-গলিতে এবং উপকণ্ঠে কত নূতন নূতন 'গুরুর' কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মফস্বলেও আছেন—বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও আছেন। প্রত্যেকেই একটা মৌলিকত্বের দাবী এবং একটা 'মিশন'এর ঘোষণা করেন—পূর্বেকার ধর্মাচার্যগণের ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া নিজের অভ্রান্তত্ব জ্ঞাপন করেন। এই সকল সাম্প্রতিক 'যোগী' 'বাবা' এবং 'ঠাকুর'গণের বাণী এবং (ভবিষ্যদ্বাণীও) কিছু কিছু আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহাদের প্রচারধারা এবং ক্রিয়াকলাপও কিছু কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সংশয়াকুল চিত্তে ভাবিতে হয়—এই সকল 'বাণী' জাতির ধর্ম-শক্তিকে যথার্থ পরিপুষ্ট করিতে কতটা সহায়তা করিবে। বলিষ্ঠ মননধারার অভাব হইলেই নূতনের মোহ মানুষকে পাইয়া বসে। সত্য অপেক্ষা সুখকর ও সুবিধাজনক কল্পনাতেই তখন তাহার হয় অধিকতর আকর্ষণ, তত্ত্বের বিচারে অসমর্থ হইয়া সে তখন বাগাড়ম্বরেই বেশী মুগ্ধ হয়।

* * *

অনেক সময়ে আশঙ্কা জাগে, যুগপৎ এত ধর্মগুরুর আবির্ভাবে এবং পথনির্দেশে ধর্মপথের পথিকদের আখেরে রাস্তা গুলাইয়া যাইবে না তো? প্রত্যেকটি বাণীই শুনিতে পাই 'যুগবাণী'—প্রতেকটি আলোকেরই গায়ে লেবেল আঁটা 'যুগালোক'। কোন্ বাণী অনুসরণ করি? কোন্ আলোকের নীচে গিয়া দাঁড়াই? আবার মনে প্রশ্ন উঠে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অকস্মাৎ এত কী ধর্মের গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল যাহা

অপনোদন করিবার জন্য একই সময়ে এতগুলি ধর্মনায়কের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভয় হয়, রোগের প্রকোপ অপেক্ষা চিকিৎসার ভারেই রোগী না মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এত ধর্মগ্লানি নিবারণের উৎসাহই না অবশেষে নূতন এক ধর্মগ্লানি হইয়া দেখা দেয় !

* * *

ত্রিশ বৎসর পূর্বেও খ্রীষ্টধর্মে যে উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনাও করা যাইত না আজ যুগের হাওয়ায় তাহা ক্রমশঃই কত সহজ হইয়া আসিতেছে মাঝে মাঝে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি লণ্ডনের সেন্টপল্ গির্জার চ্যান্সেলর—ক্যানন কলিন্স উক্ত গির্জার একটি উপাসনায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"খ্রীষ্টীয় গোঁড়া বিশ্বাস-সমূহকে মানাই যদি খ্রীষ্ট-ধর্মের বনিয়াদ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে আমাদের ধর্ম বালুকার উপর দাঁড়াইয়া আছে। যাঁহারা সৎজীবন যাপন করিতেছেন অথচ খ্রীষ্টধর্মের গোঁড়া মতবাদগুলিতে আস্থা রাখিতে পারেন না এমন লোকদিগকে যদি সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে দেওয়া না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 'মত'ই আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রেমকে আমরা করিয়াছি ক্রীতদাস, আর ঈশ্বরের চৈতন্য-সত্তা গিয়াছেন দূরে চলিয়া। * * * খ্রীষ্টান হইতে গেলে যে একটি নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এইরূপ মনে করা ধর্মবিরুদ্ধ।"

ক্যানন কলিন্সের এই নির্ভীক উদার উক্তি-গুলি শুধু খ্রীষ্টানদের নয় অপর ধর্মাবলম্বীদেরও ভাবিয়া দেখিবার। ধর্মযাজকদের লিপিবদ্ধ কতক-গুলি সাম্প্রদায়িক মত ও বিশ্বাস—যাহা ধর্মের সার্বজনীন সাধনা ও লক্ষ্যের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, বহুশতাব্দী ধরিয়া যেমন খ্রীষ্টধর্মকে নানা সঙ্কীর্ণতা-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তেমনি ইসলাম এবং হিন্দুধর্মেরও কতকগুলি সম্প্রদায়ের চারিধারে একদেশিতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে। এই শৃঙ্খল, এই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিবার শুভদিন সমাগত। ধর্মের যাহা সাময়িক, অবান্তর তাহার উপর জোর না দিয়া যাহা চিরন্তন, মুখ্য তাহাকে স্বচ্ছ বিচার ও যুক্তি দ্বারা চিনিয়া লইতে হইবে। এই কর্তব্য যেমন খ্রীষ্টানদের, তেমনি মুসলমানদের, তেমনি হিন্দুদেরও।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগ-গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে ধর্মের মূল আদর্শ স্বল্পকথায় এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—

"বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া নিজের ভিতরকার দেবত্বের বিকাশসাধনই হইতেছে লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়-গুলির দ্বারা ইহা সংসাধন কর এবং মুক্ত হইয়া যাও। ইহাই ধর্মের প্রকৃত তথ্য। মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ উহার গৌণ বিস্তারমাত্র।"

* * *

মনীষী অলডাস্ হাক্সলি তাঁহার The Devil of Loudan নামক যন্ত্রস্থ নূতন পুস্তকের একটি অংশ প্রবন্ধাকারে Vedanta and the West পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটির নাম 'মুক্তির পরিবর্তসমূহ' (Substitutes for Libert'on)। মানুষের মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজকে বিশ্লেষণ করিয়া হাক্সলি দেখাইতে চান যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ন্যায় আত্ম-বিলুপ্তিও মানুষের একটি অতি শক্তিশালী প্রবৃত্তি। মানুষ সময়ে সময়ে নিজকে ভুলিতে চায়, সংসারের তথাকথিত অভাব, দ্বন্দ্ব, দুঃখ প্রভৃতির চাপে নয় – স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সম্পন্নতা সত্ত্বেও কোন দুর্বোধ্য কারণে সে

নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে—তাহার নিজের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া অন্য একটি বৃহত্তর সত্তায় আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হয়। এই আত্ম-অতিক্রম বা 'মুক্তি'র ইচ্ছা তিন দিকে গতি লইতে পারে। (১) তাহার ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে—যখন সে জগৎ ও জীবনেব অন্তর্নিহিত মূল চৈতন্য-সত্তার আভাস পাইয়া উহার সহিত তাদাত্ম্য অন্বেষণ করে।

(২) তাহার ব্যক্তিত্বের নিম্নে—মাদক-দ্রব্য, প্রাথমিক যৌন-পরিতৃপ্তি এবং বহুলোকের অর্থাৎ দলেব সংস্পর্শ (তীর্থযাত্রা, রাজনৈতিক সম্মিলন, সমষ্টি-সঙ্গীত, প্যারেড্ প্রভৃতি) এই তিন উপায় দ্বারা যখন মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ স্ব-পরিচয় সাময়িকভাবেও ভুলিতে চায়। এই ধরনের আত্ম-অতিক্রমের দ্বারা কখনও কখনও সে কল্যাণকর শান্তি লাভ করিলেও প্রায়ই এই সকল দ্বারা তাহাব ব্যক্তিত্বের প্রভূত অধোগতিরই সম্ভাবনা থাকে।

(৩) তাহাব ব্যক্তিত্বের সমান্তরালে। এই গতির পরিধি খুব বিস্তৃত। সামান্য চিত্তবিনোদক খেয়াল হইতে সঙ্গীত, রাজনৈতিক ব্যাপৃতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি সবই এই শ্রেণীতে পড়ে। মানুষ তাহাব নিজের অভ্যস্ত চিন্তা, কাজ ও জীবনধারায় অতিষ্ঠ হইয়া উহাদেব বাহিবে একটা কিছু ব্যাপৃতি খুঁজে, যাহাতে ডুবিয়া সে নিজেকে ভুলিতে পারে—নিজের ব্যক্তিত্ব হইতে 'মুক্তি'-লাভ করিতে পারে। এইপ্রকার 'মুক্তি'র প্রেরণা মানব-সভ্যতার সংগঠনে অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রেরণা যদি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের শিল্প, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন—এসব কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুদ্ধ, পরমতাসহিষ্ণুতা, কোন বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠীর উপর ঘৃণা ও অত্যাচার—এ সকলেরও জন্য দায়ী মানবপ্রকৃতির এই প্রেরণাটিই। মানুষ যে নিজকে ভুলিয়া একটি কল্পনা, ভাব বা উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তদ্গত হইয়া যাইবার ক্ষমতা রাখে ইহারই ফলে সমাজে উদ্ভূত হয় উপরোক্ত অসংখ্য শুভ এবং অগণন অশুভগুলিও।

এই ত্রিবিধ আত্ম-অতিক্রম বা 'মুক্তি'র মধ্যে প্রথমটিই মানুষের চরম কল্যাণকর। দ্বিতীয়টি বিপদ-সঙ্কুল। তৃতীয়টি মানুষকে মাত্র কিয়দ্দূর লইয়া যায়; ইহাকে প্রথমটির সহিত সংযুক্ত না করিলে মানুষ কখনও অবিমিশ্র কল্যাণ লাভ কবিতে পারিবে না। সোস্যালিজম্, কম্যুনিজ্‌ম্, ক্যাপিটালিজ্‌ম্, কলা-বিজ্ঞান-সমাজ-শৃঙ্খলা, কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়-গির্জা এ সবই মানুষের অপরিহার্য, কিন্তু কোনটিই তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মানবীয় কোন ভাব বা লক্ষ্যের সহিত তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যদি জ্ঞাতসারে ও সঙ্গতভাবে ঊর্ধ্বদিকে সর্বময় আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত আত্ম-বিলয় সংসাধন না করিতে পারে তাহা হইলে তাহার নিকট এককগুণ শুভের সহিত দশগুণ অশুভ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

অলডাস্ হাক্সলি বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাহাই একদিন উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বলিয়াছিলেন, ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি—শুন, যাহা কিছু মানুষ প্রিয় বলিয়া কামনা করে তাহা মানুষের অন্তর্বহিঃ-ওতপ্রোত পরম-প্রেমস্বরূপ আত্মসত্যের আকর্ষণেই; আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ—নিজকে (সাধক) জগৎ ও জীবনের পরম সত্য ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন এবং সেইজন্যই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সহিত একাত্মতা লাভ করিলেন ; সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি—তত্ত্বদর্শী ধীর ব্যক্তি সর্বব্যাপী সর্বত্রগামী পরমসত্যে যুক্ত হইয়া নিখিলের সকল বস্তুর সহিত সংযোগলাভ করেন ; যস্যৈব মহিমা ভুবি—আত্মসত্য পিছনে রহিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বভুবনের যতকিছু মহিমা ইত্যাদি - তখন সেই ঋষিগণ মানুষকে জাগ্রত জীবনের খণ্ড খণ্ড অশেষ চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, পরিপূর্তি, ব্যাপৃতি লইয়া গঠিত তাহার সীমাবদ্ধ মানবীয় ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে এক সনাতন অখণ্ড অসীম ব্যক্তিত্বের প্রতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ ভূমা অস্তিত্বে 'মুক্তি'লাভ করিতে না পারিলে মানুষ তাহার স্বাস্থ্য, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছু সত্ত্বেও অপূর্ণ রহিয়া যায়—তাহার হয় মহতী বিনষ্টিঃ—বিষম ক্ষতি। পক্ষান্তরে ঐ ভূমাকে জানিয়া অপর যাহা কিছু করিবার করিলে ভয় নাই।

সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যগুলি বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, যুক্তি ও মননধারায় সমৃদ্ধ করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপিত করিবার সময় আসিয়াছে। মনীষী জলদাস ভাক্কালির প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করি।

জাগরণী

অধ্যাপক শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য, এম্-এ

হৃদয়ে আমার অগ্নির শিখা অনিবার কেন জ্বলে ?
কাঁপে থরথর দেহ জর্জর বেদনার হলাহলে।
পরমাত্মীয় বলি' যা'রে মানি,
সে হানে পরাণে নিদারুণ বাণী,
মধুরে বিষাদ মিশাইয়া পান করায় কত না ছলে!

সে তো নাহি জানে দেবতারে মোর,—শকতি তাঁহার কত !
নাহি শোনে গুরু গর্জন, যবে অন্তরে জাগ্রত।
তাঁ'রই পূজা তরে ফুল ফোটে বনে,
জ্বলে নীহারিকা সুনীল গগনে,
বিবিধ ভঙ্গে বিহঙ্গগণে গীত-উৎসবে রত ॥

তাঁ'র অনুরাগে বাতাসের বেগে ম্লান তরু মর্মরে।
উষা যে সাজায় অশ্রুমুক্তা পল্লবে থরে থরে।
সন্ধ্যাবধূর মুখে সরমের
বঙ্কিম ছায়া, কৃষ্ণা রাতের,
কালিমাখা তনু, বিরস বদনে ব্যথায় কথা না সরে॥

দুঃখ-দহন, তীব্র বেদন,—মোর কামনার ধন ঃ
জড়দেবতার চেতনার তরে অর্চন-আয়োজন।
অপমান-জ্বালা আরতির দীপ,
অর্ঘ্য-থালায় বেদনার নীপ,
পাষাণ দেবতা জাগে এইবার,—সাবধান দুর্জন ॥

অমর গ্রন্থ—রামচরিত-মানস

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

বেশী দিনের কথা নয়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তুলসীদাসজী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-অবলম্বনে অপূর্ব ছন্দে ও ভাবে তাঁহার রামচরিতমানস-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোনও ধর্মগ্রন্থ অদ্যাবধি এতটা জনপ্রিয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ, উত্তরভারতে আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য নরনারী অশেষ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সহকারে রামচরিতমানস প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থপাঠে শত সহস্র ব্যক্তির জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে।

তুলসীদাস গুরু নরহরিদাসের নিকট রামচরিত বিস্তারিত ভাবে শুনিয়াছিলেন এবং আচার্য শেষসনাতনের নিকট বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস স্থানে স্থানে রামায়ণের কথকতা করিতেন; শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। অতঃপর তিনি নিজে কিছু লিখিবার জন্য অন্তর হইতে বার বার অনুপ্রেরণা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ইতোমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্তরের অনুপ্রেরণাকে অবহেলা না করিয়া তুলসীদাস মনে মনে সংস্কৃত শ্লোক রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিনের বেলায় যে শ্লোক রচনা করিতেন, রাত্রিতে বা পরদিন তাহার কিছুই স্মরণ থাকিত না। এইভাবে এক সপ্তাহ অতীত হইল। রোজই তিনি শ্লোক রচনা করেন, কিন্তু পরদিনই একেবারে উহা ভুলিয়া যান। অষ্টম দিবসে তিনি শিব ও পার্বতীকে স্বপ্নে দর্শন করেন। শিব তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "সংস্কৃতে কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিও না। অপরের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া অযোধ্যায় যাও এবং তথায় প্রচলিত গ্রাম্যভাষায় কবিতা রচনা কর। আমার আশীর্বাদে উহা সামবেদের ন্যায় আদরণীয় হইবে।" ইহাতে মনে মনে আশ্চর্য হইলেও শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তিনি অযোধ্যায় গমন করেন এবং কিছুকাল পরে ১৬৩১ সম্বতে (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) রামনবমী-দিবসে তিনি তাঁহার বিখ্যাত রামচরিতমানস রচনা আরম্ভ করেন। দুই বৎসর, সাত মাস, ছাব্বিশ দিন একমনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১৬৩৩ সম্বতের (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) শুক্ল-পক্ষের মঙ্গলবারে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়। ঐ দিবস রামসীতার বিবাহবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছিল—কাজেই শুভদিনেই রাম-চরিত রচনা আরম্ভ হয় এবং শুভদিনেই উহা সমাপ্ত হয়। মিথিলার শ্রীরূপারুণ স্বামী নামে এক প্রসিদ্ধ সাধক সর্বপ্রথম এই রামচরিত-মানস শ্রবণ করেন এবং মুগ্ধ হন। তিনি রাজর্ষি জনকের ভাব অবলম্বন করিয়া সাধন করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ জামাতারূপে দেখিতেন।

বেণী মাধো দাসের মতে তুলসীদাস যখন রামচরিতমানস রচনা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স সাতাত্তর। তুলসীদাস কাশীতে ফিরিয়া প্রথমেই বিশ্বনাথজীর মন্দিরে বসিয়া তাঁহারই নির্দেশে রচিত প্রচলিত গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় লিখিত রামচরিত শিবজীকে শ্রবণ করান। মন্দিরে উপস্থিত যাত্রীবৃন্দও উহা শুনিয়া পরম প্রীত হন। এখানে একটি অত্যাশ্চর্য

ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যাসমাগমে পাঠ সমাপ্ত হইলে তুলসীদাস পুঁথিখানি শিবলিঙ্গের নিকটেই সেই রাত্রের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। পূজারী ভোগ ও আরাত্রিক-সমাপনান্তে যথাসময়ে মন্দির-দ্বার বন্ধ করেন। পরদিন প্রত্যুষে বহুদর্শকের সমক্ষে যখন মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করা হইল, তখন দেখা গেল পুঁথির উপর 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এই শব্দ তিনটি লেখা হইয়াছে এবং নীচে দেবাদিদেব মহাদেবের নামসহি রহিয়াছে! সকলের মনই বিস্ময়াপ্লুত! তুলসীদাসের ত কথাই নাই। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে! স্বয়ং ভগবান মহাদেব তাঁহার রচনার অনুমোদন করিয়াছেন। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—মাত্র তিনটি কথা হইলেও কোনও লেখক তাঁহার রচনা-সম্বন্ধে ইহা হইতে বেশী সমাদর আর নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

কিন্তু, সংকাজে ও সৎপ্রচেষ্টায় বাধা অনেক। বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দ রামচরিতমানস যে দৃষ্টিতে দেখিলেন, বিবেকবৈরাগ্যহীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উহাকে সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। কাশী সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। দেবলীলা দেবভাষা (সংস্কৃত) ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় রচনা করা অর্থ দেবতার অপমান করা, অতএব উহা গ্রাহ্য নয়, পঠিতব্য নয় ইত্যাদি নানাবিধ অপপ্রচার সেই সকল সঙ্কীর্ণ-মনা পণ্ডিতবর্গ করিতে লাগিলেন। শুধু বিরুদ্ধ প্রচার করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, পক্ষান্তরে তুলসীদাসকে নানাভাবে কদর্য উপায়ে অপরের সমক্ষে হেয় ও অপদস্থ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। যতই রামচরিতমানসের প্রচার হইতে লাগিল, যতই উহা জন-সাধারণ আকুল আগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল, স্বার্থদুষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলীর অন্তর্দাহ ততই বর্ধিত হইতে লাগিল। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় অন্ধ পণ্ডিতবৃন্দ শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া পুঁথিখানি ধ্বংসের জন্য হীন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে অসি ঘাটের উপরে ক্ষুদ্র কুটিরে তুলসীদাস যখন নিদ্রামগ্ন তখন স্বার্থান্ধ পণ্ডিতগণ দুইটি পাকা চোরকে প্রেরণ করিলেন, কোনও প্রকারে পুঁথিখানি চুরি করিয়া আনিতে। উদ্দেশ্য, উহা হস্তগত হইলেই তাঁহারা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে!' ভগবান রক্ষা করিলে মানুষের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার শক্তি কোথায়? কুটিরের নিকটে আসিয়া চোর দুইটি গভীর বিস্ময়ের সহিত দেখিল, দুইটি অপরূপ মনোরকান্তি বালক ধনুর্বাণ হস্তে তুলসীদাসের কুটির পাহারা দিতেছে। অবস্থা সুবিধার নয় দেখিয়া তাহারা গা ঢাকা দিল এবং দু'একঘণ্টা পরে পুনরায় আসিয়া একই দৃশ্য দেখিতে পাইল। এই ভাবে সমস্ত রাত কাটিল, কিন্তু যে ভাবেই হউক চোর দুইটির আমূল মানসিক পরিবর্তন হওয়ায় পরদিন প্রাতে তাহারা তুলসীদাসের নিকট আসিয়া তাহাদের পূর্বরাত্রির কুমতলবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তুলসীদাস তাহাদের বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করিয়া তাহাদের সৌভাগ্য-দর্শনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের বলিলেন, 'তোমরা মহা পুণ্যবান এবং তোমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে তোমরা এই শরীরেই স্বয়ং ভগবান রামলক্ষ্মণের দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছ।' তাহারাও কৃতকর্মের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া তুলসীদাসের পদতলে পতিত হইয়া বারংবার ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল এবং তদবধি চৌর্যবৃত্তি চিরতরে পরিত্যাগ করিল।

রামচরিতমানস-রচনাকালে মোগলসাম্রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুদের সনাতন ধর্ম, কৃষ্টি প্রভৃতি নষ্ট ও নিস্তেজ হইতেছিল এমন সময়

ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ যেন রামচরিত-মানস রচিত হইল এবং ইহা অচিরেই বিভ্রান্ত হিন্দুদের মনে নূতন আশা ও বলের সঞ্চার করিয়াছিল।

সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাসমাগমে স্বল্পাহারে সন্তুষ্ট গ্রাম্য সরল বিশ্বাসী আবালবৃদ্ধবনিতা যখন ভক্তিগদগদচিত্তে এই অপূর্ব রামচরিতমানস শ্রবণ করিত তখন তাহাদের মন চলিয়া যাইত অযোধ্যায় দশরথের প্রাসাদে, মানসনেত্রে তাহারা কেহ দেখিত নবদূর্বাদল ধনুর্ধারী রামচন্দ্র হয়ত লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনগমন করিতেছেন, কেহ বা দেখিত মুনি-ঋষিরা শ্রীরামের ধ্যান ও স্তুতি করিতেছেন, আবার কেহ বা দেখিত আদর্শ রাজা রামচন্দ্র অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন, সেখানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, হিংসা নাই, অধর্ম নাই, যেন এক স্বর্গরাজ্য, তাহারাও ক্ষণকালের জন্য যেন সেই স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইত এবং রামচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। পাঠ সাঙ্গ হইলে রামচিন্তায় বিভোর হইয়া সকলে নিদ্রামগ্ন হইত এবং পরদিন আবার আকুল আগ্রহে এই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিত। এইভাবে গ্রাম হইতে গ্রামে, শহর হইতে শহরে, দেশ হইতে দেশে রামচরিতমানসের মাহাত্ম্য প্রচার লাভ করে।

আকবর বাদশাহের বিখ্যাত মন্ত্রী নবাব আবদুল রহমান খানখানা তুলসীদাসের বন্ধু ছিলেন। রামচরিত মানস-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

রামচরিতমানস বিমল সন্তোঁ জীবন প্রাণ।
হিন্দুয়োঁ কো বেদ সম যবনোঁ হি প্রকৃত কোরাণ॥

অর্থাৎ, রামচরিতমানস পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের নিকট জীবনপ্রদ, হিন্দুদের নিকট ইহা বেদ এবং মুসলমানদের নিকট প্রকৃত কোরাণস্বরূপ।

বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী রামচরিতমানস-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী ভাতি রামভ্রমরভূষিতা॥"

আনন্দকানন কাশীতে তুলসীদাস জীবন্ত তুলসীতরুর ন্যায়। তাঁহার কাব্যরূপ প্রস্ফুটিত পুষ্প অতি সুন্দর এবং উহাতে রামরূপ ভ্রমর সদাই গুঞ্জন করিতেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন তাঁহার রচিত "তুলসীদাস—কবি ও ধর্মসংস্কারক" শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন,

"তুলসীদাস কেবলমাত্র সন্ন্যাসী ছিলেন না। সব দিক হইতেই তিনি আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য আপামর সাধারণের চিত্ত আনন্দাপ্লুত করে" ইত্যাদি। ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাদাস বলিয়াছেন, 'কলির দুষ্ট ব্যক্তিদের উদ্ধারকল্পে বাল্মীকি এযুগে তুলসীদাস-মূর্তিতে জন্ম লইয়াছেন এবং নূতন ছন্দে ত্রেতাযুগের অমরকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।'

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষের দিকে পাঞ্জাবে প্রচণ্ড প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, উহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া আগ্রা ও কাশীতে আসে এবং বহুলোক উক্ত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় ও অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করিতে থাকে। তুলসীদাস মা অন্নপূর্ণা এবং রামভক্ত হনুমানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানান—যাহাতে শীঘ্র ঐ মারাত্মক ব্যাধির উপশম হয়। বাবু সুন্দরদাস লিখিত তুলসীদাসের জীবনী হইতে জানা যায় যে, তিনি নিজেও শেষ পর্যন্ত উক্ত কষ্টদায়ক ব্যাধির কবলে পতিত হন এবং উহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। এই সময়ে তিনি যে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করিয়াছেন, তাহা হনুমান বাহুকের (কবিতাবলীর শেষ অংশ) শেষ শ্লোকগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে। ভক্তের সে কি আর্তি ! প্রভু রামচন্দ্র ও ভক্তবীর হনুমানের কাছে কাতর নিবেদন করিতেছেন ! যে রামনাম তুলসীর এত প্রিয় সেই রামনাম লইতে লইতেই সজ্ঞানে তিনি মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার শেষ শ্লোক হইতেছে :

রামনাম জস বরনিকৈ হোন চহত অব মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজীয়ে অবহী তুলসী সৌন॥

অর্থাৎ, যে জিহ্বা রামনাম বর্ণনা করিত, তাহা এখন মৌন হইতে চায়—এখন তুলসীর মুখে তুলসীপত্র ও সোনা দাও। রামনাম করিতে করিতে ১৬৮০ সম্বতে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) ১২৭ বৎসর বয়সে তুলসীদাস তাঁহার ইষ্টপদে চিরতরে মিলিত হন।

তুলসীদাস চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার অমরগ্রন্থ রামচরিতমানস তাঁহাকে জনগণের চিত্তে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রদ্ধা

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

যখন মানুষ কোন বস্তুকে—সে বস্তু দৃশ্য হউক বা অদৃশ্য হউক, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক—সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করে, তখন তাহার ঐ দৃঢ় ধারণাকে বলা হয় বিশ্বাস; আর যখন সে এই সত্য ও বিশ্বাস-অনুসারে নিজ জীবনের গতিপথ নির্দেশ করিবার—নিজেকে গঠন করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প করে, তখন সেই বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের একতানতাকে বলিতে পারা যায় শ্রদ্ধা। চৈতন্যচরিতামৃতকার অতি অল্প কথায় শ্রদ্ধার এইরূপ পরিভাষা দিয়াছেন—'শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।' (চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২২শ পঃ) কিন্তু জাগতিক জীবনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা প্রভৃতি প্রায় একই পর্যায়ের শব্দ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে, 'নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্ধধাতি, নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্ধধাতি' (৭। ০) অর্থাৎ নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে না, পরন্তু নিষ্ঠাবানই শ্রদ্ধা করিতে পারেন। বস্তুতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কোন কার্যে ব্রতী হইলে, তন্ময় হইলে—সে কার্যে সফলতা সহজলভ্য হয়। তাই ছাত্রের বিদ্যায় উন্নতি, রোগীর সুস্থতাপ্রাপ্তি, সাধকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ শ্রদ্ধার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

'মনুয়ারে তুই বাইয়া যারে দাঁড়;
তোর হাইলে বইস্যা আছে মাঝি ভাবনা
কিরে আর!'

- এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধালু সাধককে সিদ্ধির পথে পরিচালনা করে।

.বেদে শ্রদ্ধাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ নিম্নলিখিতভাবে শ্রদ্ধার সাধনা করিতেন।

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে, শ্রদ্ধাং মধ্যান্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি, শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ মা॥
(ঋ ১০। ৫ ।৫)

—অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আবাহন করি, শ্রদ্ধাকে আমরা মধ্যাহ্নে আবাহন করি; সূর্যের অস্তগমনকালে আমরা শ্রদ্ধাকে আবাহন করি। হে শ্রদ্ধে, এখন আমাদিগকে শ্রদ্ধাময় কর।

হিন্দুর সকল ধর্মপুস্তকেই শ্রদ্ধার বিপুল মহিমা কীর্তিত হইয়াছে; প্রবন্ধের বিস্তৃতি আশঙ্কায় সংক্ষেপে গুটিকয়েক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(১) ঋগ্‌বেদে (১ ।১৫) একটি 'শ্রদ্ধাসূক্ত'ই আছে, যাহাতে শ্রদ্ধার মহত্ত্ব বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে উপরি লিখিত শ্রদ্ধা-সাধন মন্ত্রটি গৃহীত হইয়াছে।

(২) 'শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে' (যজুর্বেদ, ১৯।৩০), —অর্থাৎ শ্রদ্ধা দ্বারা সত্যরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩) 'শ্রদ্ধয়া দেবো দেবত্বমশ্নুতে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা লোকস্য দেবী' (তৈঃ ব্রাঃ, ৩।১২।৩)—অর্থাৎ শ্রদ্ধা দ্বারা দেবতা দেবত্ব পাইয়া থাকেন, শ্রদ্ধাদেবী সকল লোকের প্রতিষ্ঠা (স্থিতির কারণ)।

(৪) 'শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ' (নিরুক্ত, ৯।।৩১)—অর্থাৎ সত্যের (পরমাত্মার) স্থাপন (প্রাদুর্ভাব) যাহা হইতে হয় তাহাই শ্রদ্ধা।

(৫) 'শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেত'
(বৃহঃ উঃ, ৪।৫);
—অর্থাৎ, শ্রদ্ধারূপী ধন লাভ করিয়া অন্তঃকরণে আত্মাকে দেখিতে হইবে।

(৬) 'শ্রদ্দধদেব মনুতে' (ছাঃ উঃ, ৭।১৯)
—অর্থাৎ, শ্রদ্ধাবানই মনন করিয়া থাকেন।

(৭) 'সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি'।
(যোগভাষ্য, ১।২০)
—অর্থাৎ, সেই কল্যাণকারিণী শ্রদ্ধা মাতার ন্যায় যোগীকে রক্ষা করেন।

বাহুল্য-পরিহারার্থ একটি মাত্র উদাহরণ শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইল। পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-পূর্বক কলেবর-পরিত্যাগ করিবার মানসে গঙ্গাতীরে অবস্থান-কালে শ্রীশুকদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

(৮) তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥
(২।১।১০)

—অর্থাৎ, তুমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপাত্র, অতএব এই পুরাণকথা তোমার নিকট বর্ণন করিব। ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিলে শ্রীগোবিন্দে নিশ্চলা ভক্তি হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রদ্ধার প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে ইহার অর্থ আস্তিক্য-বুদ্ধি (ছাঃ উঃ, ৭।১৯ শাঙ্করভাষ্য), ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস, যাহার ফলে ধর্ম-জীবন উজ্জ্বল হয় এবং যাহার অভাবে ধর্ম-জীবন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়। ঈশ্বরলাভের দুর্গম পথে শ্রদ্ধাই সম্পদ্ ও সহচর।

গীতাতে শ্রদ্ধার উপকারিতার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রদ্ধার অপকারিতা-সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে সকল পাপের মূলের কথা—নরকের তিনটি দ্বারের কথা, উল্লেখ করিয়া সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির—প্রকৃত কল্যাণপ্রাপ্তির একমাত্র প্রধান দ্বারই হইল যে শ্রদ্ধা, তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে দৈবী-সম্পদের কথা (১৬।১-৩) বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই দৈবী বা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই মানুষকে তাহার জীবনের পথে পরিচালিত করে, তাহাকে গঠিত করিয়া তোলে; সুতরাং উহার বিপরীত অশ্রদ্ধাই যে সকল অসৎভাবের মূল, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই দৈবী বা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা জিনিসটি কি তাহা জানা আবশ্যক। ইহা সর্বব্যাপী, সর্ব-শক্তিমান ভগবানের সত্তায়, তাঁহার অবতারে, তাঁহার বাণীতে, তাঁহার অচিন্ত্য, অনন্ত দিব্যগুণে এবং তাঁহার মহিমা, শক্তি, প্রভাব, লীলা, ঐশ্বর্যাদিতে পূর্ণ ও অটল বিশ্বাস।

গীতায় শ্রদ্ধার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ৩য় অঃ ৩১ শ্লোকে—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ ঈশ্বরে সমর্পণ-পূর্বক বেদ-বিহিত শুভকর্মের অনুষ্ঠানের গুণ কহিতেছেন। 'যাঁহারা নিষ্কাম কর্মযোগকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং অসূয়াহীন হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই কর্ম হইতে মুক্ত হন।' মনে রাখিতে হইবে যে জোর করিয়া বা না ভাবিয়া নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলে কোন ফল হইবে না, ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক হওয়াই একান্ত প্রয়োজন।

ইহার বিপরীত কি দোষ হয়, তাহা পরের শ্লোকে (৩। ২) ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, যাহারা অশ্রদ্ধাবান্, অর্থাৎ যাহারা আমাতে শ্রদ্ধা হারাইয়া কর্মত্যাগ করে, তাহারা সকল পুরুষার্থ

হইতে ভ্রষ্ট হয়। কেন না, নিষ্কামভাবে শুভ কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য যে আত্মোপলব্ধি তাহা বুঝিতে না পারিয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া থাকে—কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

ইহার পর ৪র্থ অঃ ৩৯ শ্লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শ্লোকে জ্ঞানাধিকারী নির্দেশ করা হইয়াছে—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

—অর্থাৎ, শ্রদ্ধাবান্ তৎপর (জ্ঞাননিষ্ঠ) ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। পূর্বে প্রণিপাত, সেবা প্রভৃতি জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলিয়া এখানে ভগবান্ পরিস্ফুট-ভাবে বলিতেছেন যে, শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ উপায়। ইহা কোন জ্ঞান? ব্রহ্মের যাথাত্ম্যজ্ঞান—আত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদ-জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, যাহা লাভ করিলে সাধক অচিরে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমশান্তি (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। এই পরম শান্তিলাভ করিবার মূল হইল শ্রদ্ধা; কেননা, এই শ্রদ্ধা হইতে আসে তৎপরতা (নিষ্ঠা) এবং নিষ্ঠা হইতে ইন্দ্রিয়সংযম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়।

তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে—শ্রদ্ধাবান্ কে? যে সাধনে তৎপর। তাৎপর্য এই যে, সাধনমার্গে যাহার যতটুকু শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে তাহার ততটুকু তৎপরতা আছে; অর্থাৎ, শ্রদ্ধার কষ্টিপাথর হইতেছে তৎপরতা। দ্বিতীয় বিশ্লেষণ হইল 'সংযতেন্দ্রিয়', অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় বশে আছে; যাহার ইন্দ্রিয় বশে নাই সে পূর্ণ তৎপরতা-পূর্বক সাধন করে না। অর্থাৎ, শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাসের কষ্টিপাথর হইতেছে 'ইন্দ্রিয়সংযম'।

ইহার পরের শ্লোকে (৪।৪০) ভগবান্ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ অনধিকারী নির্দেশ করিয়াছেন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কেননা, শ্রদ্ধা না থাকিলে সংশয় দেখা দেয়; সংশয় থাকিলে প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। অশ্রদ্ধাই তাই বিনাশের কারণ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন তুলিয়াছেন—শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু শিথিল বৈরাগ্য-বশতঃ যোগভ্রষ্ট যোগী চরমে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন? অর্জুনের সংশয়—এইরূপ যোগীর মনো-নিরোধরূপ যোগ লণ্ড-ভণ্ড হওয়ায় তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সকল প্রয়াস কি পণ্ড হইয়া যায়?

শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন—'কল্যাণকৃৎ' দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। (৬।৪০) যে সাধক অশুভ মার্গ ত্যাগ করিয়া বাসনা-স্রোতকে কল্যাণের পথে মোড় ফিরাইয়াছেন, তাঁহার কখনো অসদ্গতি হইতে পারে না, তিনি ইহলোক বা পরলোকে বিনাশপ্রাপ্ত হন না—ইহলোকে পতিত ও নিন্দিত অথবা পরলোকে মনুষ্য অপেক্ষা হীন জন্ম প্রাপ্ত হন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ দেখাইয়াছেন, কিরূপে সাধক ধাপে ধাপে যুক্ত, যুক্ততর ও যুক্ততম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠেন, কিন্তু সকল যোগীর মধ্যে ভক্তই যে 'যুক্ততম' যোগী, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এই অধ্যায় উপসংহার করিয়াছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(৬।৪৭)

—অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, যোগযুক্তগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ—তিনিই 'যুক্ততম', ইহাই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধায় আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা একান্ত প্রয়োজন; সেই কারণ ৭ম অঃ ২১ শ্লোকে শ্রদ্ধার প্রশংসা-কল্পে ভগবান্ বলিতেছেন—'যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই দেবমূর্তিতে সেই ভক্তের সেই শ্রদ্ধাই অচলা করি।' ইহা করিয়া ভগবান্ ক্ষান্ত হন না; তাই আবার বলিতেছেন—'যদি সেই ভক্ত ঐকান্তিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করে, ভগবান্ সেই রূপের ভিতর দিয়া সেই ভক্তের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলসকল প্রদান করেন।' (৭।২২)

সংক্ষেপে গীতার শিক্ষা হইতেছে যে, শান্তি ও শাশ্বত স্থান পাইতে হইলে জীবনকে ক্রমশঃ কর্মময়, বিচারময়, ধ্যানময় এবং জ্ঞানময় বা আত্মময় করা; কিন্তু ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার মূলে থাকা চাই শ্রদ্ধা, জীবনের মূল নীতি হওয়া চাই শ্রদ্ধা।

নবম অধ্যায়ে ভগবান্ 'রাজযোগের' বিষয় 'উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য' বলিয়া প্রশংসা করিলে টীকাকার মধুসূদনের ভাষায় প্রশ্ন উঠে - এবমস্য সুকরত্বে সর্বোৎকৃষ্টত্বে চ সর্বেঽপি কুতোঽত্র ন প্রবর্তন্তে, তথা চ ন কোঽপি সংসারী স্যাৎ—অর্থাৎ, ইহা (রাজযোগ-রূপ আত্মতত্ত্ব) যদি এইরূপ সুগম ও সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা হইলে সকল লোকেই ইহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? আর যদি সকলেই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহই ত সংসারী থাকে না? ইহার উত্তরে ভগবানের এই অনুশাসন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ (৯।৩)

—অর্থাৎ, এই আত্মজ্ঞানের স্বরূপ ও যোগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার-পথে নিরন্তর যাতায়াত করিয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, নবম অধ্যায়ে যে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলা হইবে, তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; একান্ত শ্রদ্ধার সহিত এই সত্যস্য সত্যকে আশ্রয়-পূর্বক জীবন যাপিত করিয়া উহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। অতএব মধুসূদনের প্রশ্নের উত্তর হইতেছে যে, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু।

ইহার পর ভগবান্ কর্তৃক ৭ম অঃ ২১-২২ শ্লোকে বর্ণিত শ্রদ্ধার আবার আমরা এখানে দেখা পাই। তাঁহার অভিমত ৯ম অঃ ২ শ্লোকে তিনি স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন; এখানে তিনি বলিয়াছেন—যেহেতু অন্যান্য দেবতারূপে ভগবানই স্বয়ং অবস্থিত, সুতরাং অন্যদেবতার আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত উপাসনা অজ্ঞানপূর্বক ভগবানেরই উপাসনা; কারণ ভগবানই সকলতত্ত্বের মূল কারণ, অর্থাৎ অন্যদেবতার উপাসকগণ জানে না যে, ভগবানই অন্যান্য দেবতার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—বিভিন্ন ইষ্টদেবতার মধ্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরই পূর্ণরূপে বিরাজিত।

এখন এই শ্রদ্ধান্বিত কথাটি বুঝিতে হইবে। বেদশাস্ত্র-বর্ণিত দেবতা, তাঁহাদের উপাসনা এবং স্বর্গাদি-প্রাপ্তিরূপ উহার ফলে যাহার আদরপূর্বক দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহাকেই এখানে শ্রদ্ধান্বিত বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে এই বিশেষণটি প্রয়োগ দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে যে, বিনা শ্রদ্ধায় যাহারা দম্ভপূর্বক যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা দেবতার পূজা করে, তাহারা শ্রদ্ধান্বিত-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, উহাদের গণনা আসুরী প্রকৃতির লোকের মধ্যে; কারণ ইহারা ধর্মধ্বজী, অধার্মিক হইয়াও নিজের ধার্মিকত্ব ঢক্কানিনাদে জ্ঞাপন করে মাত্র। (গীতা, ১৬।৪, ১০)

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোকোক্ত 'যুক্ততম'-সম্বন্ধে

ভগবানের চূড়ান্ত অভিমত সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে ১২শ অঃ ২য় শ্লোকে—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

—অর্থাৎ, যাঁহারা আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্বদা মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই 'যুক্ততম' ইহাই আমার অভিমত। অভিপ্রায় এই যে, আরাধনা পরম শ্রদ্ধার সহিত (উৎকৃষ্টা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত) হওয়া দরকার।

পূর্বে সূচিত হইয়াছে যে, 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো-হত্যর্থমহং' (৭।১৭)— 'আমি জ্ঞানীর অতীব প্রিয়'—এবং 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব' (৭।১৮) 'জ্ঞানীই আমার আত্মা'। তাহাই ১২শ অঃ এর অন্তিম শ্লোকে উপসংহৃত হইয়াছে—

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

—অর্থাৎ, যে সকল মৎপরায়ণ ভক্ত মৎকথিত মোক্ষদায়ক ধর্ম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাধন করেন, তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়, পরম ভক্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কেবল 'মৎপরায়ণ' হইলে চলিবে না, 'শ্রদ্দধানাঃ' হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জীব কর্মাধিকার লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম প্রথমে থাকে সকাম। সকাম কর্ম আবার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। অশুদ্ধ কর্মই অদৃষ্ট জন্মায় এবং অদৃষ্টই জীবকে সংসার-পথে আবদ্ধ করিয়া রাখে দুঃখসঙ্কুল সংসারে বন্ধনস্থজন করে। কিন্তু কর্ম যদি শুদ্ধ হয়, বিচারযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম যজ্ঞে পরিণত হয়; অর্থাৎ কর্মের গতি বিচারের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা যখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে ভগবদ্-অভিমুখে ফিরিয়া যায়, তখন উহাই যজ্ঞার্থ বা নিষ্কাম কর্ম হয় এবং পরমার্থ-সাধনার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। এইরূপ কর্মের পরিণাম হইতেছে শ্রদ্ধা ও নির্বেদের ভূমি-লাভ। তাহা হইলে দেখা গেল শ্রদ্ধা সাধনলভ্য। অতএব শ্রদ্ধা হইল ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভাবরাজ্য-প্রবেশের প্রথম দ্বার। এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় শ্রদ্ধা, 'আদৌ শ্রদ্ধা'।

সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার কথা বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বাভাবিক এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ (১৭।২)। ইহা পূর্বজন্মকৃত পাপ-পুণ্যের ফল। শাস্ত্রজনিত শ্রদ্ধা কিন্তু এক প্রকার সাত্ত্বিকীরূপা। শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই স্বভাবের অন্যথা করণে সমর্থ; যাহাদের এ জ্ঞান নাই, তাহাদের কেবল জন্মান্তরকৃত ধর্মাদি সংস্কারবশতঃ শ্রদ্ধা ত্রিবিধ দেখা দিয়া থাকে। কি বিবেকী, কি অবিবেকী, সকল মানুষের শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপ, অর্থাৎ গুণানুরূপ (১৭।৩)। যাঁহারা শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞান-বলে স্বভাববিজয়ী, তাঁহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী ব্যতীত অন্য প্রকার হয় না। এই শ্রদ্ধাভেদ-অনুসারেই কর্মভেদ, আহারভেদ, যজ্ঞ বা ইজ্যাভেদ, তপস্যাভেদ এবং দানভেদ; তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তামস যজ্ঞের প্রধান লক্ষণ হইতেছে 'শ্রদ্ধাবিরহিতত্ব' (১৭।১৩) এবং কর্মের প্রধান লক্ষণ হইতেছে পরম শ্রদ্ধা-সহকারে কর্ম করা—'শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং' (১৭।১৭), আর তাহার বিপরীত তামস কর্মের লক্ষণ হইতেছে অশ্রদ্ধার সহিত অবজ্ঞাভাবে কর্ম করা—'অসৎকৃতমবজ্ঞাতং' (১৭।২২)। এই অধ্যায়ের তাৎপর্য হইতেছে যে, শ্রদ্ধাই সকল সিদ্ধির মূল। পরিশেষে শ্রদ্ধা-সহকারে সর্বকর্মে প্রবৃত্তি-উৎপাদনের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, নাস্তিক্যবুদ্ধিরূপ অশ্রদ্ধা সহ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি যাহা কিছু করা যায়, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া উক্ত

হয়; সে সমুদয়ের ফল ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি বা পরলোকে স্বর্গাদি কিছুই লাভ করা যায় না।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥
(১৭।২৮)

ফল কথা এই যে, শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত কর্ম মঙ্গলদায়ক এবং শ্রদ্ধাবিরহিত কৃত কর্ম অকল্যাণকর হয়।

আর একটা কথা আছে। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধালুতা-সহকারে যে কোন কর্মই করা যাউক না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে; কিন্তু 'ওঁ তৎ সৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিলে কর্ম-বৈগুণ্য তিরোহিত হয়। সুতরাং অশ্রদ্ধা-পূর্বক যথেচ্ছ ভাবে কর্ম করিলে, স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্রবিরোধী কর্ম করিলে—শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারতঃ—(১৬।১৩), ঐ নির্দেশের দ্বারা ক্রিয়া-বৈগুণ্যের পরিহার হইতে পারে কি?—না, সত্তায় কিঞ্চিন্মাত্র হয় না; কারণ, এরূপ কর্মে সাত্ত্বিকত্বের হেতুভূতা, সকল সাধনার মূল ভিত্তি যে শ্রদ্ধা তাহার আবশ্যকতা থাকে না। বলা বাহুল্য, এ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধারই প্রাধান্য দেখান হইয়াছে।

১৮শ অঃ ৭১ শ্লোকে ভগবান্ গীতা-শ্রবণের ফল কহিতেছেন। শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিলেও শুভলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই তিনি বলিতেছেন—

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ
পুণ্যকর্মণাম্॥

গীতার ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এখন শ্রবণফল কহিতেছেন। গীতার শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করিলে এবং জীবনে শ্রদ্ধাপূর্বক অনুশীলন করিলে অমৃতত্ব লাভ ত হইবেই, এমন কি গীতা শ্রদ্ধা-যুক্ত চিত্তে শ্রবণ করিলেও উত্তম লোকে গতি হইবে।

কালী

শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

জাগো মহাকালী ভীম ভীষণা ভৈরব বীণাগর্জনে।
তৃষিতরসনা দৃপ্তদশনা তৃপ্তচরণা নর্তনে॥
শ্মশানের বুকে ঝলকে পলকে শুনেছি মা তোর চরণস্বন।
দিগ্‌বসনা প্রসন্নমনা সুধাসিঞ্চনা সর্বপুর॥
রক্ষিতে সুতে অরি বিনাশিতে অদিতি-অসুর-সংগ্রামে।
তুলিলে তুফান মরণাহ্বান খড়্গ হস্তে রণঠামে॥
রক্তবীজ যে রণস্থলেতে ক্ষতবিক্ষত সতেজ উঠি'।
বিন্দুশোণিতে দানবে, তরিতে ঠিক সমবলী মুক্ত-ত্রুটি॥
ব্যর্থ ত্রিশূল শর শেল শূল ব্যর্থ পরিঘ চক্রপাশ।
বজ্র কৃপাণ দণ্ড মহান গদা ও পরশু লুপ্ত-আশ॥
ইন্দ্রাণী এল ব্রহ্মাণী এল নারায়ণী ঐ মাহেশ্বরী।
বারুণী বারাহী ও নারসিংহী মাতিলেক রণে শস্ত্র ধরি'॥

যত দেব দেবী চমকিত সবি সর্বশক্তি হ'ল বেঠিক।
কম্পিত হ'ল শঙ্কিত র'ল নিষ্ফল ভুল দিকবিদিক॥
তুই মা করালী সমরে পশিলি অম্বিকাদেশে মূর্তমার।
রক্তবীজকে শোষিলি শেষে যে সরোষে প্রদানি' হুহুংকার॥
ললাট-ফলকে নামিয়া পলকে দেখালি একি মা বীরপনা।
বাক্যরুদ্ধ ত্রিদিবশুদ্ধ নতমস্তক সব জনা॥
তুই মা অভয়া ডানে বরাভয়া পাণিটি ঐ তো দীপ্তময়।
বামে শ্রীখড়্গ রাখিল স্বর্গ বধি' অসংখ্য দানবচয়॥
হরষ হরষ অসীম পরশ অনাদি স্ফূর্তি ধরিল তোর।
ভীম আনন্দ মহান ছন্দ জাগিল নন্দে হৃদয়ডোর॥
নাচন নাচন একি এ মাতন প্রলয় এল কি ধ্বংসরূপ।
ধরা টলমল সিন্ধু পাগল সময় রুদ্ধ সভয়ে চুপ॥
খসিল তারকা উল্কাশলাকা কোথা মেঘদল মিশিল সব।
বিকট শব্দ সঘোরে স্তব্ধ কোথা আরব্ধ কোথা নীরব॥
ত্রিদিবে সর্ব কি গন্ধর্ব মাতৃবর্গ-স্তুতি মিলায়।
কোথায় বিরাম কিবা পরিণাম অধিক মত্ত পুলককায়॥
শিবতাণ্ডব হ'ল খাণ্ডব পরাজয় মানি' সে শংকরে।
পড়িল চরণে নিবার স্মরণে 'সংবর' জপ নিজান্তরে॥
জান কি জান না বুঝিতে পারি না শিব ভূমিসাৎ সম্মুখে।
চরণ দু'খানি তুলিলে জননি, বিশ্বজনক-শ্বেত-বুকে॥
উঠিলে চমকি' ঠমকি' ছমকি' নামালে নয়ন চরণদিক।
একি একি একি দেখিলে কি দেখি স্থির ও মুরতি নির্নিমিখ॥
স্তিমিত নয়ন দেব ত্রিলোচন সমাধিমগন স্পর্শনে।
তুমিও লগনা যোগমগনা কেবা বুঝে কেবা বর্ণনে॥
কি মধুর যোগ শিবশিবা-যোগ নয়নে নয়নে অন্তহীন।
শক্তি উপরে শিব নিথরে দুঁহু দোঁহামাঝে একে লীন॥
ওমা ত্রিনয়না মাল্যশোভনা চন্দ্রভূষণা অম্বিকা।
কিরীট-সজ্জা রুদ্র-লজ্জা সর্বপূজ্যা চণ্ডিকা॥
অলকে পলকে অশনি ঝলকে কুণ্ডলে নাচে দীপ্তাভা।
ভ্রূকুটি-করাল কালো কেশজাল দশনের পাঁতি মনলোভা॥
রসনা বিশালে রক্তিমা খেলে পঙ্কজ ফোটে চরণঘায়।
ভীম-সুন্দরে কান্তি বিহরে ভঙ্গিমা মৃদু দীপ্তে ভায়॥
কখনও পালিছ হরষে খেলিছ বিশ্ব সৃজিছ আনমনে।
ত্রিদশ ভুবন নিমেষে কখন ভাঙিছ চুরিছ কোন ক্ষণে॥
জাগ মা হৃদয়ে সঙ্গেতে লয়ে প্রলয়ের রূপ সুপ্রকট।
অজ্ঞান দূর মায়া হোক চুর হিংসা বিকার বিষ কপট॥
কর মা ছিন্ন শতধা ভিন্ন এ পাশ-অষ্ট মরণ ঘায়।
ও খট্টাঙ্গে রুদ্র-রঙ্গে সাট্টহাস-মূর্চ্ছনায়॥
আয় আয় কালী ওমা মহাকালী করালি নাচ এ শ্মশানে আজ।
দাও মা শক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, লও মা প্রণাম অর্ঘ্য-সাজ॥

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী লীলা সরকার

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী হবে এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভগিনী নিবেদিতা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৯৮ সালের ৺কালীপূজার দিনে। আমার বিশ্বাস, মিস্ মার্গারেট নোবলের জন্ম ছিল দেবী-অংশে, তাই কালীপূজার দিনে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সারদামণি দেবীর আশীর্বাদ এবং স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের শুভেচ্ছা নিয়ে এই বালিকাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি হতে বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বহু বালিকা আদর্শ নারীশিক্ষা লাভ করে আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন এই বিদ্যালয়টি ভারত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতার অমর কীর্তি, সন্দেহ নেই।

নিবেদিতাকে বোঝা ও তাঁর বিষয় কিছু লেখা সামান্য কথা নয়। তাঁর স্মৃতি আমার একটু মনে আছে। সে অনেক দিনের কথা। বঙ্গদেশে যশোর জেলায় (বর্তমানে পাকিস্তান-ভুক্ত) আমার পিত্রালয়। আমার পিতা ৺যদুনাথ মজুমদার যশোরের পদস্থ লোক ছিলেন। তাঁর দুখানা মাসিক পত্রিকা ছিল; একখানি ইংরেজী, অপরটি বাংলা। ইংরেজীখানির নাম ছিল 'Brahmachari', বাংলাখানির নাম 'হিন্দুপত্রিকা'। ইংরেজীখানায় যুবকদের ব্রহ্মচর্য, চরিত্রগঠন, শরীররক্ষা ও দৃঢ়চিত্ত হওয়ার প্রেরণা থাকতো; বাংলাখানায় থাকতো ধর্মবিষয়ক লেখা। স্বামিজীর নশ্বর দেহ এ জগৎ হতে চলে যাবার পর শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ধারা-বাহিকরূপে কোন পত্রিকায় প্রকাশের চেষ্টা চলছিল। 'হিন্দুপত্রিকায়' উহা প্রকাশ করবার জন্য নিবেদিতা যশোরে আমার পিতৃগৃহে যান। আজও আমার সে পবিত্র স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তুষারধবল আবরণে অঙ্গ ঢাকা, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ—মনে হল যেন মূর্তিমতী বাগ্দেবী বীণাপাণি বীণা ছেড়ে মালা হাতে করে আমার পিতামহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভয়ে ভয়ে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেমসাহেব কি জন্য এসেছেন? আমাদের কি ধরে নিয়ে যাবেন? আহা, তখন কি জানি, দেবী তাতে অত ব্যথা পাবেন! চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে কোলে নিয়ে তাঁর থলির মধ্য থেকে চকোলেট লজেন্স দিয়ে কত আদর করলেন। বললেন, ও খুকু, আমি যে তোমার দিদি, তোমার বাবা যে আমার বাবা, তুমি জান না তুমি ছোট ছিলে; বাবাকে ছেড়ে, তোমাদের ছেড়ে আমি কাজের জন্য অন্য জায়গায় ছিলাম, তাই চিনতে পারনি—আমি তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব না—তোমরাই আমাকে জন্ম জন্ম ধরে রাখবে। তুমি যে আমার ছোট খুকু বোন্, আমি যে তোমার দিদি!

আজও যেন তাঁর সেই পবিত্র স্পর্শ পাচ্ছি, আর কী এক অপূর্ব আনন্দে হৃদয় ভরে উঠছে! নিবেদিতার ভিতর এমন কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা স্বামিজীরূপ অভিজ্ঞ 'জহুরী' দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন—এই পবিত্রহৃদয় পরসেবোন্মুখ, তীক্ষ্ণমেধাশালিনী তেজস্বিনী নারী দ্বারা তাঁর বহু কাজ হবে। স্বামিজী তাঁকে

বলেছিলেন, তুমি ভারতে যেতে চাচ্ছ, তুমি পারবে—ভারতের অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, মূখ, দরিদ্র, দীন ভারতবাসীকে তোমার নিজের শরীর থেকে ভালবাসতে, আমার থেকেও শ্রদ্ধা করতে? নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই পারব। যতদিন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, সেকথা বর্ণে বর্ণে পালন করে গেছেন। হিন্দু-ধর্মের জন্মস্থান পবিত্র ভারতভূমিকে এই মহীয়সী পাশ্চাত্ত্য নারী তাঁর অন্তরতম, প্রিয়তম দেবতা বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত এই দেবভূমির সেবা ও কল্যাণ-কামনা করে গেছেন। গুরুপদে তাঁর ভক্তিবিশ্বাস এত গভীর ও অবিচলিত ছিল যে, তাঁর পৃথক সত্তা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিজেকে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা বলে পরিচয় দিতেন।

স্বামিজী ভারতীয় যুবকদের ডেকে বলেছেন, ওরে হতভাগ্যগণ, দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মায়েরা এখন কি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা একবার পাশ্চাত্ত্যদেশ ঘুরে এলে বুঝতে পারতিস। মেয়েদের এই দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী—আবার তোরাই এই মায়েদের বাঁচিয়ে তুলতে পারিস। কি হবে রে কতগুলো হাকিম, উকিল, প্রফেসার, মাষ্টার হয়ে, কি হবে তোদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বেদ-বেদান্ত শিল্প-বাণিজ্য দিয়ে—ওরে মূর্খ, মা-মরা ছেলে কি কারো ভাল হতে পারে রে? ধর্মশীলা, ভক্তিমতী, বিদুষী, বীর ললনা না হলে তোদের ভাবী বংশধরদের জননী কে হবে?

একটি চিঠিতে তিনি জনৈক শিষ্যকে লিখেছেন, "বাবাজী, 'শাক্ত' শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্ নয়—শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি ব'লে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। মনু বলেছেন 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপরে ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা (পাশ্চাত্ত্য জাতি) তাই করে। এরা তাই এত সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয় অপবিত্র বলি; তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"

তাই আজ একটি নিবেদিতা আমাদের যে কর্মের বন্যা প্রবাহিত ক'রে দিয়েছিলেন আমরা ভারতের নারী হয়ে ঐরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের কি ক'রেছি? আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই হয়ত হ'য়েছি—নিবেদিতা সমষ্টিগত কর্ম নিয়ে মহৎ আদর্শের পথে চলেছিলেন। আমি নিজে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মুখ হতে নিবেদিতার উচ্চ আদর্শের এবং মহাপ্রাণের কথা শুনেছি। বহু বিদেশী পুরুষ ও নারী ভারতের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রেছিলেন,—এণ্ড্রুজ্ মীরাবেন্ ইত্যাদি কবিগুরু বললেন, নিবেদিতার মত এঁরা কেউই নন্। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে অন্তরের সহিত ভালবেসেছিলেন—তাঁর কার্য-কুশলতায় মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। কবি বললেন, আমি যখন শিলাইদহে থাকতাম, তখন নিবেদিতা কখনো কখনো এসেছেন। একদিনের ঘটনা বললেন। পদ্মার চরের মধ্য হতে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হচ্ছে। চাষারা ভোরের সময় লাঙ্গল কাঁধে মাঠে আসছে। গেরুয়া বসন-পরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সহিত আর একটি মেয়ে ছিল তাঁর সহচরী, কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা! নিবেদিতা দৌড়ে চাষাদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই তোমরা এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা বলল, আমরা মেমসাহেবকে

দেখছি। তিনি বললেন, মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল তোমাদের বাড়ী যাই, তোমাদেরই দেখব আমি। চাষারা শশব্যস্তে তাঁকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস নিবেদিতা যেন আমাকেও চিনতে পারেন না। আমার জমিদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল সমস্ত গ্রামে তিনি গিয়েছেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে তাদের সুখদুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন। তাদের সঙ্গে চিঁড়ে কুটেছেন, ধান ভেনেছেন—তাদের নাড়ু মোয়া খেয়েছেন—তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি যে, তিনি তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান কুটছেন।

নিবেদিতার সাহায্য না পেলে আমাদের এই বাংলার দুজন নামকরা মনীষীর জীবনের পূর্ণ বিকাশ হত কিনা সন্দেহ। একজন বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, আর একজন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বসু মহাশয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে নিবেদিতা অপরিসীম সহায়তা করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যখন রাজনৈতিক আন্দোলন হতে মুক্তি পেলেন তখনি ইংরেজ সরকার তাঁকে চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। ভারতের দরদী ভগ্নী কোন প্রকারে তা জানতে পারেন। তাঁকে আরাকানী পুস্তক কিনে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ আরাকানী ভাষা শিখে ফেললেন। ভগিনী নিবেদিতা আরাকানী পোষাক-পরিচ্ছদ কিনে তাঁকে আরাকানী নাবিক সাজালেন এবং মাদ্রাজগামী জাহাজে তাঁকে তুলে দিয়ে বললেন, ঘোষ, তুমি মাদ্রাজ হতে পণ্ডিচেরী ট্রেনযোগে সত্বর চলে যাও। ঘোষ তো বিস্ময়ে অবাক্! যে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য তিনি জেল থেকে মাত্র অব্যাহতি পেলেন সেই ইংরেজরমণীই তাঁকে কলের পুতুলের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! ঘোষ যখন জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি করছেন? তার জবাবে নিবেদিতা বললেন, যা বলি তাই কর, ভাই। অরবিন্দ তথাপি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? নিবেদিতা বললেন, কেনর উত্তর শুনবে? তোমাকে সুন্দরবনে রয়াল টাইগারের মুখে ফেলবে, না হয় হিমালয়ের তুষারের মধ্যে চিরসমাধিস্থ করবে? তুমি এই দুটি চাও না ফরাসী উপনিবেশে আত্মগোপন করতে চাও?

এই দুটি মহামূল্য জীবন ভগিনী নিবেদিতা স্নেহের অঞ্চলের মধ্যে বেঁধে তাদের কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন ভেবে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। আমাদের এই প্রস্ফুটিত শতদলরূপিণী নিবেদিতা তাঁর শরীর, মন, কর্ম এই দীনহীন দরিদ্র ভারতের জন্য নিঃস্বার্থরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন; গুরুর সাক্ষাতে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে জীবনের কর্মক্ষেত্রে সার্থক করে গিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা কর্মক্ষেত্রে যেরূপ উচ্চাঙ্গের কর্মী ছিলেন, সাধনক্ষেত্রেও সেরূপ ছিলেন একজন উন্নত সাধিকা।

সমালোচনা

ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-সংকলন—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ-সংকলিত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ৸৶+৮০; মূল্য দেড় টাকা।

বেদবিহীন বাংলায় ঋগ্বেদের এই ক্ষুদ্র সংকলন-গ্রন্থখানিকে আমরা শ্রদ্ধায় বরণ করিয়া লইতেছি। নানা মণ্ডল হইতে ভূয়-আহৃত দেবতাদের প্রতি সু-উক্ত ঋগাবলীর ভিতর যেগুলি ভাবে ও ভাষায় চিরন্তনী তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি রত্ন আহরণ করিয়া সংকলয়িতা যে হারটি রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও সংযমের নিদর্শন। অনুবাদের ভাষা শব্দ-লঘু হইয়াও মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল। "ঋগ্বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" নামক ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ তথ্যপূর্ণ। অনুবাদক কখন কখন প্রাচীন মনীষীদের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে আমরা অনেকক্ষেত্রে তাঁহারই পক্ষপাতী।

আমরা ২।১টি বিষয়ে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'ঊষা'কে ২৫ পৃষ্ঠায় 'দুহিতর্দিবঃ বলা হইয়াছে এবং উহার অনুবাদ, 'দেবদুহিতা' করা হইয়াছে। ৩৪ পৃষ্ঠায় ঐ 'ঊষা'কে 'দিবোদুহিতা' এবং ৩৭এ 'রাত্রি'কে 'দুহিতর্দিবঃ' বলা হইয়াছে এবং অনুবাদে যথাক্রমে 'স্বর্গ-কন্যা' ও 'আকাশের কন্যা' করা হইয়াছে; ১০।১২৭।৮ ঋকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিতেছেন "দ্যোতমানস্য সূর্যস্য পুত্রি যদ্বা দিবসস্য তনয়ে" আমাদের কিন্তু তিন স্থানেই অনুবাদকের 'স্বর্গকন্যাই' ভাল মনে হইতেছে। কারণ শেষোক্ত ঋকের দেবতা 'রাত্রি'; তাঁহাকে সূর্যের বা দিবসের কন্যা বলা একটু কষ্টকল্পনা, যাহা 'স্বর্গকন্যা'য় নিবারিত হয়। অতএব ২৫ পৃষ্ঠার 'দেবদুহিতা'কে স্পষ্ট করিয়া 'স্বর্গকন্যা' বা ত্রিদিবকন্যা বলিলে সংগতি রক্ষিত হয়, যুক্তিতেও বাধে না। আর একটি কথা: ৩৬ পৃষ্ঠায় রাত্রিকে মূলে বর্ণনা করা হইয়াছে "জ্যোতিষা বাধতে তমঃ" ও "অপেদু হাসতে তমঃ"। অনুবাদে 'তিনি' ও 'আলোকে'র মাঝখানে সায়ণকে অনুসরণ করিয়া যদি ব্র্যাকেটের মধ্যে 'গ্রহনক্ষত্রাদিরূপ' কথাটি বা ঐ ভাবদ্যোতক অন্য কথা বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অর্থ পরিষ্কার হয়। ১৪ পৃষ্ঠায় দেব সবিতা আসিতেছেন "নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ"। সায়ণ 'নিবেশয়ন্' পদের অর্থ করিয়াছেন 'স্বস্বস্থানে অবস্থাপয়ন্'। পদার্থ ঠিক হইলেও বাক্যার্থে গোলযোগ ঘটে। সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'সচেতন করিয়া'। তিনি সহজ আধিভৌতিক দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিতেছেন; তাই আমাদের বিবেচনায় অনুবাদ ভালই হইয়াছে। ১০ পৃষ্ঠায় ইন্দ্র-দেবতার প্রথম ঋকের শেষ চরণে 'ইন্দ্রং' পদটি অনুস্বারবিহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি অকিঞ্চিৎকর মুদ্রাকর-প্রমাদ, যথা—৷৶০ পৃষ্ঠায় 'সোভন', ৮ পৃঃ 'প্রশাস্তা' ও 'উঁদ্গাতা' ইত্যাদি গ্রন্থকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

জপসূত্রম্ (২য় খণ্ড)—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; পৃষ্ঠা—৩৩৬+৷৷০; মূল্য—৫৲ টাকা।

এই গ্রন্থে লেখক বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে জপতত্ত্ব স্বরচিত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মনস্বিগণের আনন্দবর্ধক হইবে। গ্রন্থকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া গায়ত্রীই যে সকল

বিশ্বের কারণ তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করিয়া অদ্বৈততত্ত্বেই সকলের পরিসমাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জপের প্রক্রিয়া, নিষ্ঠা, উপায়, রহস্য ও ফল বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তন্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা সাধক ও বিদ্বৎসমাজে আদরণীয় হইবে। সাধারণের পক্ষে নিতান্ত সহজবোধ্য না হইলেও পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ

হিউ এন্ চাঙ্—সত্যেন্দ্রকুমার বসু-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৪৭; মূল্য আড়াই টাকা।

বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার এই পুস্তকখানা পড়িয়া মনে হইল ইতিহাস কত রোমাঞ্চকর, সত্য কত চমকপ্রদ! ছাত্রজীবনে মহামনীষী চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনচাঙ্-এর ভারত-আগমন শুষ্ক, সংক্ষিপ্ত, অনুদ্দীপক ঐতিহাসিক ঘটনা-হিসাবেই পড়িয়াছিলাম; কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বলিষ্ঠ আদর্শপ্রীতি ও সংকল্পের অনমনীয়তা সক্রিয় ছিল, তাহার প্রথম সন্ধান পাইলাম এই গ্রন্থখানিতে। সুপ্রাচীন চৈনিক সভ্যতার সহিত ভারতবর্ষের আত্মিক যোগ সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছিলেন চূড়ান্ত সাহসিক, অকুতোভয়, জ্ঞানৈকলক্ষ্য হিউএনচাঙ্। কি ভাবে তিনি ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কত প্রচণ্ড প্রতিকূলতা তাঁহার সংকল্পকে শিথিল করিতে গিয়াছে, কত দুর্দৈব তাঁহাকে দুঃস্বপ্নের মত পীড়িত করিয়াছে, তাহার রোমাঞ্চকর বিবৃতিতে গ্রন্থখানি পূর্ণ। উচ্চাঙ্গের চরিতকথা-হিসাবেই বইখানি কেবলমাত্র আদর পাইবে তাহা নহে, ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠায়ও ইহা অনন্য-সাধারণ। মূল ঐতিহাসিক উপাদান-সম্মত এই বিবৃতি। বইখানিতে তৎকালীন ভারতবর্ষ ও চীনদেশ-সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ বহু অমূল্য স্মরণীয় তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় চিত্র-সন্নিবেশে। পরিশিষ্ট-প্রদত্ত হীনযান ও মহাযান-বিষয়ক নিবন্ধে এবং 'হিউএনচাঙ্'-শব্দটির বানান-সম্বন্ধে আলোচনায় জিজ্ঞাসা উদ্দীপিত হয়। প্রত্যেক সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিকে বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

আলপনা—কবিতার বই। লেখক—শ্রীরণজিৎ-কুমার রায় চৌধুরী। প্রকাশক—দি বুক হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কবিতার সংখ্যা মোট ৭১। পৃষ্ঠা—৭০। মূল্য এক টাকা।

প্রাচীন ধারার অনুবর্তী খোলা প্রাণে লেখা পল্লী যুবকের কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা মিষ্ট, সরল ও পরিচ্ছন্ন। লেখকের ভাবুক ও দরদী মন আছে। কবিতাগুলিতে বিদায় ও বিষাদের সুরই বেশি বাজিয়াছে। কয়েকটি কবিতার মূলধন সাধক রামপ্রসাদের গান, বৈষ্ণব কবির পদ ও বাউল-সংগীত। অনেকগুলি কবিতায় হিংসাদ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভরা বর্তমান যুগ, সমাজ, সংসার ও বাস্তব জীবনের প্রতি কবির বিমুখতা এবং ভাবী জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবৎ-প্রেমের কবিতাগুলিতে ভাব-ব্যঞ্জনা ও রস-সান্দ্রতা না থাকিলেও কোমল হৃদয়ের আন্তরিকতা আছে। বইখানির নাম, প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ ইত্যাদি সুরুচিব্যঞ্জক।

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

পূজা-পার্বণ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। ১৭৮ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রবীণ গ্রন্থকার এই বইখানিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দোলযাত্রা, শারদোৎসব, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ পূজা-পার্বণের ঐতিহাসিক ও প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে ভক্তের হৃদয়ের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ব্যাহত তো হইবেই না বরং উহাদিগকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বলবত্তর করিবে। পূজাপার্বণ-সম্বন্ধে এই ধরনের গবেষণাত্মক বই বাংলায় বোধ করি প্রথম। হিন্দুর বিবিধ পূজা-পার্বণ, তাহার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক সংহতি এবং সাংসারিক বহুতর কল্যাণের সহিত কত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এই পুস্তকখানি পড়িলে তাঁহার পরিষ্কার ধারণা হয়। 'রাসযাত্রা'-অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থকার ঠিকই লিখিয়াছেন—"কতকালের কত কথা কত রূপে পুরাণে ও ধর্মকৃত্যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন আমরা আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের পদতলে বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছি। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান্ নপ্তা কে আছে?" দ্বিতীয়খণ্ডে ৯৩ পৃষ্ঠাব্যাপী 'দুর্গোৎসব'-সম্বন্ধীয় আলোচনা যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনই চিত্তাকর্ষক। শিক্ষিত বাঙালী-মাত্রকেই গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বাংলার পালপার্বণ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। ৪১ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আনা।

বইখানি 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার ৯৬তম অবদান। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"সংসারের বিবিধ সুখদুঃখের মধ্যে সুখদুঃখদাতা ভগবানকে স্মরণ করা, সংযম-অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য চিত্তকে সর্বপ্রকার প্রস্তুত করিয়া তোলা—ইহাই হইল উৎসবগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য আসল উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ বা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে; আড়ম্বর, নাচ-গান, সাজ-পোষাক, খানা-পিনা প্রভৃতি আজ অনেক ক্ষেত্রে উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।..... চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য নাই, চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি নাই, জাঁকজমকের সঙ্গে একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই জীবনের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্ত অন্যায়-অপরাধ চাপা পড়িবে এবং তাহাদের স্থান অধিকার করিবে অখণ্ড পুণ্যরাশি—এইরূপ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ যে পালপার্বণের অনুষ্ঠান করেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা বিকৃতি মাত্র। এই বিকৃতি দেখিয়া উৎসবের খাঁটি রূপের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সংগত নয়।"

বাংলার পালপার্বণের এই 'খাঁটিরূপ' মনীষী লেখক আলোচ্য স্বল্লায়তন পুস্তকখানিতে প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। আমাদের সংস্কৃতির উপর ক্রম-বর্ধমান গৌরববোধের দিনে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ভারতকথা (সহজ ভাষায় মহাভারতের কাহিনী)—চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী প্রণীত। প্রকাশক—আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯; রয়াল অক্টেভো, ২৬৫ পৃষ্ঠা; মূল্য আট টাকা।

মহাভারতের আখ্যানসমূহ অবলম্বন করিয়া শ্রীরাজগোপালাচারী তামিল-ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করেন। আলোচ্য বইটি উহারই বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করিয়াছেন ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপি শেষাদ্রি। ১০৭টি ভিন্ন ভিন্ন 'কথা' পুস্তক-

খানিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতের ধারাবাহিক কাহিনীর মুখ্য অংশ কোথাও বাদ পড়ে নাই। 'কথা'গুলির নির্বাচন ও প্রকাশ-ভঙ্গী প্রশংসনীয়। মহাভারতের ধর্ম ও নীতির তাৎপর্য-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে গ্রন্থকারের মন্তব্য আখ্যানগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। একজন অ-বাঙালী পণ্ডিতকৃত বাংলা অনুবাদ যে এত সুন্দর হইতে পারে দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। গ্রন্থের মুখবন্ধে অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন লিখিয়াছেন,—"চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী শুধু বর্তমান ভারতের একজন কৌশলী কূট-নীতিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা নহেন, সাহিত্য ও দর্শনে তাঁহার কিছু বলিবার অধিকারও যে আছে, তাঁহার রচিত একাধিক পুস্তকের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

'ভারতকথা' পড়িয়া আমরা প্রিয়রঞ্জন বাবুর এই উক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করি। বাঙালী পাঠক-পাঠিকা এই মূল্যবান গ্রন্থখানির উপযুক্ত সমাদর করিবেন আমাদের বিশ্বাস।

আমার কথা—লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী (গোবিন্দ মা)। প্রকাশক—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, ৫৯ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; ২৮৯ পৃষ্ঠা; মূল্যের উল্লেখ নাই, মন্দির ও আশ্রমের জন্য প্রণামী ৫৲ চাওয়া হইয়াছে।

সংসারের পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও আন্তরিক বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ও সাধন-আগ্রহ থাকিলে ধর্মজীবনের বিমল আনন্দ ও শান্তি অনুভব করা যে সম্ভবপর এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বইটির প্রথমপর্বে সাধিকা লেখিকার জীবনকথা এবং দ্বিতীয় পর্বে তাঁহার সহিত নানা ব্যক্তির ধর্মপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল, প্রকাশভঙ্গী সজীব।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্গাপূজা—বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মহোৎসাহে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যহই সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মঠে বহুসহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন ৫৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। অপর দুই দিবসে প্রায় ৫০০০ ব্যক্তিকে হাতে হাতে মায়ের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রহড়া (চব্বিশ পরগণা), আসানসোল, মেদিনীপুর, কাঁথি, মালদহ, ঢাকা, বরিশাল, বালিয়াটি (ঢাকা), কাশী অদ্বৈত আশ্রম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, শিলং, শেলা (খাসিয়া পাহাড়)—এই সকল কেন্দ্রেও প্রতিমায় সুচারুরূপে পূজানুষ্ঠানের খবর আমরা পাইয়াছি।

মাদ্রাজ মঠে ১৯২১ সালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ৩১ বৎসর পরে এইবার পুনরায় উহা উদ্‌যাপিত হইল। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র দক্ষিণদেশীয় হিন্দু নরনারী চার দিন পূজোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সাড়ে পাঁচহাজার ভক্ত এবং দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং প্রায় পনর হাজার নরনারীকে হাতে হাতে ফল ও মিষ্টান্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। পূজার কয়েক দিন ১০ জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সমস্বরে বেদগান অনুষ্ঠানের অভিনব অঙ্গ ছিল। অষ্টমী ও নবমীর অপরাহ্নে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দ এবং স্থানীয় কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্মাতা-সম্পর্কে ভাষণ দেন।

বম্বে আশ্রমে প্রতিমায় শারদীয়া পূজানুষ্ঠানের এইবার দ্বিতীয় বৎসর। স্থানীয় বাঙ্গালী বন্ধুগণ ব্যতীত আশ্রমের মারাঠী, গুজরাটি, পার্শী এবং অন্যান্য ভক্ত, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের মধ্যেও এই পূজায় প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়িগণকে আমরা বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সম্মেলন—গত ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ত্রি-চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সম্পন্ন

হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য কলিকাতা হইতে অধিকসংখ্যক গৃহস্থ সভ্য সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। মিশনের সেক্রেটারী মহারাজ তাঁহার কার্য-বিবরণীতে ভারত এবং ভারতের বাহিরে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের বহুমুখীন জনসেবার পরিচয় প্রদান করেন। দুইজন গৃহস্থ সভ্য মিশনের সেবাকার্য-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজের গভীর চিন্তা ও প্রেরণাপূর্ণ সুললিত ভাষণ উপস্থিত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সকল সভ্যগণেরই হৃদয়ে প্রভূত উদ্দীপনা আনয়ন করিয়াছিল।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রম—(২, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা—৯) কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণমিশন কর্তৃক পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলির মধ্যে প্রধান ও প্রাচীনতম এই বিদ্যার্থি-আশ্রমের (ষ্টুডেণ্টস্ হোম) ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের (১৯৫১ সাল) মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৭; তন্মধ্যে ২৬ জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ৯ জন আংশিক ও ১২ জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া আশ্রমে বাস করিয়াছে। মোট পচিশ জন ইণ্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সকলেই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। ৭ জন বি-এস্‌সি পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে দুই জন পাইয়াছে প্রথম শ্রেণীর ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অনার্স'। দুইজন 'ডিস্টিংশন' পাইয়াছে। বি-এ-উপাধিপ্রাপ্ত দুইজন বিদ্যার্থীর এক জন বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অনার্স' লাভ করিয়াছে। ১৬ জন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে ১৩ জন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিল। একটি ছাত্র সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে। আশ্রমের গৌরীপুর (দমদমের নিকট) স্থায়ী আবাস যুদ্ধের দরুন ১৯৪১ সালে গভর্নমেণ্ট-কর্তৃক দখল হওয়া অবধি ছাত্রাবাসটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার উপরোক্ত ঠিকানা ব্যতীত আশ্রমের একটি অংশ সোদপুরের একটি বাগান বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকটে প্রায় ১০৫ বিঘা জমি ভারত-সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। উহাতে আশ্রমের স্থায়ী আবাসের নির্মাণকার্য চলিতেছে।

উপাসনা, উৎসব, ধর্মগ্রন্থের ক্লাস প্রভৃতি দ্বারা আশ্রমবাসী বিদ্যার্থিগণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ পায়। তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য আশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে লাইব্রেরী, পাঠাগার, হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা (বিদ্যার্থী), রবিবাসরীয় আলোচনাসভা, সাময়িক বিতর্কসভা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদের কার্যকারিতা ও স্বাবলম্বন-শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রাক্তন ছাত্রদের আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ও সহযোগিতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫১ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আশ্রমের কার্যাবলী ধর্ম ও সংস্কৃতি, জনসেবা এবং শিক্ষা মুখ্যতঃ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত। শ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কগণের জন্মদিবস-পালন আশ্রমের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত। রবিবাসরীয় গীতালোচনা-সভায় উত্তরোত্তর শ্রোতৃসংখ্যা বাড়িতেছে।

বিশেষ অর্থসংস্থান না থাকা সত্ত্বেও আশ্রম-কর্তৃপক্ষ এই দুই বৎসর রোগীদিগকে ঔষধ এবং দুঃস্থ কয়েক জন ছাত্রকে অর্থ ও পুস্তক দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

আশ্রম-পরিচালিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৫১ সালে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬২৩। আশ্রমস্থ ছাত্রাবাসে এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ১৪ ও ৮ জন ছাত্র থাকিয়া পড়াশোনা করিয়াছে। আশ্রমের লাইব্রেরীতে ১৯৫১ সালে ১১৫৫ খানা পুস্তক ছিল। লাইব্রেরী-সংলগ্ন পাঠাগারে নিয়মিতভাবে কয়েকখানা দৈনিক ও সাময়িক পত্র রাখা হয়। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ইহার কার্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী—প্রসূতি-পরিচর্যা এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সন্তান-প্রসবের পূর্বে ও পরে সুদক্ষ চিকিৎসক ও সেবিকাগণ দ্বারা প্রসূতিগণের সম্ভাব্য

সর্বপ্রকার যত্ন নেওয়া হয়। এই প্রসূতি-সদনে ১৫০টি প্রসূতিশয্যা আছে। দরিদ্র প্রসূতিদের জন্য ৫০টি শয্যার অবৈতনিক ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে স্ত্রীরোগেরও চিকিৎসা হয়। ইহাতে প্রসবোত্তর কালে অন্ততঃ দুই বৎসর পর্যন্ত নবজাতকদিগের পরিচর্যা করা হয়। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলাগণ, বিশেষতঃ বিধবাগণ যাহাতে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন এই প্রতিষ্ঠান তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্রটি Bengal Nursing Council দ্বারা অনুমোদিত। ১৯৫১ সালে ৭ জন মহিলা সিনিয়র এবং ১২ জন মহিলা জুনিয়র ধাত্রীবিদ্যা কোর্সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানটির কার্য পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ-প্রকাশ করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন- আমরা এই জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫১ সালের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই বর্ষদ্বয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও বালকালয়ের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। মালয়স্থ মিশন-ইতিহাসের ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৮ই জুন, ১৯৫০ বালকালয়ের উদ্বোধন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিশনার জেনারেল মিঃ ম্যালকম্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বালকালয় পরিদর্শন করিয়া উহাকে যথার্থ শান্তিনিলয় বলিয়া অভিহিত করেন। ফিজি দ্বীপস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রানন্দ ও বম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সিঙ্গাপুর মিশনে আগমন করিয়া সারগর্ভ ভাষণ দ্বারা মিশনের কর্মিগণকে উৎসাহিত করেন। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। রামনবমী, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মিশন-পরিচালিত লাইব্রেরী ও পাঠাগার দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। বালকালয়ে ১৯৫০ সালে ৭৬টি এবং ১৯৫১ সালে ৮৩টি বালক ছিল। ১৯৫১ সালে বিবেকানন্দ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১৯। বিদ্যালয়টিতে ছয় জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। মিশন-পরিচালিত সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯৫১ সালের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩২। বালিকাগণকে সূচিশিল্পও শিক্ষা দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে বালকালয়ের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিশুগণ পড়াশোনা করে। এতদ্‌ব্যতীত মিশন একটি শিল্প-বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন। শিল্প-বিদ্যালয়ে বালকাশ্রমের বালক-গণ দর্জির কাজ, কাঠের কাজ, বয়ন ও খেলনা তৈরী করে। ১৯৫১ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১০।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী—১৯২১ সালে ইহা একটি ক্ষুদ্রপরিসর সেবায়তনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি রেঙ্গুন, তথা ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ হাসপাতালগুলির অন্যতম। আলোচ্য বৎসরে হাসপাতালটির অন্তর্বিভাগে নূতন একটি ওয়ার্ড যুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহাতে ১৩৫টি রোগিশয্যা আছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৪৪৮জন রোগী এই বিভাগে চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। হাস-পাতালের বহির্বিভাগে ৬টি বিভাগ আছে। ১৯২১ সালে এই বিভাগে ২,০৬,৪৪৭জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। Physiotherapy বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৫৯৭ জন। এই সেবাপ্রতিষ্ঠানে রেডিয়াম্-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। এই বৎসর ১৫২ জন ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। Clinical Laboratory এবং রঞ্জনরশ্মি-বিভাগও প্রতিষ্ঠানটির বিশিষ্ট অঙ্গ। আলোচ্যমান বর্ষে শেষোক্ত বিভাগে ১০৩৭ জন রোগী পরীক্ষিত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দ্বারা কম্পাউণ্ডারী শিক্ষাও দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে সেবাশ্রমের আয় ২৪৯,১৭০/৬ পাই এবং ব্যয় ২৬৪, ৪৫২।৴০ ছিল।

নব-প্রকাশিত পুস্তক

(১) **শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (২য় ভাগ)**—স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ৫০৪ পৃষ্ঠা; মূল্য পাঁচ টাকা।

ইহাতে স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই চারি জন সন্ন্যাসী শিষ্যের এবং ২৬ জন গৃহস্থ ভক্তের (পুরুষ ও স্ত্রী) জীবন-কথা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

(২) The Upanishads (Volume Two)—By Swami Nikhilananda Page 390. Price $ 4. 50. Published by Harper & Brothers, New York.

এই খণ্ডে শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন ও মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ইংরেজিতে অনূদিত। মন্ত্রগুলির শাঙ্করভাষ্যও ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে অনুবাদক-লিখিত Hindu Ethics-নামে একটি সারগর্ভ মননাত্মক আলোচনা প্রদত্ত।

বিবিধ সংবাদ

কবি রজনীকান্ত-স্মরণে—গত মাসে কলিকাতায় স্বদেশপ্রাণ ভক্তকবি রজনীকান্ত সেনের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কান্তকবির স্বদেশী গান এবং অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক ভজন সঙ্গীতগুলি বঙ্গভারতীতে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

কবির জন্মভূমি পাবনাতেও 'ভারতীভবনে'র উদ্যোগে ৩রা আশ্বিন স্মরণানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, কান্তকবির কবিতা ও সঙ্গীতে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন। সুস্থাবস্থায় ধর্ম-সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলা সহজ, কিন্তু রজনীকান্তের ন্যায় রোগযন্ত্রণা-ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানে অটুট বিশ্বাস কয় জন রাখিতে পারেন? এই সাধক কবি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া গাহিয়া ছিলেন:—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল ক'রেছে
গর্ব করিতে চূর
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করিতে দূর।
* * * *
বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর॥"

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের বৈদেশিক সফর—ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ প্রধানতঃ শিক্ষা ও সমাজগত এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তাঁহার সফরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ন্যায় ভারতীয় জীবনাদর্শের সুযোগ্য প্রতিনিধির এই বিদেশ ভ্রমণ ভারতের সহিত বিভিন্ন দেশের মনীষি বর্গের সাংস্কৃতিক যোগ পরিপুষ্ট করিতে প্রভূত সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর—গত ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই আশ্রমটি সাধ্যমত নরনারায়ণ সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। প্রতিষ্ঠান দ্বারা একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার ও ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। ১৯৫১ সালে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, এবং স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর প্রতি শনিবার শ্রীরাম নাম-সংকীর্তন ও রবিবারে উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পরলোকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গত ১৭ই আশ্বিন অক্লান্ত বঙ্গসাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে আমরা বিশেষ মর্মাহত। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২। তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' প্রকাশনে তাঁহার অপূর্ব সংকলন-নৈপুণ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস-রচিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস'-নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আমরা ব্রজেন্দ্র বাবুর লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতা

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্রীশ্রীমা

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ (কৃষ্ণা সপ্তমী) শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি। যে অসামান্য পবিত্রতা, চরিত্রবল, ত্যাগ-বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, করুণা, সেবা এবং সর্বোপরি বিশ্বাবগাহী উদার স্নিগ্ধ মাতৃত্ব তাঁহাকে ভক্তের হৃদয়ে 'ভগবতী'র আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল উহারাই ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শ। তাই তো ভারত চিরদিন নারীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে দেবীবুদ্ধিতে; নারী-মাতা, কন্যা, ভগিনী, কান্তা—কিন্তু সর্বত্রই নারী দেবী। নারীর এই শাশ্বত মহিমার অপমান ভারত সংস্কৃতির নিকট অসহ্য। ভারতের পুরাণে, ইতিহাসে, সাহিত্যে যুগে যুগে শত শত মহীয়সী রমণীর পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে - সেই পরিচয়ের নিবিড় ঐক্যসূত্র কিন্তু এক—নারীর দেবীত্ব। রূপযৌবনের গর্ব, ঐশ্বর্যবিভবের আড়ম্বর, নৃত্যগীত-কলা-নৈপুণ্য, অথবা কুটিল ছলনা ও ভেদ-নীতির চমৎকারিতা কোন ভারতীয় নারীর ইতিহাস-প্রখ্যাতির কারণ হয় নাই। ইতিহাস-সম্মানিতা ভারতরমণীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীভগবানের সাত্ত্বিক বিভূতি—"কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা"—"লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্তং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।"

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-সঙ্গিনী সারদা দেবীর ভিতর ভারতীয় নারীশক্তির মহিমাই অত্যুজ্জ্বলরূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার চরিত্র অনুধ্যান করিয়া আমরা ভারতের সামগ্রিক অভ্যুদয়ের জন্য একান্ত অপরিহার্য সেই নিদ্রিতা মহাশক্তিকেই জাগ্রত করিয়া তুলিব। বিবিধ-আদর্শ-বিক্ষুব্ধ ভোগলালসা, দম্ভ ও স্বার্থপরতার উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে মায়ের শুচিতা সংযম-সরলতা-আত্মত্যাগ-ভক্তি-সেবার মন্ত্র আমাদের প্রাণে আনিবে সত্য ও শান্তির সন্ধান।

অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা-সপ্তমীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করি।

মাতৃ-বন্দনা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্‌-এস্‌সি, বি-টি

একদা এ-যুগ পুণ্য উষায়
বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ কোলে,
শাখা প্রশাখায় বিহগ যখন
কলঝঙ্কার নিভৃতে তোলে।

যখন প্রাচীর-অঙ্ক রাঙিয়া
শৈলশিখরে নীরবে নমি,—
উদিল সূর্য আঁধার বিনাশি
বনপ্রান্তর নিভৃতে চুমি'।

তখন ধরায় আসিলে মা তুমি
মানবীর বেশে শৈলসুতা,
পৃথ্বীর ধূলি অঙ্গে মাখিয়া
মেলিলে প্রথম চোখের পাতা।

শিশুরূপে তুমি 'রামের' কুটিরে
হাসিয়া খেলিয়া গোপনে থাক,
'সারদা' নামের ছদ্ম নিচোলে
নিয়ত স্বরূপ ঢাকিয়া রাখ।

তবু ক্ষণে ক্ষণে সে দেবীমূর্তি
"স্বর্গ-সুষমা চকিতে আনি,
বিষাদখিন্ন জীর্ণ জীবনে
শুনাইয়া যায় আশার বাণী।

তবু তব ছায়ে 'শ্যামাসুন্দরী'
দিব্য দৃষ্টি চকিতে পায়,
জগৎশক্তি জগদ্ধাত্রী
দেখা দিয়ে তারে পুন লুকায়।

তারপর ধীরে অমোঘ বিধানে
যুগের সাধনাপূর্তি লাগি,
ডাক দিল তোমা যুগনিয়ামক—
সাধনাশ্রয় নিভৃতে মাগি।

কিশোর জীবনে ছেদ টানি দিয়া,
সে-ডাকে শ্রীমাতা বাহির হ'ল।
যেন দুর্গম গিরি-শির হতে
তটিনীর ধারা উৎসারিল।

তখনি কি মাতা জানিলে স্বরূপ,
বুঝিলে কি হেতু এসেছ ভবে?
গ্রহ, তারা, নভ, জীব চরাচব
বন্দনা কেন গাহিছে সবে?

তুমি মাগো বাক্‌ আদ্যাশক্তি
ভস্মাবৃতা অগ্নিশিখা,
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গিনী
মহেশের ভালে জ্যোতির টিকা।

চন্দ্রমা-কোলে আছে কলঙ্ক,
আছে মলিনতা গঙ্গাজলে;
নাহি কালিমার ক্ষীণতম রেখা
তোমার শুদ্ধ মানস-তলে।

দিন বয়ে যায়, বয়ে যায় রাতি,
দুর্নিরীক্ষ্য কালের স্রোতে;
বিরামবিহীন নিভৃত সাধনে—
তুমি ভেসে যাও তাহারি সাথে

'ষোড়শীপূজা'র হয় আয়োজন
দেব-নির্দেশে ঘটনাক্রমে,
সর্ব সিদ্ধি তাহে নিবেদিয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ মায়েরে নমে।

চকিতে খসিয়া পড়ে আবরণ,
প্রকাশিতা হ'ন জগন্মাতা,
প্রেমের যমুনা উছলে উজান
জ্ঞানালোকে দিশি দীপান্বিতা।

সরস্বতীর শ্বেতভুজারূপ
উগ্রা বগলা সংহারিণী;
মিশে আসি মা'র পুণ্যজীবনে—
সমন্বয়ের সূত্র চিনি।

লক্ষ্মীর রূপে সিদ্ধিদায়িকা,
সীতার রূপেতে বিরহক্ষমা,
মৈত্রেয়ীরূপে জ্ঞানপ্রদায়িনী,—
চিরকল্যাণী বিশ্বরমা।

এই মত রহি মাটির ধরায়
সপ্তষষ্টি বরষ মাতা,
প্রচারিলে নিজ জীবনভাষ্যে
শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব-কথা।

গৃহী যেই জন চলে সংসারে,
বন্ধনবোঝা লইয়া মাথে;
সন্ন্যাসী যে বা উদাসী জীবন
ঢাকিয়াছে দেহ গেরুয়া-সাজে,

জ্ঞানী হয়ে যেবা শ্রবণ-মনন
করিয়াছে সার সাধনাপথে,
ভক্ত, কর্মী, যোগী বা যাহারা—
সিদ্ধি মাগিছে বিরোধী মতে।

সবাই তাহারা প্রণমি চরণে
যুগপৎ পেল কাম্যফল,
গৃহে-সন্ন্যাসে মিলনসূত্র
ত্যাগের মন্ত্রে হ'ল উজল।

ক্ষমারূপে তুমি বিশ্ব-সাধিকা
ধৈর্য দেখালে ধরিত্রী-মত,
প্রেমকরুণার অমৃতপরশে
ধন্য করিলে জীবন শত।

জননি তোমার অভয়দীপ্তি -
করিছে সকলে শঙ্কাহারা
দিন-শেষে যবে নামিবে সন্ধ্যা
শিরে যেন পাই আশিসধারা।

" ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না সদসদ্ বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়।"

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীমা

(জীবন-আলেখ্য)

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

সারদা দেবী—"শ্রীমা" নামে পরবর্তী জীবনে যিনি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন—খনা, লীলাবতীর মত বিদুষী ছিলেন না, রাণী দুর্গাবতীর মত যুদ্ধে অশ্বচালনাও করেন নি; কিন্তু তাঁর ভগবৎপ্রেম, আত্মত্যাগ, চরিত্রের মাধুর্য, এই দেশের মেয়েদের মধ্যে তাঁকে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে।

"শ্রীমা"—এই একটি ক্ষুদ্র কথায় তাঁর স্নেহ, সেবাপরায়ণতা, ও পবিত্রতা যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমন তার কোন নামেই হয়তো হোত না। বস্তুতঃ তিনি সকলের কাছেই মাতৃরূপা ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর "শ্রীমা" বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা'র নাম শ্যামাসুন্দরী। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সামান্য অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। কয়েক বিঘা জমির ধান ও ক্রিয়া-কর্মে পৌরোহিত্য করে তিনি যা পেতেন তাইতেই তাঁর কোন রকমে জীবিকা-নির্বাহ হোতো। শ্রীমার আর চারিটী ভাই ছিলো। বাল্যকালে বাপমায়ের সর্বপ্রথম সন্তান হিসাবে ভাই-বোনগুলিকে দেখা শোনা করা ছাড়াও তাঁকে গৃহস্থালির কাজকর্মে মাকে সাহায্য করতে হোতো। এমন কি বর্ষার সময় জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য ঘাসও তাঁকে কাটতে হোতো। ছেলেবেলা হতেই ঠাকুর-দেবতায় তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং এই ভক্তিই পরবর্তী জীবনের ঘটনার জন্য অনেক পরিমাণে তাঁকে প্রস্তুত করেছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ৫ বছর ছয়মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত শ্রীমার বিবাহ হয়। তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে এই বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া কোনও অভাবনীয় ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স তখন ২৩ বৎসরেরও বেশী। বিবাহের অনুষ্ঠান খুব সামান্য ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল; কারণ দুপক্ষের অবস্থাই সচ্ছল ছিলো না। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈরাগ্য ও বিয়েয় অনাসক্তি দেখেই তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবী খুব অল্পকালের মধ্যেই এই বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের পর ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই বেশী দিন কাটে। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২।৪ বার কামারপুকুরে এসেছিলেন, জয়রামবাটীতেও ২।১বার গিয়েছিলেন কিন্তু সামান্য কয়দিনের বেশী শ্রীমার সঙ্গে তিনি থাকেন নি। শ্রীমার যখন ১৪ বছর বয়স, সেই সময়—কামারপুকুরে শ্রীমার সঙ্গে তিনি মাস তিনেক ছিলেন। এই সময়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাঁকে ঈশ্বর ও ধর্মজীবন-সম্বন্ধে শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবৎপ্রেম ও মনের পবিত্রতা সারদামণির বালিকা-মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। এর পরে প্রায় ৫ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। বাপের বাড়ীতেই তাঁর দিন কাটছিলো। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈরাগ্য ও ভাব-বিহ্বল অবস্থা এমন আকার ধারণ করছিলো

য সাধারণ লোক তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে করতো না। এই অখ্যাতি সুদূর পল্লীগ্রামে জয়রামবাটীতেও পৌছেছিলো। শ্রীমার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকেরা তাঁকে করুণার চক্ষে দেখতে লাগলো। এই অবস্থা শ্রীমার বেশী দিন সহ্য হোল না। কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন তাঁর স্বামী কি। অবশেষে গঙ্গাস্নান করবার ছলে কয়েকজন গ্রামের লোকের সঙ্গে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন স্বামীর কাছে। এর পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যতদিন বেঁচেছিলেন—ততদিন তাঁর ও তাঁর ভক্তদের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। এই সেবার মধ্যে কোন দৈহিক কামনার স্থান ছিলো না, কারণ শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছু দিন পরেই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে মাতৃভাবে ষোড়শী-পূজা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি ছিলেন মহামায়ার অংশ, জগজ্জননীর প্রতীক। সাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে এইরূপ অবস্থা সহজে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবান যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণীরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সাধারণ স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে, এবং তাঁর নির্দেশ-মত শ্রীমাও গভীর ধর্মজীবন আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর শিষ্যদের জন্য—দুবেলা রান্না ও আহার্য প্রস্তুত করার ভারও তাঁর উপর এসে পড়লো। এই সময় তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল, রাত তিনটায় উঠে গঙ্গাস্নান করে নহবৎ-খানায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরখানিতে বসে পূজা-জপাদি সেরে নিয়ে গৃহস্থালীর কাজ ও শাশুড়ীর সেবা শেষ করে রান্না আরম্ভ করা। খুব যত্নসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আহার্য প্রস্তুত করে তিনি তাঁর ঘরে তাঁকে খাওয়াতে যেতেন। শুধু দুবেলা আহারের সময় ব্যতীত স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোত না। কারণ সব সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে লোক থাকতো। তাঁর আহারের পর শাশুড়ী ও অন্যান্য অতিথিদের খাইয়ে শ্রীমার খেতে অনেক বেলা হয়ে যেতো, খাবার পর অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার তাঁকে রাত্রির জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করতে হোতো। শুধু সন্ধ্যারতির সময় তিনি পূজাদি করবার জন্য কিছু সময় করে নিতেন। এই রকম ভাবেই ১৪ বছর কাটলো; এর মধ্যে তিনি ১৩ বার জয়রামবাটীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সিংহবাহিনীর প্রসাদে স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তারপর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে শ্যাম-পুকুরের বাড়ীতে আনা হোলো। স্থানাভাবের জন্যে প্রথমতঃ সেখানে শ্রীমাকে আনা হয়নি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতিক্রমে শ্রীমা সেখানে গিয়ে তাঁর স্থান করে নিলেন। কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যখন স্থানান্তরিত করা হোলো, শ্রীমাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু শ্রীমা ও শিষ্যদের অক্লান্ত যত্ন ও সেবা সত্ত্বেও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসান ঘটলো। শ্রীমা খুব কাতর হয়ে পড়লেন, কিন্তু কথিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সময়ে তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর শোক নিবারণ করেন, এমন কি শ্রীমাকে তাঁর হাতের বালাও খুলতে দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দেহরক্ষার পর শ্রীমা কিছুদিন তীর্থপর্যটন করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়েছিলো; কিন্তু এর জন্য তিনি

কারো কাছে নালিশ জানান নি। অবশেষে তাঁর এই অবস্থার কথা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক জন ভক্ত শ্রীমার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং মাসিক কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পরেও তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁর সংসারের ভারও শ্রীমার উপর এসে পড়ে। রাধু নামে তাঁর মৃত এক ভ্রাতার এক মাত্র কন্যাকে শ্রীমাই লালন-পালন করেন, কারণ তাঁর ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব সাংসারিক গোলযোগ ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও ব্যাহত হয়নি। শেষ জীবনে তিনি কখনো কলিকাতা বাগবাজারে আবার কখনো জয়রামবাটীতেই অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে অনেক লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে আসতো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে কয়টি মন্ত্র তাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তি-বিশেষে সেই সব মন্ত্রের দীক্ষা দিতেন। তার সামান্য অর্থ থেকে এই সব অভ্যাগতদের আহারের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হোতো। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন কোন ভক্ত ২।১ দিন জয়রামবাটীতে থেকে যখন চলে আসতেন, তখন শ্রীমা বাইরে থেকে ছল ছল চোখে তাদের দিকে চেয়ে থাকতেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে অতিবাহিত করে ১৯২০ সালের ২০শে জুলাই প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শ্রীমার জীবন ঘটনা-বহুল নয়। কিন্তু নীরব আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন জগতের ইতিহাসে তা খুবই বিরল। এই রূপ সহধর্মিণী লাভ না করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন যে অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ হোতো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মায়ের আধ্যাত্মিক সহায়তার কথা স্বীকার করেছেন।*

* কলিকাতা আকাশবাণীর সৌজন্যে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

এক ভদ্রমহিলা তাঁর কোন পরিচিতেরা খুব বিপদগ্রস্ত হওয়ায় শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, এই সব কষ্ট কি ঠাকুর দেখতে পাচ্ছেন না? তিনি এর প্রতিকার করছেন না কেন? মা বললেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া কি কোন কর্ম হয়? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও পড়ে না। তাঁর ইচ্ছাতেই ত জীব-জগৎ চলছে। পেছনে চৈতন্য না থাকলে কি শুধু জড়ে কোন কাজ করতে পারে? মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে কি তাঁর জানাশুনাতেই এ সব কষ্ট? মা বললেন, মানুষ যখন অসৎ কর্ম করে, তখনকার কথা কি তার মনে থাকে? তিনি নিয়ম কোরে দিয়েছেন, এই কর্মের এই ফল—এই নিয়মেই এই সংসার চালাচ্ছেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে জীব এই কঠোর কর্মফলের পেষণ হতে অব্যাহতি পাবে কি করে? এর

ক্ষমা নেই? মা বললেন, ক্ষমা না থাকলে বেঁচে আছ কি কোরে, অনন্ত জীবনের কর্ম কি তুমি দেখতে পাও? তা হলে আর ও কথা বলতে না। অর্জুনই তাঁর অনন্ত জীবনের কর্ম জানেন না, তা আর সামান্য জীবের কা কথা! যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন ভাঙতেও পারেন। তা ছাড়া তিনি শুভ কর্মের প্রবৃত্তিও তো দিয়েছেন, শুভ কর্মের দ্বারা অশুভ কর্ম ক্ষীণ হয়। সদসৎ কর্মের স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, নইলে এ লীলা চলছে কি কোরে? কিন্তু মূল কলকাঠি তাঁর হাতে, কিন্তু এর মধ্যে একটু স্বাধীনতাও আবার দিয়ে রেখেছেন,—ভাল ও মন্দ দুই তোমার সামনে, এখন বেছে নাও—এইতে খেলা চলেছে। নইলে যদি কেউ কেবল পাপ করে, বা কেউ যদি কেবল পুণ্য করে, তা হলে খেলা চলে না। বুড়ী চায় না যে, সকলেই তাকে ছুঁয়ে ফেলে বা কেউ তাঁকে ছোঁয় না—তাতে খেলা চলে না। শাস্ত্রে অশুভ কর্মফলের কত রকম প্রতিকারের কথা লেখা আছে, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা—এ সবও ত তিনিই বিধান করেছেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ওসবের দ্বারা প্রতিকার ত সব সময় দেখা যায় না? মা বললেন, ঠিক্ ঠিক্ করলে প্রতিকার হবেই। প্রত্যেক কর্মের ফল হতে একটা সময়ের দরকার। আমের বোল হলেই কি তার পর দিন পাকা আম পাওয়া যায়? যাগ-যজ্ঞ করলেই কি তখনই স্বর্গ থেকে রথ নেমে আসে? বোল বলতেই কি হয়? সে বোলে ফল ফলতে একটা সময় লাগে, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক। তবে একটা কথা বলে রাখি, যদি ভাল-মন্দ সকল কর্মের হাত থেকে রেহাই পেতে চাও তা হলে ভগবানের নাম, জপ, পূজা, পাঠ কর; সব সময় সদসৎ বিচার কর। শুভ কর্ম অশুভ কর্মকে দাবিয়ে দেয়, জড় নষ্ট করতে পারে না। এক ভগবানের নামেই জীবের শুভাশুভ কর্মের নাশ হয়ে মন পরিষ্কার হয়; তখন ভেতরের সত্য বস্তু জানা যায়।

(দুই)

স্বামী ঈশানানন্দ

পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। ইতোমধ্যে একদিন সকালে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বেলা ৮টা হইবে। মা তাঁর ঘরে খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া চাদর মুড়ি দিয়া আমাকে বলিলেন, শরৎকে বলে রাখালকে শরতের ঘর থেকে ডেকে আন। আমি ঐ কথা পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়া বলায় (পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও মহারাজ গল্প করিতে ছিলেন) পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ আগে আগে আর আমি তাঁর পিছনে পিছনে মার নিকট আসিলাম। পিছন হইতে দেখিতেছি পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ শ্রীশ্রীমার যত নিকট হইতেছেন মহারাজের পা দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন, মা রাধি কেমন আছে? রাধিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই রাধি, কোথায়? ইত্যাদি। (জিহ্বা যেন শুকাইয়া আসিতেছে মনে হইল) মা মহারাজের দাড়ি ধরিয়া স্নেহচুম্বন করিয়া মাথায় ও বুকে হাত বুলাইয়া ধীরে ধীরে রাধুর অসুখের কথা বলিয়া মহারাজের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল ছেলেরা (সেবক সাধুরা) থাকেন তাঁহাদেরও কুশল-জিজ্ঞাসা করিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ সংক্ষেপে সকল উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। দেখিলাম, ইহারই মধ্যে মহারাজের সমস্ত শরীর ঘামিয়া

গিয়াছে। তাহার পর মা আমাকে যেমন যেমন বলিলেন, সেই ভাবে একটি রেকাবিতে কয়েকটি বিস্কুট, কমলা লেবু ও মিষ্টি সাজাইয়া মার হাতে দিলে মা উহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটু দেখাইয়া নিজে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমাকে বলিলেন, রাখালের হাতে দিয়ে এস। উহা পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট গিয়া (মহারাজ শরৎ মহারাজের খাটের উপর বসিয়া আছেন) মা প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া মহারাজের হাতে দিতেই শরৎ মহারাজ বলিলেন, দাদা, একাই সব মার প্রসাদ খাবেন? মহারাজ বলিলেন, শরৎ, তুমি তো রোজ মায়ের প্রসাদ খারচ, আবার এতেও ভাগ বসাবে? তা নাও, তুমি মায়ের দ্বারী। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিলেন, সেত আপনিই নিযুক্ত করেছেন দাদা। এই বলিয়া দুই জনেই মহা আনন্দ করিতে করিতে উহা খাইতে লাগিলেন, আমি পাশের কুঁজো হইতে দুই গেলাস জল দিয়া আসিলাম।

(তিন)

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীমা যেবার শেষ জয়রামবাটীতে ছিলেন (১৩২৬) সেবারকার কথা। তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ। ক্রমে তাঁহার শুভ জন্মতিথির দিন উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমা বেশী ঝঞ্ঝাট করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, ভক্ত ছেলেগুলি যারা আছে আর প্রসন্ন, কালীদের বাড়ীর সব বলে দাও। কালী মামা উপস্থিত ছিলেন; শুনিয়া বলিলেন: দিদি, বোষ্টম ভিখারী আছে। শ্রীশ্রীমা বলিলেন: থাম্, ঘরের বোষ্টম ভিখারী আগে সামলাই; তারপর তোর বোষ্টম ভিখারী হ'বে। শুভজন্মতিথি-পূজার দিন উপস্থিত। শ্রীশ্রীমা পূজনীয় শরৎ মহারাজের প্রেরিত নববস্ত্রখানি পরিধান করিয়া পূজা-সমাপনান্তে ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া বসিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন একে একে সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীমা সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন। ভোগ-সমাপন হইলে শ্রীশ্রীমা আহারে বসিয়া কিছু প্রসাদ দিলেন। উপস্থিত অনেকেই প্রসাদগ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বৈকাল বেলা পর্যন্ত অনেক মেয়ে ও পুরুষ পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ পাইলেন।

পূর্ব হইতেই সময় সময় দেখিতাম পাড়াপ্রতিবেশী ব্যক্তিদের শ্রীশ্রীমায়ের উপর ঈর্ষাবিদ্বেষের অন্ত নাই। কখনও কখনও তাহাদের বলিতে শুনিতাম, ইস্! সারদাঠাকুরাণীর কি কপালের জোর—কত শিষ্য, সেবক, টাকা, পয়সা, জিনিষ পত্র আসে! কেনরে বাপু, যদি বামুনের মেয়ে বলে দিস্, তবে আমরাও ত বামুনের মেয়ে আছি। মা কোন জিনিষ আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া, বাকী কিছু কিছু দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। অনেক দিন যাবৎ দেখিতেছি শ্রীশ্রীমা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সন্তানদের দীক্ষা দেন। কখনও কখনও তাহাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেন। এই সকল অজুহাতে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহার সামাজিক অর্থদণ্ড করিয়া সেই অর্থ গ্রামের বারোয়ারী ৺শীতলাপূজা উপলক্ষে যাত্রাগান ইত্যাদিতে ব্যয় করিত। শ্রীশ্রীমায়ের জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষে, অথবা মামাদের বাড়ীতে কোনও ক্রিয়াকর্ম হইলে গ্রামের কয়েক জন মাতব্বর ব্যক্তি নানা অজুহাতে ঐরূপ টাকা আদায় করিত। শ্রীশ্রীমা তাহাদের বলিতেন, তোদের টাকার দরকার হয় বল না টাকা দিচ্ছি; আমাকে এত বেগ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছিস্ কেন? আমি এই সব সহ্য ক'রে গেলাম, আমার ছেলেরা এই সহ্য করবে না। আমি তাহাদের এই সব ব্যবহার দেখিয়া বিশেষ

বিরক্তির সহিত উচ্চবাক্যে প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। মধ্যে মধ্যে ঐরূপ প্রকৃতির লোকদের—যত বয়স্কই হউক না—শাসন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, ওদের পশুর মত ব্যবহার। ওদের সঙ্গে লাগা—শক্তিক্ষয় করা; তবে ফোঁস্ করতে হবে বাবা, না হ'লে পেয়ে বস্‌বে।

* * *

শ্রীশ্রীমা সামান্য সামান্য জ্বরে শরীর খুব দুর্বল বোধ করিতেছেন। নানা প্রকার চিকিৎসা হইতে লাগিল এবং কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। ক্রমে ১২ই ফাল্গুন (১৩২৬) কলিকাতা-যাত্রার দিন স্থির হইল এবং সেই অনুযায়ী সকল বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আমোদরনদ-বাঁধের জন্য ডোঙ্গাতে পাল্কী লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করিয়া সিহড় ঘুরিয়া পাল্কী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। অন্যান্য মেয়েদের জন্য নদীর পরপারে গোগাড়ী প্রস্তুত, ডোঙ্গায় নদী পার হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইবেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে দুপুর বেলা আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। ওখানে আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা এবং অন্যান্য সকলে গোগাড়ীতে বিষ্ণুপুরের পথে কলিকাতা রওনা হইবেন—এই রূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট দিনে সকলেই যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিয়া কিছু জলযোগ-পূর্বক মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করা ফটোখানা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বাক্সটি বন্ধ করিলেন এবং একখানা কাপড় দিয়া বাক্সটি ঢাকিয়া আমাকে বলিলেন, এইটি তুমি নিয়ে চল। আমি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি। গ্রামে হাম্ হওয়ার জন্য গ্রামের মধ্যে পাল্কীতে উঠিবেন না বলিয়া পাল্কীটি সিহড়ের পথে আহের নামক জলাশয়ের পাড়ে রাখা হইয়াছে। রওনা হইবেন এমন সময় পূর্ব রাত্রির অবশিষ্ট ভাতগুলি, যাহা জলদেওয়া ছিল, একটি মেয়েকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, ভাতগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলি দিয়ে যাই। আমি বলিলাম, আমরা দিয়ে দিব, আপনাকে কষ্ট করিয়া দিতে হইবে না। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, না বাবা, আমিই দিয়ে যাব। ভাতগুলি মেয়েটিকে দিয়া পুকুরঘাটে হাত ধুইতে যাইয়া পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। একটু সামলাইয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, এখুনি পড়ে গেছলাম বাবা, শরীর খুব দুর্বল কিনা। বসিয়া সামান্য বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি বাক্সটি লইয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলাম। সামান্য পথ আসিয়া দেখা গেল, একটি শুভ্র শঙ্খচিল শ্রীশ্রীমায়ের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি দেখিয়া বলিলাম, মা, শুভ-যাত্রা, মাথার উপর শঙ্খচিল উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মা বলিলেন, হ্যাঁ, বাবা। (কে বলিবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত দিব্যধামে দিব্যমিলনের শুভযাত্রা কিনা ?) শ্রীশ্রীমা আহেরের নিকট উপস্থিত হইলে পাল্কীতে উঠিবার সময় জনৈক ব্রহ্মচারী একটি পাত্রে জল লইয়া গামলাতে পা ধোয়াইয়া মুছিয়া দিলে তিনি পাল্কীতে বসিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্সটি পাল্কীতে তুলিয়া দিলাম। ব্রহ্মচারীকে বলিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের এই পাধোয়া জল যত্ন করিয়া লইয়া যাও। আমি কিছু তফাৎ হইলেই শ্রীশ্রীমা ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, এই সব জায়গা মাড়িয়ে এলাম, গামলার জল ফেলে দাও। দুঃখের বিষয় ঐ ব্রহ্মচারী গামলার জল ফেলিয়া দিল। শ্রীশ্রীমায়ের পাল্কী চলিতে আরম্ভ করিয়া সিহড় গ্রামের ৺শান্তিনাথ শিবঠাকুরের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে মা পাল্কী হইতে নামিয়া

৺শিবঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। একটি টাকা দিয়া বলিলেন, মিষ্টি দিয়া শান্তিনাথকে পূজা দাও। তাহাই করা হইল। পূজান্তে কিছু কিছু প্রসাদ সমবেত সকলকে দেওয়া হইল। তাঁহার মাতুলসম্পর্কীয় এক জন ব্রাহ্মণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। জয়রামবাটী হইতে প্রায় দুই মাইল আসিয়া সিহড়-গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এল্যা নামক পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড় কোয়ালপাড়া যাইবার রাস্তায় পাল্কী উপস্থিত হইল। পাল্কী দাঁড় করাইয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, অনেকটা এসেছ, বেলা হয়েছে, ফিরে যাও। খাওয়া দাওয়া করগে। আমি পৌঁছে চিঠি দিব। আমি শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পাল্কী চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপা-করুণা স্মরণ করিতে করিতে এবং তাঁহার অসুস্থ শরীরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী জয়রামবাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

(চার)

শ্রী—

১৩২৬ সনের কার্তিক মাস (খৃঃ ১৯১৯)। ছুটি লইয়া কাশী যাইতেছি। পথে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া যাইব ইচ্ছা। কোয়ালপাড়া মঠের কাছে গরুর গাড়ী রাখিয়া জয়রামবাটী উপস্থিত হইলাম। মাকে দর্শন ও প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, কেমন আছেন? মা বলিলেন, বাবা, আর পারি না। এদিকে শরীর পড়ে গেছে, কিন্তু কাজ কেবলি বাড়ছে। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। দেখিলাম চলিবার সময় একখানি লাঠি হাতে লইতে হয়। বিকাল ৪টার সময় মাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া ৺কাশীধামে যাইবার জন্য বিদায়প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, সে কি! তুমি ঘরের ছেলে, ২।৪ দিন থাকবে না? আমি বলিলাম, কাশী থেকে ফিরবার সময় আবার আসবো, মা। আমাদের দেশের একজন বৃদ্ধ ভক্তের দেহরক্ষার কথায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আহা বুড়ো মারা গেল! ভক্তটি কি ভাবে সর্বভাবে নিঃস্পৃহ হইয়া শেষ সময়ে মা মা বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিলাম। মা শুনিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। চাকুরী ছাড়িয়া ত্যাগের জীবন যাপন করিবার ইচ্ছায় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, আর চাকুরীর কি দরকার? (যে কর্তব্যের জন্য সংসারে আটকাইয়াছিলাম তাহা সম্প্রতি শেষ হইয়াছিল) মা বলিলেন, বাবা, ঐ তো তোমার কাজ। (অর্থাৎ উপার্জন করা) বুঝিলাম, এখনও কর্তব্য বাকী আছে।

আমি বলিলাম, মা, টাকাপয়সা হাতে আসে, ভয় হয়। মা বলিলেন, না বাবা, তোমার ভয় নেই। আমি তাঁহাকে শ্রীপাদপদ্মদুখানি আমার মস্তকে দিতে প্রার্থনা করিলে করুণাময়ী চরণ-যুগল আমার মাথায় রাখিলেন। আমি আনন্দাভিভূত হইয়া শান্তহৃদয়ে ৺কাশী রওনা হইলাম।

মাসাধিক কাল পরে কাশী হইতে ফিরিয়া পুনরায় তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। তাঁহার জন্য কাশীর চমচম (শুনিয়াছিলাম মা উহা ভালবাসেন), কাশীর বাটি, মিছরি, পাঁপর, কয়েক রকমের আচার ও আমলকীর মোরব্বা লইয়া গিয়াছি। মা ঐ মিছরি একদিন ভিজাইতে-ছিলেন। বলিলেন, বেশ মিছরি, কিন্তু পাঁপরটা ভাল নয়।

সেবার শ্রীশ্রীমায়ের চরণছায়ায় ১০।১২ দিন বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দুদিন মায়ের জন্য বাজার করিতে কামারপুকুর ও কোতুলপুরের হাটে গিয়াছিলাম। পথে একটি বর্ধিষ্ণু লোকের

বাড়ী হইতে মায়ের জন্য কয়েকটি মোচা সংগ্রহ করিলাম। আমোদরের ধারে আসিয়া দেখি খেয়াওয়ালা চলিয়া গিয়াছে। অনেক হাঁকাহাঁকির পর লোকটি আসিল। ভোরে যাইবার সময় মাকে বলিয়া যাই নাই। পৌছিতেই তিনি বলিলেন, তোমাকে না দেখেই মনে করেছি তুমি বাজারে গিয়েছ। মায়ের জন্য কোনও কিছু সামান্য করিলেই মা যে দিব্য হাসি সহ আনন্দ-প্রকাশ করিতেন তাহার তুলনা নাই।

ঐ সময়ে আর একদিন তাঁহার কাছে চাকুরী ছাড়িবার কথা উঠাইলাম। ঐ দিনও বলিলেন, বাবা, তোমার এইই কাজ। ইহার পরে আরও দুই দিন ঐ প্রসঙ্গ উঠিয়াছে এবং ঐ একই উত্তর পাইয়াছি। শেষের দিন মা একটু জোরের সহিত বলিলেন, তুমি আর কি চাও? ঠাকুরকে ক্ষীর দিচ্ছ। এইই তোমার কাজ।

নিজের ভুলভ্রান্তি যতই থাকুক না কেন, মায়ের কৃপায় ঠাকুর যৎকিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ করিতেছেন এই আশ্বাসবাণীই প্রাণে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। মায়ের কাছে এই প্রার্থনা, মা, তোমার অহৈতুকী কৃপার স্মৃতিটুকু সব সময়ে যেন মনে জাগরিত থাকে।

একদিন ঐ সময়ে মাকে বলিয়াছিলাম, মা, ধ্যান হয় না। মা বলিলেন, না-ই বা হল, স্মরণমনন থাকলেই হবে। আমিও মাকে জানাইলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকাহিনী স্মরণমননের চেষ্টা করি। মা শুনিয়া বলিলেন, তাই ভাল। আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, নিজের ভাব গোপন করতে হয়। নারদ ছিলেন শাক্ত, কিন্তু তিনি হরিনাম করে বেড়াতেন ও বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিতেন।

রাস্তাঘাটে চলিবার সময় (ভ্রমণ-কালে) সন্ধ্যাদি যথাযথভাবে করা যায় না এই কথা মাকে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, স্মরণমনন থাকলেই হবে।

একদিন বৈকালে এক নাগা সাধু হাতী চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত। একটি ছোট হাতী কেহ তাঁহাকে দিয়াছেন। মা একটি বাটিতে কিছু চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন; মাথায় সিঁদুর পরাইয়া দিলেন। সাধুর ভোজনের জন্য আটা-চাউলের দাম বাবদ কিছু পয়সাও দেওয়া হইল।

কালী মামা ঐ সময় মাকে একটি পুরুষ পাচক রাখিতে বলেন ও ঐ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সম্ভবতঃ রন্ধনাদির খুব অসুবিধা চলিতেছিল; মা উহাতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। বলিলেন, আমি মেয়েছেলে নিয়ে থাকি, পুরুষ মানুষ কি করে থাকবে? আমার ছেলেরা যে থাকে ওরা ছেলে নয়, ওরা আমার মেয়ে। সেই সময় দুজন ব্রহ্মচারী মায়ের বাড়ীতে তাঁহার সেবাদির জন্য ছিলেন।

শিশুর মা

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

শিশু-ক্রোড়ে এক নারী, দাঁড়াল আসিয়া,
দেবীর আঙ্গিনাতলে, ভক্তিনত হিয়া।
শিশুরে রাখিয়া ভূমে, করি মায়ে নতি,
কহিল সে, "দেখ বাছা, মায়ের মুরতি।
কি সুন্দর রূপ মা'র, দেখ ভাল করে,
ঐ যে জগৎ-মাতা, সবার উপরে।"
শিশু পুনঃ মাতৃক্রোড়ে, উঠি ধীরে কয়,
"তুমি মোর মা যে শুধু, আর কেহ নয়।"

আদর্শ নারী সারদা দেবী

স্বামী পরমশিবানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ।" জগতে যত মহান ব্যক্তি এবং মহীয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু একমাত্র আদর্শ চরিত্রবলেই যে তাঁরা সে সব অতিক্রম করে জয়ডংকা বাজিয়ে চলে গেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এক-একটি আদর্শ-চরিত্র মানব কিরূপে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে স্বীয় চরিত্রদ্বারা প্রভাবান্বিত করে তাদের জীবনগতিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন তার নিদর্শনও সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্মনীতি কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। একটি জাতি যার শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে এবং সুযোগ বুঝে শক্তিশালী অপর জাতিরা তাকে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে, সেখানেও হয়ত এমন একটি শক্তিমান ও চরিত্রবান পুরুষের আবির্ভাব হলো, যাঁর প্রভাবে ঐ পদানত নিপীড়িত জাতি আবার জগতের দরবারে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াল! যে জাতির মধ্যে শক্তিমান, স্বার্থত্যাগী, সংযমী ও সত্যনিষ্ঠ আদর্শ পুরুষ ও নারীর অভাব সে জাতি মৃত। ঐরূপ আদর্শ-চরিত্র নরনারীর অভাবেই মানবসমাজে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও অসত্যের সিংহাসন হয়ে পড়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। পুঁথিগত উচ্চ উচ্চ দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মাদর্শ তখন মানুষের কোন কাজেই আসে না। সুতরাং জাতিকে বড় হতে হলে, উন্নত হতে হলে চাই আদর্শ কতকগুলি জীবন—যাঁদের মধ্যে থাকবে না কোন রূপ ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশ, চরিত্র হবে যাঁদের একেবারে নিষ্কলংক, সংযম এবং সত্যনিষ্ঠাই হবে যাঁদের চরিত্রের মূল ভিত্তি। এতে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রীপুরুষ, ছোট-বড় ভেদ নেই। যিনিই উক্ত আদর্শে স্বীয় জীবন গঠন করতে পারবেন তিনিই হবেন সমাজের পথপ্রদর্শক এবং জাতির আদর্শস্থানীয়।

দেবী সারদামণির জীবন আলোচনা করলে আমাদের সন্দেহ থাকে না যে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা, আভিজাত্য, সাংসারিক বিভব প্রভৃতি না থাকলেও এই একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীরমণীর ভিতর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল যা ভারতের নারীজাতির কাছে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে গেছে। তাঁর জীবনের প্রভাব গভীর এবং দূরপ্রসারী। উহা দেশের নারীসমাজে একটি ক্রমবর্ধমান শক্তিবিশেষ একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না। ছোটবেলায় ভাইদের সাথে পাঠশালায় গিয়ে তাঁর মাত্র বর্ণজ্ঞান লাভ ঘটেছিল। রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানগুলির সহিত বিশেষ পরিচিতা হয়েছিলেন। অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে হলে কি হবে; সরলতা ছিল তাঁর অকৃত্রিম এবং উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল বড়ই প্রখর।

সারদামণির পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয়ই ছিল দরিদ্র। ছোটবেলা থেকে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হলেও এক মুহূর্তের

জন্যও কখনো তাঁকে অর্থের জন্য লোভ করতে দেখা যায় নি। বরং আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তিনি ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেও সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মাড়োয়ারী ভক্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দশহাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে হাজির, আর পরমহংসদেব ঐ টাকা নিতে অস্বীকার করাতে যখন সারদামণিকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করে পাঠানো হোল, তখন মায়ের জবাব সত্যই অনুপম—"টাকাটা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলেও ওঁরই (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নেওয়া হোল। কেননা ঐ টাকা আমি নিয়ে কি করবো, ওঁরই সেবাতেইত লাগাবো? ত্যাগী সাধু বলে ওঁকে সকলে মান্য করে; সুতরাং এ অবস্থায় কিছুতেই আমি এই টাকা গ্রহণ করতে পারি না।" আজন্ম দারিদ্র্য-ক্লিষ্টা মহিলা—যাঁকে অর্থাভাবে কতবার সুদূর জয়রামবাটী হতে বহু কষ্ট স্বীকার করে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসতে হচ্ছে তাঁর পক্ষে এই অযাচিত অর্থকে উপেক্ষা করা কতবড় কঠোর সংযম ও নির্লোভের পরিচয়!

সারদামণি বিখ্যাত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী হয়েও স্বীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে সতত সতর্ক ছিলেন। পতিসেবা, গুরুজনের যথোচিত যত্ন লওয়া এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী এবং অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ানো প্রভৃতি কাজে কখনও তাঁকে ক্লান্তি বা বিরক্তিবোধ করতে দেখা যায়নি। দক্ষিণেশ্বরে নহবত-খানার যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বহুদিন কাটিয়েছেন সেটি একটি পায়রার খোপ বললেই চলে। অথচ কর্তব্যবোধ তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল বলেই ঐরূপ শত শত দুঃখকষ্টকেও তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। এমন কি যখন তিনি বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের জননীরূপে অনায়াসে সুখে জীবন যাপন করবার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন তখনও তাঁকে পূর্ববৎ কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত করা যায় নি। নিজ গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি তাঁর ছিল না সত্য, কিন্তু ভাইদের এবং স্বামীর এই দুই বিরাট সংসারের সকল প্রকার হাংগামাই তাঁকে পোহাতে হতো। বিধবা পাগল ভ্রাতৃজায়া, পিতৃহীনা ভাইঝি এবং এই দুই পরিবারের অন্যান্যের জন্য তাঁকে কি-ই না করতে হয়েছে! এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর কত শত আবদারই না তিনি রক্ষা করেছেন। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুরে থাকাকালীন নিজ হস্তে রান্না করে খাইয়ে দিনের পর দিন ভক্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন। এমন কি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত নিজহস্তে পরিষ্কার করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এ জন্য অনেক সময় তাঁকে তিরস্কৃতও হতে হয়েছে। কিন্তু নির্বিবাদে এসব সহ্য করে মায়ের মত তিনি সকল ভক্ত সন্তান-সন্ততির সেবা ও যত্ন করে গেছেন।

একদিকে তিনি যেমন ছিলেন ধর্মভাবের মূর্তপ্রতীক—কত শত সংসারতাপদগ্ধ নরনারী তাঁর পবিত্র জীবনস্পর্শে তাপিত প্রাণ শীতল করেছে তার ইয়ত্তা নেই, অপরদিকে তিনি ছিলেন অক্লান্ত সেবাময়ী। দেশের লোকের দুঃখকষ্ট তাঁকে বড়ই পীড়া দিত। একবার জয়রামবাটীতে কলকাতা থেকে কতকগুলি ভাল আম পাঠানো হয়। ঐ আম পেয়ে প্রথমে সারদামণি দেবী রেলগাড়ীর সুখ্যাতি করেন। ইহা শ্রবণে জনৈক ভক্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিজ্ঞানের সাহায্যে এদেশে কত কি করেছেন বলতে গিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সারদামণি মনোযোগ দিয়ে সব শুনে এই বলে তাঁর নিজ অভিমত প্রকাশ করলেন—সবই হয়েছে

সত্য, কিন্তু অন্ন এবং বস্ত্রাভাবে লোকের কি কষ্টই না হচ্চে! এতে অন্নবস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা কোথায়? আগে তো এত অন্নকষ্ট লোকের ছিল না। সারদামণিদেবীর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ঘটে নি সত্য, কিন্তু তথা ভারতের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়বিধ জ্ঞানের অধিকারিণী হন তদ্বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। তখনকার দিনে মেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর রীতি ছিল না। সারদামণি তাঁর বহু স্ত্রীভক্তকে বলে তাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে তিনি ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীগণকে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রেরণা দিয়ে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ৩৪ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সহিত যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে এই মঠ ও মিশনের সুপ্রতিষ্ঠা ও প্রসার-লাভের পিছনে এই মহীয়সী মহিলার দান কত। মা যেমন তাদের যত্ন এবং স্তন্যদান করে তাঁর শিশুসন্তানকে ধীরে ধীরে বড় করিয়া তুলেন তেমনি ধাবা সারদামণি ও সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই শিশু শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে স্নেহ-ভালবাসার ভিতর দিয়ে গড়ে নিয়ে বিশ্বদরবারে হাজির করেছেন।

একবার একটি সুন্দর ছাঁচ তৈরী করে নিতে পারলে যেমন ঐ ছাঁচে ঢেলে বহু সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করা যায় এক একটি আদর্শ চরিত্রও তদ্রূপ এক একটি ছাঁচ। এই মহীয়সী মহিলা যে আদর্শ জীবন আমাদের সম্মুখে রেখে গেছেন সেই আদর্শে যদি ভারতীয় মহিলাগণ তাঁদের জীবনকে তৈরী করবার প্রযত্ন করেন তবেই সারদামণি দেবীর প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

মাতৃতীর্থ

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

বীততৃষ্ণ মানুষ যখন পরমলাভের নূতন তৃষ্ণায় বেরিয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, সে তীর্থযাত্রার শেষ হয় এসে মহাপুরুষের জীবনতীর্থে। মহাপুরুষের কৃপাধারায় মুক্তিস্নান করে নিভে যায় হৃদয়ের সব জ্বালা; মিটে যায় মনের সব দ্বন্দ্ব। দেহ চলে যায়, কারণ মহাপুরুষের দেহও অমর নয়। কিন্তু থাকে জীবন। জীবনতীর্থ থেকে যায় যুগ থেকে যুগান্তে।

কিন্তু জীবনতীর্থের মধ্যেও সারতীর্থ আছে। এ জগতে সকলের চাইতে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক সম্বন্ধ সন্তানের সংগে মায়ের; সকলের চাইতে নিষ্পাপ জীবন মাতৃজীবন; আর সকলের চাইতে শুচি সুন্দর ভাব মাতৃভাব বা মাতৃত্ব। শ্রীশ্রীমার জীবন সেই অপার মহিমান্বিত মাতৃতীর্থ।

ম্যাডোনার কোলে শিশু যীশু বা মা যশোদার কোলে বালক কৃষ্ণ—মা যশোদার স্তনক্ষরিত গোপালের মুখ থেকে উপচে পড়া দুগ্ধধারা বাৎসল্যপ্রেমের শাশ্বত মিলনভূমি। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের স্তনক্ষরিত বাৎসল্যস্নেহধারা প্রবাহিত হয়েছে নিখিল মানবজাতিরূপ শিশুর মুখে, বুকে। এ দৃশ্যের স্থূল ছবি তুলি ও রঙের ছোঁয়ায় পটে আঁকা যায় না—এ

দৃশ্য শুদ্ধমনে ধ্যাননয়নে দেখা যায়, অনুভব করা যায়। জগতের সমস্ত মাতৃত্বের একীভূত মূর্তি শ্রীশ্রীমা।

শুধু মানবজাতি নয়, মায়ের এই স্নেহধারা উৎসারিত হয়েছিল জগতের প্রতিটি জীবের জন্যে। একটা ডেয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে, রাধু তাকে মারতে যাচ্ছে—মা তাকে দিচ্ছেন বাধা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুগ্ধবঞ্চিত গোশিশু তুলেছে করুণ হাম্বারব। মা বলছেন, 'যাই মা, যাই'—আর ছুটলেন দিগ্‌বিদিগ-জ্ঞানশূন্য হয়ে খুলে দিলেন তাদের রজ্জু। 'তিনি যে মা! শরণাগত সন্তানের কণামাত্র সত্যিকার আকর্ষণে তিনি কি সাড়া না দিয়ে পারেন! আর খুলে কি না দিয়ে পারেন তার বন্ধনরজ্জু! সমস্ত মায়ের অন্তরে তিনি যে মা-রূপে জেগে রয়েছেন!

কিন্তু, যিনিই 'মহতো মহীয়ান্' তিনিই আবার 'অণোরণীয়ান্'। যিনিই জগন্মাতা, যাঁর কণামাত্র স্পর্শে জগতের সকল মায়ের মাতৃত্ব, তিনিই এসেছেন সাধারণ মানবী হয়ে। সাধারণ মানবী মায়ের মত আনন্দে হাসছেন, দুঃখে কাঁদছেন, কখনও বকছেন আবার আদরও করছেন কখনও। সাধারণ বাঙালী বধূর মত স্বামিসেবা করেছেন, স্বামিচিন্তায় চিন্তিতা হয়েছেন, স্বামিদর্শনের জন্য ব্যাকুলা হয়েছেন।

কিন্তু মায়ের এই সাধারণত্বের পেছনেও লুকিয়ে আছে অসাধারণত্বের ছাপ, যেমন ভস্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আগুন। মায়ের ঐ সাধারণত্বও যেন একটা বর্ম, আত্মরক্ষার রক্ষাকবচ। যদি অসাধারণত্ব দেখতে চাই তাহলে আর একবার স্নান করে নিতে হবে তাঁর জীবনতীর্থে।

মায়ের জীবন যেন একটি অনাঘ্রাত নিষ্কলঙ্ক সূর্যমুখী ফুল। বোঁটা রয়েছে গাছের সাথে, কিন্তু দলগুলি মেলে চেয়ে আছে আকাশের সূর্যের দিকে। ঠাকুর তাঁর জীবনদেবতা, তাঁর ইষ্টদেব, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাঁর স্বামী। জীবনে মরণে তাঁর সেবা, তাঁর ধ্যান, তাঁর চিন্তা—নারীর এর চাইতে বড় আদর্শ আর কী আছে? এই ধ্যান তিনি সমস্ত জীবন 'ঘড়ির কাঁটা'র মত করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানার অন্ধকূপের মধ্যে এক হাতে করেছেন রান্না, স্বামী ও ভক্তসেবার আয়োজন, আর একহাতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন অন্তরের পূজার প্রদীপ। ঠাকুরের কণ্ঠনিঃসৃত প্রতিটি কথা, প্রতিটি গানের কলি মালার মত গাথা হয়ে গেছে তাঁর অন্তরে। হয়ত দিনের মধ্যে একবার কি দুবার দেখা—কিন্তু তাতে কী এসে যায়? 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রহিয়াছে' যে! এই অভিনব স্বামিসঙ্গ নিশ্চয়ই খুব সাধারণ নয়। কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তিনিও ত সাধারণ বাঙালী বধূর মত স্বামীর অসুখের কথা শুনে স্বামিদর্শনে গিয়েছেন, স্বামীর সেবা করেছেন, এতে অসাধারণত্ব কোথায়?

সাধারণ বাঙ্গালী কুলবধূর মত তিনি সংসারের সকল কাজ করতেন সত্য, কিন্তু সে কাজ করতেন পূজার দৃষ্টিতে। কাজমাত্রেই পূজা যখন অনুভূতিতে সত্য হয়ে ওঠে তখন ঠাকুরপূজা ও কুটনোকোটা দুইই সমান হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমাও তেমনি সব সাধারণ কাজের মধ্যেও করতেন পরমসুন্দরের ধ্যান, তাই প্রতিটি কাজ তাঁর হয়ে উঠত পূজার ফুলের মত শুচিসুন্দর। যে শিল্পী সে দেখবে মায়ের জীবনটি যেন একটি ছবি! প্রতিটি কাজ এক একটি তুলির স্পর্শ! যে কবি সে মনে করবে—

যুগে যুগে কত কবি কত ছন্দে গাঁথি
বিচিত্র কবিতা কত করেছে রচনা।
আর তুমি, তুমি বিশ্বমাতা
পলে পলে গড়িয়াছ একখানি জীবনকবিতা।

নারীর সত্যিকারের যা ভূষণ—স্নেহপ্রেম, নম্রতা, লজ্জা—সেই সব ভূষণেই বিভূষিতা ছিলেন মা। মাতা চন্দ্রমণি যে বলেছিলেন—গদাই তোমাকে কত অলংকারে ভূষিতা করবে—এক অর্থে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসির মত শ্রীশ্রীঠাকুরের কিরণস্পর্শে বিকশিত হয়েছিল মায়ের চিত্ত-শতদল। উপদেশ ত চিরকাল রয়েছে, থাকবেও। কিন্তু উপদেশ যদি মূর্তিলাভ করে কারও জীবনে—তা হলেই তার সার্থকতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু উপদেশকে মূর্তি দিয়েছিলেন মা—তাই শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের থেকে অভিন্ন করে না দেখলে খুব অল্পই দেখা হয়। কিন্তু এই উপদেশকে মূর্তি দেওয়ার জন্য খুব বড় কোন কাজ করেননি তিনি; জীবনের প্রতিটি ছোট ছোট কাজ, কথা, ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার রূপায়ণ। তাই সাধারণের চোখে এ প্রতিভাত হবার কথা নয়; আর অশুদ্ধ মনে তা প্রতিভাত হয়ও না।

মায়ের চরম অসাধারণত্ব তাঁর মাতৃত্বে—এখানে তিনি অনন্যা। 'আমি পাতান মা নই, কথার কথা মা নই—আমি সত্যিকারের মা'—নব্যযুগ কান পেতে শুনল এ কথা। ভাববে 'আর কেউ না থাক আমার একজন মা আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই মাতৃতীর্থের উদ্বোধন করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মৌলিকতা দেখাতে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন এ কথা। নূতন যুগ—নূতন হাওয়া আসছে—নারীপ্রগতির যুগ, বিলাসব্যসনের যুগ, যন্ত্রযুগ। প্রগতিকে অস্বীকার করে লাভ নেই। গাছে পুরানো পাতা ঝরবে, নূতন পাতা গজাবে সবুজের আশ্বাস নিয়ে। কিন্তু তাই বলে গাছের মূল কাটা মূর্খতা। ভারতীয় সভ্যতার কতগুলি মূল জিনিষ রয়েছে। সে গুলি বাদ দিলে হাজার প্রগতির কথা বলেও জাতি মরে যাবে। মূল ঠিক রাখ, তারপর ডালে পাতায় বাড়িয়ে তুলে সূর্যমুখীর ফুল ফোটাও। ভারতীয় নারী-সভ্যতার মূল আদর্শকে অবলম্বন করে এই নবযুগে আমাদের আবার উঠতে হবে। দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধনা সেই নূতন সম্ভাবনার সূচনা। ষোড়শীপূজার মধ্যে সেই নারীপ্রগতিরই ইশারা। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—ভারতবর্ষেই সে কথা উচ্চারিত হয়েছে। বৈদিক নারী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন—একথা ইতিহাসের। গার্গী মৈত্রেয়ী তার প্রমাণ। সমাজে সমান আসনই পেয়েছেন তাঁরা। নবযুগে আবার ত তার পুনরুদ্বোধন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন নীরবে সেই উদ্বোধন—শ্রীশ্রীমাও নীরবে গঠন করেছেন তাঁর জীবনতীর্থ। সে তীর্থে অনেক ঘাট। একঘাটে তিনি মৈত্রেয়ী—নিমীলিত নয়নে যুক্তকরে তিনি বলছেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌'। সেখানে তিনি ব্রহ্মবাদিনী,—'আমার মাঝেও যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্দী ডোমের মাঝেও তিনি'। সেখানে তিনি ধ্যানস্থা, দেহ-জ্ঞান নেই—'গা থেকে আঁচল খসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই।' সেখানে নিজের ভেতরে সবাইকে, সবার ভেতরে নিজেকে দেখছেন!

আর এক ঘাটে চল, সেখানে তিনি সীতা সাবিত্রী, কর্মনিষ্ঠা, সেবিকা, প্রেমিকা—স্বামীই যাঁর ধ্যান, যাঁর জ্ঞান, চিন্তা, যাঁর কথা। স্বামীর সংগে সেখানে তিনি চলে যেতে পারেন বন থেকে বনান্তরে, অথবা যমের সদনে। অলংকার নেই, সাজ নেই, শয্যা নেই। অলংকার তাঁর সতীত্ব, তাঁর নিরহঙ্কার, তাঁর নম্রতা তাঁর লজ্জা। জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলছেন, 'তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'

আর একঘাটে চল, সেখানে দেখবে তাঁর নিরুপমা মাতৃমূর্তি—সন্তানের জন্য রাঁধছেন, দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দুধ সংগ্রহ করে আনছেন, এঁটো পরিষ্কার করছেন, কাউকে আবার খাইয়ে দিচ্ছেন—এমনি কত! মায়ের অবিরত স্নেহধারা বেয়ে পড়ছে ; নয়ন থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, সন্তানের দুঃখে, সন্তানের শুভকামনায়।

এমনি আরও কত ঘাট।

মায়ের মুখনিঃসৃত কথা কিছু কিছু লিখিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তাঁর অগণিত সন্তানের মনঃপটে আঁকা, যা প্রকাশিত হয়নি বা হবে না। Carlyle এক জায়গায় লিখেছিলেন, "Advice can profit but little for the reason that it is so seldom and can almost never be rightly given." কিন্তু মায়ের কথা পড়লে মনে হয় এ যেন কত ঘরোয়া, কত প্রাণের কথা! এর ভেতরে নেই উপদেশ দেওয়ার মানসিক দূরত্ব। যে কথা শুনবার জন্য মন তৃষিত এ যেন সেই কথা। দু-একটি ঘরোয়া কথার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সারতম সত্যের ইঙ্গিত তিনি পারতেন দিতে। একটি কথায় পরিবর্তিত হয়ে যেত এক একটি মানুষের জীবন। উপদেশ বাদ দিলেও তাঁর অপার্থিব ভালবাসার বারিসিঞ্চনে অনেক শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয়েছে।

মায়ের জীবনী ও উপদেশ ভবিষ্যতে হয়ত অনেক আলোচনা হবে। নব্যযুগের নারী হয়ত তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে প্রগতির পথে অগ্রসর হবে, নিজেদের জীবনকে করে তুলবে মহনীয়, পূজনীয়। আর যদি তা নাও হয় তাহলেও থাকবে তাঁর জীবনতীর্থ, সেখানে যুগে যুগে চলবে অনেক তীর্থযাত্রীর আনাগোনা। কেউ যাবে ভুল করে, কেউ যাবে বেড়াতে, কেউ যাবে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, আবার কেউ বা যাবে দুফোঁটা মুক্তোর মত চোখের জল নিয়ে। কেউ ব্যর্থ হবে না, সবারই থলে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

বীততৃষ্ণ মানুষ, সর্বহারা মানুষ জানবে তার আর কেউ না থাকেন আছেন একজন মা। মায়ের পায়ে মাথা রেখে আমরাও যেন বলতে পারি তুমি-ই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ তীর্থ। বলতে পারি—

'Mother, my eternal pilgrimage !"

মায়ের কুটীর—জয়রামবাটী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

চির-আশ্রয় মায়ের কুটীরে দেখেছি আমার মা'কে,
স্নেহ ও করুণা স্ফুরিত-অধরে সন্তানে আজো ডাকে।
হৃদয়ে আবেগ, আকুলিত মন,
গভীর মায়ায় ভরা দু'নয়ন,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে পথ পানে চেয়ে—মা আমার আজো থাকে!

দুইটি সেবার হস্ত বাড়ায়ে মা আমার আজো আছে,
সন্তান ছাড়া থাকিতে পারে না—তাই যে ডাকিছে কাছে।
শত অপরাধে সীমাহীন ক্ষমা,
বক্ষের মাঝে হ'য়ে আছে জমা,
স্নেহের দৃষ্টি সদা জাগ্রত সকলের পাছে পাছে!

প্রাচী-দিগন্তে ওঠে যবে রবি রক্ত-অরুণ-রাগে,
স্নিগ্ধ ও শুচি মায়ের আননে তাহারি ছোঁয়াচ্ লাগে।
ওঠে যবে চাঁদ গগন-সীমায়,
পথ-প্রান্তর ভরে জোছনায়,
মমতা-উছল মায়ের হৃদয় দিকে দিকে যেন জাগে।

আকাশ ত' নয়—ও যেন মায়ের সজাগ মধুর আঁখি,
সারাটি ভুবন ভ'রে আছে সেই দৃষ্টি-প্রসাদ মাখি'।
বায়ুর বীজনে প্রাণেব পরশ,
করিছে নিখিল মধুব সরস,
এখানে পুলক-স্রোত ব'য়ে যায় কাননে ডাকিলে পাখী।

তরু-ছায়াতল, তড়াগের জল, মেঠো পথ আঁকা বাকা,
ফুল-উপবন, আম্র-কানন, ছবির মতন আঁকা!
সবি আছে মা'র স্বরূপ বহিয়া,
প্রাণে আনন্দ দিতেছে আনিয়া,
মা আছে তাই ত' সবি সুন্দর—না হ'লে সবি যে ফাঁকা!

বেদনা-ব্যথিত, দুঃখ-পীড়িত কে আছিস্ ছুটে আয়!
নিবিড় শান্তি হেথা ভরে আছে মায়ের আঙ্গিনায়!
মা আমার দেখ্ দুঃখ-হারিণী,
কল্যাণময়ী বিঘ্ন-বারিণী,
হেথা অশরণ পাবিরে শরণ মায়ের অভয় পায়!

"মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।"

—শ্রীশ্রীমা

কথাপ্রসঙ্গে

বর্তমান মাসের শেষাশেষি ভগিনী নিবেদিতা-কর্তৃক স্থাপিত নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে। এই স্মারক উৎসবটিকে আমরা কলিকাতা শহরের শত শত বালিকা বিদ্যালয়েরই একটির নির্দিষ্ট পরিধিতে সীমাবদ্ধ অনুরাগি-গোষ্ঠীর সাময়িক একটি সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র বলিয়া যেন মনে না করি।

ভগিনী নিবেদিতার অবদান শুধু এই বিদ্যালয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সত্য, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি ভারতীয় নারীশিক্ষার আদর্শের কালোপযোগী একটি বাস্তব রূপ দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নিকটেই। স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, ভারতের নারীশক্তির জাগরণ না হইলে ভারতীয় জাতির উন্নতির আশা নাই। ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শের মুখ্য বিষয়গুলিকে অব্যাহত রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচিতি কি ভাবে আমাদের দেশের মেয়েদের নিকট উপস্থাপিত করা যায়, ইহা প্রকৃতই একটি কঠিন সমস্যা ছিল। উহার সমাধানের দিগ্‌দর্শন স্বামিজী তাঁহার মানস-কন্যা নিবেদিতাকে দিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎকালীন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা শহরের উপান্তে ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসিয়া ভগিনী গুরুনির্দিষ্ট ইঙ্গিতগুলিকে স্বকীয় মনীষা ও কর্মশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে বৎসরের পর বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গেলেন তাহা ভারতনারীর অভ্যুত্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

কিন্তু অসামান্য শক্তিশালিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ বৎসরের কর্মজীবন শুধু এদেশের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী উন্নতির যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছিলেন নিবেদিতার হৃদয়ে উহা দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল। কবে কি ভাবে উহা সফল হইবে—মানব-সভ্যতার আদি-জননী ভারতমাতা কবে নিদ্রোত্থিতা হইয়া তাঁহার বন্ধনমুক্তা সর্বাভরণভূষিতা মঙ্গলমূর্তি ধারণ করিবেন—কবে তাঁহার ভাস্বর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন সত্যে, তেজে, প্রেমে উদ্ভাসিত হইবে নিবেদিতা তাহা জানিতেন না—ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেন না। তবে তিনি এইটুকু জানিতেন যে, সেই মহনীয় লক্ষ্যের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহা ব্যর্থ হইবার নয়। তাই গুরুপ্রদত্ত 'দায়'—নারীশিক্ষার জন্য যেমন তিনি প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতেন, তেমনি ভাবিতেন, করিতেন ভারতের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ইতিহাস, সাহিত্যের 'রেনেসাঁস'-এর জন্য—পরাধীন জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য। এই সকল ক্ষেত্রে এই ভারতপ্রাণা বিদেশিনী নারী যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত আজ পাওয়া সুকঠিন—কিন্তু যেটুকু কাহিনী তাঁহার সংস্পর্শে উপনীত বিশিষ্ট মনীষীদের কথা ও লেখা হইতে জানা যায়, তাহা হইতেই উহার গভীরতা সহজেই অনুমান করা চলে।

ভারতের স্বাধিকার ও সংস্কৃতির জন্য এই আত্মনিয়োগের প্রেরণাও যে ভগিনী তাঁহার

আচার্যদেবের নিকটেই পাইয়াছিলেন তাহা স্বামিজীর সহিত তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর বিবরণগুলি পড়িলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। একদা স্বামিজী পদব্রজে সমস্ত ভারতভূমি ভ্রমণ করিয়া ইহার দীন-দরিদ্র-কৃষক-শ্রমিক আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইয়া যথার্থ ভারতকে চিনিয়াছিলেন। ভারতের সেবার জন্য যিনি আত্মদান করিবেন সেই ভারত-সেবিকা নিবেদিতাকেও তাই তিনি সঙ্গে লইয়া ভারতীয় জীবনের সকল স্তরের সংহত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে ভারত-মন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষাদান বিবেকানন্দ-জীবনের একটি প্রধানতম কাজ, সন্দেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একান্তে গড়িয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার যুগব্রত-সংসাধনের যোগ্যতম যন্ত্ররূপে—স্বামিজী তৈরী করিয়াছিলেন এই অদ্ভুত তেজস্বিনী ব্রতধারিণীকে ভারত-সেবার একটি জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইবার জন্য। ভারতে অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের সঞ্চার ও সুপ্রতিষ্ঠা, ভারত-সংস্কৃতির বহুবিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, ভারতে জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রণালী, বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষের আগামী স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গভীর চিন্তাপ্রসূত লেখাগুলি হইতে আজও আমরা প্রচুর আলোক পাইতে পারি। পরাধীন ভারতীয় জাতির যে সমস্যাগুলি তাঁহার সময়ে সুপ্রকট ছিল তাহার অনেকগুলিরই সুসমাধান স্বাধীন ভারতে এখনও হয় নাই। এই বিষয়ে লোকান্তরিতা ভগিনীর জীবন ও বাণী হইতে যে সহায়তা ও উদ্দীপনা আমরা পাইব তাহা উপেক্ষণীয় নয়।

* * *

৩রা অক্টোবর, মন্টিবিলো দ্বীপপুঞ্জে সাফল্যের সহিত বৃটিশ আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের সংবাদ শুনিয়া ডক্টর সি ভি রমণ মন্তব্য করিয়াছেন,—"আমি বুদ্ধের অনুগামী; সুতরাং আর একটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণের খবরে খুশী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আণবিক বোমার দ্বারা মানবসমাজের কোন মঙ্গল হতে পারে বলে আমি মনে করি না।"

কলিকাতায় ডক্টর মেঘনাদ সাহা ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"স্বয়ংচালিত এবং স্বয়ংক্রিয় এই সমস্ত আণবিক অস্ত্র সত্যিই ভয়াবহ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে বসে শুধু বোতাম টিপে এই যুদ্ধ চালানো যাবে, আর যাদের নিকট এই বোমা প্রচুর পরিমাণে থাকবে, তারা অনায়াসেই অপর দেশের শহরগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে। এ রোধ করবার কোন উপায় নেই। * * * শক্তির অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে মানবজাতির একটি মিলিত বিবেক সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের শয়তানী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বিজ্ঞানীদের অস্বীকার করা উচিত।"

ভারতের দুই জন আন্তর্জাতিক-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের এই নির্ভীক স্পষ্ট উক্তি বিশ্বের সকল মনীষিগণের প্রণিধানযোগ্য। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য জাতিসমূহের ভাসা-ভাসা শুভেচ্ছা এখন আর পর্যাপ্ত নয়। এখন প্রয়োজন বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণের বলিষ্ঠ সক্রিয় কর্মনীতির। ডক্টর সাহা যে 'মিলিত বিবেকের' কথা বলিয়াছেন তাহারই আশু উদ্বোধনের উপর পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ২৪শে অক্টোবর, রাষ্ট্রসঙ্ঘ-দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বেতার-ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও এই বিশ্ববিবেকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্ববিবেকের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য

ভগিনী ক্রিষ্টিন ও ভগিনী নিবেদিতা
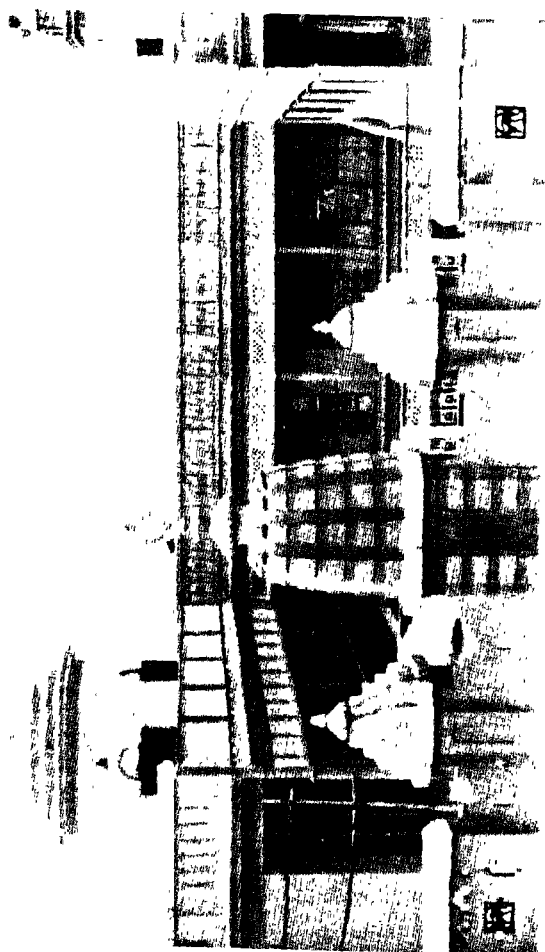
ভারতের দায়িত্ব কম নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তাঁহারা যদি ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বজনীন মূল তথ্যগুলির সহিত গভীর ভাবে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন এবং কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া সঙ্কীর্ণ স্বার্থবদ্ধ কোন দলের সন্তোষ বা রোষের পরোয়া না করিয়া অসঙ্কোচে বিশ্বের এক একটি সমস্যার সমাধানে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করিতে পারেন, তাহা হইলে 'বিশ্ববিবেক'-এর উদ্বোধনে প্রচুর সহায়তা হইবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

*　　*　　*

"রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার মূল গভীর-ভাবে নিহিত ধর্মের মধ্যে। সে ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে ঠিকভাবে বোঝা কখনও সম্ভব নয়।"

উপরের উদ্ধৃতিটি আমরা লইয়াছি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র এই বৎসরের (শ্রাবণ—আশ্বিন) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা'-নামক প্রবন্ধ হইতে। মন্ত্রতন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ঊর্ধ্বে যে উদার সার্বজনীন সত্য ও প্রেমের অনুভূতি মানুষের ধর্মসাধনার প্রকৃত লক্ষ্য—রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহারই অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। লেখক কবির গদ্য ও পদ্য নানা রচনা হইতে সুনির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা'র ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য; সাহিত্য, শিক্ষাব্রত, দেশসেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে তাঁহার বিশাল বহুমুখীন ব্যক্তিত্বের এই দিকটি লইয়া বোধ করি, তত হয় নাই। আলোচ্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে প্রবোধ বাবু ভগবৎ-সাধক ও ধর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথের যে চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনই আলোক-ও প্রেরণাপ্রদ।

প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ (শেষ) অনুচ্ছেদে "ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মসমন্বয়-সাধনার নীতি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা" যাহা লেখক করিয়াছেন সেই বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রবোধবাবু লিখিতেছেন,—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ-নিরসনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। * * গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এঁদের প্রয়াস প্রধানতঃ দুই পর্যায়ভুক্ত। এক পর্যায়ে আছে ধর্মনীতি, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বাহ্য সংঘটনের প্রয়াস; ইংরেজিতে যাকে বলে eclecticism, এ প্রয়াস মূলত তাই। এ প্রসঙ্গে আকবর (দীন-ইলাহি), রামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে মনে পড়ে। এ মতের প্রধান কথা—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১), 'যত মত তত পথ' (রামকৃষ্ণ) —যে যে ভাবেই সাধনা করুক তাতেই তার মুক্তি। এ হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা সহিষ্ণুতার দ্বারা সকলের একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা। এ মতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম···
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম;
সবকো সন্মতি দে ভগবান।

ভগবদ্দত্ত 'সন্মতি' অর্থাৎ সর্বমত-সহিষ্ণুতার উপরেই এর ভরসা। এ মিলন বাহ্য মিলন; পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুকেও নির্বিরোধে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর আদর্শ। নানা ধর্মের নানা

শাস্ত্র (গীতা-কোরান-বাইবেল), ও আচার, ভগবানের বিভিন্ন নাম (গড-আল্লা) প্রভৃতি সব কিছুকে মেনে নেওয়ার উপরই এর আশ্রয়। এর মূলে কোনো নিত্যসত্যের দৃঢ়ভূমি নেই। সুতরাং এ মিলনের স্থায়িত্বও সুনিশ্চিত নয়।

"দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য বাহ্যসমাবেশ বা অবিরোধ-মাত্র নয়, অন্তরের মিলন। এই পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক। অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পরে মধ্যযুগে কবীর নানক দাদূ প্রভৃতি এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে রামমোহন এবং অন্তে রবীন্দ্রনাথ সর্ব-মানবকেই এই পথের আহ্বান জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য একদিকে বিশ্ববোধ এবং অপরদিকে চিরন্তনতা-বোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন ও খণ্ড-দেশিক তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। নিত্য-সত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা চিরজাগ্রত। 'নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোক-ব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি'র প্রতি তাঁরা সদা খড়্গহস্ত। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণে তাঁরা অক্লান্ত। বিশ্বমানবের অন্তরে যে অখণ্ড নিত্যসত্যের বোধ নিহিত আছে একমাত্র তাকেই তাঁরা সত্যধর্মের আশ্রয় বলে স্বীকার করেন। যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি এই নিত্যসত্যকে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন করে, তাঁরা সেগুলির অপসারণেই বদ্ধপরিকর।"

আকবর যে ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন উহার একমাত্র পটভূমি ছিল রাজনৈতিক একতা। মহাত্মা গান্ধীও যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য প্রাণপাতী সাধনা করিয়া গেলেন উহারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসীর মধ্যে একটি অবিভক্ত স্বরাজের আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা। যে কারণেই হউক ইঁহাদের সমন্বয়-চেষ্টা যে এখনও আশানুরূপ সার্থক হয় নাই ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয়। অতএব এই দুই মিলনকে প্রবোধ বাবু যে একটি শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন তাহা ঠিকই হইয়াছে—যদিও মহাত্মা গান্ধীর ধর্মদৃষ্টিকে eclecticism-সংজ্ঞিত করিতে আমাদের কুণ্ঠা বোধ হয়। তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভগবদনুরাগের কথা মনে পড়ে। তিনি যখন সকল ধর্মাবলম্বীদের মিলনের কথা প্রচার করিতেন তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের এই আধ্যাত্মিক স্পর্শ কিছু না কিছু শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগের আত্মিক যোগ ঘটাইত না কি? প্রবোধ বাবুর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য 'বিশ্ববোধ' যে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল না তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ ('প্রথম পর্যায়ে' তাঁহার উক্তি উদাহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি আকবর, রামকৃষ্ণ, গান্ধীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও 'বাহ্যমিলনে'র দলের) ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-চেষ্টার মধ্যে কোন 'নিত্যসত্যের দৃঢ়ভূমি' নাই প্রবন্ধোক্ত এই সিদ্ধান্তে আমরা হতবুদ্ধি হইলাম। যিনি বলিয়াছিলেন, 'যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ (গীতা, ৫।১৯), 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' (গীতা ৬।২৯); 'যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা॥' (১৩।৩০) তিনি কি "বিশ্বমানবের অন্তরে অখণ্ড নিত্যসত্যের বোধের" সন্ধান পান নাই এবং তাঁহার সমন্বয়-প্রচেষ্টা ঐ বোধেরই উপর আশ্রিত হয় নাই? শ্রীরামকৃষ্ণও যখন নিজে পরপর বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিলেন উহাদের প্রত্যেকটিরই প্রকাশভঙ্গী আলাদা হইলেও মুখ্যতঃ উহারা সার্বজনীন পরম সত্যেরই দিকে প্রযুক্ত এবং ঐ উপলব্ধিই তাঁহার সরল গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত করিলেন—'সব শিয়ালের এক রা'—তখন তাঁহার 'যত মত তত পথ' উক্তিকে শুধু "স্বীকৃতির দ্বারা সকলের একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা" বলা

সঙ্গত কি? "খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ" তাঁহাদেরও লক্ষ্য ছিল—তবে তাঁহারা জানিতেন উচ্চতম আদর্শ এককালেই সকল মানুষ গ্রহণ করিতে পারে না। অনেক চেষ্টা-যত্ন-পরিশ্রম করিলে তবে বিশ্ববোধের যথার্থ ধারণা আসে। মন্দির-মসজিদ-মন্ত্র-তন্ত্র-পূজা-নামজপাদি বাহ্য অবলম্বন ছাড়িয়া আজ যদি পৃথিবীর সকল ধর্মানুসন্ধিৎসু 'অখণ্ড নিত্যসত্য'কে ধরিতে পারিত তাহা হইলে কতই না সুখের কথা হইত; নিমেষে পৃথিবীর বহুতর দ্বন্দ্ব ও কলহের অবসান ঘটিত! কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। তাই আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির অনিষ্টকর অপ-প্রয়োগগুলি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিলেও এবং উহাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই ঐগুলি আমূল 'অপসারণে বদ্ধপরিকর' হন নাই। 'বাহ্য' বলিয়াই আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই একথা বলা চলে কি? বরং উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির দিকে জনগণকে সচেতন করিয়া দিয়া উহাদিগকে সহ্য করাই শ্রেয়ঃ নয় কি? অধিকাংশ মানুষকে তো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই আচার-অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করিতে হয়, নিত্যসত্যে পৌঁছিতে হয়।

তবুও আমরা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-প্রচেষ্টাকে লেখকের নির্দিষ্ট 'দ্বিতীয় পথে' ফেলিবার সুপারিশ করি না – কেন না ইঁহারা মন্দির-মসজিদ্-শাস্ত্র-মন্ত্র-পূজা প্রভৃতি 'বাহ্য সংঘটনে'র সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন এবং উহার উপদেশও দিয়াছিলেন। 'বিশ্ববোধ' 'চিরন্তনতা-বোধে'র সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের বিচিত্র প্রকৃতি ও রুচিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের অসংখ্য উপাসনা-প্রণালীকে পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়কে যদি সংক্ষেপে এই ভাবে নির্ণয় করা যায় তাহা হইলে আমাদের মনে হয় উহাকে প্রবোধ বাবুর উল্লিখিত শ্রেণীদ্বয়ে না ফেলিয়া আর একটি তৃতীয় পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট করাই সমীচীন। এই সমন্বয়ে নিহিত মিলন যে 'অন্তরেরই মিলন' তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিবেদিতা-প্রশস্তি

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শেফালী-শুভ্র স্নিগ্ধ কান্তি, সৌম্যা অনিন্দিতা
আত্মদানের নীরব মহিমা, হে ভগিনী নিবেদিতা।
দেশ হতে এলে ভারততীর্থে, সুদূর সাগরপারে
ভারতের হিতে আপন জীবন নিঃশেষে সঁপিবারে।
মহাজীবনের দীপ্ত গরিমা, হে তাপসী বন্দিতা
বিদেশিনী তুমি আত্মীয়তমা ভারতের নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার ভারত-প্রীতি

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শাস্ত্র বলেন, আত্মতত্ত্বকে স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তরতম করিয়া তোল। তাহাতেই শক্তি, তাহাতেই সর্ব আপ্তব্যের পর্যবসান। যাহা 'গুহাহিত', যাহা 'গহ্বরেষ্ঠ' তাহার অনুশীলনেই পুরুষকারের চরিতার্থতা। ইহা কোন ভোজবাজি নয়, কোন ভুতুড়ে ব্যাপার নয়। এই অনুশীলন-পরম্পরা, এই নিরলস অনুধ্যানের নৈরন্তর্যই ভারতের যথার্থ ইতিহাস। যুগে যুগে কত রাজা-উজির তলাইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের শত অশ্বমেধ-রাজসূয়, তাঁহাদের সহস্র জিগীষা, তাঁহাদের সংখ্যাহীন বিজয়-অভিযান দৃষ্টিকে ধাঁধাইয়া দিয়াছে! কিন্তু অপরিবর্তিত, বিভিন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবে নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখাবৎ সুস্থির-অচঞ্চল, দেবতাত্মা হিমালয়সাক্ষিক মহাভারত যুগে যুগে চলিয়াছে একই লক্ষ্যকে অনুসরণ করিয়া। ক্ষ্যাপার মত 'পরশপাথর' খোঁজাই হইয়া আসিতেছে তাহার দীর্ঘজীবনের দুস্ত্যজ অভ্যাস। ভারতবর্ষের ব্যষ্টিজীবনে, সমষ্টিজীবনে এই অন্তর্মুখীনতা এত গভীরভাবে প্রবিষ্ট যে, ইহাই তাহার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতাত্মার এই মূল সুরটি ধরিতে পারিয়াছিলেন। বিপরীত ভাবের প্রতিকূল পরিবেশও যে সৃষ্ট হয় নাই তাহা নহে। যখনই জড়ের ক্ষণপ্রভা সংশয়ের অন্ধকারকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তখনই আবার দেখি স্বয়ং-জ্যোতি তমোবিদারী চৈতন্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। স্বামিজী এই চৈতন্য-অভিমুখী ভারত-সংস্কৃতিকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া দিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; ইহাকেই আবার নবভারত-সৃষ্টির আসল উপকরণরূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন।

সর্বত্রই, ভারতবর্ষেও লোক-ব্যবহার চলিয়াছে সত্য ও অনৃতকে মিশাইয়া। নিষ্পলক তত্ত্বদৃষ্টি ভারতবর্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের অধিকারী করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষার অভাবে, কুশিক্ষার বিষময় প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে কর্মবিমুখ সত্যের মুখোসপরা অলস আত্মতৃপ্তি দেব ও ঋষির বংশধর ভারতবাসীদিগকে করিয়াছে দুর্বল, কাপুরুষ, পরানুকৃতিপর। এই বিনষ্টি হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে হইবে; আপন সমাজ-জীবনের চিরন্তন সত্যকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া ভারতকে 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লইতে হইবে —'ধর্মে মহান্ কর্মে মহান্' হইয়া সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইতে হইবে। এই গুরু দায়িত্ব-বহনে স্বামিজীর অনুগত সহায়ক হইবে কে? চমকপ্রদ আকস্মিকতায় অগ্রসর হইয়া আসিলেন কুমারী মার্গারেট ই নোব্‌ল্। আয়ারল্যাণ্ড-বাসিনী প্রতীচ্যের চূড়ান্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারিণী কুমারী নোব্‌ল্ স্বামীজীর মর্মপীড়া সহজ মহাপ্রাণতায় অনুভব করিলেন।

স্বামিজী চাহিলেন আমূল রূপান্তর। ভারত-বর্ষকে ভালবাসিতে হইলে সম্পূর্ণ ভারতবাসী হইতে হইবে; মনে প্রাণে ভারতবর্ষকে আপন করিয়া তুলিতে হইবে। এই পূর্ণ রূপান্তরের চাহিদায় কুমারী নোব্‌ল আত্মপ্রকাশ করিলেন ভগিনী নিবেদিতা-রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ভারত-জীবনের অন্তঃস্থিত অনাহত নাদধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজে ধন্য হইলেন

তাঁহার অকুণ্ঠ ভারত-সেবা দ্বারা আমাদিগেরও বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে ফিরাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা-যাপিত ভারতীয় জীবনের মধ্য দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির স্পন্দন অনুভব করা যায়।

ব্যাপক অর্থে ভারত-সংস্কৃতি আর হিন্দু-সংস্কৃতি অভিন্ন। হিন্দুর অন্তর্মুখীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচিতি। অর্বাচীন ও অবান্তর সংস্কারবর্জিত হিন্দু জীবনধারার অনাবিল গতিচ্ছন্দকে ভগিনী ঠিক ঠিক চিনিয়াছিলেন। নিজের ধর্মসম্বন্ধে কোন প্রকার দুর্বল মনোভাব পোষণ করার প্রয়োজন নাই। সত্য যাহা তাহা নির্ভীকভাবে বলিতেই হইবে; পাশ্চাত্ত্য ভারত-তত্ত্ববিদ্‌গণ (Indologists) কি বলিলেন তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। দুর্বল, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি স্বধর্মের কথা নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে বলিতে সাহস পায় না—'পাছে লোকে কিছু বলে!' স্বধর্মপ্রেমিক হিন্দুকে হইতে হইবে যুধ্যমান; তাহাকে আপন বিশ্বাসকে সদর্পে ঘোষণা করিতে হইবে—তাহাকে মৃদু অথচ দৃঢ়নিষ্ঠ, পরমতগ্রাহী অথচ aggressive হইতে হইবে। স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের দর্পণে তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দুধর্মের মোহন ও মহীয়ান্ রূপ। ভারতীয় মীমাংসকগণের অনমনীয় যুক্তিনিষ্ঠা, তাহাদের বিশ্বাসের অচলপ্রতিষ্ঠা ভগিনীর নিকট 'the very glory of Hinduism'—হিন্দুধর্মের যথার্থ গৌরব বলিয়া প্রতিভাত। মূর্তিপূজা-সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃপ্ত প্রত্যয়-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কী অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলিতেছেন :

"There is assuredly no evasion of the logical issue in a people who can say, even while they worship the image, that the image is nothing but the idea made objective; that prayer is powerful in proportion to the concentration it represents; that the gods exist only in the mind, and yet the more assuredly exist. The whole train of thought sounded like the most destructive attack of the iconoclast, yet it was being used for the exposition of a faith!"[১] কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তির সমুচিত উত্তর দিতে হইবে অটুট বিশ্বাসের সিংহগর্জনে, বিনতভাবে আত্মাবমাননা দ্বারা বা স্বধর্মনিন্দকের উদ্দেশ্যমূলক হীন সমালোচনাকে কাপুরুষতার সহিত হজম করিয়া নয়। হিন্দুর বেদবেদান্তনিহিত সনাতন সত্যরাশি দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়ুক, দুনিয়াকে হিন্দুভাবাপন্ন করুক—ইহা স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, ভগিনী নিবেদিতারও ছিল। হিন্দুধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। তাঁহার বিশ্বাস হইল : "Truth being the one goal of the Hindu creeds, and this being conceived of not as revealed truth to be accepted, but as accessible truth to be experienced, it followed that there could never be any antagonism real or imagined, between scientific and religious conviction, in Hinduism."[২]

ভগিনী নিবেদিতা অনুভব করিয়াছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য হিন্দুকেই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে; ইউরোপের অনুকরণে সে যতই পটুতা দেখাক না কেন তাহাতে কিছুই হইবে না যতক্ষণ সে আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ না হয়। তাঁহার আক্ষেপোক্তি অনুধাবনীয় : "The soil that has brought forth the

১ The Master as I saw Him, p. 252-53.

২ „ p. 284.

mango and the palm, ought not to be degraded to producing only gourds and vetches. And similarly, the land of the Vedas and of Jnana Yoga has no right to sink into the role of mere critic or imitator of European settler."[৩] আমাদের স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রীতি শান্ত গৃহকোণ হইতে বাহির হইরা অবিশ্বাসীর দম্ভকে দমিত করুক—অস্ত্রধারণ করিয়া নয়, রক্তপাত দ্বারা নয়, সতেজ সুস্পষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের নির্ভীকতায়। এ অভীই আমাদের ভাবরাজ্যের আক্রমণ। এই সত্যাগ্রহী আক্রমণাত্মক নীতিই হইবে ভারতের Plan of Campaign—তাহার সমরনীতি। ভগিনী বলিতেছেন: "Aggression is to be the dominant characteristic of the India that is to-day in school and class-room—aggression and the thought and ideals of aggression. Instead of passivity, activity; for the standard of weakness, the standard of strength; in place of a steadily-yielding defence, the ringing cheer of the invading host. Merely to change the attitude of the mind, in this way, is already to accomplish a revolution."[৪]

বিরুদ্ধ সমালোচকের নিকট হিন্দুধর্ম কেবল মাত্র বিচিত্র অনুষ্ঠান, আচার-আচরণের পুঁটলি ছাড়া আর কি? কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন সদাচার-পরিপূত হিন্দুসমাজ চরিত্র-সৃষ্টি দ্বারা নরনারীর জীবনে সু-সূক্ষ্ম অনাবিল রসবোধ জাগ্রত করিয়াছে। চুপ করিয়া বিদ্রূপোক্তি সহ্য করিলে চলিবে না; শান্ত-সংযত প্রতিবাদে অবিশ্বাসীকে নিরস্ত করিতে হইবে: "Our work is not now to protect ourselves but to convert others. Point by point, we are determined not merely to keep what we had but to win what we never had before. The question is no longer of other people's attitude to us but rather of what we think of them. It is not how much we kept but how much have we annexed. We cannot afford now to lose, because we are sworn *to carry the battle* far beyond our remotest frontiers." 'আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ নয়, অন্যকেও আমাদের ভাবভুক্ত করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে ধীর পদক্ষেপে, যাহা আমাদের ছিল তাহার রক্ষায়ই শুধু আমরা কৃতসঙ্কল্প নই, যাহা আমাদের কোন দিন ছিল না তাহাও আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদের প্রতি অন্য জাতির কি মনোভাব তাহা এখন বিচার্য নয়, আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি ভাবি তাহাই বিচার্য। আমরা কতটুকু রক্ষা করিয়াছি ইহাই শুধু বিবেচ্য নয়, কতটুকু নূতন ভাবসম্পৎ আমরা সঞ্চয় করিয়া সমাজজীবনের সহিত যুক্ত করিয়াছি তাহাই ভাবিতে হইবে। আমাদের আর হারাইলে চলিবে না, কেন না আমাদের সংগ্রাম চালাইতে হইবে সুদূর সীমান্তেরও পরপারে।' সক্রিয় সংগ্রামশীল হিন্দুধর্মকে ভগিনী কখনও একটা যুগান্তস্বামী অপরিবর্তনীয় 'মমী'র মত মনে করিতেন না। যুগে যুগে হিন্দুসমাজে যে কত নব নব ভাবের সমীকরণ হইয়াছে। তাহার মতে "No other religion in the world is so capable of this dynamic transformation as Hinduism"—'হিন্দুধর্ম ছাড়া বিশ্বের অন্য

৩ Aggressive Hinduism, p. 2.

৪ " " p. 4.

কোন ধর্মই এত সক্রিয়ভাবে পরিবর্তন-সহ নয়।' বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতির এত সহজ স্বীকৃতিই হিন্দুধর্মের অনবসিত শক্তির পরিচায়ক।

ভগিনী নিবেদিতার ভারতপ্রীতির সঙ্গে হিন্দু-ভাবধারা-প্রীতি ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-জীবনালোকে তিনি হিন্দুসাধনার যে দিব্যরূপ দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণা। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি এই ভারতীয়তাকে মুদ্রিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। Hints on National Education-গ্রন্থে যে শিক্ষাদর্শ তিনি উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা চিরকল্যাণময়ী ভারত-সভ্যতার আবরণ-উন্মোচন ছাড়া কিছু নয়। Web of Indian Life প্রভৃতি গ্রন্থ ভারতীয় শিল্প, শিক্ষা-জীবনের ফল্গুধারার সহিত মর্মে মর্মে পরিচিতি ছাড়া আর কি? তিনি চাহিয়াছিলেন পূর্ণাঙ্গ ভারতীয়তার উদ্দীপ্ত শিল্প, সত্যাশ্রয়ী ভারত-ইতিহাস, ঋষিজ্ঞানসমুজ্জ্বল দর্শন ও বিজ্ঞানের সাধনা। শয়নে স্বপনে যিনি ভারতের কথা ভাবিয়াছেন, তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতিও তিনি উদাসীন হইতে পারেন না। জাতীয় আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার কল্যাণ-প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। তাহার কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারিয়াছি। সর্বোপরি ভারতের নারীশক্তিকে শিক্ষাহীনতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনযুদ্ধে আয়ুধসন্নদ্ধা করিতে গিয়া তিনি ভারতপ্রীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন।

আমি

শ্রীচিত্তদেব

আমি এই পৃথিবীরে করেছি সুন্দর
এর বুকে বেঁধেছি মানস-রূপ ঘর।
আমি সুখ ভোগ করি ত্যাগের প্রসাদে
আমার হৃদয়ে দুঃখ বাসা যদি বাঁধে
সেই বাসা ভেঙে দিই আশার আঘাতে
নিজে আমি জেগে থাকি অপরে জাগাতে।

আমি করি পৃথিবীরে কলঙ্ক-বিহীন
এর বুকে চলাফেরা মোর রাত্রিদিন।
আমি আলো করি যত কিছু অন্ধকার
স্রষ্টা-অভিলাষ আমি সৃষ্টি-বন্দনার।

চির-মঙ্গলেরে বয় আমার বাতাস
আমার নিঃশ্বাসে দোলে সাগর আকাশ।
লোকে লোকে আমি বই দৈবের বারতা
আনন্দ-সঙ্গীত আমি, আমি সুর কথা।

আমি প্রভাতের সূর্য সন্ধ্যার তারকা
আমি শরতের মেঘ চন্দ্রমার সখা।
আমি সত্য সুন্দরের শিবের বিভূতি
পৃথিবী দিবসরাত্রি করে মোর স্তুতি।
আমি অমৃতের পুত্র মোর মৃত্যু নাই
জীবনতরঙ্গে ভেসে দিকে দিকে ধাই।

ভগিনী নিবেদিতা-স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্‌-এ

১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে এক দিন ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষামন্দির ও বাসভবনে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পাঠাবস্থায় রেঙ্গুন হইতে আসিয়া তখন আমি স্কটিশচার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া ১৯১০ সালের I.A. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে আমার Classical ভাষা ছিল পালি। রেঙ্গুনে থাকিতেই পালি ভাষায় লিখিত কতকগুলি বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে ইংরেজি মাসিক পত্রে ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধাদি পাঠে তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম এবং তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ইহাও জানিয়াছিলাম। রেঙ্গুনে ইউরোপিয়ানদিগের নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল যে, সাহেবরা যেরূপ শিক্ষাদান বা বিদ্যালাভ করিতে পারেন ভারতবর্ষীয়েরা ততদূর পারেন না এবং তাঁহাদের নিকট আমাদের ধর্মপ্রসঙ্গ বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পুরাণের উপকথার মত বড়ই বেসুরা দেখায় বা মোটেই থাপ খায় না। নিবেদিতা একজন ইংরেজ' মহিলা হইয়া কি প্রকারে ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব-গ্রহণ করিলেন তাহা বুঝিবার আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া উপযাচক হইয়া তাঁহার দর্শনমানসে তাঁহার ১৭ নং বোসপাড়া লেনস্থিত বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

ছাত্র এবং অল্পবয়স্ক হইলেও তখন আমার সাহস ছিল অদম্য। যাঁহাকেই কোন বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় দেখিতাম তাঁহারই সহিত জোর করিয়া দেখা করিতাম, ইহাতে মাঝে মাঝে লজ্জায়ও পড়িতে হইত। যেমন নাট্যসম্রাট গিরীশবাবুর নিকটে প্রথম আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আলোচনা বা ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে যাইয়া দেখিলাম তিনি ত ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেনই না বরং আমি কি আহার করি, কখন পড়ি, কখন শুই কোথায় বেড়াই ইত্যাদি প্রশ্নই করিতে লাগিলেন! যেন আমি একটি বালকমাত্র! ভগিনী নিবেদিতার নিকটে আমার প্রায় তদ্রূপ অবস্থাই ঘটিল।

উপরে সংবাদ পাঠাইবার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রথম আসিলেন সিষ্টার ক্রিশ্চান তাঁহার পরিচয় দিয়া তিনি এই বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন জানাইলেন, কিন্তু আমি ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিতে আসিয়াছি বুঝিয়া তিনি তখনই উপরে গিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ভাবিয়াছিলাম একজন শান্ত ধর্মপ্রসঙ্গরতা মৃদুভাষিণী বিদুষী ভক্তমহিলাকে দেখিব, কিন্তু নিবেদিতার সিংহবিক্রমে আগমন, তাঁহার শক্তিপূর্ণ অঙ্গ-সঞ্চালন, তীব্র হৃদয়ভেদী দৃষ্টি, তেজোদ্দীপ্ত কথা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তাঁহার নিকটে আমি ক্ষুদ্র বালকই হইয়া পড়িলাম। সিষ্টার ক্রিশ্চীন্ সাদা সাড়ী পড়িয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু নিবেদিতা লাল ডুরে ঘাগরা পরিয়াই আসিলেন। অর্থাৎ যে ভাবে ছিলেন সেই ভাবেই দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার মেয়েদের পড়াইবার ঘরে লইয়া আসিয়া নিজে একটি পিঁড়াতে বসিলেন এবং

আর একটিতে আমায় বসিতে বলিলেন। নিমন্ত্রণ-বাটীতে খাওয়াইবার জায়গায় যেমন পর পর আসন পাতা থাকে তেমনই এই গৃহে মেয়েদের পড়িবার জন্য সারি সারি পিঁড়া পাতা আছে দেখিলাম। একদিকে দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসন রহিয়াছে, বুঝিলাম উহাতেই শিক্ষয়িত্রী উপবেশন করেন। তখনও স্কুলের পূজার ছুটি চলিতেছিল।

নিবেদিতা বলিলেন, 'এইটি মেয়েদের পড়িবার ঘর। আমি এইখানে পাড়ার মেয়েদের পড়াই। তুমি কি চাও?'

আমি বলিলাম, 'আমি একজন ছাত্র, আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। রেঙ্গুনে I.A. পড়িতেছিলাম, এখানে আসিয়া I.A. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি, আগামী বৎসর পরীক্ষা দিব। আমার পালি Classical ভাষা—আপনার নিকট ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব মনে করিয়াছি।'

নিবেদিতা একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিলেন, 'ওঃ! তুমি পালি পড়! পালির দিকে তুমি আকৃষ্ট হইলে কেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'রেঙ্গুনে সকলকেই পালি পড়িতে হয়; কিন্তু আমার পালি ভাল লাগে, কারণ আমার মনে হয় ভারতের পূর্ব গৌরব বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে পালি পড়া প্রয়োজন।' নিবেদিতা কৌতূহলপূর্ণ নয়নে ক্ষিপ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি ভবিষ্যতে কি হইবে ঠিক করিয়াছ?' আমি বলিলাম 'তাহা আমি বলিতে পারি না।'

তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন 'ইহা একটি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। (This is foolishness) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনে রাখা উচিত সে ভবিষ্যতে কি হইতে চায়।' তাহার পর সহাস্যে আমায় বলিলেন 'তুমি যখন বড় হইয়া পালি ভাষায় M.A. পাশ করিবে তখন আমার নিকটে আসিও; আমরা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। এখন আমি বড় ব্যস্ত, আমায় বিদায় লইতে হইবে।' —মুহূর্তমধ্যে ভগিনী নিবেদিতা তেজোময়ী বিদুষী হইতে ভক্ত নিবেদিতায় পরিণতা হইলেন। জোড়করে আমাকে বহুবার নমস্কার করিতে করিতে এবং মনে হয় তাঁহার গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের কথাবার্তা ইংরেজিতেই হইয়াছিল। রেঙ্গুনে অবস্থান করিবার ফলে আমার বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার এই গৃহটি রাস্তার উপরই অবস্থিত। গৃহমধ্যে একখানি পুষ্পমাল্যে শোভিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি রহিয়াছে দেখিলাম এবং তাঁহারই নাম লইয়া বালিকারা অধ্যয়নাদি কার্য আরম্ভ করে বুঝিতে পারিলাম।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—১৯১০ সাল জানুয়ারী মাস হইবে। ভগিনী 'উদ্বোধনে' স্বামী সারদানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। আমি মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি। স্বামী সারদানন্দ উপর হইতে নামিতেছেন, সে এক অপরূপ দৃশ্য! মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত বিরাট দেহধারী মহাপুরুষের মুখমণ্ডলে একটি অপূর্ব প্রশান্ত জ্যোতি! নিবেদিতা 'উদ্বোধনে' প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামিজী, আপনি আজ কোন রাজ্য জয় করিতে চলিয়াছেন?' মহারাজ সহাস্যবদনে কি বলিলেন মনে নাই, তবে আমি তাঁহার ঘর তখনই পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। নিবেদিতা এবং মহারাজ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আধ্যাত্মিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ যে পাশ্চাত্ত্যদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়

জন্মাইয়া ভারতীয়গণের নিকট তাঁহাদের অবনত করে তাহা দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয়বার দেখা ১৯১১ সালের মে মাসে হইবে। শ্রীশ্রীমা 'উদ্বোধনে' রহিয়াছেন। বহু পরিমাণে লোকসমাগম হইতেছে। আমি নিয়মিত যাওয়া-আসা করিতেছি। হস্তে ছাতা লইয়া চলা আমার একটি বাতিক ছিল, এখনও বোধ হয় আছে। আমার অগ্রজ মহাশয় এবং নিবেদিতা উদ্বোধনে আসিয়াছেন; বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, উভয়ের মধ্যে অল্প আলাপের পর আমার অগ্রজ মহাশয় ও ভগ্নী নিবেদিতা উভয়ে প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে 'উদ্বোধনের' রোয়াকের সিঁড়িতে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিয়া হিন্দুদর্শন-সম্বন্ধে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। বালিকার মতই কোথায় বসিয়াছেন নিবেদিতার হুঁশ ছিল না; কারণ কাহাকেও 'উদ্বোধনে' আসিতে বা যাইতে হইলে তাঁহাদের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। অনেকক্ষণ শরৎ মহারাজের গৃহে বসিয়া থাকিবার পর আমার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া সহসা বাহিরে আসিলাম। ভগিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু আসিয়াই ছাতাটির কথা স্মরণ হওয়ায় উহা লইবার জন্য উভয়ের মধ্য দিয়া আবার ভিতরে গেলাম এবং ছাতাটি হাতে লইয়া তখনি উভয়ের মধ্য দিয়াই বাহিরে চলিয়া আসিলাম। তাহা দেখিয়া ভগিনী আমার উপর ভীষণ রুষ্ট হইলেন। আমি ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাদের বিরক্ত করিয়াছি ভাবিয়া আমার দাদার নিকট আমার সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আমারও এ সাহস হইল না যে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিই কেন আমাকে তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভ্রান্ত ভাবে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। যাহাই হউক গঙ্গাতীরে আসিয়া আমি শান্তি পাইলাম।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ভগিনীর কোপ উপশম করিবার ইচ্ছায় আমি আবার 'উদ্বোধনে' আসিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা হইবে। দেখিলাম তিনি শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয়ের সহিত 'উদ্বোধন' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি আর 'উদ্বোধনে' প্রবেশ না করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। নিবেদিতা সজোরেই কথা কহিতেছিলেন এবং মাষ্টার মহাশয় শান্তভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছিলেন। কথা আমার সম্বন্ধেই হইতেছিল। একবার উচ্চস্বরেই ভগিনী বলিয়া উঠিলেন 'We ought to hammer them'—অর্থাৎ এইরূপ বালকদের রীতিমত শাস্তি দেওয়া উচিত। ভাবিলাম, আজ কোন অশুভ মুহূর্তে বহির্গত হইয়া ভগিনীর অপ্রিয়ভাজন হইলাম। তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কিছু বলিবার আর শক্তি রহিল না। নিবেদিতার বাটী পৌঁছান পর্যন্ত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলাম। বাটীর নিকটে আসিয়া তাঁহার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে জ্যোৎস্না-কিরণে স্নাত পত্রহীন একটি শুষ্ক বৃক্ষে কাকের বাসা দেখাইয়া নিবেদিতা মাষ্টার মহাশয়ের নিকট বালিকার মত আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ভগিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমি মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সহিত শ্যামবাজারের দিকে আসিতে লাগিলাম। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'দেখ, নিবেদিতা তোমার উপর বড় রাগ করিয়াছেন।' আমি ইহার সমস্ত কারণ বলিলাম। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন 'ওঁরা বড় discipline এর পক্ষপাতী। এতটুকু বেচাল দেখলে সহ্য করতে পারেন না। তোমায় যাতায়াত করিবার সময় প্রত্যেক বার 'Excuse me madam' বলিয়া যাওয়া আসা করা উচিত ছিল।' আমি বলিলাম, 'নিবেদিতা আমাকে hammer করিবেন বলিতেছিলেন, তাই ভয়ে তাঁর

নিকটে আসিয়া 'মাপ' চাহিতে পারি নাই।' মাষ্টার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন 'Hammer করা মানে হাতুড়ী মারা নয়; ওর মানে যারা অশিষ্ট বালক তাদের কঠোর হস্তে শাসন করা। যাই হোক, তোমার উপর তাঁর কোন আন্তরিক রাগ নেই। আমি বলিয়াছি তুমি একজন ভক্ত, স্বামিজীর আদর্শ মান, তাঁর বই পড়, মঠে যাও এবং অশিষ্ট নও।' নিবেদিতার অশেষ গুণের কথা বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয় আসিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, 'দেখ, উনি বিদেশিনী তার পর ইংরেজ মহিলা। নিজেদের দেশ ও জাতির উপর ওঁদের প্রবল ভালবাসা ও বিশ্বাস। কিন্তু স্বামিজীর উপর ওঁর কি শ্রদ্ধা ভক্তি! নিজের দেশ ও জাতি ছেড়ে তাঁর কাজ করবার জন্য ভারতে এসেছেন। স্বামিজীর আদেশ 'আমাদের মেয়েদের তুমি দেখবে' অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। যেন একটি দেবীপ্রতিমা, ওঁদের রাগ ক্ষণিক, সর্বদাই আনন্দময় হয়ে আছেন।' মাষ্টার মহাশয় tram depotয় আসিয়া tram-এ চড়িয়া ঝামাপুকুরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং আমি বাটী আসিলাম।

পরবর্তী চতুর্থ এবং শেষ দর্শন। উপরোক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 'উদ্বোধনে'র কাছাকাছি আসিয়াছি। দেখি কিছু দূরে নিবেদিতা 'উদ্বোধন' হইতে ফিরিয়া বোসপাড়ার দিকে আসিতেছেন। যদিও মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন নিবেদিতার অন্তরে কোন রোষের আভাস নাই তবুও তাঁহার সেই দিনের তীব্র ধারণা আমার মন হইতে সম্পূর্ণভাবে অপগত হয় নাই। আমি রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া নত মস্তকে সন্তর্পণে যাইতে লাগিলাম যাহাতে তাঁহার ঠিক সম্মুখে না পড়ি। কিন্তু চকিতের মধ্যে বক্রভাবে আসিয়া ভগিনী আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চাহিয়া দেখি তাঁহার মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি! মাষ্টার মহাশয়ের কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ পাইলাম। আমার বক্ষস্থলে হাত রাখিয়াছেন। উহা এক বিতস্তি মাত্র দেখাইয়া ভগিনী বলিলেন 'তুমি বড় রোগা। বেশী পড়িও না, উপযুক্ত ব্যায়াম করিয়া নিজকে সবল কর। মাঠে যাইবে এবং সেখানে ফুটবল ক্রীকেট হকি প্রভৃতি খেলাধূলা করিবে। আমার কথা বুঝেছ? গায়ে জোর না করিলে কিছুই করিতে পারিবে না।' (You look very thin. Do'nt study hard. Take sufficient exercise. Make yourself strong. Go to the field. Take to sport, play football, cricket, hockey etc. Eh? Do you understand? Unless you are strong you can do nothing.) আমি বলিলাম 'আমি রেঙ্গুনে যাইতেছি সেখানে সুবিধা পাইলে এই সব করিব। আবার সেই হাসি! যেন বলিলেন' আমি তোমার বড় দিদি, আমার উপর অভিমান করিও না, আমার উপদেশ রক্ষা করিও।' হায়-ভগিনী, কে জানিত এই তোমার শেষ বাণী! পরবর্তী অক্টোবর মাসে রেঙ্গুনে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া শুনিলাম 'Sister Nivedita no more'. ভগ্নী নিবেদিতা আর ইহজগতে নাই এই সংবাদ কলিকাতা হইতে তারযোগে রেঙ্গুনে প্রচারিত হইয়াছিল। ভগ্নী, তুমি যে বলিয়াছিলে M. A. পাশ করিবার পর আমার সহিত প্রাচীন ভারত-সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। আমি ত বসিয়া আছি, তুমি কোথায়? তুমি ঠিকই বুঝিয়াছিলে শৃঙ্খলা-রহিত শিক্ষা হয় না, তুমি বলিয়াছিলে স্বাস্থ্য-উন্নতি করিতে না পারিলে পড়াশুনা বিড়ম্বনা। আজ ভারত স্বাধীন। তোমার একটি ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আজ বাঙ্গালী আদর্শভ্রষ্ট, তুমি আসিয়া শিক্ষা দাও। ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দাও কি করিয়া দেহের ও মনের উন্নতি সাধন করিতে হয়। তোমার মত আর কে জাতির জন্য তেজোময়ী শক্তিশালিনী বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী নারীকুল সৃষ্টি করিবে? কে না তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অহেতুক ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিবে?

নিবেদিতা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শিশিরস্নাত শ্বেত-শতদল পদ্মের মতই আজন্ম শুভ্র পবিত্র ও শান্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিলেন কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ইঁহার পিতা সামুয়েল রিচমণ্ড নোবল ছিলেন খৃষ্টভক্ত ধর্মপ্রচারক পাদরী। নিবেদিতার মাতা মিসেস নোবল (পিতৃকুলের নাম ইসাবেল হ্যামিল্টন) ছিলেন সুন্দরী সুশীলা, সত্যপরায়ণা, সরল ধর্মানুরাগিণী। কুমারী মার্গারেট নোবল তাঁহার প্রথম সন্তান। প্রথম অন্তঃসত্ত্বা বলিয়াই তিনি সর্বদা একটা ভয় ও আশঙ্কা অনুভব করিতেন। সরলভাবে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "হে ভগবান, যদি নিরাপদে সুপ্রসব হয় তবে এই সন্তানকে তোমার কাজে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব।" মাতৃগর্ভেই কুমারী নোবলকে ভগবৎকার্যেই মাতা মনে মনে নিবেদন করিয়াছিলেন! স্বামিজীর আহ্বানে যখন ভারতে আসিয়া কুমারী নোবল কাজ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন তখন তিনি পিতৃহীন; তাই জননীর অনুমতি চাহিলেন। মাতার পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ হইল। কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া ধর্মকার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে সর্বান্তঃকরণে স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। মিস ম্যাকলাউড বলিতেন যে তিনি নিবেদিতার মাতার কাছে ইহা শুনিয়াছিলেন এবং এই তথ্য তিনি কুমারী মার্গারেটের কাছেও গোপন রাখিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর কুমারী মার্গারেট উত্তর আয়ারলণ্ডে ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডনে স্বামিজীর দর্শনের পূর্বে তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁহার পিতা অতি যত্নেই শৈশব কাল হইতেই তাঁহাকে সুশিক্ষা প্রদান করেন এবং জননীর সদ্‌গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নিবেদিতার চরিত্রমাধুর্য, দৃঢ়তা, সরল তেজস্বিতা, স্বাধীন বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতা আধ্যাত্মিক আদর্শ স্বামিজীর সংস্পর্শে ও শিক্ষায় তাঁহাকে এক মহিমময়ী প্রতিভাশালিনী দীপ্তিময়ী তপস্বিনী নারীতে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা নিবেদিতাকে সর্বতোভাবে স্বামিজীর মানসী কন্যারূপেই বোধ হইত। তাঁহার ভাব, আচরণ, পবিত্রতা, তেজস্বিতা, উদ্দীপনাময়ী বাণী, ত্যাগ, তিতিক্ষা, অপার কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্ম-নিবেদন, অদম্য অধ্যবসায়, কঠোর তপশ্চর্যা এবং পরহিতব্রত—শুধু পাশ্চাত্যদেশে নহে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও অপূর্ব ও অনন্য-সাধারণ। কোন শুভক্ষণে এই শুচিস্মিতা নারী লণ্ডনে স্বামিজীর দর্শনে গিয়া বিমুগ্ধ এবং আত্মহারা হইলেন—তাঁহার নূতন বাণী, অপূর্ব সংস্কৃতি-কাহিনী শুনিয়া! তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"It occurred to me that though separate *dictum* might find its echo or its fellow amongst things already heard or already thought, yet it had never fallen to my lot to meet with a thinker who in one short

hour had been able to express all that I had hitherto regarded as highest and best."

অনন্তের ঝঙ্কারে কুমারী মার্গারেটের হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিয়া উঠিল। স্বামিজী প্রথমবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই এক শুভমুহূর্তে কুমারী নোবল 'আচার্যপ্রভু' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন স্বামিজীর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক পৌরুষভাব। সেই মুহূর্তে তাঁহার চিত্তে জাগিল অপূর্ব বাসনা—নিবেদিতার নিজের ভাষায় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"I had recognised the heroic figure of the man and desired to make myself the servant of his love for his own people." এই ঘটনা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগেই ঘটিয়াছিল। স্বামিজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসিলেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। মার্গারেট একদিন স্বামিজীর বক্তৃতায় আকুল আহ্বান শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আজ জগৎ চায় বিশ জন নরনারী যারা সব ত্যাগ করে ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে পারে ভগবান ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। বল কে যাবে?" বলিতে বলিতে স্বামিজী দাঁড়াইয়া শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকাইলেন—যেন আবেদন করিতেছেন—যদি কেহ তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দেয়। নিবেদিতার প্রাণে সেই আকুল আহ্বান স্পর্শ করিল, কিন্তু সাড়া দিবার শক্তি তখন ছিল না। একদিন স্বামিজীর ক্লাসের কোন সতীর্থের নিকট স্বামিজীর একখানি পত্রে তিনি পাঠ করিলেন—তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী। স্বামিজী লিখিয়াছেন,—"জগৎ চায় চরিত্র। জগৎ চায় তাদের, যাদের জীবন স্বার্থলেশশূন্য জলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত। জাগ, জাগ, মহান্ আত্মার অধিকারীরা; দুঃখ-দুর্দশায় জগৎ জলে পুড়ে মরছে—তোমরা কি ঘুমুতে পার?"

একদিন স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে কুমারী নোবল্‌কে বলিলেন, "আমার নিজের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা কাজ করবার মতলব আছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই কাজে অনেকটা সাহায্য করতে পাব।" স্বামিজী স্পষ্ট ভাবেই আজ তাঁহাকে কাজেব সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাইলেন—মার্গারেটের প্রাণের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। কি কাজ—স্বামিজীর কি সংকল্প তিনি কিছুই জানেন না—জানিতেও চাহিলেন না। নিবেদিতা নিজেই বলিয়াছেন—"একটা আহ্বান শুনলাম—জানি এতেই আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইবে!" কিন্তু কুমারী নোবল্ সেদিন মৌন রহিলেন। হৃদয়ে তখনও দ্বন্দ্ব চলিতেছেন—কি করিবেন? ইংলণ্ডেও তিনি শিক্ষাব্রতে ব্যাপৃতা। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুগৃহে স্বামিজীর সহিত ঘন্টাখানেকের জন্য মিলিত হইলেন—অতিথিরূপে। মার্গারেট জানাইলেন যে, তিনি স্বামিজীর প্রস্তাবিত কাজে যোগদান করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া স্বামিজী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ধীর শান্তভাবে বলিলেন "আমার স্বদেশের কাজ করতে যদি আবশ্যক হয় আমি দু'শোবার জন্ম নিতে প্রস্তুত—এই কাজ যা আমি আরম্ভ করেছি।" কুমারী মার্গারেট নোবল্ যখন ভারত আসিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন, তখন স্বামিজী কাঁজের কোন প্রলোভনের ছবি, নাম-যশ-খ্যাতি তাঁহার সম্মুখে ধরেন নাই। তিনি চিঠিতে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়াছিলেন,—"তোমাকে কোটি কোটি অর্ধনগ্ন নরনারীর সংস্পর্শে আসতে হবে—ভয় বা ঘৃণায় তারা তোমাকে শ্বেতাঙ্গ বলে এড়িয়ে চলবে—বিকট দেশাচারের সংস্কারে, জাত আর স্পর্শদোষের ভয়ে। আবার ভারতের শ্বেতাঙ্গের

দল তোমাকে উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত মনে করবে —তোমার গতিবিধি সন্দেহের চোখে তারা লক্ষ্য করবে। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের শীতকাল—তোমাদের দেশের গ্রীষ্মকালের মত। দক্ষিণ ভারতে যেন আগুনের হলকা! ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভারতের বড় শহর ছাড়া আর কোথাও পাবে না। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি এদেশে, ভারতবর্ষে কাজ করতে সাহস কর—তবে একশোবার তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তবে এটা জেনো "I will stand by you unto death whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it."

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিস মার্গারেট নোবল্ ভারতে আসিয়া পৌছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতা আলবার্ট হলে 'মা কালী'-সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পরে স্বামিজী দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিলে মার্চ্চ মাসে ষ্টার থিয়েটারে এক মহতী সভা হয়। স্বামিজী ছিলেন সভাপতি। নিবেদিতা সেদিন এদেশে সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন—বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কলিকাতাবাসী সর্বসাধারণ তাঁহাকে চিনিল। ঠিক এই সময়ে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। রোগের অপেক্ষা বম্বের রাজপুরুষের ও সৈনিকদের অত্যাচারের এখানে পুনরভিনয় হয় এই আশঙ্কায় দলে দলে লোক কলিকাতা ত্যাগ করিতে লাগিল। প্লেগরোগীকে ফেলিয়া আত্মীয়গণ আতঙ্কে পলাইয়া যাইতেছে। স্বামিজী দার্জিলিং গিয়াছেন—এই সংবাদে তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় পৌছিলেন। স্বামিজী প্লেগ রোগীদের সেবা এবং উক্ত রোগ যাহাতে না ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য প্রতিষেধক প্রতিকারগুলি অবলম্বন করিতে তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যসেবক ও গুরুভ্রাতাদের নিয়োজিত করিলেন। নবাগত বিদেশী মহিলাদের মধ্যে নিবেদিতা অগ্রণী হইলেন। এমন কি, প্লেগরোগীর সেবা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত বা ভীত হন নাই, যখন ভয়ে ও আতঙ্কে কেহ সেবা করিতে চাহে নাই। প্লেগের আতঙ্ক চলিয়া গেলে মহানগরী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নিবেদিতা ও মার্কিন শিষ্যাদের লইয়া স্বামিজী নাইনিতাল, আলমোড়া এবং পরে কাশ্মীর-ভ্রমণে গেলেন। নিবেদিতা "The Master as I saw Him"-গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে স্বামিজীর আলাপ-আলোচনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভ্রমণেই নিবেদিতার সর্বতোভাবে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসাধনার মর্মবোধ হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় চিন্তা, রাষ্ট্রীয় উন্নতির উপায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সর্ববিধ কল্যাণের পথ স্বামিজী তাঁহার এই মানসী কন্যাকে শিখাইয়া ভবিষ্যৎ কার্যের উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামিজী যে অগ্নিমন্ত্রে নিবেদিতাকে দীক্ষিত করিয়াছেন, যে আগুনের সুরে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কবির ভাষায় বলিতে গেলে - "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে—সবখানে—সবখানে।" ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধে তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। রাষ্ট্রক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মনস্বী নেতা, সাহিত্যক্ষেত্রে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ, নবচিত্রকলায় আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র, বঙ্গভাষার ইতিহাস-রচনায় দীনেশচন্দ্র, শ্রেষ্ঠ জাপানী শিল্পবিশারদ ওকাকুরা সকলেই তাঁহার সহায়তা, পাইয়াছেন—তাঁহার অপূব প্রতিভা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচারশক্তি এবং তাঁহাব বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া নবালোকে তাঁহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এই মহীয়সী তপস্বিনীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতার নানা স্মৃতি মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ প্রবন্ধে আমাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। যখন টাউন হলে তাঁহার মৃত্যুর পর স্মৃতিসভার উদ্যোগ হইতেছিল—তখন আমাকে স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন, "এঁর স্মৃতিসভা তাড়াতাড়ি একটা গোলমালে সারবেন না। এখন সম্রাটের আগমনে হৈ চৈ চলছে; এটা থেমে গেলে তাঁর স্মৃতিসভা আহ্বান করবেন। নিবেদিতার মত প্রতিভাশালিনী নারী জগতে দুর্লভ।" স্মৃতিসভায় রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন।

উপসংহারে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট নিবেদিতা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি: "নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উঁচুতে। তাঁর ত্যাগ অতুলনীয়—কি ত্যাগ তিনি করেছেন তা এদেশের লোক বুঝবে না। সাহিত্যে, বর্তমান যুগের সমস্যাসমাধানে, নানা-বিষয়িণী বিদ্যায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। যদি তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে থেকে কাজ করতেন—যশ-মান-প্রতিষ্ঠা-ঐশ্বর্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত; আজ তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ শোক প্রকাশ করতো। কিন্তু তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে এই দেশকে এমন আপনার করে নিয়েছিলেন যা এদেশে বড় বড় নেতার মধ্যেও দেখতে পাবে না। তাঁর সঙ্গে গঙ্গার তীরে যেতে যেতে দেখতুম তিনি এক টুকরো পাথর, একটা পুতুল, একটা জীর্ণ ভাঙ্গা মন্দির দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এমনি ভালবাসতেন তিনি এই দেশকে। তাঁর মত দৃষ্টি, তাঁর মত সৌন্দর্য-বোধ, তাঁর মত গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁর মত শিল্পী মন আমাদের দেশে কারো নেই। সময়ে সময়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী দেখে অবাক হয়েছি—মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি তাঁর শ্রেষ্ঠতাকে। বোসপাড়ায় একটা ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়ীতে অর্ধাহারে—প্রায় অনাহারে এই দেশের সেবায় তিনি তিলে তিলে আত্মদান করেছেন। কত অনুরোধ করা হয়েছে ভাল বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্য—তাঁর পুষ্টিকর আহারের জন্য। তিনি হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করছেন। দধীচির মত আত্মবলিদান, উমার মত তপস্যা যা পুরাণে কাব্যে বর্ণনা শুনেছি—তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে—ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম ঠিক রেখেছিলেন—নিবেদিতা।"

এই সর্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী তেজস্বিনী তপস্বিনীকে কি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব না?

"ধর্মের সংরক্ষণ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য বাহিরে যে সকল যুদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা তপস্বিনী-তুল্যা গৃহাভ্যন্তরবাসিনী নারীগণের শান্ত নীরব জীবন অনেক বেশী সহায়তা করিয়াছে। একনিষ্ঠাই ছিল ইঁহাদের একমাত্র গর্ব—নিখুঁত হওয়াই ছিল ইঁহাদের একমাত্র উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।"

"নূতন শিক্ষার যিনি প্রচারক তাঁহাকে আশা রাখিতে এবং একান্তভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আমাদের এই বর্তমান কালে দেশের প্রত্যেক গ্রামে আমরা এমন সব রমণী দেখিব যাঁহারা গান্ধারীর মত মহীয়সী, সাবিত্রীর ন্যায় বিশ্বস্তা ও সাহসিকা এবং সীতার ন্যায় পবিত্রা ও মাধুর্যময়ী।"

—ভগিনী নিবেদিতা

রামপ্রসাদী গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

কীর্তন যেমন বাংলার নিজস্ব কারুণ্যের গীতি-ধারা, বাউল যে রকম বাঙ্গালীর বৈরাগ্যের সুর-ধুনী, রামপ্রসাদী গানও তেমনি গত দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর ভক্তিরসের প্রবাহিণী হইয়া বহমানা। বাঙ্গালী তাহার মমতা, তাহার প্রাণের কথা কীর্তনের মতো এ গানেও প্রকাশ করিয়াছে, বাউলের মতন অনাসক্তি, ঔদাসীন্যের ভাবও এই রামপ্রসাদী গানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাউল এবং কীর্তনের রূপ ও ভাবের সম্মিলন হইয়াছে রামপ্রসাদী সুরে।

রামপ্রসাদ-সম্বন্ধে বহু গল্পই প্রচলিত আছে। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁহার জীবনের প্রামাণিক ইতিহাসও সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে গল্পগুলির মধ্যে সত্য আছে কি না সে বিষয়ে তর্ক নিষ্ফল—তবে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁহারও সাধন-মহিমায় মুগ্ধ সামসময়িক দেশবাসী যে সেগুলির প্রচার করিয়া আনন্দ পাইত তাহা সুনিশ্চিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের সঙ্গে তাঁহার গীতিবিহ্বল মাতৃমহিমা-মুগ্ধ জীবনের সাদৃশ্য বেশ আশ্চর্যজনক।

রামপ্রসাদের ধর্মমত এবং তাঁহার গানের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা-বিষয়ে অনেক জটিল আলোচনা হইয়াছে। তিনি শাক্ত সাধক ছিলেন—কালীমায়ের ভীষণ রুদ্রলীলার মধ্যে তিনি রসের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। মায়ের লীলারঙ্গে কবি শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলার অনুসরণ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের মতন ভগবতীর জন্ম, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রণলীলা, রাসলীলা প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া খোল-করতালে মত্ত দেশবাসীর সংস্কারকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই; তৎকালীন সমাজ ও চিন্তা-ধারায় এই ভঙ্গীর গান ছাড়া আর কিছু যে ভাল লাগিতেই পারে না তাহা তিনি জানিতেন।

তাঁহার নিজস্ব সুরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও কিছু কিছু রচিত হয়; ভাষায় ব্রজবুলির অনুকরণ তাঁহার বহু গানেই হইয়াছে। এখানে 'নৌকা-বিলাসে'র একটি রামপ্রসাদী গান উদ্ধৃত করিয়াছি—

ওহে নূতন নেয়ে! ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দুকূল রহিল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর
কেমন কেমন করয়ে দেয়া;
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া :
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হ'ক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হ'ল বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল।
কহিছে প্রসাদ দাস রসরাস কিবা হাস
কুলবধূর মনে বড় ভয়॥ (একতালা)

রামপ্রসাদের উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার গানের মধ্যে নানা সাধন-ভজনের গূঢ় ইঙ্গিত, তত্ত্বকথা রহিয়াছে; ষট্‌চক্র-ভেদের রহস্য নিগূহিত আছে—গান গাহিবার সময় সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। মুক্তির জন্য আকুলতা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের

জন্য উৎকণ্ঠাজনিত ব্যাকুলতা সে সবও আপাত-প্রাধান্য তাঁহার গানে পায় না—তাঁহার সুর আমাদের ছায়াঢাকা, পাখীডাকা গ্রামপ্রান্তের নির্জন কুটিরের আঙ্গিনার নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লইয়া যায়।

উমার জন্য মায়ের আর মায়েব জন্য উমার উদ্বেগ দুশ্চিন্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অপেক্ষা সাংসারিক প্রশান্তিই ঘনাইয়া উঠিয়াছে বেশি; তাহার মধ্যে কোনো কষ্ট কল্পনা নাই; আছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা—

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ,
প্রেমানন্দসিন্ধু তার পূর্ণ ইন্দু মন গজেন্দ্র আলান॥

শ্যামাসঙ্গীতের অপেক্ষা রামপ্রসাদের উমা-সঙ্গীত (আগমনী বিজয়ার গান প্রভৃতি) বাঙ্গালীর আরো ঘরের কথা—গৃহস্থঘরের প্রবাসী কন্যার পিত্রালয় আসা-যাওয়ার চিত্রটি ইহাতে বাস্তব রূপ পাইয়াছে।

সংসারের সমস্ত ভয়ভাবনার বাহিরে আছে মায়ের কোল, শত সংকটের মধ্যে একান্ত নির্ভর বিরাজ করে যেথানে—রামপ্রসাদ তাঁহার গানের সুরে সেখানেই আমাদের লইয়া গিয়াছেন। সেদিনকার রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সামাজিক উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গবাসী শ্রোতারা তাঁহার গানেই প্রথম অভয়ের, নিশ্চিন্ততার সুর শুনিয়াছিল।

রামপ্রসাদেব গানের মূল সুরটি কারুণ্যের। দুঃখবাদ ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য—বাংলা-সাহিত্যেও এই কারুণ্যের সুর যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব গানের মধ্যে বিরহের রোদন জমিয়া আছে, বাউলের গানের মধ্যে অসাফল্যের হতাশ্বাস মিশিয়া আছে, সংসার-বৈরাগ্যের করুণাধারা দেহতত্ত্বের গানের মধ্যে প্রবাহিত—রামপ্রসাদের গানেও রহিয়াছে তেমনি একটি দুঃখবাদ। দুঃখের মধ্যে তিনি জননীর স্নেহকরুণ হাতের স্পর্শে অভয়লাভ করিয়াছেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
আমি দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

সন্তানেব প্রতি জননীর স্নেহেব নাম বাৎসল্য—আর যখন ঠিক ঠিক সেই চোখেই সন্তান জননীকে পূজা করে তাহাকে বলা হয় প্রতিবাৎসল্য। রামপ্রসাদ এই প্রতিবাৎসল্যের কবি—জননী শ্যামাকে কন্যারূপে লালনপালনের নানা ছবির মধ্য দিয়া এই রসটি রূপ লইয়াছে।

রামপ্রসাদ রীতিমতো পণ্ডিত লোক ছিলেন—তাঁহার গানের মধ্যে কবিত্বশক্তির সঙ্গে বিদগ্ধতাও প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসীম ব্যুৎপত্তি এবং অপূর্ব সুররচনার ক্ষমতা গানগুলি এখনও প্রমাণ করে। তখনকার দিনে স্বরলিপি-রচনার প্রথা ছিল না; তাঁহার গানগুলি গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠেই বহিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে গান গাহিবার ঢঙ্ বা গীতিরীতি (style) লোকপরম্পরায় রূপান্তরিত হয় নাই। তিনি যেভাবে গাহিতেন আজও ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার গান গাওয়া হয়—এই রামপ্রসাদী ভঙ্গীটিই তাঁহার সুরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার গানের ঐকিকতার পরিচায়ক।

কবি নিজেই ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক—তাঁহার গান তিনিই গাহিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার সুর যে কালপ্রবাহে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা

সুনিশ্চিত—এমন কি হয়ত তাঁহার নামে প্রচলিত সমস্ত গানই রামপ্রসাদের রচনা নাও হইতে পারে। সবই শ্রদ্ধাভরে তাঁহার নামে গায়কেরা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। একসঙ্গে প্রচলিত এক গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এ কথার প্রমাণ করে; যেমন—

মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোখঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।
কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত॥

মা আমায় ঘুরাবি কত?
যেন নাক-ফোঁড়া বলদের মত।
আশিলক্ষ যোনি ভ্রমি,
পশু-পাখী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত॥
কুপুত্র অনেক হয়,
কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার,
তাড়ায়ে দেও জনমের মত॥

মায়ের সন্ধানে কাশী-কাঞ্চী গিয়া কাজ নাই—এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রায় দশটি গান আছে। কোনো কোনো গানে পাঠান্তর প্রচলিত আছে—সেগুলি বোধ হয় গায়কদের যোজনা। দ্বিজ এই উপনামে ভণিতাযুক্ত গানগুলি তাঁহার রচনা নয় বলিয়া সন্দেহ করা হয়। গানের বিষয়ের অবশ্য বৈচিত্র্য নাই; একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হইয়াছে। একমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাপান বহুগানের উপজীব্য; যথা—(১) ওরে সুরাপান করিনে আমি (পিলুবাহার) (২) রসনায় কালী কালী বলে (রামপ্রসাদী) (৩) কালী কালী বল রসনা (বসন্ত বাহার) প্রভৃতি।

বন্দে মাতরম্ গানের ন্যায় সংস্কৃত শব্দ-বহুল মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে তাঁহার কয়েকটি গান আছে। যেমন মূলতানের সুরে—

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়-ভয়চরবারিণী।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা
ভয়পারাবার-তরণী।
সগুণা নিগু́ণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা হীনমূলা
মূলাধার অমলকমলবাসিনী॥

রামপ্রসাদের গানের মধ্যে এমন সব সাংসারিক ইঙ্গিত, গ্রাম্য কানুন এবং ঘরোয়া কথা আছে যে তাহার দ্বারা এগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রাণের ধন হইয়া উঠিয়াছে—এত সহজে। ভূতের বেগার, আটাশে ছেলে, যমের ভটা, মনঘুড়ি প্রভৃতি শব্দ তাঁহার গানের খাঁটি স্বদেশীয়ানার পরিচয় দেয়।

রামপ্রসাদী গানের সুর ও তালের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেশ রেশ আছে। তাঁহার অধিকাংশ গানের সুরই একটি বিশিষ্ট রামপ্রসাদী মিশ্র ঢঙ্ এবং একতালায় রচিত। পিলুবাহার (কালীনাম জপ কর, এবং গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না) লগ্নী (মা বসন পর) জংলা (আর কাজ কি আমার কাশী) ঝিঁঝিট (অন্ন দেগো অন্ন দেগো) সিন্ধু-ঠুংরী (এমন দিন কি হবে তারা) গৌরী গান্ধার (মা মা বলে আর ডাকব না) তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গানের রাগিণী।

তখন বৈঠকী গানের দিন ছিল; স্বরবিস্তার এবং সুরবিহার করিয়া বহু কুটতান ব্যবহার

করিয়া তাঁহার গান গাওয়া চলে সেই বৈঠকী গানেরই ভঙ্গীতে। তাঁহার বহু গানের সুর ওস্তাদী ভঙ্গীতে পূর্বে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু ক্রমে গানের বিশিষ্ট রাগিণী, সুর-তাল অপেক্ষা তাঁহার বিচিত্র গীতিরীতিই প্রাধান্য পাইতে লাগিল। শেষে রামপ্রসাদের অনুসৃত গীতিভঙ্গীই একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুর-সৌষ্ঠব গ্রহণ করিল।

ঠিক এই ভাবেই আধুনিক কালে কবি রবীন্দ্রনাথের কথা, সুর এবং তাল অবলম্বনে একটি স্বতন্ত্র গীতিশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে।

রামপ্রসাদ যে সুর ধরিয়া গিয়াছেন তাহার বেশ আজো বাংলার আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কবিরা তাঁহারই সুরাশ্রয়ে গান রচনা করিয়াছেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কাঙাল ফিকির চাঁদ হইতে রবীন্দ্রনাথ, এমন কি নজরুল ইস্‌লাম পর্যন্ত উহার সুরচ্ছন্দের অনুকরণে গান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুরে কমলাকান্তের বিখ্যাত গান—

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যারে কৃপা হয় মা,
তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা॥

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত গান এই রামপ্রসাদী সুরেই রচিত। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র গান—

আমিই শুধু রইনু বাকী
যা ছিল তা চলে গেল,
রইল যা তা কেবল ফাঁকী।

স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে এই রামপ্রসাদী সুরেই কবির প্রসিদ্ধ গান—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে॥

ভারতে গ্রন্থাগার

শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায়, বি-এ, সি-লাইব্, বি-এল্-এ

(দুই)

মধ্য যুগের বাংলায় চণ্ডীমণ্ডপ গ্রন্থাগারের মতই একটি বিশিষ্ট জনশিক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলার পল্লীজীবন-গঠনে চণ্ডীমণ্ডপের স্থান তাই সেদিন পর্যন্ত আমরা অনুভব করেছি। এ যুগের গ্রন্থাগারের মত চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল বাংলাদেশের 'Community Intelligence Centre'. আনন্দের নব নবরূপে পল্লীর অন্তরে প্রাণ-সঞ্চারণের ভার নিয়েছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ। সুখে দুঃখে ভালয় মন্দয় বিপদে আপদে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল গ্রাম-সভ্যতার মর্মস্থল। সে যুগে আক্ষরিক শিক্ষা কতদূর প্রসারিত ছিল, কতটা সর্বাঙ্গীণ ছিল জানা যায় না, তবে নীতি ও সৌন্দর্য-বোধের সাধনায় মোটামুটি একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে চণ্ডীমণ্ডপ এক সময়ে বিশেষ সাহায্য করেছে। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-পাঠের

মধ্য দিয়ে পল্লীর রসজীবন ও জ্ঞানজীবন পরিপূর্ণতার পথে ও সামঞ্জস্যের পথে এগিয়ে দিত এই চণ্ডীমণ্ডপ। মোটামুটি একথা বলা যায় যে, সে যুগে আমাদের দেশে এই চণ্ডীমণ্ডপের মত লোক-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে যে দেশের সর্ব-সাধারণের মানসিক খোরাকের ব্যবস্থা ছিল তা একেবারে অপূর্ণ নয়। শুধু মানস খোরাকের ব্যবস্থাই নয়, বা সমাজের জ্ঞানময় দেহের পরিপুষ্টিই নয়—সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক বোধ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল। সন্ধ্যায় সংকীর্তন ও ভজন যেমন পল্লীবাসীর হৃদয়ে একটা সুন্দর আনন্দবোধ জাগিয়ে তুলত তেমনি এই চণ্ডীমণ্ডপেই সেযুগে বসত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভা-সমিতি। সামাজিক অন্যায়ের শাস্তিবিধান করার ভারও গ্রহণ করেছিল চণ্ডীমণ্ডপ। যে কোন নৈতিক বা সামাজিক অপরাধের বিচারসভা হত এই চণ্ডী-মণ্ডপে। তাছাড়া সারাদিনের কর্মের শেষে সকলের মিলিত প্রীতি-সম্পর্কে এখানে যে বসত একটি সান্ধ্য মজলিস—তা নানাদিক থেকে সামাজিক মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপোষকতা করত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগে এমন কি ব্রিটিশ যুগের প্রথম ও মাঝামাঝি পর্যন্তও চণ্ডীমণ্ডপ বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যা অনায়াসে এ যুগের শুধু গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। তবে আজ আর চণ্ডীমণ্ডপের সে যুগ নেই। নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে চণ্ডীমণ্ডপ তার ভূমিকা অভিনয় করে আজ বিস্মৃতির অন্তরালে পা বাড়িয়েছে।

নতুন যুগের আগমনের সঙ্গে আমরা এই চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তে আজো কিছু পেলাম না আমাদের জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবনের পরি-পূর্ণতার জন্য। অবশ্য একথাও ঠিক যে আজ আর চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়া ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাছাড়া সে যুগের মত বইয়ের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করা আজ অসম্ভব। যুগ-অগ্রগতির সঙ্গে বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপের ভূমিকাটি গ্রহণ করতে পারে—সুপরিচালিত জন-গ্রন্থাগার। যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে গোটা জগৎ আজ অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গেছে। সুখে দুঃখে বেদনায়, প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ পরস্পরের প্রতিবেশী। নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করলেও নেহাত বাঁচবার জন্যই আজ গোটা পৃথিবীর খোঁজ-খবর রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য আজ একটি প্রাত্যহিক ঘটনা শুধু নয়, একান্ত প্রয়োজন। আর এই বিরাট পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ জানাব একমাত্র পথ বইয়ের খোলা পাতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য—সব দিক থেকেই আজ বইয়ের রাজ্যের খবর মানুষকে রাখতে হচ্ছে। সমস্ত মানুষের যুগ-যুগান্তের জ্ঞানময় সত্তাটির পরিচয় বহন করছে এই সমস্ত বই। সুতরাং বই বা গ্রন্থ ছাড়া আজকের জগতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। নিত্যকার প্রাণধারণের জন্যও মানুষকে বইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কাজেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পথে গ্রন্থ তথা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা আজ বইয়ের পাতায় রূপায়িত।

গ্রন্থাগার প্রতিটি মানুষের জন্য। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন গ্রন্থঘরের সিংহদরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। বইয়ের মাধ্যমে ছাড়া আজ আর মানুষের মনোজগতের খবর জানার উপায় নেই। এখানে স্বভাবতই গ্রন্থের প্রয়ো-জনের সঙ্গে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনের কথাও এসে পড়ে। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ে পঞ্চ-তন্ত্রের সুবিখ্যাত শ্লোকটি—

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং তথা গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

সত্যই এই অনন্ত জ্ঞানজগৎ থেকে সারটি বেছে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েই এই সুলভ ছাপাখানার যুগে গ্রন্থাগারিকের আবির্ভাব। জয় হোক গুটেনবার্গের,—সহজ ছাপাখানার আশীর্বাদে আজ গ্রন্থজগৎ এত বহুবিস্তৃত যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থারণ্যে প্রবেশ করে আপন পথটি খুঁজে পাওয়া এক বিষম সমস্যা। এখানেই গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। আদর্শ পথ-প্রদর্শকের মত গ্রন্থাগারিক গ্রন্থজগতে মানুষের হাত ধরে নিয়ে যান তার গন্তব্যপথে। প্রতি মুহূর্তে আজ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বই ছাপাখানার লৌহযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের প্রতিটি বিভাগ আজ বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর হচ্ছে। এই লক্ষ লক্ষ বইয়ের মাঝে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই নিজেকে অসহায় বোধ করে এবং গ্রন্থাগারিক আপনার সঙ্কেত-আলোটি হাতে নিয়ে মানুষকে জ্ঞানের পথের নির্দিষ্ট রাস্তাটি দেখিয়ে দেন।

গ্রন্থাগার আজ বিভিন্ন দেশে খাওয়া-পরার মতই একটা নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 3 H-এর উৎকর্ষসাধন (অর্থাৎ head, hand and heart) যদি মানুষের পরম আদর্শ হয়, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দেহের পরিপূর্ণ পরিণতি জীবনের লক্ষ্য হয়—তবে আজকের এই বিংশ শতকে কোন রাষ্ট্রই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারে না। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ আজো এই গ্রন্থাগার-আন্দোলনে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন না। অথচ আমাদের এই শতকরা আশী জন অশিক্ষিতের দেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। পরিপূর্ণ শিক্ষা ছাড়া যেমন গণতন্ত্র (Democracy) ব্যর্থ, তেমনি গ্রন্থাগার ছাড়া জনশিক্ষার আর কোন পথ নেই। তাই ইংলণ্ডে জনশিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাগার আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিধিবদ্ধ হয়। আমেরিকায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় তারও আগে। অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতেও অনেকদিন হল গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। ওদেশের বড় বড় রাষ্ট্রকর্ণধারগণ জানতেন মানুষের শিক্ষার পথে, পরিপূর্ণ নাগরিক গড়বার পথে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন কতটা; তাই দেখতে পাই সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের ছিল একটি বিশেষ স্থান।

স্কুল-কলেজের শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট বয়সে বাঁধাধরা পদ্ধতিতে চলে, কিন্তু গ্রন্থাগারের শিক্ষা সর্ব মানুষের সকল সময়ের জন্য। স্কুল-কলেজে আমরা লেখাপড়া শিখি, কিন্তু চর্চার অভাবে আমরা তা আবার অনায়াসেই ভুলে যাই। কিন্তু গ্রন্থাগার আমাদের এই অর্জিত শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ে আমরা শিখি, আর গ্রন্থাগার আমাদের শিক্ষিত রাখে। এই শিক্ষিত রাখার দায়িত্ব যে কত বড় ও কত প্রয়োজনীয় এ তথ্য আজ বোঝবার সময় এসেছে।

একদিক থেকে রাজনীতির গোড়ার কথা এই গ্রন্থাগার আন্দোলন। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের পূর্ণ দায়িত্ব নির্ভর করে সুশিক্ষিত কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিকের উপর। এই আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের দান যে কতটা তা আজ একটি উপলব্ধ সত্য। আজকে ওয়াশিংটনের উজ্জ্বল আলোয় বা লেক সাক্‌সেসের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে বিশ্বসভার আয়োজন চলেছে, সেখানে আমাদের মর্যাদাপূর্ণ আসনটি নিতে হলে

আমাদের রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। এই জনশিক্ষার কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে গ্রন্থাগারের কথা। জনশিক্ষার বাহন এই গ্রন্থাগার। শ্রীনেহেরুর সমস্ত শান্তিবাণী "শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"—যদি না আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তর থেকে দূর না হয় অশিক্ষার বন্ধন। মুক্তমনা নাগরিকই এযুগে রাষ্ট্রের ভিত্তি। আমাদের সে ভিত্তিই নেই; এই ভিত্তিহীন রাষ্ট্র নিয়ে—এই দেশ জুড়ে অশিক্ষা ও অন্ধকার নিয়ে যতই আমরা বিশ্বশান্তি আর মৈত্রীর কথা, নিরপেক্ষনীতির কথা বলি কেউই আমাদের সেকথা শুনবে না—যতক্ষণ না আমরা নিজেরা সুস্থ সবল হয়ে উঠি। অশিক্ষিত মানুষ নিয়ে এযুগে রাষ্ট্র অচল। তাই সুষ্ঠু রাষ্ট্র-পরিচালনের জন্য—সার্থক ডেমোক্রেসীর (Demo cracy)-র জন্য—আজকে দেশে গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন।

শিশুর মনে নব নব সৃজনীশক্তির বিকাশের জন্যও গ্রন্থাগারের (Children's library)-র একটি বিশেষ অবদান আছে। শিশুমন সদা ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল—একে উপযুক্ত রসের যোগান না দিতে পারলে অবশ্যই বিপথে চালিত হয়ে অপমৃত্যু ডেকে আনবে। আমাদের হতভাগ্য দেশে চোখের উপর তাই দেখছিও। অথচ আমাদের সমাজের শিক্ষাবিদেরা এ সমস্ত সম্বন্ধে আজো দৃষ্টি দিচ্ছেন না। একমাত্র লণ্ডন শহরে কয়েক হাজার শিশু-গ্রন্থাগার আছে। এইসব গ্রন্থাগারে ছোটবেলা থেকে শিশুদের বইয়ের সম্বন্ধে যাতে উৎসাহ ও ভালবাসা জাগে তার ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচিত সিনেমা, lantern slides প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রয়োজনীয় ও তথ্যপূর্ণ জ্ঞান ও সংবাদ রসের সঙ্গে মিশিয়ে শিশুদের পরিবেশন করা যায়। শুধু ওদের দেশে নয় আমাদের দেশেও আজ শিশুদের সন্ধ্যাবেলা গল্প বলার মত দিদিমারা ঠাকুরমারা আর নেই। অথচ এই রূপকথা শোনার আগ্রহ আজো শিশুদের সমানই আছে এবং এই রূপকথার মাধ্যমে শিশুচিত্তের গঠনোপযোগী নানা তথ্যও সরবরাহ করা যায়। তাই ওদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এই সব গ্রন্থাগারে Story Hours (গল্পের আসর)-এর বন্দোবস্ত আছে। সুশিক্ষিতা ও সুযোগ্যা নারী গ্রন্থাগারিকাই এই দুরূহ কর্তব্যটি সম্পন্ন করেন ওদেশে। আমাদের কর্পোরেশনের আয় পৃথিবীর যে কোন দেশের পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বড় শহর কলকাতায় শিশুদের বা বয়স্কদের জন্য কোন একটি সত্যিকারের জনগ্রন্থাগার নেই। এই সেদিন UNESCO-র দয়ায় দিল্লীতে ভারতের প্রথম জনগ্রন্থাগারের জন্ম হল।

ছাত্র বা শিক্ষক শুধু নয়—সমাজের যারা অবজ্ঞাত, ঘৃণিত বলে দূরে স্থান পাচ্ছে—যেমন কয়েদী, অর্ধ-উন্মাদ, শিশু-অপরাধী, অন্ধ, বোবা প্রভৃতি,—তাদের জন্যও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার অনেক কিছু করতে পারে। সুনির্বাচিত পুস্তকের সহায়তায় এদের মনের রোগগুলিকে অনায়াসে দূর করা যেতে পারে। U. S. S. R. এর Correction House এর সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগারগুলি আজ এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছে। রোগীর জন্য পর্যন্ত আজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনেক মানসিক ব্যাধির অবসান হয়—এই বইয়ের সাহায্যে। অবশ্য এই সব গ্রন্থাগারের পিছনে সব সময়েই একজন সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন, যিনি যাচাই করে উপযুক্ত বইটি বিভিন্ন স্তরের মানুষের হাতে তুলে দেবেন। শুধু এদের জন্যই নয়—আজকের সুলভ ছাপাখানার জগতে গ্রন্থাগার-পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব বিরাট। সে সম্বন্ধে এখানে বলার আর অবকাশ নেই। তবে এই কথাটি বলে আজ এ প্রবন্ধের শেষ করা যেতে পারে যে—আজকের যুগে প্রত্যেক সমাজে গ্রন্থাগার খাওয়া পরার মতই একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। বিশেষ করে আমাদের এই অশিক্ষাময় দেশে অন্ধ মানুষকে আলোকের পথ দেখাতে গ্রন্থাগার-রূপ আলোক-স্তম্ভের প্রয়োজন একান্তভাবেই। দেশজুড়ে অশিক্ষামেধ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে এ দেশকে কল্যাণের পথে, আনন্দের পথে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার।

সাতজন্মের সতী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু, এম্‌-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ

(গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট শ্রুত এবং সত্য বলিয়া কথিত কাহিনী-অবলম্বনে)

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তারিণীচরণ চক্রবর্তীর বিয়ে হচ্ছে। গ্রামের বহুলোক বরযাত্রী গেছে। পুরোহিত আদেশ দিলেন,—'শুভদৃষ্টি হবে।'

শুভদৃষ্টির জন্য যেমন বরকনের মুখে ঢাকা দেওয়া হলো—অমনি কনে যোগমায়া বরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠ্‌লেন।

তারিণীচরণের অত্যন্ত রাগ হলো। বিয়ে শেষ হয়ে গেল। বিয়ে করে তারিণীচরণ কনেকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসেই তিনি বলে বসলেন—'ও মেয়ে আমি নেব না।'

গুরুজনদের পীড়াপীড়িতে তারিণীচরণ ঘটনাটি প্রকাশ করে বললেন—সকলেই কনের আচরণ শুনে অবাক হয়ে গেল। সাতে পাঁচে গৌরীদানের যুগ। কনের বয়সও খুব কম। অনেকে তারিণীচরণকে বোঝাল—'ছেলেমানুষ মেয়ে—কোন কাণ্ডজ্ঞান হয় নি—হঠাৎ খেয়ালবশে এরকম কাজ করে ফেলেছে।'

কিন্তু তারিণীচরণের এক জিদ—হয় মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হোক—নয়ত তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে বালিকা-বধূ যোগমায়া এই সব দেখে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছেন। তিনি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বললেন,—'আমায় যদি ছেড়ে দিলে ভাল হয়,—ছেড়েই দেবেন।. তবে আমি ওঁর সঙ্গে আড়ালে একবার আলাপ করতে চাই।'

তারিণীচরণ তাতেও নারাজ।

কনেকে ছাড়তে হয় ছেড়ে দেওয়া হবে,—কিন্তু একটা কথা শুনতে দোষ কি? সকলে খুব জিদ করায়—তারিণীচরণ একটু আড়ালে গিয়ে কনের সঙ্গে দেখা করলেন।

যোগমায়া বললেন,—'আপনার কাণ্ডখানা কী? আমাকে সব কথাই খুলে বলতে হবে দেখছি। আপনার কি স্মরণ নেই—গত ছয় জন্ম ধরে আপনি আমার স্বামী?'

তারিণীচরণ অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন,—'না, আমার কিছুই স্মরণ হয় না।'

তখন যোগমায়া একে একে অতীত জন্মগুলির কথা বললেন। তার মধ্যে দুই জন্মের ঘটনা পাশাপাশি গাঁয়ের। বাকি চার জন্মের ঘটনা বহুদূরের। প্রতি জন্মে কাজললতাখানি তিনি কোথায় পুঁতে রেখেছেন, বলে দিলেন। কিন্তু সাবধান করে দিলেন,—যেন এ সব কথা প্রকাশ না করা হয়।

কিশোরী বালিকার মুখে তারিণীচরণ যে-সব কথা শুনলেন, তাতে তাঁর কৌতূহল বেড়ে উঠল। তিনি পরদিনই নিকটবর্তী সেই গ্রামগুলিতে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা খুঁড়ে কাজললতা দু'খানি উদ্ধার করলেন।

যোগমায়ার পিত্রালয় অনেক দূরে। তবু নিকটবর্তী গ্রামে তিনি যে দম্পতীদের কথা বলেছেন,—গ্রামবাসীদের মুখে তারিণীচরণ অবিকল তাঁর মুখের কথা শুনলেন।

তারিণীচরণ যোগমায়াকে নিয়ে পরমশান্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। তিনি একজন প্রচ্ছন্ন যোগী ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সহধর্মিণী তাঁর ধর্মচর্যায় প্রধান সহায় ছিলেন।

যোগমায়া ছিলেন আদর্শ স্বামিপরায়ণা রমণী। প্রতিদিন ভোরে স্নান করে এসে স্বামীর পাদোদক পান করে গৃহকর্মে মন দিতেন। তাঁর যেমন রূপ—তেমনি সকলের প্রতি অকপট স্নেহ। গ্রামের সকলে তাঁকে মা-দুর্গার প্রতিমূর্তি মনে করে 'মা-ঠাকুরুণ' বলে ডাকত।

একবার গ্রামে অজন্মা হয়। আষাঢ় মাসে মেঘশূন্য আকাশ। ধুনির আগুনের মত সূর্যের কিরণ ধূ ধূ করে জ্বলছে। গ্রামের সকলে হতাশ হয়ে জমিদারের কাছে এল। জমিদার ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধানকে ডেকে বুড়োশিবের মন্দিরে জলস্বস্ত্যয়ন করতে বললেন। পর পর তিন দিন জলস্বস্ত্যয়ন হল,—তবু আকাশে মেঘের চিহ্ন দেখা গেল না।

ব্রাহ্মণেরা তখন জমিদারের কাছারীতে সমবেত হয়ে বললেন,—'আমাদের ইচ্ছা আর একবার জলস্বস্ত্যয়ন হোক।'

জমিদার বল্লেন,—'তিন দিন স্বস্ত্যয়ন হল,—তাতে ফল হল না—আর একদিন করলেই হবে ?'

স্বস্ত্যয়নে যিনি প্রধান আচার্যের কাজ করেছিলেন, তিনি বল্লেন,—'একদিন তারিণীচরণ চক্রবর্তীকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করানো হোক্।'

সমবেত ব্রাহ্মণসমাজ একসঙ্গে তাঁর বাড়ীতে হাজির হলেন। তারিণীচরণ তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি দাওয়ায় কম্বল বিছিয়ে বসে ছিলেন। সকলে তাঁকে জমিদারের কাছারীতে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ব্রাহ্মণদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি লাঠি ধরে কাছারীতে এসে হাজির হলেন। স্বস্ত্যয়নের কথা নিবেদন করা হলো। প্রথমতঃ তাঁর বয়সের দোহাই দিয়ে তারিণীচরণ বিস্তর আপত্তি করলেন,—কিন্তু সকলের জিদ দেখে শেষে তাঁকে মত দিতে হল। তিনি বললেন,—'আমার সঙ্গে আর কাকেও থাক্‌তে হবে না। কিছু ফুল বেলপাতা শিবঘরে যেন দিয়ে আসা হয়।'

পরদিন সকালে স্নান করে তারিণীচরণ শিবঘরে ঢুকলেন। যথাবিধি পূজার্চনা করে তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন বেলা অনেকটা হয়েছে,—আকাশে প্রখর সূর্য হাসছে। বেরিয়ে এসেই সমবেত সকলকে বললেন,—'আমি একটু তফাতে বসব, আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।'

তারিণীচরণ কিছু দূরে সূর্যের দিকে মুখ করে সোজা হয়ে ব'সে ধ্যানস্থ হলেন। দুপুর পেরিয়ে গেল। ক্রমে সূর্য পশ্চিমদিকে হেল্‌লেন;—তারিণীচরণ স্থিরভাবে বসে আছেন।

হঠাৎ বায়ুকোণে একটু মেঘের সঞ্চার হলো। মুহূর্তমধ্যে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হলো। বহুক্ষণ ধরে প্রবলবেগে বৃষ্টি হলো; ধ্যানস্থ তারিণীচরণের কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল।

তখন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা যোগমায়াদেবীকে সংবাদ দিলেন। তিনি এসেই স্বামীর চরণে প্রণাম করে তাঁর পদ্মাসন ভেঙ্গে দিলেন।

তারিণীচরণ চোখ মেলে যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বৃষ্টি হয়েছে ?'

আরও কিছুদিন পরে তারিণীচরণ ধ্যানস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। যোগমায়া বাড়ীর সামনে চিতা সাজাবার জন্য সকলকে বললেন।

যখন চিতা সাজানো হলো,—তখন যোগমায়া দেবী চওড়া-আলতা-পেড়ে শাড়ী পরে, কপালে সিন্দুর ও পায়ে আল্‌তা দিয়ে, সহাস্যমুখে এগিয়ে এলেন। সকলে তাঁকে যেন নূতন করে দেখল। কী রূপ, কী জ্যোতিঃ—যেন স্বয়ং দেবী ভগবতী আবির্ভূতা হয়েছেন !

যোগমায়া দেবী স্বামীর শব কোলে নিয়ে, বাঁ হাতে বেলডাল দোলাতে দোলাতে চিতায় বসলেন। বসেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আগুন দিতে বললেন।

অগ্নিদেব হেসে উঠলেন। সমগ্র জনতা দেখল ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাটি হতে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বে আকাশে যোগমায়া বসে আছেন,—তাঁর হাতে বেলডাল, কোলে মৃত স্বামী।*

* আখ্যায়িকার স্থান বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস্ থানার অন্তর্গত দিঘল নামক গ্রাম। পথের ধারে একটি তেঁতুলগাছের তলায় সতীর চিতা যেখানে হইয়াছিল ঐ স্থানের মাটি এখনও সকলে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। অনুমান ইহা দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ঘটনা—তখন সতীদাহপ্রথা সহজ ভাবে প্রচলিত।

কুম্ভকোণম্

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাবেরীর তীরে গো-সমাজে ময়ুরম্-তীর্থে শিব (ময়ূরনাথ) দর্শন করিয়া বেদাবন (বেদারণ্যন্) আসিয়া তথায় মহাদেব-দর্শন করেন। তৎপরে 'অমৃতলিঙ্গ' শিবদর্শন প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে, তাহা কুম্ভকোণমের শিবলিঙ্গের কথা বলিয়াই মনে হয়। কুম্ভকোণম্ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান তীর্থ। এখানে অসংখ্য শিব ও বিষ্ণুর মন্দির আছে। তন্মধ্যে কুম্ভেশ্বর-স্বামী, সোমেশ্বর-স্বামী ও নাগেশ্বর-স্বামী এই তিনটি শিবের মন্দির এবং শার্ঙ্গপাণিস্বামী, চক্রপাণি-স্বামী ও রাম-স্বামী—এই তিনটি স্বয়ম্ভু বিষ্ণুর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভকোণমে বেদাধ্যয়ন ও বিশেষরূপে সংস্কৃত-চর্চা এবং প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ মুদ্রণ ও প্রকাশার্থ বহু মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থাগার দৃষ্ট হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন ফার্লং দূরে শহরের দিকে কুম্ভকোণম্ পোষ্টাফিসের নিকট 'মহামথকুলম্' নামক একটি বিশাল সরোবর বিরাজমান। ইহার পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর তটে চারিটি করিয়া ১৬টি শিব-মন্দির আছে। বিশাল দীর্ঘিকা সর্বত্র প্রস্তরমণ্ডিত সোপান ও চত্বরে ভূষিত। প্রত্যেক বৎসর মাঘমাসে এখানে একটি বিরাট মেলা হয়। দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে এখানে মহা-মাঘোৎসব হইয়া থাকে। তখন এই সরোবরে স্নান করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৯।৭৪-৭৬

উক্ত ষোলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির মহামথকুলের উত্তর তীরে অবস্থিত। তাহাতে লিঙ্গ-স্বরূপ শিব, বিশালাক্ষী নামক পার্বতী এবং গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, সরস্বতী, কাবেরী, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা ও সরযূ—এই নবকন্যকার মূর্তি বিশ্বনাথের গর্ভমন্দিরের উত্তর পশ্চিমকোণে অবস্থিত। কথিত হয় যে, এই নয় নদী ঈশ্বরকে এই স্থানে দর্শন করিতে আসিয়া এখানেই রহিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের মতে প্রলয়কালে এক কুম্ভ অমৃত মহামেরু-পর্বতের গাত্রে শিকায় করিয়া ঝুলান ছিল। প্রলয়ের জল বাড়িতে বাড়িতে শিকা স্পর্শ করিল। কুম্ভ শিকা হইতে বাহির হইয়া জলে ভাসিতে লাগিল এবং ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণ দিকে চলিল। পরে প্রলয়ান্তে জল শুষ্ক হইয়া গেলে কুম্ভ একস্থানে পড়িয়া থাকিল। কুম্ভের ঘোণ অর্থাৎ কাণা ভাঙ্গিয়া গিয়া অমৃত পতিত হইতে থাকিল। তখন শ্রীশম্ভু সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া অমৃত পান করিলেন। অমৃত পড়িয়া ঐ স্থান পবিত্র হওয়ায় উহাকে তীর্থভূমি জানিয়া শ্রীশম্ভু ঐ স্থানে লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। অমৃতপান করিয়াছিলেন বলিয়া শিব অমৃতলিঙ্গ ও অমৃতকুম্ভের ঈশ্বর 'কুম্ভেশ্বর' নাম ধারণপূর্বক তথায় নিত্য পূজিত হইতে থাকিলেন। কুম্ভের ঘোণ বা কাণা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানের নাম হইলে 'কুম্ভঘোণম্' বা 'কুম্ভকোণম্'।

'কুম্ভেশ্বর' শিবের মন্দির অতি বিরাট।

ইহার গোপুরমটি ১২৮ ফুট উচ্চ ও উৎকীর্ণ নাগলীলা-মূর্তিসমূহে বিভূষিত। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় মন্দিরের সমস্ত স্থান সুশোভিত। গর্ভমন্দিরে 'কুম্ভেশ্বর স্বামী' নামক অমৃতলিঙ্গ শিব ও ঈশ্বরী 'মঙ্গলাম্বিকা' অধিষ্ঠিতা।

সোমেশ্বর-শিব—কুম্ভকোণম্ বাজারের নিকটে এই প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। কথিত হয়, সোম অর্থাৎ চন্দ্র এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। এখানে পার্বতীর নাম 'সোম-সুন্দরী'। আদি শৈব ব্রাহ্মণগণ বংশপরম্পরাক্রমে এই লিঙ্গের পূজা করিয়া আসিতেছেন। প্রবাদ রাজরাজ চোলনৃপতি সোমেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন।

নাগেশ্বর শিব—এই শিবের মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। মন্দির পূর্বাভিমুখী নাগেশ্বরলিঙ্গের উপর ফণাধারী সর্প বা নাগ শোভিত রহিয়াছে। নাগেশ্বরের মন্দিরটি এইরূপ কৌশলে নির্মিত হইয়াছে যে, বহুদূর হইতে গোপুরম্ ও সুদীর্ঘ অট্টালিকাশ্রেণী ভেদ করিয়া সূর্যকিরণ লিঙ্গের উপর বৎসরে তিন দিন পতিত হয়। ঐ দিন সূর্যদেব যেন শ্রীনাগেশ্বরের আরাধনা করেন। শিবলিঙ্গের প্রধানা নায়িকা দক্ষিণাভিমুখী। স্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে জানা যায়,—এই স্থানটি জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। 'রামালিঙ্গী স্বামী' —নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসী এই মন্দির সংস্কার করেন।

শ্রীশার্ঙ্গপাণি-স্বামী—শ্রীনাগেশ্বর-শিবমন্দিরের পশ্চিম-উত্তরে অল্পদূরে শ্রীশার্ঙ্গপাণি-বিষ্ণুর বিশাল মন্দির অবস্থিত। ইহা মধ্যরঙ্গম্-নামে কথিত। মন্দির পূর্বাভিমুখী, প্রবেশ-পথে দক্ষিণদিকে শ্রীশঠকোপ, শ্রীমধুরকবি ও তিরুমান্ (মুনিবাহ) আলবরের অচল শ্রীমূর্তি ও সচল উৎসব-মূর্তি; পূর্বদিকের পৃথক প্রকোষ্ঠে শ্রীসারযোগী (পয়গই আল্‌বর), শ্রীভূতযোগী (পূদত্ত আল্‌বর) ও শ্রীভ্রান্তযোগী (পে-আল্‌বর) এই আলবরত্রয়ের মূর্তি; সংলগ্ন অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ও শ্রীপরকালস্বামী; দক্ষিণে পৃথক প্রকোষ্ঠে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত, শ্রীনাথমুনি ও শ্রীযামুনমুনি এবং অন্য দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীভক্তিসার, শ্রীকুলশেখর ও শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ এবং তৎসংলগ্ন অন্য মন্দিরে শ্রীবেদান্তদেশিক প্রমুখ আল্‌বর ও আচার্যগণের মূর্তি নিত্য পূজিত হইতেছে।

শ্রীশার্ঙ্গপাণি-মন্দিরের শতস্তম্ভমণ্ডপের অভ্যন্তরে উত্তরদিকে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীসীতা ও শ্রীবজ্রাঙ্গজী; অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাজগোপাল-মূর্তি, বামে শ্রীসত্যভামা ও দক্ষিণে শ্রীরুক্মিণী। শ্রীশার্ঙ্গপাণির মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পূর্ব দিকে চণ্ড ও প্রচণ্ড নামক দুইটি দ্বারী; মূল-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে লোকমাতা—মহালক্ষ্মী। মূল মন্দিরটি একটি প্রস্তরের রথাকারে নির্মিত ও খোদিত প্রস্তরচক্রের উপরে অবস্থিত। গর্ভমন্দিরে শেষনাগশয্যায় অর্ধশয়ান দ্বিভুজ কৃষ্ণ-প্রস্তরময়ী বিশাল শ্রীমূর্তি। মহাবিষ্ণুর দক্ষিণ বাহু উপাধানরূপে ও বামবাহু আজানুলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। নাভিকমলে ব্রহ্মা, শ্রীচরণকমলে মূর্তিমতী সপ্তনদী; পার্শ্বে ত্রিংশৎ কোটি দেবতা মহাপুরুষের স্তব করিতেছেন। মহাপ্রভুর পদতলে ভূ-শক্তি ও মস্তকের দিকে শ্রী-শক্তি। মহাবিষ্ণু দক্ষিণ দিকে শিরোদেশ ও উত্তরদিকে স্বর্ণকবচাবৃত শ্রীচরণকমল স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমুখারবিন্দ পূর্বাভিমুখী। সম্মুখে স্বর্ণধাতুময়ী উৎসব-মূর্তি। ইনি চতুর্ভুজ; হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা ও অভয়-মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন। যে হস্তে গদা ধারণ করিয়াছেন, সেই হস্তেই স্বর্ণনির্মিত মণিমাণিক্য-খচিত শার্ঙ্গ (ধনুক) ধরিয়া আছেন। উৎসববিগ্রহের দক্ষিণে শ্রীদেবী ও বামে ভূদেবী। বামপার্শ্বে বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ ও অভিষেক-বিগ্রহও রহিয়াছেন।

শ্রীশার্ঙ্গপাণির রূপবর্ণনার পর নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় এখানে পূজকগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন—

ত্রিংশত্ত্রিকোটি-বসু-রুদ্র-দিবাকরাদি-
দেবাদিদেবগণ-সন্ততসেব্যমানম্।
অম্ভোজসম্ভব-চতুর্মুখগীয়মানং
বন্দে শয়ানমিহ ভোগিনি শার্ঙ্গপাণিম্॥
উত্তানশায়িনমুদারকিরীটচূড়ং
উৎফুল্লপদ্মনয়নমুপধানবাহুম্।
আজানুবাহুমমলং ফণিরাজতল্পে
শার্ঙ্গেশমচ্যুতমহং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥*

শ্রীচক্রপাণি-স্বামী:—শ্রীচক্রপাণি স্বামীর মন্দির উচ্চ পীঠোপরি অবস্থিত। কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া মূলমন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে প্রবেশ করিতে হয়। গোপুরমের পর চত্বর, তৎপরে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত পূর্বাভিমুখী মণ্ডপ ও মন্দির। মন্দিরের চতুর্দিকে পরিক্রমার স্থান। মূলমন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে ছত্রপতি শিবাজীর ধাতুময়ী মূর্তি। শিবাজীই বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। চক্রপাণি মহাবিষ্ণু অষ্টভুজ। তাঁহার দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে চক্র, তন্নিম্নহস্তে খড়্গ; তন্নিম্নহস্তে পরশু ও তন্নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং বামোর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, তন্নিম্নহস্তে গদা, তন্নিম্নহস্তে পাশ ও তন্নিম্নহস্তে ধনুক। শ্রীবিষ্ণু ষট্‌কোণচক্রের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান; তাঁহার বামভাগে পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বিজয়লক্ষ্মী; দুইটি হস্তী শুণ্ডের দ্বারা লক্ষ্মীর অভিষেক করিতেছে এবং শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণভাগে পদ্মাসনা চতুর্ভুজা সুদর্শনবল্লী। চতুর্ভুজা শক্তিদ্বয়ের ঊর্ধ্ব দুই হস্তে পদ্ম এবং নিম্ন দুই হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা। মূলমন্দিরের উত্তরদিকে মহালক্ষ্মী শ্রীবিজয়বল্লীর পৃথক্ মন্দির। এই মন্দিরটি নূতনভাবে সংস্কৃত হইয়াছে। উত্তর অহোবিলমঠাধিপতি স্বামী বালমুকুন্দ তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারা এই মন্দিরটি সংস্কার করাইয়াছেন। চক্রপাণির প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ বর্তমান মডপল্লীতে (রন্ধনশালায়) শ্রীবিজয়বল্লী ও শ্রীসুদর্শনবল্লীর সহিত অবস্থান করিতেছেন।

চক্রপাণির পূজকগণ শ্রী-সম্প্রদায়ের বরগলই শাখান্তর্গত বৈষ্ণব। চক্রপাণি রুদ্রাংশ বলিয়া কথিত। কথিত হয় যে, এক সময় সূর্যদেব শ্রীবিষ্ণুর সহিত বিবাদে উদ্যত হন। শ্রীবিষ্ণু চক্রের দ্বারা সূর্যকে পরাস্ত করিলে সূর্য শ্রীবিষ্ণুকে চক্রপাণি নামে অভিহিত করিয়া স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করেন। কুম্ভকোণম্ এজন্য ভাস্করক্ষেত্র-নামে পরিচিত। এখানে শ্রীতুলসী ও বিল্বপত্র উভয়েরই দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয়।

আদি-বরাহমন্দির—কুম্ভকোণমে আদি-বরাহের একটি সুপ্রাচীন মন্দির আছে। ইনি চতুর্ভুজ। শেষনাগের উপর পাদস্থাপনপূর্বক এক হস্তে লক্ষ্মীকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক এই স্বয়ম্ভূ-মূর্তি বিরাজমান। স্থানীয় পূজক বলিলেন, পেরি-ই-আল্বর (শ্রীবিষ্ণুচিত্ত) স্বরচিত স্তোত্রে এই আদিবরাহ এই ভাস্করক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মূল-শ্রীবিগ্রহ ব্যতীত আদিবরাহের একটি উৎসব-মূর্তি শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীরামস্বামী—শ্রীরামস্বামীর মন্দিরে কোদণ্ড-পাণি শ্রীরামচন্দ্র অধিষ্ঠিত। তাঁহার বামে শ্রীসীতাদেবী, শ্রীসীতার বামে শ্রীশত্রুঘ্ন এবং শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মণ, তৎপার্শ্বে শ্রীভরত। ভরতের পার্শ্বে শ্রীহনুমান্ পাষাণময়ী সুদীর্ঘ

* বসু রুদ্র সূর্য শিব প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবতা দ্বারা সর্বদা সেবিত, পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক স্তূয়মান, অনন্তদেবের উপর শয়ান শার্ঙ্গপাণিকে বন্দনা করি।

মস্তকে যাঁহার মহান মুকুট, হস্তযুগল যাঁহার আজানুলম্বিত নয়নদ্বয় যাঁহার প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দর সেই নাগরাজ-শয্যায় নিজবাহুকে উপধান করিয়া উত্তানভাবে শায়িত বিশুদ্ধমূর্তি শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুকে আমি নিত্য প্রণাম করি।

সুন্দরদর্শন শ্রীমূর্তি। অচল-বিগ্রহ ব্যতীত প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহেরই সচল উৎসববিগ্রহ আছেন। এক একটি অখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে অপূর্ব কারুকার্যখচিত শতস্তম্ভ-নির্মিত একটি মণ্ডপ মূলমন্দিরের সম্মুখে শোভা পাইতেছে। মূলমন্দির উত্তরাভিমুখী। শ্রী-সম্প্রদায়ের বরগলই শাখাস্থ বৈষ্ণবগণ এখানকার পূজক। রামনবমীর সময় এখানে ১০ দিন ব্যাপী ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে।

কুম্ভকোণমের প্রাচীন নাম কামকোষ্ঠী বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।১৪) শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কামকোষ্ণী (পাঠান্তরে কামকোটী) পুরীর উল্লেখ আছে। শ্রীবল্লভাচার্য তৎকৃত সুবোধিনীটীকায় কামকোষ্ণী পাঠ ধরিয়া লিখিয়াছেন—"কামকোষ্ণীং কামাক্ষীং শিবকাঞ্চী ইতি প্রসিদ্ধাঃ" অর্থাৎ শ্রীবল্লভাচার্যের মতে শ্রীশিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবী যে স্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাই কামকোষ্ণী। আর শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী 'পুণ্যকোটি' নামে অভিহিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীশৈল হইয়া কামকোষ্ঠী-পুরী আসিয়াছিলেন এবং কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ মথুরা বা মাদুরায় বিজয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ—কামকোষ্ঠী-পুরীর বর্তমান নাম 'কাণপল্লী' বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ইহা দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা জেলার দাবেপল্লী নগর হইতে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বলেন।*

কুম্ভকোণম্ তাঞ্জোর জেলার একটি বড় শহর। রাজপথগুলি বেশ প্রশস্ত। বৈদ্যুতিক আলো ও জলের কল আছে। এস্থানে সংস্কৃত-শাস্ত্র ও সাহিত্যের চর্চা এবং বহু মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থাগারের সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাউদার্ণ রেলওয়ের মাদ্রাজ-মায়াভরম্-ত্রিচিনাপল্লী মাদুরা-ধনুষ্কোটি লাইনে কুম্ভকোণম্ ষ্টেশন। ইহা মাদ্রাজ হইতে ১৯৪ মাইল এবং তাঞ্জোর হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত কাবেরীনদীর তীরস্থ প্রাচীন তীর্থ। কুম্ভকোণম্ ষ্টেশনের নিকটে ছত্র ও অনেকগুলি ভাল বাসগৃহ আছে। এতদ্ব্যতীত চক্রপাণি-মন্দিরের সন্নিকটে একটি পুরাতন ছত্র আছে।

* শ্রীঅতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ৪২৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ভৌগোলিক বিবরণসূচীর 'কামকোষ্ঠীপুরী' শব্দ দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্ (শ্রীম-কথিতম্)—শ্রীজগন্নাথানন্দস্বামি-অনূদিত। প্রকাশক—পণ্ডিত শ্রীআকুলমিশ্র কাব্যতীর্থ; কটক ট্রেডিং কোম্পানী, কটক। পৃষ্ঠা—৫৩; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। এই অমৃত পান করিয়া কত নরনারী ধন্য হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার ইংরেজী অনুবাদ পাশ্চাত্ত্য দেশে অসামান্য লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। হিন্দি এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহা অনূদিত হইয়া যথার্থ ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিত্য সহচর হইয়াছে। দেবভাষা সংস্কৃতেও ইহার অনুবাদ হইল দেখিয়া বড়ই পরিতোষ বোধ করিতেছি। সংস্কৃতভারতী বঙ্গভারতীর সেবায় কৃতোদ্যম হইলেন। দুহিতার ভাবৈশ্বর্যে মাতা আপনাকে সমৃদ্ধ করিতেছেন! শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের সেবায়ও দেবভাষা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই পুস্তকে 'কথামৃতে'র কয়েকটি সুনির্বাচিত খণ্ডের সংস্কৃতানুবাদ করা হইয়াছে। মুখবন্ধে প্রদত্ত শ্রীঅনন্তত্রিপাঠিশর্মার অভিমতের 'অনুবাদস্ত আক্ষরিকঃ' এই উক্তির সহিত আমরা একমত। দীর্ঘ সন্ধি-সমাসাদির জটিলতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল প্রাণমাতানো উক্তিগুলিকে কোথায়ও ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। সুতরাং শর্মা মহোদয়ের 'অনুবাদকানাং সিদ্ধহস্ততাং দ্যোতয়তি'-রূপ অভিমতও আমরা অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করিতেছি। গ্রন্থারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সংক্ষিপ্ত চরিতকথা প্রদত্ত হইয়াছে। মূলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে কিছুটা আড়ষ্টতা অনিবার্য, কিন্তু সিদ্ধহস্ত লেখকের মৌলিক রচনায় তাহা থাকে না। "যথা অরুণোদয়ে সূর্যোদয়ো ভবিষ্যতি তূর্ণমিতি নিশ্চীয়তে, তথা ব্যাকুলতোদয়েন জ্ঞানার্কোদয়ো ভবিষ্যত্যচিরাদিতি নিশ্চয়ঃ, উক্তঞ্চ, ভবন্তু সাকার-বাদিনো নিরাকারবাদিনো বা, যে বিভিন্নাঃ সম্প্রদায়াঃ সন্তি তে ত্যজন্তু সাধনবর্ত্মানি পরস্পরং কলহং বিদ্বেষঞ্চ গৃহ্ণন্তু ঈশ্বরে অনুরাগং ব্যাকুলতাঞ্চ। এবং কৃতে কিংস্বরূপং ব্রহ্ম ক ঈশ্বর ইত্যাদি-প্রশ্নানাং নাবকাশ ইতি"—ইহা অনুবাদ নয়, গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা; সহজ সরল সংস্কৃত যে মোটেই বিভীষিকা নয় তাহারই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সাবলীল অনুবাদেরও উদাহরণ দিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, "যেনেদং জগৎ সৃষ্টং, যেন সূর্যাচন্দ্রমসৌ মনুষ্যাদিজীবজাতং নির্মিতানি, যেন বিবিধপ্রাণিনাং নিবাসগ্রাসাচ্ছাদনার্থং বহুবিধানি দ্রব্যানি বিহিতানি, যেন পরিপালনার্থং পিতৃভ্যাং স্নেহো দত্তঃ, যেন এতানি পালনরক্ষণোপায়ভূতানি কৃতানি, স কিং বিধেয়ং কিমপি বিধাতুমসমর্থঃ? যদি প্রয়োজনং ভবেৎ স এব জ্ঞাপয়েৎ যৎকিঞ্চন।"

অনুবাদক কথামৃতোক্ত বহু বাংলা গানেরও সংস্কৃতানুবাদ করিয়াছেন। তাহারও দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিতেছি—

মরিষ্যামি যদা দুর্গা দুর্গেত্যুক্ত্বা তদা কথম্।
ন বিধাস্যতি মে ত্রাণং দীনস্য ভবগেহিনী॥
বিদিতং তদ্‌ভবেদ্‌বিপ্র-নারী-গো-ভ্রূণহিংসয়া।
সুরাপানাচ্চ পাপানি যানি তানি ন চিন্তয়ে।
শক্তো ব্রহ্মপদং লব্ধুং দুর্গানামপ্রসাদতঃ॥

যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মূল বাংলা অথবা ইংরেজী, হিন্দি প্রভৃতি অনুবাদ পড়া সম্ভব নয় তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে খুবই আনন্দ পাইবেন। সাধারণ সংস্কৃতি-অনুরাগীদের নিকটও ইহা অবশ্যই আদরণীয়। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

মুক্তিদাতা (যীশুখ্রীষ্টের জীবনী)—**অনুবাদক:** অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পি ফার্লো এস্ জে। রেভঃ ফাঃ এফ্ ওয়েষ্টার, এস্ জে কর্তৃক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ৩০, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২৪৮; মূল্য কাগজে বাধাই ১৵, বোর্ড বাধাই ১৷৹।

আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের একখানা পূর্ণাঙ্গ বাংলা জীবনচরিতের অভাব দীর্ঘ-অনুভূত। অনুবাদকদ্বয় তাহা পূর্ণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য মথি, মার্ক, লুক্ ও যোহন লিখিত 'মঙ্গল-সমাচার' (Gospels) সমাবিষ্ট হইয়াছে। মূল গ্রন্থগুলিতে যাহা আছে তাহাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে; অনুবাদকদ্বয় নূতন কিছুই যুক্ত করেন নাই। তবে মূল বাইবেল-গ্রন্থে একই ঘটনা একাধিক মঙ্গল-সমাচারে বিবৃত; এই বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে যেটি অধিকতর স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক তাহাই গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অনাবশ্যক পুনরুক্তি যেমন বর্জিত, ঘটনার ঐতিহাসিক আনুপূর্বিকতাও তেমনি অব্যাহত। আলোচ্য পুস্তকখানির এই অভিনব

সমাবেশ-পদ্ধতি খ্রীষ্টজীবন-অনুধাবনের পক্ষে খুবই সহায়ক হইবে। অনুবাদের বাংলা মোটেই 'পিণ্ডোপম' নয়; উহা মৌলিক রচনার স্বারসিকত্ব দাবী করিতে পারে। মুদ্রণ এবং প্রচ্ছদপটও প্রশংসার্হ। গ্রন্থখানিতে ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের কয়েকখানি সুদৃশ্য চিত্র স্থান পাইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

Idealism and Progress.—লেখক অধ্যক্ষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, এম্-এ, পিএইচ্-ডি; প্রকাশক—দাশগুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড্, ৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা ৪৫৪; মূল্য ১০৲ টাকা।

গ্রন্থকার Reason, Intuition and Reality নামে যে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D উপাধি লাভ করিয়াছিলেন আলোচ্য দার্শনিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক উহা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। প্লেটো প্রমুখ প্রাচীন এবং কান্ট, হেগেল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্গসঁ, রাসেল, জেম্‌স্, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিশারদগণের বিভিন্ন মতবাদগুলির মৌলিক বিশ্লেষণ এবং প্রাচ্য-দর্শনের সহিত ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা লেখকের প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। রামানুজ প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনাচার্যের Relational Absolutism-এর সহিত ব্রাড্‌লি, স্পিনোজা এবং ক্রোচ্-এর মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা খুবই উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মায়াবাদ বা অনির্বচনীয়-খ্যাতিবাদকে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ মতবাদ-সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক ধারণা লেখক অপনোদন করিয়াছেন। 'একজীববাদ' খণ্ডন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পুস্তকখানিতে চারিটি অধ্যায় আছে—তন্মধ্যে "Transition from Intellect to Supra-logical Intuition" নামক অধ্যায়টি পুস্তকের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তা এমন একটি স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জীবতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব 'সম্যক-ভাবে' এবং সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারণ করা 'প্রজ্ঞা' বা 'বোধি'-পথেই সম্ভবপর হইবে। প্রাচ্য বৈদান্তিক মহর্ষি বাদরায়ণ "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" সূত্রে এবং আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আগম অর্থাৎ ঋষির যোগযুক্ত-দৃষ্টি (supra-logical intuition) ব্যতীত তত্ত্ব-বিষয়ে ছিন্ন-সংশয় হওয়া যায় না। যুক্ত ব্যক্তির স্বানুভবই তত্ত্ব-আবিষ্কারক। দর্শন বিচারমূলক এবং পরোক্ষ-জ্ঞানেই ইহার অবসান। 'বোধি'—যাহা চিত্ত-সরোবরের অনাবিল অচাঞ্চল্য হইতে উৎপন্ন হয়—উহাই জগৎ ও জীবনের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অবারিত করিয়া দেয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ব্যক্তিদের কেহ কেহ তত্ত্বনির্দ্ধারণে 'বোধির' প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য মনে করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধির এই স্তরে উঠিবার কোন উপায় তাঁহাদের জানা নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি এই বিষয়ে অনেক আলোক-সম্পাত করিবে।

জীব নিজের বিপরীত দিকে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে জগদ্রূপ একটি দ্বিতীয় পদার্থ যেমন দেখিতেছে তেমনি প্রত্যহ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক "অবস্থাত্রয়ের" মধ্যে বিচরণ করিয়া অপর একটি পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব বা অনুমান করিতেছে। ইহাই "তুরীয় তত্ত্ব"—যে ভূমিতে জীবের জ্ঞান ও জীবন থাকে কিন্তু দ্বৈতাত্মক অনুভূতি থাকে না। পাশ্চাত্ত্য দর্শন-চিন্তা এই চরম তত্ত্বকে বোধগম্য করিতে পারে নাই। উক্ত তুরীয়ের অপরোক্ষানুভূতিকেই লেখক "awareness of pure identity" বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন। এই জ্ঞান ব্যতীত তত্ত্বানুসন্ধানী বুদ্ধি উহার self-consistency-রূপ চিরন্তন লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে না। সেইজন্য ব্রাডলি প্রভৃতি Neo-Hegelians-দের মত দোষদুষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাববৃত্তির ভূমি হইতে জগৎ ও জীবনের অধিষ্ঠানীভূত তুরীয়কে বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হইবে Absolute Will, Absolute Thought বা Absolute Bliss. পাশ্চাত্য দর্শন এই দৃষ্টি লইয়া জগতের ও জীবনের ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু জীবভূমি অতিক্রম করিলে তুরীয়তত্ত্বের অন্য নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়; আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইহা বোধগম্য করিতে পারেন নাই। একমাত্র ভারতের অদ্বৈতাচার্যগণ Non-relational absolutism—'অস্পর্শযোগ' প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা দর্শন-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অপূর্ব অবদান এবং ইহাকে তত্ত্বানুভূতির 'গৌরীশঙ্কর' বলা যাইতে পারে। লেখক এই মহান তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া একটি সমন্বয়মূলক দর্শনরচনা করিয়াছেন, যাহাতে 'গতি' ও 'স্থিতি' সমন্বিত হইবে এবং সমাজের সর্ববিধ কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে আধ্যাত্মিকভাবে পুষ্ট করিবে।

'Reality to Life' নামক শেষ অধ্যায়ে বেদান্তোক্ত তুরীয়তত্ত্ব বা 'সর্বাত্মকস্বভাব' জীবনে ছন্দায়িত হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন কি ভাবে সমৃদ্ধ হইবে এবং বৈষম্যদোষ-দুষ্ট সমাজ মহত্তর স্তরে উন্নীত হইবে তাহার সুন্দর ইঙ্গিত গ্রন্থকার করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের 'সন্ন্যাসাদর্শের' ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে এবং পুস্তকে যে 'জীবনদর্শন' প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণা লাভ করা যাইবে।

স্বামী আদিনাথানন্দ

জাপ অথবা গণচণ্ডী—লেখক: শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক — শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৩২৩ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৲ টাকা।

শিখগুরু গোবিন্দসিংহের উপদেশ-সংগ্রহ 'জাপজী'র এই বাংলা সংস্করণটির জন্য বহুভাষাবিদ্ মনস্বী লেখক বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালী হিন্দুর সমষ্টিজীবনে সাহস ও শক্তি আনতে গুরুগোবিন্দের শিক্ষার প্রচুর উপযোগিতা আছে। 'জাপজী'র প্রথম দশটি অধ্যায় গুরু গোবিন্দসিংহের নিজের রচনা, পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে গুরুর নিকট হইতে শোনা উপদেশ শিষ্য ও ভক্তগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ। আলোচ্য বইখানিতে প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা মূল গুরুমুখী শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা দেশের সাম্প্রতিক কতকগুলি সমস্যার সমাধানে সুন্দর আলোকসম্পাত করে, যদিও লেখকের কোন কোন স্বাধীন চিন্তার সহিত আমরা একমত নহি।

সম্ভবামি যুগে যুগে—লেখক: শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৪ পৃষ্ঠা; মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ১৮৮১ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ অঃ পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লেখা হইয়াছে। ঘটনার নির্বাচন, কথোপকথনগুলির

সংযোজন এবং স্বচ্ছ ও সরল ভাষা ভাল লাগিল। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবনকথা ও বাণী যে ভাবেই আমরা আলোচনা করি, তাহাতেই আমাদের মনের উন্নতি হয়।" সত্য, কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজী-সম্বন্ধীয় আলোচনা ও প্রচারের, যথার্থ-তথ্যাবলম্বী ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করিবার সময় এখনও পর্যন্ত আসে নাই। ইঁহাদিগকে নাটকীয় চরিত্র-রূপে দাঁড় করাইতে গেলে সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু না কিছু কল্পনা, বিকৃতি ঢুকিয়া যাইবেই এবং কে জানে এই বিকৃতিগুলিই কালে ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিবে না? আলোচ্য বইখানিতেও এই আশঙ্কার বীজ লক্ষিত হইল।

মহর্ষি রমণ—লেখক: শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি; প্রাপ্তিস্থান—লেখকের নিকট, ১৫।৪, জামির লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ১৭২ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

দক্ষিণ ভারতের তিরুভেন্নমালাই-বাসী সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীরমণ মহর্ষি আড়াই বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব শুধু মাদ্রাজ রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ভারতের এবং ভারতের বাহিরেরও বহু শান্তিপিপাসু নরনারী তাঁহার সান্নিধ্যে ও উপদেশে ধর্মজীবনে প্রচুর প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। মহর্ষিকে স্বচক্ষে না দেখিলেও আলোচ্য গ্রন্থ-খানির লেখক নানা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অবলম্বন করিয়া মহাপুরুষের যে জীবন-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট বইটি সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আনন্দময়ী মা—লেখক: শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি; প্রকাশক—"নয়া প্রকাশিকা"র পক্ষে শ্রীহেরম্ব নাথ মুখোপাধ্যায়; ২৩।২৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯৫ পৃষ্ঠা; মূল্য একটাকা চারি আনা।

বাংলা-দেশের এবং উত্তর-ভারতের নানাস্থানে 'আনন্দময়ী মা' একজন দিব্যপ্রেরণাসম্পন্না ধর্মনেত্রী-রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি চিত্র আলোচ্য পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও আবেগপূর্ণ। এই বহুজনমান্যা মহিলার অনুরাগী ভক্তগণ বইখানি পড়িয়া এবং পুস্তকসংলগ্ন তাঁহার বিভিন্ন ভাবের ছবিগুলি দেখিয়া আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

রাধা মদনমোহন—লেখক: শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র; প্রকাশক: আর, কে, পাবলিশিং কোম্পানী, ১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা—৫, ১৪৮ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা।

বাগবাজারের বিখ্যাত শ্রীশ্রী৺রাধা মদনমোহন জীউ বিগ্রহ সম্বন্ধীয় ইতিহাস এবং কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী সুখপাঠ্য গল্পের আকারে লেখা। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন কলিকাতার অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ বইখানিতে স্থান পাইয়াছে। ভাষা সরল ও সরস; আগাগোড়া একটি ভক্তিভাব বর্ণনায় অনুস্যূত দেখিয়া আনন্দ হয়।

বেদবাণী—প্রকাশক: প্রবুদ্ধভারত সংঘ, মাঝেরপাড়া রোড্, পোঃ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (২৪ পরগণা), পকেট সাইজ্, পৃষ্ঠা ৫৮; মূল্য পাঁচ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি বাণীর সঙ্কলন। উক্তিগুলির নির্বাচন এবং সন্নিবেশ ভালই হইয়াছে।

মুক্তভারত—অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার, এম্-এ প্রণীত। ঠিকানা: গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সির-হাট (হাওড়া) ২০ পৃষ্ঠা; মূল্য চারি আনা।

দশটি 'সর্গে' নিবদ্ধ এই 'মহাকাব্যিকা'য় 'মুক্তভারতে'র ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা চিত্রিত করিয়া উহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। চিন্তাধারা বলিষ্ঠ, কবিতার ছন্দ পঙ্গু নয়।

ক্ষেপার ঝুলি (প্রথম খণ্ড) লেখক—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। ১৩৫ পৃষ্ঠা; মূল্য দেড় টাকা।

কথোপকথন ও গল্পের আকারে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে ১২টি নিবন্ধ এই 'ঝুলি'তে স্থান পাইয়াছে। নিবন্ধগুলির নাম: কামিনীকাঞ্চন, ভীষণ ডাকাতি, স্বরাজ, আত্মার কথা, কুকুর-সংবাদ, পরশমণি, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য, দ্বার ও পথ, নরমুণ্ড, শালগ্রামের গঙ্গাযাত্রা, সাধনা ও সিদ্ধি, তত্ত্ববিভ্রাট। লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং শাস্ত্রজ্ঞান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষা সরস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পূজা ও উৎসব—বেলুড় মঠে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন কার্যালয়) এবং কলিকাতা ও মফস্বলের অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে প্রতিমায় প্রভূত উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে কালীপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত কালীপূজায় বাঙ্গালী ব্যতীত অনেক অন্যপ্রদেশবাসী এবং বর্মী বন্ধুও (তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর পত্নী মিসেস অউঙসান্‌ও ছিলেন) সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। প্রতিমা কলিকাতা হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মাদ্রাজ মঠের প্রতিমা নির্মাণ করেন স্থানীয় গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের দুইজন বাঙ্গালী ছাত্র। নিরঞ্জনের দিন প্রতিমা মঠ হইতে একটি শোভাযাত্রা করিয়া সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। মাদ্রাজ মঠে দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজাও স্থানীয় দক্ষিণ-দেশবাসী ভক্তগণের হৃদয়ে গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে। শ্রীশ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে বেলুড়মঠে যথারীতি তিনদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি পূজা—পরমারাধ্যা মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর (শততম) জন্মতিথি এবার পড়িয়াছে ২৩শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) সোমবার।

দুর্ভিক্ষসেবাকার্য—সুন্দরবন এবং টাকী মিউনিসিপালিটির এলাকায় মিশন অক্টোবর মাসে কিঞ্চিদধিক ২৫১৪ মন চাউল ও আটা বিতরণ করিয়াছেন। দক্ষিণভারতে রায়লসীমা অঞ্চলে ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত মিশনের সেবাকেন্দ্র-সমূহ হইতে যে খাদ্যশস্য বিতরিত হইয়াছে উহার মূল্য ৬৮,৪০৫৸৵১৫ পয়সা। দুর্গতদিগের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণের জন্য ১,১২৩৷৵৫ পয়সা খরচ হইয়াছে। ইহা ছাড়া মিশন বোম্বাই হইতে দানস্বরূপ প্রাপ্ত ৩০০০ গজ ধুতি ও শাড়ি দুঃস্থ নবনারীগণকে দিতে পারিয়াছেন। এই অঞ্চলে কিছু শিক্ষা-সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে। উহার পরিমাণ—১৮৪৮।৵১০ পয়সা। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার সাম্প্রতিক দক্ষিণ ভারতীয় সফরের সময় ৬ই অক্টোবর রায়লসীমায় মিশনের একটি সেবাকেন্দ্র (অনন্তপুর জেলার পুলগমপল্লী) পরিদর্শন করিয়া খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ধর্ম-সম্মেলন—গত দশহরার সময় বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনদিনব্যাপী একটি ধর্ম-সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রথম দিবসে পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ সুললিত সংস্কৃতভাষায় সনাতন ধর্মসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আচার্য টি, ভি, দীক্ষিতার সংস্কৃত ভাষায় এবং পণ্ডিত শ্রীনাথ মিশ্র হিন্দীতে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হিন্দী বক্তৃতাও খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অন্য বক্তাদের মধ্যে ভূতপূর্ব বিচারপতি দেওয়ানবাহাদুর শ্রীকৃষ্ণলাল এম্ ঝবেরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ শ্রীপ্রেমপুরীজী মহারাজ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া হিন্দীতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ ও শ্রীযুত এইচ্ এম্ দেশাই মহাশয়ও বিভিন্ন ধর্মের উদার মত সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

তৃতীয় দিন সম্মেলনের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন বোম্বাইএর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী আর দেশাই। তিনি হিন্দীতে এক মর্মস্পর্শী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সদ্য আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী ব্রহ্মমগ্নানন্দ—হিন্দুধর্ম, অধ্যাপক এন কে ভাগবত—বৌদ্ধধর্ম, অধ্যাপক

মহম্মদ ইব্রাহিম দার—ইস্লাম, অধ্যাপক জে পি ডিসোজা—খ্রীষ্টধর্ম এবং শ্রীজাহাঙ্গীরজী সি চিনিওয়ালা—জরথুষ্ট্রধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন।

রাজ্যপালের নিবেদিতা বিদ্যালয় পরিদর্শন :—২০শে কার্তিক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয় ৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যালয়-ভবনটির প্রশংসা করেন। শিল্প-বিভাগ ও আবাসিক বিভাগ—'সারদামন্দির' দেখা হইলে ছাত্রীগণ নীচের দালানে সমবেত হয়। মাননীয় অতিথিদ্বয়কে মাল্য-চন্দন দ্বারা সম্বর্ধনা জানান হয়। সম্পাদিকা শ্রীমতী রেণুকা বসু প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের পক্ষ হইতে রাজ্যপালমহোদয়কে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। শিল্পবিভাগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ভগিনী নিবেদিতার প্রিয় প্রতীক 'বজ্র'-চিহ্নিত একটি খদ্দরের রুমাল এবং তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়কেও একটি রুমাল ও একটি সুন্দর থলি উপহার দেওয়া হয়।

ছাত্রীগণ শুদ্ধ সংস্কৃত-উচ্চারণে বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করে। অতঃপর ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল পুস্তক হইতে জ্ঞান আহরণ করা নয়, পরন্তু জীবনকে গঠিত করা। ঈশ্বরে সত্যকার বিশ্বাসী হইয়া লোভ ক্রোধ ত্যাগ করিয়া যথার্থ পবিত্র জীবন যাপন করাই উদ্দেশ্য। রাজ্যপাল বালিকাগণকে ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোন ধনী যখন তাঁহার প্রচুর ধনের কিয়দংশ দান করেন, তাহাকে দান বলে না—সত্যকার দান হইতেছে স্বার্থত্যাগ করিয়া, কৃচ্ছ্রতাস্বীকার করিয়া, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, অপরের সুখের জন্য দান। এই বিষয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশের কোন এক মহিলার অপূর্ব ত্যাগের গল্প বলেন। রাজ্যপালের শান্ত সৌম্য মুখমণ্ডল, অনাড়ম্বর ভাব ও আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ সমবেত শ্রোত্রীবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

সিঙ্গাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সিঙ্গাপুরকেন্দ্রে স্থানীয় তামিল ব্যবসায়ী শ্রীপি গোবিন্দস্বামী পিল্লাই ১,৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সুদৃশ্য মন্দির করিয়া দিয়াছেন। গত ১৪ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী উহার দ্বারোদঘাটন কার্য সম্পন্ন করেন। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন-উৎসবে সিঙ্গাপুরবাসী সকল সম্প্রদায়ের নরনারীই সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের অন্যান্য কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসীও এই উৎসবের জন্য সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ কমিশনার-জেনারেল মিঃ ম্যালকম্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ অনুষ্ঠান-উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার বাণীতে বলেন—"সিঙ্গাপুরের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ইতিহাস ইতোমধ্যে সম্ভ্রম এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই চমৎকার নূতন মন্দিরটির সমাপ্তিতে উহার এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আরম্ভ হইল।……আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বহু ধর্মাবলম্বীর আবাসস্থল সিঙ্গাপুরের সমষ্টি-জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং শান্তি উদ্বুদ্ধ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অবদান উত্তরোত্তরই বাড়িয়া চলিবে।"

আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির—হিমালয়ের গম্ভীর পরিবেষ্টনীতে একান্ত ধ্যান-ধারণার জন্য পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কর্তৃক ১৯১৬ সালে আলমোড়া শহরের প্রান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির' স্থাপিত হইয়াছিল। তখন হইতে

মনোরম প্রাকৃতিক শোভা-পরিবেষ্টিত এই নির্জন আশ্রমটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কিছু কিছু কাল তপস্যা এবং শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা একটানা অনেক বৎসর মিশনের জনসেবা করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য বা ক্লান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ও ধ্যান-ভজনের জন্য অবস্থান খুবই উপকারদায়ক। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে এই সকল ভ্রাতার সর্ববিধ সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে আশ্রম-পরিচালনার জন্য আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। আশ্রমের কোন নিজস্ব তহবিল নাই। সাধুসেবক দরদী গৃহস্থ বন্ধুদের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বিবিধ সংবাদ

গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী—গত ১৫ই কার্তিক (১লা নভেম্বর) কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থিত গুরুদ্বারে শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী বিশেষ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিখসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু নাগরিকও ভারতের এই অন্যতম ধর্মনেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আহূত সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গুরু নানকের প্রেম, সৌহার্দ্য ও শান্তির বাণীর উল্লেখ করিয়া ভাষণ দেন। ডাঃ রায় বলেন যে, সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ জগৎকে আজ গুরু নানকের উপদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঐ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ছিলেন নাগপুরে। তিনি গুরু নানকের জন্মদিবস উপলক্ষে স্থানীয় শিখমণ্ডলী-কর্তৃক আহূত সভায় বলেন, গুরু নানকের প্রেমের বাণী কোন কাল বা দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনন্তকালই এই অমর বাণী সত্য হইয়া থাকিবে এবং বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে। আজিকার ছিন্নমূল ও দ্বন্দ্বপূর্ণ পৃথিবীতে গুরু নানকের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেয় যে, যুদ্ধের দ্বারা বিশ্বসমস্যার সমাধান হইবার নয়।

দিল্লীতে আহূত সভায় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, গুরু নানক সত্য ও শান্তির ঋষি ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ নিপীড়িত মনুষ্যত্বের পক্ষে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। গুরু নানক সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, সত্য এক, কিন্তু সত্যে পৌছাইবার পথ বহু। বর্তমানে জনসাধারণ এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের অবসান ঘটিবে।

কংগ্রেসভবনে ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস উদ্‌যাপন—গত ১১ই কার্তিক (২৮শে অক্টোবর) কলিকাতায় কংগ্রেসভবনে জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস উদ্‌যাপনকল্পে সুধী, সাহিত্যিক, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের এক সমাবেশ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বৃহত্তর রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিবেদিতার স্থান পুরোভাগে বলিয়া অভিমত

প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, শিল্পে, সাহিত্যে, সর্বদিকে 'ভারত-উপলব্ধি' নিবেদিতার মূল সাধনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন 'লোকমাতা', শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায় যেন চাঁদের কিরণ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস বলেন, জাতির জাগরণ-মূলক সমস্ত আন্দোলনের পশ্চাতে নিবেদিতা ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন ভারতের আত্মাকে উপলব্ধি করায়। আজ আবর্জনা-বিনাশের পাবক বহ্নিশিখা লাভ করিতে হইলে তাঁহার রচনা অবশ্য-পাঠ্য। ভগিনী নিবেদিতার অক্ষয়কীর্তি শ্রীরামকৃষ্ণমিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আগামী সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়কে সাহায্য করিতে বক্তা জনগণের উদ্দেশে আবেদন জ্ঞাপন করেন।

আনন্দ আশ্রম—১৩৩৮ সনে (১৯৩১ খ্রীঃ) ঢাকা নগরীতে এই নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ইহাকে প্রভূত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর ধরিয়া আশ্রম অতি প্রশংসনীয় ভাবে মেয়েদের ভিতর একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ শিক্ষাদানের কাজ করিয়া আসিতেছিল। দেশবিভাগের পর ঢাকায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে আশ্রমের একটি শাখা ২১এ দমদম রোডে একটি বাড়ীতে পরিচালিত হইতেছে। এখানে আছে সারদা-বিদ্যাপীঠ, সারদা প্রাইমারী স্কুল ও সারদা শিল্পপীঠ। শিল্পপীঠে মেয়েরা তাঁত, গালিচা বোনা এবং দর্জীর কাজ প্রভৃতি শিখে।

দ্বিতীয় শাখা টালিগঞ্জের নাগতলায় (১।১ অর্চনা এভিনিউ, কলিকাতা-৩২)। ইহা ১৯৫১ খৃঃ ১লা এপ্রিল হইতে খোলা হইয়াছে সরকারের অনুরোধে। সরকার সেখানে ৩০০ বাস্তুহারা মেয়ে রাখিয়াছেন আনন্দ আশ্রমের শিক্ষাধীনে। সকলেরই বয়স ৮- হইতে ১৬এরমধ্যে। ইহাদের ব্যয়ভার সরকারই বহন করিতেছেন।

আশ্রমকর্তৃপক্ষ নাগতলার বাড়ীখানি ২০৬০০০৲ টাকায় কিনিয়াছেন; তন্মধ্যে ৫৬ হাজার টাকা এখনও দিতে পারেন নাই। পরিবর্ধনের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা ধার হইয়াছে। আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীমতী চারুশীলা দেবী সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইতেছেন।

পরলোকে শ্রীসুরেন্দ্রকান্ত সরকার—গত ১৩ই কার্তিক, রাত্রি ২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান শ্রীসুরেন্দ্রকান্ত সরকার (রাঁচির সুরেনবাবু নামে পরিচিত) ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্মভূমি ধীপুর (ঢাকা) গ্রামে সজ্ঞানে ইষ্টচিন্তা করিতে করিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা এই সর্বজনপ্রিয় অমায়িক প্রবীণ ভক্তের আত্মার পরমা শান্তি কামনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক-সংখ্যা, নাম ও ঠিকানাসহ বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে এই আফিসে পাঠাইবেন। পাকিস্তানের গ্রাহকগণের টাকা পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, উয়ারী, ঢাকা।

কাঁদিও না

কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যুঃ
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মদুঃখম্ ।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তেঽস্তি কামঃ
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে প্রলোভঃ ।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিমোহো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

(অবধূত-গীতা)

হে সখে, কাঁদিতেছ কেন ? তোমার তো জরা নাই, মৃত্যু নাই—জন্মরূপ দুঃখ তোমাকে তো স্পর্শ করে না—তোমার তো কোন বিকার নাই। ভাবো—'আমি অমৃতস্বরূপ জ্ঞানঘন সমরস আত্মা—সর্বব্যাপী আকাশের মত আমি নির্লেপ।' রোদনের কোন হেতু তোমার আছে কি ?

হে বন্ধু, কাঁদিও না। (নিজের স্বরূপ স্মরণ কর, উহা ভুলিয়াই তো তোমার যত দুর্গতি !) কাম, লোভ, মোহ এই সকল মলিনতার সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। চিরকালের জন্য জানিয়া রাখ—'আমি সকল-বৈষম্য-বিযুক্ত নিঃসঙ্গ সর্বব্যাপী চৈতন্যময় আত্মা।' কেন তবে বৃথা অশ্রুমোচন ?

শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্তাবহ—তিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহা যে তাঁহার আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শিক্ষা, ইহাতে সন্দেহ তুলিবার লোক ইদানীং যে একেবারেই নাই তাহা বলা চলে না। তবুও উভয়ের উপদেশের মধ্যে যে একটি সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকত্ব আছে এই সিদ্ধান্ত আজকাল একপ্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া একদিনে এবং সহজে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার একটি ক্রম আছে, ইতিহাস আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উহারই আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে ভাবী বিবেকানন্দ—নরেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ-৫ম ভাগে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থের পাঁচখানি খণ্ডের নানাস্থানে আমরা ইহা দেখিতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবৎ-কালে তাঁহার একান্ত সত্যসন্ধিতার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবারাত্র পাইয়া তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তির (ভবিষ্যতের ঘটনাবলী-সম্পর্কেও) উপর স্বভাবতই ভক্তগণের একটি সুদৃঢ় আস্থা জন্মিত। তবুও কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যত কিছু বলিতেন (লৌকিক এবং অলৌকিক) তাহাদের কতক-গুলির ভাষা, উপমা ও কল্পনা বাস্তব হইতে এতদূরে যে, অনেকেরই শুনিয়া বিস্ময় লাগিত—বিশ্বাস করিলেও ঐ বিশ্বাস সংশয় ঘেঁষিয়া চলিত। নরেন্দ্রনাথ যে একজন অসামান্য অধিকারী—তাঁহার পবিত্রতা, তেজস্বিতা, বৈরাগ্যভাব এবং সাধননিষ্ঠার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন এইটুকুই শুধু সকলে অসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ লোক-শিক্ষক জীবনের কোন চিত্র কাহারও মনে বোধ করি তেমন স্থান পাইত না, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বিষয়ে বহুতর ইঙ্গিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠে যে কয়েক জন যুবক গৃহত্যাগান্তে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা স্বতই নরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাধিক পুস্তকে বরাহনগর মঠের তদানীন্তন জীবনপ্রণালীর লিপিবদ্ধ বিবরণীতে দেখিতে পাই, নরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া যেমন সাধন-ভজন করিতেছেন তেমনি বেদ-বেদান্তাদি হিন্দুশাস্ত্র এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও আলোচনা করিতেছেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার কথাবার্তায় প্রচুর উদ্দীপনা পাইতেছেন, তাঁহার চিন্তাধারার মৌলিকত্বের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেছেন। গৃহস্থ ভক্তগণেরও অনেকে এই সন্ন্যাসিদলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশমান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর একদল গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন যাঁহারা নরেন্দ্রনাথ-পরিচালিত এই সন্ন্যাসী-দের মঠকে খুব সুনজরে দেখিতেন না—এমনও বলিতেন, নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার যথাযথ অনুসরণ করিতেছেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের কাহারও মনে এই সন্দেহ উঠিবার কোনও অবসর তখনও ঘটে নাই নরেন্দ্রনাথের কোন আচরণে, মতে বা উক্তিতে। নরেন্দ্র-

নাথ তাঁহার অন্যান্য অনেক গুরুভ্রাতার ন্যায় পরিব্রজ্যায় বাহির হইয়াছিলেন কয়েক বার। শেষ ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে বরাহনগর মঠ হইতে যে বাহির হইয়া যান—১৮৯৩ সালের মে মাসে আমেরিকা-যাত্রা করা পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর ভারতে থাকিলেও মঠে ফিরিয়া আসেন নাই—নানাস্থানে ভ্রমণেই দিন কাটিতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের এই পরিব্রজ্যা শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপূর্তির জন্য ছিল না—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্তা পরিবহনের প্রস্তুতি* সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তিনি দীনদরিদ্রের কুটির হইতে রাজা-রাজড়ার প্রাসাদ পর্যন্ত সব-স্থানে ঢুকিয়া, বাস করিয়া ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের মানুষ ও তাহাদের জীবনধারার নিবিড় প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতেছিলেন। সমগ্র ভারতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উপযোগিতা কি, তাহার সম্যক উপলব্ধির জন্য এই পরিচয় নিশ্চিতই অপরিহার্য ছিল।

১৮৯০ সালের জুলাই মাসে স্বামিজী যখন বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিয়া আসেন তখন গুরু-ভাইদের বলিয়াছিলেন,—"এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদ্‌লে ফেলতে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফিরছি না।" ছয়মাস তাহার পরিব্রজ্যার সাথী হিসাবে কোন কোন গুরুভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মীরাটে সঙ্গী গুরুভ্রাতাদের ডাকিয়া বলিলেন—"আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।"

প্রিয়তম নেতার পূর্বোক্ত বিদায়বাণী শুনিয়া বরাহনগরের ভ্রাতারা কি মনে করিয়াছিলেন? আবার—"গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়লে কার্যসাধনের বহু বিঘ্ন ঘটবে"—এই কথা দ্বারা সকলের মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া নির্মম ভাবে সকলকে ছাড়িয়া দিল্লী-প্রস্থানোদ্যত স্বামিজীকে মীরাট ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিদায় দিতে দাঁড়াইয়া অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন সন্ন্যাসী ভ্রাতার মনেই বা কি চিন্তাপ্রবাহ আনাগোনা করিতেছিল? স্বামিজীর বিদায়কালীন উক্তির কি ব্যাখ্যা তাঁহাদের চিত্তে উদিত হইতেছিল? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলিয়াছিলেন,—"নরেন শিক্ষে দেবে"—তাহার সহিত নরেন্দ্রনাথের কথিত 'জীবনব্রত' এবং 'কার্যসাধন'-এর কোন সম্বন্ধ তখন তাঁহারা ধরিতে পারিয়াছিলেন কি?

বস্তুতঃ চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামিজীর অভূতপূর্ব সাফল্য এবং পরে চার বৎসর আমেরিকায় ও ইউরোপে তাঁহার বেদান্ত-প্রচারের আশাতীত সমাদর—এই ঘটনাদ্বয়ের পূর্বে নরেন্দ্র-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর দূরপ্রসারী তাৎপর্য অল্পই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাঁহার 'জীবনব্রত' ও 'কার্যসাধন'-এর পরিপূর্ণ রূপ আত্মপ্রকাশ করে নাই। যদিও স্বামিজী তাঁহার ভারতবর্ষের সঙ্কল্পিত কার্যধারার ইঙ্গিত তাঁহার গুরুভ্রাতা এবং অনুরাগী বন্ধু ও শিষ্যগণকে বিদেশ হইতে লিখিত বহু পত্রে নানাভাবে দিতেছিলেন তবুও উহা বাস্তবক্ষেত্রে কি আকার লইবে স্বামিজী এদেশে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহা ধারণা করা কঠিন ছিল। কে তখন ভাবিতে পারিয়াছিল

* শুধু প্রস্তুতি কেন, প্রচারের কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ইংরেজীতে প্রকাশিত বা তদবলম্বনে প্রমথনাথ বসু-কৃত বাংলায় সংকলিত (উদ্বোধন-প্রকাশন) স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনীতে স্বামিজীর পরিব্রজ্যার বিস্তারিত বৃত্তান্ত-পাঠে জানিতে পারা যায়, ভারতের নানাস্থানে বহু ব্যক্তি তাঁহার মুখ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর সহিত পরিচিত হইতেছেন প্রাক্‌-আমেরিকার বিবেকানন্দও এক জন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ধর্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

অহর্নিশ ভগবদ্ভাবে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য বেদান্ত-প্রচারক মোক্ষব্রতী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সারাপ্রাণ কাঁদিতেছিল দারিদ্র্য-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা-অধীনতা-অপমানপীড়িত ভারতের জনগণের মূক বেদনায়, তাঁহার ধর্ম ও কর্ম কেন্দ্রীভূত হইতেছিল এই ব্যাপক দুঃখগ্লানি অপনোদনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায়? স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে বেদ-বেদান্তের কথা, দর্শন-পুরাণের উপদেশ, বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকগণের বাণীর বিশ্লেষণ, ঈশ্বর-মায়া-মুক্তি-সাধন-ভজনের ব্যাখ্যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের পাশাপাশি সাজাইলে উহাদের সহিত স্বামিজীর পাশ্চাত্ত্য-বক্তৃতাবলীর মুখ্যত কোন অসঙ্গতি লক্ষিত হইবার কথা নয়। অবশ্য ঠাকুরের বাণীর সরল ভাষা, সহজ উপমার সহিত স্বামিজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ, তথ্যবহুল বিবৃতির পার্থক্য চোখে পড়ে, যদিও দুইটিই অপূর্ব শক্তিশালী। কিন্তু স্বামিজী ভারতে ফিরিয়া দেশবাসীকে যে সকল কথা শুনাইতে লাগিলেন তাহা সচরাচর আমরা 'ধর্ম' বলিতে যাহা বুঝি তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া রজোগুণপ্রধান দেশসেবা, শিক্ষাপ্রচার, পীড়িত আর্তের সহায়তা প্রভৃতি কর্মপ্রেরণাকে স্পর্শ করিল। স্বামিজী বলিলেন, ইহাও ধর্ম—যুগোপযোগী ধর্ম—নিষ্কাম কর্মযোগ—কর্ম-পরিণত বেদান্ত—জপতপ-ধ্যান-ধারণা-সমাধির ন্যায় নিঃশ্রেয়সের অন্যতম উপায়।

তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া স্বামিজী কিন্তু ঘোষণা করিলেন—

"অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।........ অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নি।...... এদেশে কিছু কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর্।"

দেশের যুবকসম্প্রদায় স্বামিজীর কর্মমন্ত্রকে শ্রদ্ধার সহিত, উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিবে ইহা স্বাভাবিকই ছিল—কিন্তু হরিনামে, মায়ের নামে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যাঁহারা সঙ্গ করিয়াছিলেন, উপদেশ শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাকে বিবেকানন্দের এই নূতন যুগবার্তার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা যে একটু কঠিন বোধ হইবে ইহা বিচিত্র নয়। স্বামিজীর নিজ গুরুভ্রাতাগণ—যাঁহারা প্রিয়তম নেতার জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারিতেন—তাঁহাদেরও চিত্তে যে সংশয় জাগিয়াছিল, তাঁহারাও যে এই 'নূতন ধর্ম'কে প্রথমদিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু যুক্তিবিচার যেখানে চিরপ্রচলিত সংস্কারের বাধা দূর করিতে সমর্থ হইল না, সেখানে কার্য সিদ্ধ করিল দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুরের প্রাচীন স্মৃতি—শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্বন্ধ-পরিজ্ঞাপক পুরাতন ঘটনাগুলির বিবিধ চিত্র—যাহা চোখে দেখা অথচ যাহাদের তাৎপর্য তখন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় নাই। কেন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুদ্ধকক্ষে নরেন্দ্রকে লইয়া কত কি গুহ্য উপদেশ দিতেন—কেন গিরীশ-মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির সহিত নরেন্দ্রকে তর্কে লাগাইয়া দিয়া পরিশেষে নরেন্দ্রের মতেরই সমর্থন করিয়া বলিতেন, 'ওর মতই আমার মত'? কেন 'ক্রমাগত পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি'—এই ইচ্ছা প্রকাশকারী নরেন্দ্রনাথকে তিনি তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ছি ছি! তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা নয়, তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি

চাস্ ?"[১] তাঁহাদের মনে পড়িল নরেন্দ্র ও জনৈক ভক্তবন্ধুর পারস্পরিক সেই আলোচনার কথা। ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশায় উক্তি "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না,—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"—শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ ইহার গভীর ব্যাপক আধ্যাত্মিক মর্ম্ম-সম্বন্ধে কত কথা বলিয়াছিলেন—পরিশেষে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"ভগবান যদি কখনো দিন দেন ত আজ যাহা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার কোরব, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনিয়ে মোহিত কোরব।"[২]

গুরুভ্রাতাগণের চোখে ভাসিয়া উঠিল সেই ছবি—ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের কাছ ঘেঁষিয়া বসিতেছেন—

"বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব' ... দুই চারি টান টানিয়া কল্কেটি নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি ওটাও আমি।'"[৩]

এই তো সত্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের সুস্পষ্ট পরিচয়। এই তো স্বামিজীর ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকের অভূত-পূর্ব বিস্তার। তিনি যদি যুগাবতার হইয়াই আসিয়া থাকেন তবে অজস্র দেববিগ্রহের উপর আর একটি নূতন ঠাকুর সাজিয়া মন্দিরে বসিয়া পূজা লইতেই কি আসিয়াছেন? সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য যদি আসিয়া থাকেন তো উহার আধার ভারতীয় জাতির সমষ্টি দেহ-মনের প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন নয় কি? তাহা হইলে ঐ প্রস্তুতির জন্য যে প্রচণ্ড কর্ম প্রয়োজন, সেই কর্মও তাঁহারই অভিপ্রেত নয় কি? যুগধর্ম নয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণী তাঁহার জীবৎকালে অকথিত ছিল—শুধু নরেন্দ্রনাথকেই বিশেষ করিয়া বলা ছিল তাহাই আজ স্বামিজী প্রচার করিতেছেন। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছাড়া তাঁহার নিজের অপর কোন বাণী নাই—শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার এবং প্রচার ব্যতীত বিবেকানন্দের জীবনে অপর কোন কাজ নাই। কিন্তু গুরুভ্রাতারা দেখিলেন, স্বামিজীর অঙ্কিত সেই শ্রীরামকৃষ্ণ অতি বৃহৎ বিশ্বম্ভর মূর্তি—

(১) "সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক সমক্ষে সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ......বেদমূর্তি ভগবান.........সর্ব-যুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।"[৪]

(২) "তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই।...... ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতঃপূর্বে আর কখনও আসেন নি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহা-পুরুষই জ্যোতিস্তম্ভস্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।"[৫]

(৩) "তিনি বেদবেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। ... এই ব্যক্তিটি একপঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তস্বরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন।"[৬]

১ স্বামী বিবেকানন্দ (প্রমথনাথ বসু) ১ম ভাগ, ১২শ অধ্যায়

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম ভাগ, ৮।২

৪ ভাববার কথা—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ': স্বামী বিবেকানন্দ

৫ স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ৭ম বল্লী

৬ পত্রাবলী (১ম ভাগ)—২৭৭ পৃঃ

(৪) "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পাববে।"৭

(৫) "কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই।...ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে।......রাজনৈতিক, এমন কি, সামাজিক বা বাণিজ্যজগতেরও কোন আদর্শপুরুষ কখন সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না।...ধর্মবীর নহিলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্মবীর—এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি, তুমি বা অপর কেহ, যেই প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।"৮

৭ পত্রাবলী (১ম ভাগ) ২৮২ পৃঃ

৮ স্বামিজী—কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তর

সত্যই, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যান ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও শিক্ষার পরিপূর্ণ তাৎপর্য বুঝা কঠিন ছিল, তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদেরও পক্ষে। তাঁহারা ধীরে ধীরে স্বামিজীর ভালবাসায় এবং প্রেরণায় এই মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে স্বামিজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তৎপ্রবর্তিত কর্মপ্রণালী সফল করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে প্রকৃত কোন দ্বন্দ্ব নাই ইহা তাঁহারা প্রত্যেকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিঃসন্দিগ্ধ প্রচারের ফলেই ধীরে ধীরে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যেন একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্ব—উভয়ের বিভিন্ন উপদেশ একই সত্যের পরিবাহক—উহা হইতেছে মানুষের আধ্যাত্মিক মহিমাকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কল্যাণসাধন।

বীর সন্ন্যাসী

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

পুণ্য ভূমি এই ভারতের পুণ্য যুগের দৈন্যহীন
রূপটি খাঁটি তোমার মাঝে আজ দেখিনু সন্ন্যাসিন্!
কর্ম, সেবা, ত্যাগ, সাধনা, তপ তোমাতে মূর্তি পায়—
স্বর্গ-অপবর্গ-জয়ী জ্ঞানের বিমল শুভ্রতায়।

সত্যিকালের অনাবৃত সত্য তুমি সত্যকাম,
অসুন্দরে ধ্বংসকারী সুন্দর শিব আত্মারাম।

প্রাণের মত প্রাণটি নিয়ে জীবেই শিব স্বয়ম্ভুর
প্রকাশ দেখে নিত্য কর সর্বজীবের দুঃখ দূর।

মৌন, জড় মড়ার মত—, সে যে তোমার ধর্ম নয়,
অভয়দানে মুখর তুমি জীবন্ত শিব কর্মময়।

জাতির পূত গরব-রবি জ্ঞান-বিলাসী নির্বিকার
সন্ন্যাসিরাজ তোমায় পায়ে নোয়াই মাথা বারংবার।

স্বামিজীর প্রসঙ্গে

(স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সহিত কথোপকথন)*

স্বামিজীর একটা বিশেষত্ব ছিল, উনি খুব নিজের ভাব চাপতে পারতেন। হয়ত ভেতরে এক রকম ভাব ; কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখালেন বা কথা কইলেন যে লোকে কিছু বুঝতে পারল না।

গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গলাভের জন্য যখন ছিলেন তখন কয়েক জন গুরুভ্রাতার সঙ্গে অমৃত বাবু বলে এক ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের লোক ছিলেন। স্বামিজী পওহারী বাবাকে দেখে ওঁদের শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতেন, আর এমন সব ভাব-ভঙ্গী করতেন, যেন ঠাকুর কিছু নন, পওহারী বাবা আরও বড়। এই ধর, যেমন বললেন, 'পওহারী বাবা কেমন কতদিন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন।' অমৃত বাবু ঐসব শুনে শুনে রেগে উঠতেন, আর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন 'গুরুদ্রোহী গুরুদ্রোহী'!

স্বামিজী পরে এখানে বলেছিলেন, "তারপর থেকে তাঁর আমার ওপর ভক্তি দিনকে দিন কমে গেল, আর আমার তাঁর ওপর ভক্তি দিনকে দিন বেড়ে গেল।

প্রশ্ন—কেন? ঠাকুরের উপর তার শ্রদ্ধা দেখে?

উত্তর—হাঁ।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী—তারপর ঐ অমৃত বাবুর কোন এক আত্মীয় সাধু হয়। তিনি ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন, "দেখ, তোমরা ঐ নরেনের কাছে যেও না। সে নাস্তিক, পরমহংসদেবকে মানে না। তোমরা ঐ রাখাল টাখালের কাছে যাবে।" আত্মীয়টি তখন বল্লে, "না, নরেন এখন মানে।" তখন অমৃত বাবু বলেন, "মানে? এখন ওসব মানে? মহাত্মা টহাত্মা মানে?"

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামিজীর ত পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছিল?

উত্তর—সে দীক্ষা মানে (আমাদের যে রকম ধারণা) ঠিক দীক্ষা নয়। ওঁর তখন সমাধিস্থ হব বলে ঝোঁক। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে থাকব, মাঝে মাঝে দু'এক দিন একটু নেমে কিছু খেয়ে নেব—এই রকম ইচ্ছা। তিনি দেখলেন যে পওহারী বাবা ঐ রকম সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তাই দেখে ওঁর ধারণা হয়েছিল যে পওহারী বাবা একটি কিছু উপায়ে ঐ রকম হন। সেইজন্য ওঁর মনে হয়েছিল যে পওহারী বাবার কাছ থেকে সেই রকম একটা কিছু শিখে নিতে পারলে উনিও ঐ রকম সমাধিস্থ হতে পারেন।

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামিজীর ঐ রকম দীক্ষা নেবার ইচ্ছার পর ঠাকুর তাঁকে দেখা দেন,—এই রকম যে গল্প আছে সে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

উত্তর—ঐ তোমরা যা পড়েছ আমরাও তাই। ওটার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না। তবে মনে হয়, স্বামিজী যখন পওহারী বাবার কাছে

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য, স্বামিজীর সমুদায় ইংরেজী গ্রন্থ ও বক্তৃতা বলীর বঙ্গানুবাদক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট স্বামী শুদ্ধানন্দজীর (সুধীর মহারাজ) সহিত বেলুড় মঠে জনৈক ব্রহ্মচারীর (ইদানীং সন্ন্যাসী) কথাবার্তার ডায়েরী হইতে সংগৃহীত।

শিখতে যান তখন পওহারী বাবা এমন ভাব দেখাতেন, যেন স্বামিজীই একজন মহাপুরুষ, তাঁর কাছ থেকেই কিছু পেলে ভাল হয়। এই রকম দেখে শেষে তাঁর পওহারী বাবার কাছে কিছু শেখবার আগ্রহ কমে যায়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আপনারা কেউ জিজ্ঞাসা করেন নি স্বামিজীকে, ঐ ঠাকুরের দর্শন দেওয়া সম্বন্ধে?

উত্তর—তুমিও যেমন! স্বামিজীকে ওকথা জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল কার?

* * *

তোমরা স্বামিজী-সম্বন্ধে যতই বল যে 'তিনি এই করেছেন, ঐ করেছেন, এই বলেছেন, ঐ বলেছেন,' আমার কিন্তু স্থির ধারণা যে তিনি যতই কাজ করুন, ওটা তাঁর স্বরূপ নয়। তাঁর স্বরূপ হল ধ্যান, তপস্যা, এই দিকে। আমার এ মনে হবার কারণও আছে। তাঁর শেষ বয়সে একদিন ওপরের ঘরে আমি তাঁকে হাওয়া করছি। তখন তাঁকে সারারাত হাওয়া করতে হত। আমাকে সাধারণতঃ থাকতে হত না; কিন্তু সেদিন লোক ছিল না কি কারণে, আমিই ছিলুম। হাওয়া করছি, এমন সময় মানুষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রকম কথা কয়, সেই রকম উনি কি বলে উঠলেন। আমি সব কথা বুঝতে পারলুম না, দু'একটা কথা বুঝলুম। উনি বলছেন—'অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেলতে হবে।'

* * *

স্বামিজী তখন ঢাকায়—আমরা দু'একজন সঙ্গে ছিলাম। ওঁকে কয়েক জন এসে জিজ্ঞেস করে,—"মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ হওয়া ভাল না বেশী বয়সে?" উনি ত direct (সোজা) কিছু উত্তর দিতেন না এসব বিষয়ে; অমনি general (সাধারণ) ভাবে উত্তর দিতেন। এখানেও ও কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বল্লেন, "হাঁ, এই dowry systemই (পণপ্রথাই) child-marriage (বাল্য-বিবাহ) তুলে দেবে।" কাজেও তাই হয়েছে। এত যে আজকাল বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে, এই dowry systemই তার কারণ।

* * *

শরীর যাবার কিছু আগে স্বামিজী আমাদের দু'এক জনকে বললেন: "দেখ আমি ত মায়ের কখনও কিছু করলুম না; আর আমার শরীরের যে রকম অবস্থা, তাতে আর দু'এক বছরের বেশী বাঁচব বলে মনে হয় না। তাই আমার ইচ্ছা মাকে কিছু তীর্থ করাই; তাহলে তবু তাঁর কিছু করা হবে। তা তোমরা যদি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য কর ত ভাল হয়; আমার নিজের শরীরের ত এই অবস্থা!"

তারপর আমি আর অন্য কয়েক জন স্বামিজীর মা ও দিদিমাকে নিয়ে কয়েক যায়গায় যাই।

তখন একটা বেশ মজার ব্যাপার হয়েছিল। স্বামিজীর মা তাঁকে বলতেন, "দেখ, এসব ত অনেক হল, বেশ ভাল; এইবার একটা বিয়ে কর।"

তার উত্তরে স্বামিজী বলতেন, "দেখ মা, বিয়ে করবার কি দরকার? এই দেখনা আমার সব কত বড় বড় ছেলে রয়েছে।" এই বলে সব দেখাতেন।

আর যখন স্বামিজীর দিদিমা ঐ কথা বলতেন, তখন স্বামিজী বলতেন, "দেখ দিদিমা, এখনও আমার হাতে কিছু টাকা আছে; তুমি এই বেলা মর, আমি তোমার বেশ ঘটা করে শ্রাদ্ধ করি।"

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামিজীর দীক্ষা-সম্বন্ধে কি রকম মত ছিল?

উত্তর—ওঁর দীক্ষার ওপর বিশেষ ঝোঁক ছিল না; ওঁর ছিল সন্ন্যাস। উনি বলতেন, "হাজার হাজার ছেলে আসবে, আমি তাদের একধার থেকে মাথা মুড়িয়ে দেব, আর তাদের বাপেরা এসে কাঁদবে, আমি দেখব।" মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার মানে সন্ন্যাস দেওয়া আর কি!

*　　*　　*

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে তখন বিজ্ঞান স্বামী (হরিপ্রসন্ন মহারাজ) এসেছেন। আমরা শুনলাম যে বিজ্ঞান স্বামীর মা এসেছেন। তারপর স্বামিজী যাচ্ছেন, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছি। দেখি একজন স্ত্রীলোক আসছেন। কাছে এসে সামনা সামনি হতে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি হরিপ্রসন্নর মা?"

তিনি উত্তর করলেন, "না, আমি তার শত্তুর!"

প্রশ্ন—স্বামিজী তখন কি করলেন?

উত্তর—করবেন আর কি? তাড়াতাড়ি সরে গেলেন!

*　　*　　*

বৃহস্পতিবারের বারবেলা, মঘা ইত্যাদির কথা উঠিল। সুধীর মহারাজ বলিলেন—

শশী মহারাজ ও সব ভীষণ মানতেন। আবার আমাদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের ওসব পছন্দ হত না। তা একবার এমন হল যে মঠে দুটো দল হয়ে গেল। যারা ওসব মানত তারা বললে, "যারা ওসব মানে না তারা ঠাকুরকেই মানে না!" ঠাকুর ওসব মানতেন কি না। তখন ঐ দ্বিতীয় দলের মধ্যে কানাঘুষো হয়ে কথাটা গিয়ে স্বামিজীর কাছে পড়ে। স্বামিজী তার উত্তরে বললেন, "হাঁ, ওসবের effect (ফল) আছে, তবে আত্মার শক্তি অসীম; আত্মার শক্তি ওসব evil effect (কুফল) কাটাতে পারে। আত্মার শক্তি বাড়াও—ওসব কিছুই করতে পারবে না।"

বিবেকানন্দ

শ্রীসুধীর চৌধুরী

শক্তির বীর সাধক বিবেকানন্দ,
দীপ্ত প্রাণের মুক্ত অবাধ ছন্দ,
চেতনে তোমার জীবপ্রেম উপলব্ধি,
হৃদয়ে তোমার উর্মিল প্রেম-অব্ধি।
কণ্ঠে তোমার যে বাণী উঠিল মন্দ্রি,
সে আরাবে ভাঙে সুপ্তি-পাষাণ-অদ্রি।

ঘুচাতে দৈন্য, বিভেদ-দানব-বন্ধ,
নাশিতে মিথ্যাচারের কলুষ, দ্বন্দ্ব
জ্বলিল তোমার অগ্নি-ঈশান মন্ত্র।
ফুটিল যে তব কৌমুদী-চিত-চন্দ্র,
বিভাসিয়া যুগ-সম্বিৎ-হারা রাত্রি,
হে রামকৃষ্ণ-পন্থার চিরযাত্রী।

ওগো বিপ্লবী সন্ন্যাসী মহামুক্ত—
আত্মচেতনা-তপনে নিত্য যুক্ত,
অভীমন্ত্রের শক্তি-সাধন-সিদ্ধ
প্রজ্ঞা-বিভবে, যোগৈশ্বর্যে ঋদ্ধ,
প্রেরণা তোমার আসুক মানব-মর্মে
জাগুক নিখিল-প্রাণ সনাতন ধর্মে।

স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব

স্বামী বিরজানন্দ *

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী ছিল যে, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যতই বলি বা পড়াশুনা করি না কেন তাঁহার মহান চরিত্রের অসংখ্য গুণরাশির একাংশেরও ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইব না। যাঁহাদের তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারাই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্বামিজীর অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সম্মুখে যিনি আসিতেন তিনি যত বড়ই হউন না কেন, অনুভব করিতেন যে স্বামিজীর কাছে তিনি বালকমাত্র। তাঁহার জীবনে পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের বিশিষ্ট ভাব ও গুণগুলির এক অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামিজীর ইংরেজী জীবন-চরিতের এই উক্তিটি নিছক অলঙ্কার নয়, বাস্তবিকই সত্য:—'তিনি জ্ঞানে শঙ্কর, হৃদয়-বত্তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মনিষ্ঠায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, বীরত্বে অর্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসদেব ছিলেন।' তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার সত্যতা যত দিন যাইতেছে ততই উপলব্ধ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—'যাঁহাদের আমরা খুব বড় লোক বলিয়া মানি তাঁহাদের ভিতর ১টি বা ২টি শক্তির খেলা দেখা যায়, কিন্তু নরেনের ভিতর এইরূপ ১৮টা শক্তি আছে।' আবার বলিতেন, 'নরেনকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এইরূপ বড় আধার আজ পর্যন্ত জগতে কখনও আবির্ভূত হয় নাই।'

তিনি যেন ছিলেন পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা (master of perfection)। যখন যে ভাব লইয়া আলোচনা করিতেন তখন সেই ভাবে এমন তন্ময় হইয়া কথা বলিতেন, তাঁহার প্রত্যেক কথার ভিতর এমন একটা সঞ্জীবনী শক্তি ছিল যে যাঁহারা তাঁহার কাছে থাকিতেন তাঁহারাও সেই ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত হইয়া পড়িতেন, শরীর আছে কি নাই,—দুনিয়াটা আছে কি নাই—তাহার বোধ থাকিত না। সে সময় এমন একটি শক্তি সকলের ভিতর খেলা করিত যে মনে হইত সত্যবস্তু যেন জীবন্তভাবে সম্মুখে রহিয়াছে। জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে থাকিলে যেমন যে কোন বস্তুই গরম হইয়া যায় সেইরূপ স্বামিজী তাঁহার সঙ্গিগণকে নিজের উচ্চ ভাবের অধিকারী করিয়া লইতেন। তাঁহার এইরূপ ভাব যে ক্বচিৎ কখন হইত তাহা নয়। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে বিষয়েই কথা বলিতেন তাহার ভিতর অপূর্ব একটি নূতনত্ব, মাধুর্য থাকিত—উহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। যে বিষয়েই তিনি হাত দিতেন, উহা যত সামান্যই হউক না কেন, এক অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া দিতেন।

স্বামিজী যেমন পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন তেমনি আবার অক্লান্ত কর্মী ছিলেন; যেমন মহাযোগী ও সমাধিমান পুরুষ ছিলেন—তেমনি আবার ছিলেন পরম প্রেমিক। তিনি যেমন স্বদেশ-বৎসল ছিলেন, সেইরূপ বিশ্বপ্রেমিকও ছিলেন। তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ছিল না;

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দের এই অপ্রকাশিত রচনাটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত স্বামিজীর একটি জয়ন্তী-সভায় পঠিত হইয়াছিল।

তাঁহার কাছে স্বজাতি-বিজাতি ছিল না। তাঁহার কাছে যে কেহ যে ধর্ম ও যে মতাবলম্বী হউন না কেন, তিনি জানতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিজের ভাই। তাঁহার নিকট ধনি-নির্ধন, পুরুষ-স্ত্রী, সাধু-অসাধু ছিল না। তিনি সকলকে ভালবাসায় এমন আপনার করিয়া লইতেন যে তাঁহারাও তাঁহাকে তাঁহাদের আপনাদের একজন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মহান হৃদয় কাহাকেও বাদ দিত না—পাপী বা নাস্তিক বলিয়া যাহাদের কাছ হইতে আমরা দূরে থাকিতে চাই তিনি তাঁহাদেরও তাঁহার স্নেহের অধিকারী করিয়া লইতেন। একমাত্র পাপ বলিতে, একমাত্র নাস্তিকতা বলিতে তিনি বুঝিতেন, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, কপটতা। 'হরি হরি বলিতেছি ও কাপড় তুলিতেছি,' নিজেকে ধার্মিক বলিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিতেছি, বেদান্ত-চর্চা করিতেছি, সর্বশক্তিমান অজর অমর পরমাত্মা আমাদের ভিতর রহিয়াছেন বলিতেছি, আবার নিজেকে দীনহীন দুর্বল ভাবিতেছি—ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দুর্বলতাই সকল মানসিক রোগের বিষাক্ত জীবাণু। তাই তিনি সর্বদা গীতার কথায় আমাদের বলিতেন, 'হে বীর, এ দুর্বলতা তোমাতে শোভা পায় না, এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ওঠ, জাগ, তোমার আবার কিসের ভয়, তুমি যে বীর'! ধর্ম—বেদান্ত যদি মানুষকে বীর্যবান না করিতে পারে, যদি নির্ভীক না করিতে পারে, যদি মানুষ না করিতে পারে তবে সে আবার কিসের ধর্ম? তাই তিনি সদা সর্বদা বলিতেন, বেদান্তের সারমর্ম উপনিষদের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'অভীঃ অভীঃ।' 'অভী'—ভয়শূন্য হও, তবে তো তোমরা মানুষ। কাকে ভয়, কিসের ভয়? যে আত্মা তোর ভিতর রয়েছে সেই আত্মাই সকলের ভিতর রয়েছে। যদি সকলের ভিতর সেই এক আত্মা না দেখতে পারিস, যদি সকলের দুঃখে সহানুভূতি না করতে পারিস, যদি পরের দুঃখ মোচন করতে না পারিস, যদি সকলকে ভালবাসতে না পারিস, প্রাণপণে পরের সেবা না করতে পারিস তো তুই আবার কিসের মানুষ, তুই তো পশুর সমান, তুই আবার ধর্ম করবি কি? তাই আগে মানুষ হ, অসীম বীর্যবান হ, অসীম কর্মঠ হ, নিজের পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াতে শেখ্, দেখবি ধর্মলাভ, মুক্তিলাভ তোদের হাতের মুঠোর ভেতর এসে যাবে।" তাই তিনি আমাদের প্রথমে তমঃ হইতে রজঃতে আসিবার জন্য উপদেশ দিতেন। তমঃকে সত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া আমরা যে তমের তমঃতে ডুবিয়া রহিয়াছি। তাই আগে আমাদের রজোগুণের অধিকারী হইতে হইবে এবং সত্ত্বতে পঁহুছিতে হইলে দেহমনপ্রাণ সমস্ত উৎসর্গ করিয়া শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে হইবে। তখনই মনপ্রাণ নির্মল ও পবিত্র হইয়া যাইবে, তখনই আমরা যথার্থ মুক্ত হইতে পারিব। যথার্থ মানুষ হইলে যেমন আধ্যাত্মিক জীবনে তেমনি ব্যবহারিক জীবনে আমরা আমাদের শক্তিকে যেভাবে ও যে পথে নিয়োগ করি না কেন সেই পথেই পরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব। তাই তিনি বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে কিরূপে কার্যকর করা যায় তাহা তাঁহার Practical Vedanta নামক বক্তৃতাগুলিতে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ যেমন প্রত্যেকেই এক একটি যুগপ্রবর্তক ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও সেইরূপ এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কালে যে ইহা সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়া মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। আসুন, আমরা সকলে তাঁহার সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী স্ব স্ব জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সেই মহান উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমাদের দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামিজী আমাদের সহায় হউন।

"যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বশান্তি

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

সমগ্র জগৎই আজ শান্তির কথা বলিতেছে, কিন্তু শান্তির অন্বেষণ তাহারা করিতেছে সংগ্রামের পথে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর আমরা শুনিয়াছিলাম, আর একটা মহাযুদ্ধ হইলেই পৃথিবীর বুক হইতে চিরদিনের জন্য যুদ্ধের অবসান হইয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিল ও গেল। যুদ্ধের অবসান তো হইল না—শান্তিও আসিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে—তাহার মহড়াস্বরূপ ছোটখাট যুদ্ধ লাগিয়াই আছে।

শান্তি হয়তো সব দেশ ও সব জাতিই চায়, কিন্তু পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশই শান্তির সত্যিকারের পথ খুঁজিয়া পায় নাই। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও কোথায় ও কিভাবে যেন সমগ্র মানবজাতি একত্বের বন্ধনে বাঁধা। সেই বন্ধনের সূত্রটি আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাই এদেশে উচ্চারিত হয় প্রেমের মন্ত্র। তাই সংগ্রামের পথে বিশ্ববিজয়ের অভিযান এদেশ হইতে কোন দিন বাহির হয় নাই ; হইয়াছে প্রেমের অভিযান।

অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে ভারতের নবজাগরণের অন্যতম নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি, সাম্য এবং পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা-স্থাপনের জন্য ভারতীয় আদর্শদ্বারা সমগ্র জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছিলেন—"বিদেশে গিয়া বেদান্তের মহাসত্যসমূহ-প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মিগণের প্রয়োজন। সমুদয় পাশ্চাত্ত্য জগৎ যেন একটি বিরাট আগ্নেয় গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্ত্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পারে। আহা, এই দেশেই একথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, ঘৃণাকে ঘৃণাদ্বারা জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায় ; আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে জগতের প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে পৌছে তাহার জন্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত লোক কোথায়? ভারতীয় চিন্তারাশি-দ্বারা জগৎ জয় করিতে হইবে।"

স্বামীজীর প্রথম কথাটি সত্যে পরিণত হইয়াছে—পাশ্চাত্ত্য আগ্নেয়গিরির ইতোমধ্যেই দুই বার বিস্ফোরণ হইয়াছে—তাহার ধ্বংসক্রীড়া এখনও চলিতেছে—তিলে তিলে, পলে পলে। ইহার পর যদি তৃতীয় বিস্ফোরণ হয় তাহা হইলে সমগ্র জগতে দুঃখকষ্ট যে আরও কত বাড়িয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। আবার তৃতীয় বিস্ফোরণই যে শেষ বিস্ফোরণ তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। বরং ইহাই অনিবার্য মনে হয় যে, পূর্বের জের স্বরূপ এইরূপ ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ-ক্রিয়া চলিতেই থাকিবে।

তাহা হইলে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত

হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ভারতের প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার মন্ত্রে জগৎ জয় করা। সেইদিন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কলিকাতায় এক বক্তৃতায় বলিলেন —"পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপায় জগতের পক্ষে ভারতীয় আদর্শের গ্রহণ।"

স্বামী বিবেকানন্দের পর বিশ্বের এই জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধানে ভারতীয় আদর্শের মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর বাণীতে। বিশ্বের মনীষিগণ দূর হইতে এই মন্ত্র শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ জগতের বিভিন্ন দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মন আন্দোলিত করিলেও তাহার ঢেউ আজিও বিশ্বের জনগণের চিত্তে দোলা দিতে সমর্থ হয় নাই। তাই রাষ্ট্র-শক্তিগুলি এখনও হিংসা ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং আণবিক বোমার প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের জন্য পূর্ণোদ্যম প্রস্তুতির পথে পা বাড়াইয়াছে। কোনদেশেই জনগণ যুদ্ধ চায় না, তাহারা চায় শান্তি। আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তাদ্বারা জগৎ জয় করা বলিতে স্বামিজী ভারতীয় আদর্শে পৃথিবীর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কথাই বলিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—পৃথিবীর প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে এই বার্তা প্রচার করিতে হইবে —শুধু ঘরে বসিয়া প্রেম, অহিংসা ও আধ্যাত্মিকতার কথা বলিলে চলিবে না—পাশ্চাত্যদেশের ভিতর গভীরভাবে এই ভাবধারা প্রবেশ করাইতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে চিরকাল শিষ্য থাকিলেই চলিবে না, গুরুও হইতে হইবে। এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের যথেষ্ট আছে। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে।" এই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা একমাত্র ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিতে পারে।

এইখানেই স্বামীজী কল্পনায়, সৃষ্টিমূলক চিন্তায়, সাহসিকতায় এবং সর্বোপরি কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও মনীষিবৃন্দ হইতে আগাইয়া গিয়াছিলেন এবং এইখানেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ যুগপ্রবর্তক বলা যায়। যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী জনগণকে ভারতীয় মহান আদর্শে—বৈদান্তিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে—উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে রাষ্ট্রশক্তিগুলি আপনা হইতেই হিংসার পথ পরিত্যাগ করিবে। ভারতবর্ষ হিংসার পথ গ্রহণ করিতে পারে না এবং করিবে না—অর্থাৎ বিনা প্ররোচনায় ভারত অপর কোন দেশের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক সংগ্রামের অভিযান করিতে পারে না—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইহার কারণ এই যে, বর্তমান জগতের গতিধারা সত্ত্বেও ভারত এখনও তাহার মহান আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই—যে মহান আদর্শ শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহার মর্মে বাসা বাঁধিয়া আছে। ভারতের পক্ষে যে আদর্শ আজ মহান, অপরাপর দেশের পক্ষে কাল কেন তাহা মহান হইয়া উঠিতে পারিবে না? যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচার ভিত্তিহীন কল্পনার অপচয় নয়—ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ফল। পাশ্চাত্য জড়বাদের কালো মেঘ ভারতীয় আদর্শের দীপ্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই, বরং সেই দীপ্তি যে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের স্বাধীনতালাভ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করিবে, তাহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বৈদান্তিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী

স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সমগ্র জগৎ এক মহত্তম পরিপূর্ণতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই যাত্রাপথের সারথি হইবে ভারত ও ভারতীয় আদর্শ বা বৈদান্তিক সাম্যবাদ। তাহার সূচনা নিশিশেষে রবিরশ্মির মতোই পূর্বগগন উদ্ভাসিত করিতে সুরু করিয়াছে।

সমগ্র জীবজগতের মধ্যে মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কি? জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকা বা সুখসম্পদের সহিত বাঁচিয়া থাকা—বা সুখসম্পদভোগে সাম্যের প্রবর্তন ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়। তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, মহত্ত্বে এবং সর্বোপরি তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভ্যুদয়ে। পশু-অবস্থা হইতে বিবর্তনের পথে মানুষ প্রথমে পশু-মানব এবং আদি-মানবের পর্যায় পার হইয়া সভ্য-মানবের পর্যায়ে আসিয়া থাকে। কিন্তু সেইখানেই তাহার ক্রমবিবর্তন শেষ হয় নাই—সে অতিমানবত্ব বা দেবমানবত্বেও পৌছিতে পারে।

মানুষকে সম্যক্‌রূপে দেবত্বেই পৌছিতে হইবে। এই সত্য ভারতে বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এই সত্যই বেদান্তের অন্যতম প্রধান বাণী। বেদান্তের মতে এই দেবত্ব আদিম সৃষ্টি হইতে জীবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার ক্রম-অভ্যুদয় হইতেছে। ইহাকেই বলা যায় বৈদান্তিক বিবর্তনবাদ। বেদান্তের এই সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ সহজ ভাষায় বলিয়াছিলেন—"Each soul is potentially divine."

বেদান্তের আর একটি সত্য হইল—জীবের চরম ও পরম সত্তা জড় নহে—চৈতন্যস্বরূপ। একই মহাসমুদ্রের কোলে অসংখ্য ঢেউএর মতো জীব শুধু এক অখণ্ড অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ-মাত্র। এই ভাবে সমগ্র মানবজাতি একত্বের বন্ধনে বাঁধা। স্বামিজীর ভাষায় —"আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল অপরিণামী সত্তা, অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য, এমন কি আর যাহা কিছু সবই এই মহান সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তের নামমাত্র—আর কিছুই নহে। যখনই আমরা পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের উদয় হইবেই—কারণ আমরা কি সকলেই এক আত্ম-স্বরূপ নহি? উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ।"

এই দুই সত্য—অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং মানুষের চরম সত্তা চৈতন্যস্বরূপ এক অখণ্ড অনন্ত আত্মা—স্বামিজী-প্রচারিত বৈদান্তিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তি। এই বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভেদের প্রশ্ন থাকে না, এবং তখনই মানুষ হিংসাদ্বেষ ও সংঘর্ষের উর্ধ্বে উঠিতে পারে। একমাত্র এই সত্যদ্বয়ের ভিত্তিতেই জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারে এবং স্বামিজী তাহাই চাহিয়াছিলেন। আর জগৎকে এই সত্যগ্রহণের শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র ভারত; শুধু পারে বলিলেই যথেষ্ট নয় —স্বামিজী মনে করিতেন ইহা ভারতের পরম দায়িত্ব।

জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার দৃষ্টি ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকিবেই—সংঘাতও সেজন্য অনিবার্য। দেশ বা শক্তিপুঞ্জবিশেষের সহিত মৈত্রীচুক্তি সাময়িক ভাবে সংঘাতকে দূরে সরাইয়া রাখিলেও পরোক্ষভাবে অপরাপর শক্তির সহিত সংঘাতের বীজই বপন করে। ভার্সাই চুক্তিই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করিয়াছিল একথা বিশেষজ্ঞরাই বলিয়া থাকেন। চুক্তি দ্বারা মৈত্রী-স্থাপনের প্রচেষ্টা হয় বাতুলতা, না হয় কপট ছলনা-মাত্র। স্থায়ী মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে একমাত্র মানুষে মানুষে একত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে। এই জ্ঞান সর্বপ্রকার স্বার্থবুদ্ধি-প্ররোচক জড়বাদের পথে আসা অসম্ভব। চৈতন্যরাজ্যের জ্ঞানবিস্তারই মানুষকে একত্ববোধের শিক্ষা দিতে পারে। এই জ্ঞানালোকে জগৎ প্লাবিত করিয়া জগতে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা এবং পূর্ণমৈত্রী-স্থাপনের দায়িত্ব যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবাসীর উপর দিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের বাণী*

জন্ ভ্যান্ ড্রুটেন্

বিবেকানন্দ ছিলেন অলোক-সামান্য পুরুষ, বিশেষতঃ আমেরিকাবাসিগণের নিকট। আমার মনে হয়, আমাদের অর্থাৎ প্রতীচ্যদের অধিকাংশের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ যেন স্বপ্নাধিক দুরধিগম্য; যদি কথনও তাঁহার প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভের সুযোগ আমাদের ঘটিত, তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধস্থাপনে আমাদিগকে বিপুল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইত। কেবল যে ভাষাগত বাধা (যাহা অনুবাদ অথবা ব্যাখ্যা দূর করিতে পারে) তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ভাবের একটা যথার্থ সংযোগ-স্থাপনের সমস্যাও হইয়া দাঁড়াইত গুরুতর। তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষার মানে 'অ-শিক্ষিত', তাঁহার নিকট মেধা বা বুদ্ধি প্রধান কিংবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য ছিল না। তিনি কথনও ব্যাপক দেশভ্রমণ করেন নাই। পাশ্চাত্য জীবনের অর্থ তাঁহার নিকট ছিল অজ্ঞাত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্ভাবে এরূপ বিভোর থাকিতেন যে সর্বদাই নিজকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবিতেন এবং এতদ্দেশবাসিগণের বিলাস-ব্যসন ও জীবন-যাত্রা তাঁহার নিকট প্রায়শঃ নিরর্থকই বোধ হইত। বস্তুতঃ পরিণামে এইগুলি ঈশ্বরীয়-গবের নিকট অকিঞ্চিৎকরই তো বটে। প্রতীচ্য জীবনের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের মাপ-কাঠিতে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র!

কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমাদের জন্য একজন বার্তাবহ আসিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর ছিল ইংরেজী ভাষায় বিস্ময়কর অধিকার, এতদ্দেশবাসিগণের অভাব-অভিযোগ-প্রয়োজনের প্রতি সজাগ ও সপ্রেম দৃষ্টি। যুবক বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের বিচারে পুরাপুরি 'শিক্ষিত' ও অধ্যয়নানুরাগী, মেধাদ্বারাই তিনি সকল বিষয়ের বিচার করিতেন। কিন্তু ধর্মকে উহা দ্বারা বিচার করিতে গিয়া তিনি তৃপ্তি পাইলেন না। মেধা বা বুদ্ধি সর্বাংশে পরোক্ষ বা গৌণ। তিনি খুঁজিতে লাগিলেন ধর্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল—'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ উত্তরে বলিয়াছিলেন,—'তোমাকে এখন যেমন দেখ্‌ছি এর চেয়ে আরও স্পষ্টরূপে তাঁকে দেখেছি। তোমার সঙ্গে এখন যেমনি কথা বলছি এর চেয়ে আরও নিবিড়ভাবে ভগবানের সঙ্গে কথা করেছি।' শ্রীরামকৃষ্ণের সহায়তায় বিবেকানন্দেরও এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছিল।

মার্কিনদিগের নিকট অন্য কোন আচার্যই বিবেকানন্দের ন্যায় ধর্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। তিনি স্বভাবতঃই আমেরিকাবাসিগণকে 'ভ্রাতা ও ভগিনী'রূপে জানিয়াছিলেন। ধর্ম-মহাসম্মিলনীতে তাঁহার প্রারম্ভিক সম্বোধন 'আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' কেন সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া দুই মিনিটকাল জয়ধ্বনি অর্জন করিয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু ঘটনা সত্যসত্যই ঐরূপ হইয়াছিল। ঐ-কয়েকটি

* ট্রাবুকো (দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত।

শব্দ দ্বারাই যেন পরিপূর্ণ বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হইল।

তদবধি বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে জানিয়াছিলেন এবং শ্রোতারাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন—জানিতেন যে অদ্বৈত-ভাবাবলম্বনে, জ্ঞানযোগের সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য মনীষার সম্মুখীন হওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আনি বেশান্ত তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন: "বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী, কিন্তু যোদ্ধা-সন্ন্যাসী" বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আমাদের ঠিক এই কথাটিই স্মরণ করা উচিত। এই দেশে শ্রোতৃবর্গের মনে তিনি বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খাঁটি 'খৃষ্টান' হইতে পারে নাই বলিয়া তিনি শ্রোতৃগণকে আক্রমণ করিতেন। ডেট্রয়েটে এক সভায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলিলেন, "যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, যথার্থ খৃষ্টপন্থী হও; তোমাদের দেশ যথার্থ খৃষ্টানের দেশ নয়।" এই ভর্ৎসনায় তিনি দুই-তৃতীয়াংশ শ্রোতাকে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্রোতা তাঁহার ঐ উক্তির যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিল—তিনি খৃষ্টধর্মের নিন্দা করেন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় খৃষ্টধর্মকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ আমেরিকান অন্ধভাবে ও নির্বিচারে যে সঙ্কীর্ণ বিকৃত স্বার্থপূর্ণ খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করিত তিনি উহারই নিন্দা করিতেন।

আমার মনে হয়, আমেরিকায় বিবেকানন্দের বাণী বলিতে প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ বুঝায়। প্রথমটি হইতেছে বেদান্তের সেই মহতী শিক্ষা, —সকল ধর্ম সত্য। আমরা সাধারণতঃ দেখি, একজন কোন ধর্মমত উদ্ভাবন করিয়া দাবী জানান যে, এই ধর্ম সকল মানবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে। তিনি যেন একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরহস্তে ভগবানের পশুশালারূপ এই বিশাল পৃথিবীতে ঘুরিয়া বলিতে থাকেন,—"প্রত্যেক জানোয়ারকেই এই পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে হইবে। বৃহৎকায় হস্তীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইলেও উহাকে ইহারই মধ্যে ঢুকিতে হইবে!" কোন প্রচারককে, কোন সম্প্রদায়কে তো বড় জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না 'লোকেরা আমাদের কথা শুনিতেছে না কেন? পরিবর্তে দেখিতে পাই তাঁহারা 'লোকদিগকে অভিশাপ দিতেছেন এবং বলিতেছেন,—লোকগুলি দুষ্টস্বভাব।' নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আরও ভাল জ্ঞান থাকা উচিত। যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, লোকেরা তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিতেছে না, তখন তাঁহাদের জানা উচিত যে, অন্যের উপর অভিশাপবর্ষণ নিজেদের প্রতিই প্রযোজ্য। তাঁহারা কখনও নিজেদের সম্প্রদায়গুলিকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর বাহিরে লইয়া গিয়া সকলকে উহাদের বিশাল বক্ষে স্থান দিতে সচেষ্ট হন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে এই একটি মহৎ সত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন: ধর্ম এরূপ বিশাল ও সার্বভৌম হইবে যে উহা যেন সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। ধর্মে সকলেরই স্থান আছে—সকলেই ধর্মে প্রবেশ করিবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে ত্যাগ। বেদান্তের শিক্ষায় ত্যাগের আদর্শ যেরূপ তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে আর কোথায়ও সেরূপ হয় নাই। কিন্তু তথাপি উহা শুষ্ক আত্মঘাতী উপদেশ নয়। ত্যাগের প্রকৃত অর্থ জগৎকে ভাগবতী দৃষ্টিতে অবলোকন—জগৎকে আমরা যেরূপ ভাবি, যেরূপ জানি, সেই ধারণা বদলাইয়া জগতের যথার্থ স্বরূপ জানা।

স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের সকল বস্তুকে আবৃত করিতে হইবে—সকলই মঙ্গলের

জন্য এইরূপ একটা অলীক মত দ্বারা নহে, অমঙ্গলের প্রতি অন্ধ দৃষ্টি দ্বারাও নহে, সর্ববস্তুতে তত্ত্বতঃ ভগবানকে দর্শন করিয়া। জীবন-মরণে, সুখ-দুঃখে ভগবান সমভাবে বিদ্যমান। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সমগ্র জগতে ব্রহ্ম অনুস্যূত হইয়া আছেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। ইহাই বেদান্তের শিক্ষা। জগৎসম্বন্ধে তোমার যাহা ধারণা ও অনুমান উহা আংশিক অভিজ্ঞতা, অতিশয় অপরিপক্ক যুক্তি-বিচার ও দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ কর। ঈশ্বরই স্ত্রী-পুত্র-স্বামীর মধ্যে আছেন—তিনিই সাধু-অসাধু, পাপ-পাপীর, মধ্যে আছেন। ইহা বাস্তবিকই -এইটি দারুণ উক্তি। তথাপি বেদান্ত আমাদিগকে ইহাই নির্ভীক ভাবে দেখাইতে ও শিখাইতে চায়।

তৃতীয় বিষয় হইতেছে—সাহস, প্রত্যয় ও সহিষ্ণুতা। তুমি কি করিয়া জানো যে গ্রন্থ সত্য শিক্ষা দেয়? বেদান্ত বলেন, কারণ—তুমি নিজে সত্যস্বরূপ এবং সত্যকে অনুভব করিতেছ। পৃথিবীর খৃষ্ট ও বুদ্ধগণের প্রমাণ কি? প্রমাণ—তুমি ও আমি তাঁহাদিগের মতো অনুভব করি। এইরূপেই তুমি ও আমি বুঝি যে তাঁহারা সত্য-স্বরূপ ছিলেন। আমাদের দ্রষ্টা-আত্মাই তাঁহাদের দ্রষ্টা-আত্মার প্রমাণ। তোমার দেবত্বই পরম-দেবতার প্রমাণ। তুমি যদি সত্য-দ্রষ্টা না হও, তবে ঈশ্বরসম্বন্ধে কিছুই কখনও সত্য হইতে পারে না। বেদান্তমতে ইহাই অনুসরণীয় আদর্শ। আমাদের প্রত্যেককেই সত্যদ্রষ্টা হইতে হইবে। সত্যদ্রষ্টা তুমি আছই, শুধু ইহা জানা বাকী। কখনও ভাবিও না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে। এরূপ চিন্তা করা একান্তই ধর্মবিরোধী। যদি কোন পাপ থাকে, তবে তুমি দুর্বল অথবা অন্যান্য সকলে দুর্বল—এই কথা বলাই একমাত্র পাপ।

এই অতিসাহসিক দেশ আমেরিকার পক্ষে বেদান্তের এই বাণীই সর্বোত্তম বার্তা; কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক সাহসের দিক দিয়া ইহা প্রচার না করিয়া উচ্চতর পারমার্থিক সাহসের দিক দিয়া প্রচার করিবার জন্যই বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল।

স্বামিজীর স্বদেশপ্রীতি

শ্রীবিবেকানন্দ পাল, এম্-এ

স্বামিজী বলেছিলেন, আমাদের উপাস্য দেবতা ভারতমাতা—ভারতীয় জাতি। এই দেবতা সর্বব্যাপী, তাঁর হাত পা কান সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ নিয়েই দেশ—এর মধ্যে কাহাকেও—একজন দরিদ্রতম লোককেও বাদ দিয়ে স্বামিজী দেশকে কল্পনা করতে পারেন নি। এই অনুভূতি তাঁর স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। তিনি বললেন—মন্দির নয়, মঠ নয়, ভারতের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানবাত্মার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে প্রাণের দেবতাকে। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে আমি ভালবাসি! নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীন-হীনকে আমি ভালবাসি। তাদের বেদনা

অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট তার স্বরাট। দেশকে জানতে, চিনতে তিনি পরিব্রাজক-রূপে ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারতবর্ষে। ভারতের ধূলিকণা, তার আকাশ বাতাস তাঁর কাছে ছিল পবিত্র তীর্থ। তুমি কোনও কাজের নও—এই কথা শুনতে শুনতে ভারতবাসী নিজের উপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিল। স্বামিজী তাদের বললেন, তোমরা ভারতের সনাতন আদর্শ ভুলো না। যা কিছু করবে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখের জন্য করো না। 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই;... তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।"

তিনি গড়তে চাইলেন এক নূতন ভারতবর্ষ। তিনি বললেন, সেই নূতন ভারত,—"বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে; বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।"

তিনি নিজেই কোনও চিঠিতে লিখেছেন, "আপনি আমাকে স্বপ্নবিলাসী কিংবা কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অবশ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার ঐকান্তিকতা অকপট। আর আমার চরিত্রের যদি কোনও ত্রুটি থাকিয়া থাকে তবে সে আমার দেশপ্রীতি—গভীর দেশপ্রীতি। আদর্শবাদী হইয়াই আমি জন্মিয়াছি এবং স্বপ্নরাজ্যেই আমি বাস করিতে পারি।"

সকলকে নিয়েই দেশ। সকলকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। দেশপ্রেমের এই অভিনব আদর্শ নিয়ে তাঁর জ্বলন্ত বাণী দিয়ে তিনি জাগিয়ে তুললেন দেশকে। জাতীয় জীবনধারায় এনে দিলেন সজীবতা। এনে দিলেন একটা মহাতরঙ্গ। পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের মূলে করলেন কুঠারাঘাত যাতে, লোকের মন নূতন কিছু—নূতন ভাবধারা গ্রহণ করতে পারে।

ভারতকে শক্তিশালী করে, তাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে সেবা করে ধন্য হতে চেয়েছিলেন স্বামিজী। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের মুক্তিকামনাও ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন। শুধু স্বদেশপ্রীতি সম্বল করেই নিঃসহায় সন্ন্যাসী সাগর পাড়ি দিতে সাহস করেছিলেন। তাঁর দেশকে ভালবাসতেন—প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন বলেই চিকাগো ধর্মসভায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কথা জগতের সামনে তুলে ধরে বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মানবৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান বা মানের মূল্য কি যদি ভারতবাসী থেকে যায় যে তিমিরে সেই তিমিরে? তাই তিনি চেয়েছিলেন দেশবাসীকে মানুষ করতে। "এরা না উঠলে মা জাগবেন না। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোনও দেশ কোন কালে উঠেছে দেখেছিস্। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোনও বড় কাজ হবে না ইহ

নিশ্চিত জানবি।" তিনি জানতেন,—"দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ।" বিশ্বাস করতেন যে, "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের উৎকৃষ্ট পন্থা।" তিনি বললেন,—"তোমরা মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি বিধান করিতে পার।"

দয়ার দ্বারা নয়, সেবার দ্বারা—সমবেদনার কোমল পরশে মানুষের মন জয় করতে চাইলেন স্বামিজী। "ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা। সকল উপাসনার সার অপরের কল্যাণসাধন করা।" তিনি বললেন,—"তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে—যুগ যুগ ধরে অনাহারে। একথা কি ভাবো? অজ্ঞানতা দেশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে একথা অনুভব কর? একথা ভেবে কি তোমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে না? নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় না? পাগল করে না? এই কথা ভাবতে ভাবতে তুমি দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাও? তবে বুঝবো তুমি দেশপ্রেমের প্রথম ধাপে পা দিয়েছ।" দেশকে কত ভালবাসলে এমনি করে প্রাণ দিয়ে কথা বলা যায়? দেশবাসীকে প্রাণ দিয়ে না ভালবাসলে কি বলা যায় "আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নবস্ত্র সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস।"

তিনি আনতে চেয়েছিলেন আমাদের মাঝে ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার প্রেরণা। তিনি বুঝেছিলেন, দেশবাসীকে মানুষ করতে হলে চাই লৌহের ন্যায় দৃঢ় পেশী, ইস্পাতনির্মিত স্নায়ু এবং বজ্রের উপাদানে গঠিত মন-বিশিষ্ট পবিত্রব্রতী, নিঃস্বার্থ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সেবাব্রতীর দল—যারা জগতের কল্যাণই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করবে, দেশবাসীর মধ্যে একতা আনতে, জাতীয় সমাজজীবন গঠন করতে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে সহায়তা করতে—দেশকে, সমাজকে, জাতীয় জীবনকে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে।

গীতার শিক্ষানুসারী তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা ছিল—এগিয়ে চলো, কাজ কর। "চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও।" তাঁর সেই সাধনার ভারতকে—স্বপ্নের সুমহান ভারতকে মহাশক্তিশালী করবার দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়? পুরাণো গতানুগতিক পথেই কি চলবে স্বাধীন ভারতের চিন্তাধারা বা কার্যক্রম? স্বামিজীর ভাবধারার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে গড়ে তুলতে হবে না কি আমাদের মহা-ভারতকে? বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে না কি তার সুমহান আদর্শকে?

স্বামিজীর স্বদেশপ্রীতি আমাদের পথপ্রদর্শক হোক।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

মহাকাশ, মহাব্যোম ধ্যানযোগে ধীরে অতিক্রমি,
অতিক্রমি দেবস্থান,—ভাব, রূপ কল্পনার ভূমি—
অখণ্ডের জ্যোতির্ময়, সমরস নিঃসীম প্রদেশে,
দেবশিশু যেই দিন অকস্মাৎ প্রথম প্রবেশে ;
যেই দিন সুকোমল অনিন্দিত বাহু দুটি দিয়া—
ধরিল মহর্ষিকণ্ঠ বিগলিত প্রেমে আবেষ্টিয়া ;
করুণার্ত্ত স্বরে নিজে দিব্যকণ্ঠে করিল আহ্বান,—
'ওঠ তুমি, হে মনীষী—মহা-ঋষি, হে যোগী মহান্ !'
সেই দিন পৌষশেষে অন্ধকার কৃষ্ণাসপ্তমীতে,
পুঞ্জীভূত কুয়াসার রন্ধ্রহীন ঘন-তমিস্রাতে,
দেখা দিলে জ্যোতির্ময় তুমি হোমশিখা,
দুঃখ-খিন্ন পৃথ্বীবুকে দীপ্ততেজ রুদ্র-বহ্নি-লিখা !
সে-দিন কি উচ্ছ্বসিত, বেগস্ফীত মন্দাকিনীধারা,
কূলপ্লাবী প্রবাহিল, প্রবাহিল তটরেখা-হারা ?
দিগন্তের প্রান্তদেশে উঠিল কি শুভ শঙ্খধ্বনি,
না জানিয়া নিগূঢ় বারতা মর্ত্ত্যবাসী করে কানাকানি
এলে যোগী মহাভাগ, আপ্তকাম ত্যাগীর ঈশ্বর,
ইচ্ছামৃত্যু, হৃদিবান্ শিব-অংশে তুমি বীরেশ্বর !

* * *

তুমি এ-যুগের প্রতিনিধি জন
মুক্তি-সাধক, সর্বত্যাগী ;
মানবের তরে সঁপেছ জীবন
সমাধি-সিদ্ধ, হে বৈরাগী !
তোমার মাঝারে শ্রীরামকৃষ্ণ
অমোঘ শক্তি সঞ্চারিল,
তোমার জীবনে ভারত-জীবন
এই যুগে পুনঃ মূর্ত হ'ল।
নিত্যমুক্ত সন্ন্যাসী তুমি
নিষ্কাম যতি সিদ্ধধ্যানী,
আর্তজনের অশ্রু মোছাতে
বহিয়াছ শিরে ব্যথার গ্লানি।
আপন মুক্তি চাহনি ত কভু
চাহনি কিছুই নিজের লাগি,
মানবের শুভ সাধনা তোমার,
সাধনা দীনের মুক্তি মাগি।
যাহাদের কথা কেহ কহে নাই,
বোঝে নাই কেহ যাদের ব্যথা,
তাহাদেরি লাগি ফেলি আঁখিজল
মর্ত্ত্যে এনেছ স্বরগ-সুধা।
তোমার কণ্ঠ কম্বু-নিনাদে
ঘোষণা করিল সিন্ধুতীরে,
'মৃত্যুপারের অমর-জীবন
সাধক যে-জন লভিতে পারে।
ধর্মে ধর্মে নাহি কোন ভেদ,
নাহি কোন ভেদ জাতিতে দেশে ;
ব্রহ্মের মহা-অর্ণব বুকে
শত স্রোতধারা চরমে মেশে।'
সার্বভৌম মানব-ধর্ম
কোন যুগে কেহ কহেনি যাহা,
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনভাষ্যে
তুমিই প্রথম ঘোষিলে তাহা।
পাপী ও পাপের সংজ্ঞা ঘুচায়ে
আত্ম-মহিমা কহিলে তুমি,
মূর্ত হইল তোমার জীবনে,
আর্যধর্ম,—আর্যভূমি।

ভারতবর্ষ তোমারে পাইল
যেন নব-যুগ-মন্ত্রদাতা,
দ্বাদশ সূর্য একযোগে পুন
আলোকে লিখিল বেদের গাথা।
তুমি মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ
চির-যৌবন, মৃত্যুঞ্জয়ী,
গত-অনাগত মিশিছে তোমাতে—
তুমি কালাতীত সত্যাশ্রয়ী।

তব কল্পিত মহামানবতা—
বহু-বিচিত্রে ঐক্যরূপ,
কালের অমোঘ নিগূঢ় বিধানে
এতদিনে ধীরে নিতেছে রূপ।
শ্রীরামকৃষ্ণ-সুত তুমি প্রভু
এ-যুগের নব বার্তাবহ,
শক্তি-মন্ত্রে এনেছ চেতনা
জাতির শ্রদ্ধা প্রণতি লহ।

অঞ্জলি

(এক)

স্বামিজী ও বর্তমান ভারত

শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এক হওয়ার মন্ত্র দিয়ে গেছেন। তাঁর মাঝে ভালবাসার স্নিগ্ধ সুধা যে কত বেশী ছিল, সমগ্র দেশ তা' আজ জানে। যাদের আমরা নীচ বলে ঘৃণা করি, ছোটজাত বলে দূরে সরিয়ে রাখি, তাদের তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন; বলেছিলেন, ভাই, তোমরা আমার পর নও। তোমরা নীচ নও, ছোট নও, তোমরা ভারতবাসী, তোমরা আমার ভাই। তোমরা আমার আত্মার আত্মীয়। তাদের কানে তিনি মন্ত্র দিয়েছিলেন—মানুষ নীচ হয়, ছোট হয় তার কর্মে, তার জন্মে নয়।

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, 'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা-লাভের চেষ্টা করিনা।' ক্ষীণবীর্য সমাজের এই দীনতা, এই ক্ষুদ্রতা, এই দুর্বলতা বিবেকানন্দকে ক্ষুব্ধ করেছিল। সারাজীবন তিনি তাই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মঙ্গল-কামনায় অতন্দ্র ছিল তাঁর মন; সমাজকে সুন্দর, সংসারকে কল্যাণময়, মানুষকে সুন্দর করে তুলবার জন্যে সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা, সবই বিবেকানন্দের দানে সমৃদ্ধ।

বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতকে সচেতন করলেন তার অমূল্য সম্পদ ধর্মের সংরক্ষণের প্রতি। আত্মার আনন্দ-ক্ষেত্রে যার বিচরণ,

জ্ঞানদীপ্ততার কেন্দ্রে যার প্রতিষ্ঠা, জীবন-প্রবাহের পুরোভাগে যার স্থান, সেই ধর্মবোধকে অন্তর হতে মুছে ফেললে ভারত কখনও মঙ্গলের পথ খুঁজে পাবে না—এই সতর্কবাণী তিনি দিয়ে গেলেন। বিবেকানন্দের কাছে ভারতের যুবকগণ শুনল, বিপদে পড়ে ভগবানকে ডাকার নাম ধর্ম নয়, ধর্ম হচ্ছে মনের প্রসার ও প্রকাশ Religion is not a groan when under oppression, it is expansion and manifestation. ধর্ম হচ্ছে মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দেখে তার সেবা। ধর্মের এই উদার সার্বজনীন সত্যের উপর তিনি বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সেবা-প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে জগতের কাছে সেবাকার্যের এক অসামান্য আদর্শ স্থাপন করলেন—ভারতের যুবকদের দিলেন সংগঠন আর আর্তসেবার দীক্ষা।

ভারতবর্ষের জাগরণে বিবেকানন্দের অবদান অসামান্য। অসংখ্য কর্মের প্রেরণায়, সুদৃঢ় শক্তির কামনায় সদ্য-জাগরিত ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল। দুর্বার তেজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুসংহত শক্তির প্রয়োগে অবসান ঘটাল দীর্ঘ বিদেশী শাসনের, ভারত পেল স্বাধীনতার সন্ধান। কিন্তু আমরা যেন না ভাবি, আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। কাজ শেষ হতে এখনও অনেক বাকী। বিদেশী রাজশক্তির নিকট বন্দী না রইলেও অন্তরের সুপ্ত বিদ্বেষবহ্নি, অপ্রীতির মালিন্য, নির্বীর্যতার গ্লানি যে আমাদের এখনও বন্দী করে রেখেছে! এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে স্বামিজীর কথা শোনাবার, স্বামিজীর মন্ত্র প্রচার কোরবার।

বর্তমান যুগের সমস্ত সমস্যার কথাই যেন তিনি ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষির মত বহুপূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই উপদেশচ্ছলে তিনি যে-সব জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনের সর্বস্তরে প্রেরণা দান করছে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর' কোটি কোটি নরনারীকে অহিংসার যে বাণী শুনিয়ে, উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলে অস্পৃশ্যতা বর্জন করে সমস্ত মানবজাতিকে ভাই বলে বুকে তুলে নেবার জন্যে সাম্য, প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর যে মন্ত্র শুনিয়ে গান্ধীজী মহামানব বলে অভিহিত হলেন—তার জন্য মহাত্মা গান্ধীর গুরুস্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকদিন আগে যখন ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুদয় হয়নি, তখন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে ভারত, ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ-দরিদ্র-অজ্ঞ-মুচি-মেথর তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল, আমি ভারত-বাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।'

বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন, সমাজ সুন্দর করে, সংসারকে কল্যাণময় করে; মানুষকে প্রগতির পথে সকল বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত করবার সাধনায় আত্মোৎসর্গ করাই সত্যিকার মুক্তিমার্গ। সঙ্কীর্ণ ব্যষ্টি-সাধনার পথকে বর্জন করে সমষ্টিগত মুক্তিসাধনাকেই জীবনের ব্রত বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামিজীর সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও বিশেষ করে বর্তমান ভারতে অনুধাবন করবার। আমাদের যা আছে তা আমরা য়ুরোপকে দেব; য়ুরোপের যা আছে তা নেব তার কাছ থেকে; কাউকে নিজের সংস্কৃতি হতে ভ্রষ্ট কোরব না, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত কোরব না।

আজকের ভারতের সমস্যাকণ্টকিত পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে মনে হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের ধারা ও জীবনের সাধনাকে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করে তাঁর আদর্শকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে ভারতের বহু কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করা যেতে পারে।

(দুই)

বেদান্তকেশরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস

আমরা যখন সংস্কারের আবর্তে পড়ে এবং পাশ্চাত্ত্যের চোখ-ঝলসানো আলোকে অভিভূত হয়ে একরূপ হতাশ ভাবে বসে পড়ছিলাম, তখন বাংলা মায়ের জঠর হতে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর জীবনের প্রারম্ভেই মনে যে ঝড় উঠেছিল তা দেখেই আমরা স্তম্ভিত, যে ঝড় তিনি বুকের মাঝে বহন করতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রেমের পরীক্ষা ত্যাগে। তাঁর প্রেম ত্যাগের মহত্ত্বে দীপ্ত। ত্যাগ ও অক্লান্ত সাধনা স্বামিজীর জীবনে সম্মিলিত ভাবে দেখা দিয়েছিল।

স্বামিজীকে একটি ব্যক্তি-বিশেষ মনে করা বোধ হয় ভুল; তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মহাজাতির অন্তরপুরুষ। ছোট সংসারের আত্মীয়স্বজন তাঁকে ফেরাতে পারেনি; অতি প্রিয়জন ও আরামের নেশা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তীব্র ব্যাকুল অন্তরে ভগবানকে জানার অনুসন্ধিৎসু হৃদয় নিয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে।

পরমহংসদেব ছিলেন বেদ ও মন্ত্র, আর স্বামিজী ছিলেন তাঁর ভাষ্য এবং অনুষ্ঠান। যার বুকে জ্বলেছিল দেশমাতৃকার মুক্তি-যজ্ঞের হোমানল-শিখা; বস্তুতান্ত্রিক জগতের লোকমান্য তাঁর কাছে শুষ্ক তৃণদল-মাত্র। মোহে যে বাঁধা পড়ে সাধনায় তার অধিকার নেই। বিবেকানন্দ আজন্ম মোহমুক্ত। তিনি বলেছেন, "দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়; লেকচার, বই, ফিলসফি সব তার নীচে।" স্বামিজীর এগিয়ে যাওবার মতবাদ শুনলে স্বতই মন সাহসে ফুলে ওঠে। তাই তাঁর সে কথা মনে হয়—"উঠ উঠ— মহাতরঙ্গ আসছে—onward, onward—নামের সময় নেই, যশের সময় নেই, মুক্তির সময় নেই, ভক্তির সময় নেই, দেখা যাবে পরে। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে। * * * সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার, তিনি আসছেন। মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। পৃথিবীতে একমাত্র কাজ আছে সে হল পরোপকার, আর বাকী সব অকাজ। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্—আমরা রামকৃষ্ণ-দাস।"

বিবেকানন্দের কথায় ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে, মৃত পায় প্রাণ, অন্ধের চোখ ফুটে যায়, কুঁড়ে হয়ে যায় বীর। যাদের প্রাণ মানুষের উন্নতি-কামনায় ছট্ফট্ করে, তাদের কাছে স্বামিজীর কথা অমৃতের সমান। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, পদতলে সীমারেখা-হীন নীল বারিধি, মাঝখানে উন্নতকায় নির্ভীক বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবক হিন্দুধর্মের পতাকা হাতে নিয়ে গেয়ে চলেছেন বিশ্বধর্ম-মহাসভায়। সম্বল তাঁর ঠাকুরের অভয়মন্ত্র, আর জন্মভূমির আশীর্বাদ। বিবেকানন্দের অনাদৃত প্রবাস-জীবনের এক অধ্যায় প্যাকিং কেস্ হতে আরম্ভ করে রাজপথপার্শ্বে যাপিত হয়। দুঃখের কষ্টিপাথরে এরূপেই ভগবান পরীক্ষা করে নেন জগতের মহামানবগণকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিরস্মরণীয় দিন; ঐ দিন জড়োপাসক, দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্ত্য জাতির সম্মুখে গৈরিকবসন-ভূষিত, উন্নতশির, মর্মভেদিদৃষ্টি-পূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, মনোহর অঙ্গভঙ্গী নিয়ে যে অমৃতময় ভাষণ বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন তার তুলনা বিরল।

স্বামিজী কারও গ্রহ ছিলেন না। তিনি স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র সূর্য। স্বতন্ত্র তাঁর আকাশ, নিজস্ব তাঁর আলোক; যে আদর্শ তিনি দিয়ে গেছেন তাতে আছে অপূর্ব অভিনবত্ব। নিষ্ক্রিয়তাই অধোগতির সব চেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। তাই স্বামিজী বলেছেন—"Do even evil work like a man. Be wicked, if you must, on a great scale." যদি খারাপ কাজও করতে হয় তাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হতে হয় তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও। এই পরিপূর্ণ আদর্শে পৌছতে গেলে সবার আগে চাই চরিত্রগঠন, শিক্ষা, নির্ভীকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা (character-building, education, fearlessness and organization); আমরা যদি আদেশ-পালনে কিঞ্চিৎ সক্ষম হই তবে তিনি আমাদিগকে সফলতা, পবিত্রতা ও আনন্দের ত্রিবেণী-সঙ্গমে পৌছিয়ে দেবেন। ধূমায়িত প্রাণবহ্নির এমন তমোনাশী দীপ্তি জগৎ অনেকদিন দেখেনি। ভারতের মর্মবাণীর মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমানব হলেও বাঙ্গালী। বাংলার যে কন্দরে এ বেদান্তকেশরী জন্মেছিলেন, তা আজ সর্বভারতীয় তীর্থস্থল। স্বামিজী স্বীয় কর্মজীবনে পবিত্র আদর্শকে প্রকটিত করে তুলতে পেরেছেন বলেই তাঁর আবেগাকুল আহ্বানে জাতি আজ উদ্বুদ্ধ।

নবজাগ্রত ভারতের কানে মুক্তির ভৈরব-রাগিণী শুনিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর সেই মৃতকল্প জাতিকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করবার জন্যই স্বামিজী বিদায় নেবার আগে দেশবাসীকে তাঁর অগ্নিবাণী শুনিয়ে গেছেন:—

"Up, up, the long night is passing, the day is approaching, the wave has risen, nothing will be able to resist its tidal fury."

(তিন)

স্বামিজীর জাতীয়তা

শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস

জাতীয়তার উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান পতনোন্মুখ হিন্দুজাতির সুপ্ত চৈতন্যের জাগৃতি আর জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেবাধর্মের ভিত্তিস্থাপন। পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানে জীবের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম। সেবার দ্বারাই একে অন্যের প্রতি জাতীয়ভাব প্রকাশ করতে পারে, হিন্দু ও অহিন্দু ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হতে পারে, ভেদ মুছে গিয়ে সমগ্র জাতি ও সমাজ এই স্নেহ-বন্ধনে দৃঢ় হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথমে সেবার মধ্য দিয়ে জগতের সম্মুখে ভারতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখলেন, মহান আদর্শ স্থাপন করলেন।

তিনিই শোনালেন,—"প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে। সেই মেরুদণ্ড বিনষ্ট হইলে জাতীয় জীবনও বিনষ্ট হইবে; ধর্মই জাতীয় জীবনের প্রধান মেরুদণ্ড।" ধর্ম হিন্দুজীবনের মূলমন্ত্র, হিন্দুজীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ। ধর্মের দ্বারাই হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব। সনাতন ধর্ম বিনষ্ট হওয়ার নয়। ধর্ম এখন মলিন ও বিকৃত। ধর্মের মলিনতায় আমরা তমোগুণকে সত্ত্বগুণ

বলে গ্রহণ করেছি। তাই স্বামিজী বলতেন, "দেখিতেছ না সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যে থানে মহাজড় বুদ্ধি পরবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদন করিতে চায়, যেখানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চায়, যেখানে ভণ্ড তপস্বী তপস্যার ভান করে নিষ্ঠুরতা ও অধর্মকে ধর্ম বলে গ্রহণ করে, যেখানে নিজের সামর্থ্যহীনতার প্রতি লক্ষ্য কাহারও নাই, কেবল অপরের প্রতি দোষ নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিবে, তাহাতে আর প্রমাণান্তর চাই ?"

পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিঃসৌষ্ঠবে আমরা যখন ছিলাম অন্ধ, তাদের বাহ্যাড়ম্বর অনুকরণ করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়েছিলাম আর অসহায়ভাবে সেই সভ্যতার তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলেছিলাম, তখন তিনি বল্লেন, আমাদের পরানুকরণে প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের মর্ম গ্রহণ করব। যেমন ইংরেজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও করব। ইংরেজ ইংরেজী রকমে চলে, আমরা চলব হিন্দু রকমে। যেখানে যা' ভাল তাই গ্রহণীয়, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাইরে হিন্দু। হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করব না।

স্বামিজীর সেবাধর্ম হিন্দুধর্মেরই রূপান্তর। সারা ভারতবর্ষে বিভিন্নধর্মাবলম্বী লোকের বাস। শুধু ভারতে কেন? বিদেশেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নিকটও তাঁর নবপ্রবর্তিত অপূর্ব সমন্বয়ের সাধন সেবাধর্ম আদরণীয়। জাতীয় জীবন বিকশিত হবে তার প্রভাবেই। সুতরাং জগতের শ্রেষ্ঠ সত্যকে অনুভব করতে হলে মানবজাতির সেবা করতে হবে, বিশ্বমানবকে ভালবাসতে হবে। কারণ, সাধারণতঃ আমরা যাঁকে ভালোবাসি তার দুঃখ-দৈন্যও আমাদের অন্তরে আঘাত করে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত। মানবজাতিকে যদি ভাই বলে বুকে জড়াতে পারি, তাদের ক্ষুদ্রতম আঘাতও হৃদয়ে তীব্র ভাবে বেজে উঠবে।

স্বামিজী সগর্বে প্রচার করেছেন, "তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও; যাও অপরের সাহায্য কর, অপরের সেবা করো"—কেননা মানবজাতির প্রতি সেই সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসীর প্রেম ছিল স্বত-উচ্ছ্বসিনী ভাগীরথীর ধারার মত। তাহা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র, উচ্চনীচ, দীনহীন আপামর জনসাধারণের উপর সমভাবে বর্ষিত হইত। দীনহীন অবজ্ঞেয়—তারাও ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাদের মধ্যেও ব্রহ্ম বিরাজমান। তাদের দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি না। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রতি ঔদাসীন্য কখনই তাঁর উপাসনার অনুকূলে নয়। ভারত চিরকালই সেবার মূল্য দিয়েছে। তার আত্মত্যাগ সকল দেশের নিকটই আদর্শ।

কালচক্রের পরিবর্তনে ও উগ্র আবহাওয়ায় ভারত বিভক্ত হলো; কিন্তু সেবাধর্ম চিরদিনই থাকবে সকল দেশের নিকট অবিস্মরণীয়, অবিভক্ত। আজ আমাদের দেশবাসীর দুঃখকষ্টের অন্ত নেই। প্রতি পদক্ষেপে সমস্যার উদ্ভব, বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর অন্ন-বস্ত্র-অর্থ প্রভৃতি সমস্যা অশেষ। তার উপর বাস্তুহারাদের সমস্যা। তাঁর সেবাধর্মকে স্মরণ করে আজও কি মনে হয় না—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

পদদলিত মানুষের দুঃখ-দৈন্যের যদি

সমাধান না হয় তাহ'লে তাঁব সেবাধর্মের মূল্য কোথায়? তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অপরিসীম। স্বদেশকে কত তিনি ভালোবাসতেন তা বর্ণনাতীত। তিনি এদেশের প্রতি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভালবাসতেন। এদেশের যা কিছু মন্দ তার প্রতিবিধান করে এদেশকে এক মহামহিমময় আসন প্রদান করবার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন। এদেশের দোষগুণ তিনি যেমন ভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছেন বোধ করি এমন আর কেউই করেন নি।

স্বামিজীর শিক্ষার আলোকে স্বদেশের প্রতি অশেষ প্রীতি ও ভালবাসা, জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও বেদনা এবং মনের সুবিশাল উদারতা যুগ যুগ ধরে সকল জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে; তাদের মিলনের পথে, ঐক্যের পথে, আর প্রীতির রাজ্যে টেনে আনবে।

অজানার প্রতি

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

মন্দিরমাঝে খুঁজেছি তোমায়, নভোবঙ্গনে শরতে;
জোছনা-জড়ান বারিধির তটে, ঘোর অমানিশি তমতে
অপির আকুতি, মধুর বিলোল,
তোমার আশায় তোলে হিন্দোল—
শ্যাম-অরণ্য তোমারে চাহে যে, কল-গুঞ্জনে ধরিতে;
তোমার ছোঁয়ায় সুরভি ছড়ায়, তনু মঞ্জুল চকিতে!

প্রদোষছায়ায় অতি চুপি চুপি, অবগুণ্ঠিত দিবসে—
তোমার বয়ান দেখিবার আশে তনু চঞ্চল হরষে।
বিদায়গোধূলি শেষ-তুলিকায়,
আলোক-গীতালি এঁকেছে ব্যথায়—
অজানিত যাহা তাহারে ঘিরেছে একি অদ্ভুত রভসে!
দেখি নাই যারে তাহার বিরহে শতবিক্ষোভ উছসে।

গৃহগেহহীন ভিখারী সেজেছি, মন-উন্মাদ মেতেছে;
নিশীথ-আসনে তোমারে চাহিতে ঘন তমিস্র ঝরেছে।
পাহাড়ের পরে বিজন বনানী,
তোমার বারতা করে কানাকানি—
মেঘের আড়ালে পাণ্ডর চাঁদ নিরজনে কোথা পশিছে?
উষার তৃষায় শুকতারকার জীবন-দীপালি নিভিছে।

বুঝিতে নারিনু, ওগো কাণ্ডারী!—কোন্ দিগন্তে উজলে;
সবারে জড়ায়ে একাকার তুমি—কী রূপ তোমার উথলে।
তুমি কি শুধুই ভাবের চাতুরী?
বাঞ্ছিত সাথে খেল লুকোচুরি—
ইংগিতে তব সংগীত ফোটে, আর্তহৃদয়-মরুতে;
চিনি না জানি না, বুঝি না, তবুও প্রাণাধিক প্রিয় জগতে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন *

সৈয়দ ফজল আলী

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার-পরিদর্শনের আহ্বান আসিলে আমি দ্বিধাসংকোচহীন চিত্তে ও সানন্দে উহা গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, আমার মনে হইল যে এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন যে সুন্দর কাজ করিতেছেন, উহার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের একটা সুযোগ পাইব। মিশনের এই গ্রন্থাগারটি পুরীবাসিগণের ও তীর্থযাত্রীদের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতেছে এবং ইহা মিশনের সেবা-কার্যের অন্যতম নিদর্শন। ইহা শুধু গ্রন্থ রাখিবার একটি ভবন নয়, পরন্তু বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার একটি কেন্দ্রও বটে—এখানে সাধু ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সদুপদেশপূর্ণ ও উচ্চ-ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা ও আলোচনাদি হইয়া থাকে।

* * *

রামকৃষ্ণ মিশন কোন কোন চিন্তাশীল মনীষিমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ইহার কারণ—যে মহান্ ঋষির নামের সহিত এই প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত, তিনি এবং তাঁহার সমকীর্তি উদারচরিত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদ, বেদান্ত ও পুরাণে নিহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমূহ সহজ সরল ভাষায় উপদেশচ্ছলে সকলের নিকট উপস্থিত করিয়া মানুষের জীবনের বৃহৎ রহস্যগুলির সমাধান সুগমতর করিয়াছেন এবং আমাদের মনে এই আশা জাগাইয়া দিয়াছেন যে, চরম সত্য উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে একেবারে সাধ্যাতীত নহে। আমরা জানি যে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনব্রতই ছিল সর্ব-সাধারণের নিকট আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ সুগম করা; স্বামিজীর নিম্নোদ্ধৃত বাণী আমার এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে:

"সমগ্র জগৎকে আমাদের সহিত মুক্তির পথে লইয়া যাইতে হইবে; মহামায়ার রাজ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিতে হইবে—তখনই তোমরা সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আকাশবৎ অসীম অপরিমেয় আনন্দের সহিত কি কিছুর তুলনা হয়? সেই অবস্থায় তোমরা বাক্যমনাতীত হইবে, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' দর্শন করিয়া অবস্থান করিবে। এই উপলব্ধি হইলে তোমরা অপরিসীম প্রেম ও করুণাভরে সকলের সহিত আচরণ করিবে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে কর্মে পরিণত বেদান্ত।"

দুঃখ-নির্যাতনের রহস্যোদ্ঘাটন-সম্পর্কেও স্বামিজী কিরূপ সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন! তাঁহার অমর উক্তিগুলি একবার স্মরণ করি—"নর-নারী প্রত্যেককে নারায়ণরূপে দেখ। তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না—কেবল সেবা করিতে পার; প্রভুর সন্তান-গণের সেবা দ্বারা তোমরা স্বয়ং প্রভুরই সেবার অধিকারী হইবে। দরিদ্র ও দুর্গতগণ আমাদের মুক্তিদাতা। কারণ, পীড়িত, উন্মত্ত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত

* পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে উড়িষ্যার বর্তমান রাজ্যপাল কর্তৃক কয়েক মাস পূর্বে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সার-সঙ্কলন।

এবং পাপী—এই সকল আকারে আমাদিগের নিকট উপস্থিত ভগবানেরই আমরা সেবা করিতে পারি।"

লোকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আকৃষ্ট হন কেন উহার একটি প্রধান কারণের বিষয় আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ—ইহার আদর্শের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশের সহিত কার্যকারিতা ও সেবার মধুর সম্মিলন ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত 'কর্মে পরিণত বেদান্তে'র অর্থ সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারি। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য—"এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যেখানে সহস্র সহস্র যুবক 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনের জন্য) জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এই দেশে ও বিদেশে বহু শিক্ষামূলক ও জনকল্যাণকর সংস্থা-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মিশনের এই উচ্চ আদর্শানুরাগের ঐকান্তিক আগ্রহ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমি বারাণসীর অধিবাসী; তথাকার সেবাশ্রম মিশনের সেবাধর্মের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। * * *

মহাভারতের বিষয়বস্তু

অধ্যাপিকা শ্রীযূথিকা ঘোষ, এম্-এ, বি-টি

জ্ঞান-গরিমায় সমুজ্জ্বল ভারতের প্রাচীন যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত রামায়ণ-মহাভারতের কথা স্বতঃই মনে আসে। এই মহাকাব্য দুইটি ভারতীয় জনসাধারণের উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে।, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র হিসাবে এই গ্রন্থদ্বয়ের পরিচিতি জনসমাজে সমধিক। মহাকাব্য দুইটির মধ্যে মহাভারতই বৃহদাকার গ্রন্থ। ভাস্বর রত্ন আপন উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিকের জিনিষকে করে প্রদীপ্ত; বিস্ময়জনক এই বিরাট মহাকাব্যও সাহিত্য-জগতের বহু গ্রন্থকে আপন সমুজ্জ্বল প্রভায় অনবদ্য রূপগ্রহণে সমধিক ভাবে সাহায্য করিয়াছে। মহাভারত প্রাচীন ভারতের সর্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস। বহু শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের চিত্র সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হিসাবেও ইহার মূল্য কম নয়। উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বগুলি অনেক স্থলে সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মহাভারত সম্বন্ধে একটি প্রবাদবাক্য বহুদিন চলিয়া আসিতেছে—'যা নাই ভারতে, তা নাই জগতে'! অবশ্য মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীপ্রসূত নিম্নলিখিত শ্লোকটির অবলম্বনে ঐ প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি—

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥"

—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি বিষয়ে যাহা ইহাতে আছে তাহা অন্যত্রও আছে, যাহা ইহাতে নাই তাহা কোথাও নাই।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-অবলম্বনে মহাভারত রচিত

হইলেও যুদ্ধটি সমগ্র গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করে নাই। এই প্রসিদ্ধ সমরবৃত্তান্ত ভিন্ন মহাভারতে আরও বহু-বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় নৃপতিদের কীর্তিকলাপ, ব্রাহ্মণগণের প্রভাবসূচক উপাখ্যান, শিক্ষামূলক ছোট ছোট গল্প ও জাতীয় জীবনের প্রকাশক বহু কাহিনী এই বিরাট গ্রন্থে কোথাও যোগসূত্র অব্যাহত রাখিয়া, কোথাও বা অসংলগ্ন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রামায়ণের মধ্যে রামোপাখ্যানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্যান্য অবান্তর কাহিনীর উল্লেখ প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে থাকিলেও তাহারা রামোপাখ্যানকে গ্রাস করিতে পারে নাই; কিন্তু মহাভারত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-ব্যতিরিক্ত কাহিনীগুলির জন্যই বিরাট কলেবর ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য উপাখ্যানভাগের সহিত রামের কাহিনীও মহাভারতে স্থান লাভ করিয়াছে। বহুস্থানের ও বহুবৎসরের লোকপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলিকে যিনি মহাভারত-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই মহর্ষি বেদব্যাসের মনীষা-অনুধাবনে স্তম্ভিত হইতে হয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবর্ণনা মহাভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য-আহরণে আমরা নিরাশ হইতাম। সেক্ষেত্রে তৎকালীন জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ চিত্রটি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আর সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হইত না। ভারতের ইতিবৃত্ত ও পুরাতত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটনে মহাভারত কত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানান্বেষীর পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দার্শনিক, লেখক, ঐতিহাসিক, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, কবি বহুকাল ধরিয়া সানন্দে মহাভারতের পীযূষধারা পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, আবার নূতন পাত্রে সেই অমৃত ঢালিয়া তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। অমর কবি কালিদাস রঘুবংশ-রচনার প্রারম্ভে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন পূর্বসূরিদের চরণে। পূর্বকালে কোন কিছু রচনার উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণের পূর্বেই অব্যাহত গতিতে লেখনীসঞ্চালনের জন্য রচনাকার অন্যান্য শ্লোকের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি শ্রদ্ধাসমাহিত চিত্তে উচ্চারণ করিতেন—

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

প্রস্ফুটিত পদ্মের বিস্তৃত পত্রের ন্যায় লোচন-বিশিষ্ট অগাধজ্ঞানসম্পন্ন ব্যাসদেব আপনার দ্বারা মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে, তাই আপনাকে প্রণাম করি।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালন, পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরস-প্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সহস্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাব-প্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবনের অস্থি কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন সেইরূপ

প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

মহাভারতের মধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-সংহিতা প্রথমে ২৪০০০ শ্লোকে রচিত হয়, কিন্তু এই ২৪০০০ শ্লোক যে কোনগুলি তাহা এখন নির্ধারণ করা কঠিন; কিন্তু ক্রমশঃ বিবিধ উপাখ্যানভাগ সংযোজিত হওয়ায় শ্লোক-সংখ্যা এক লক্ষে দাঁড়ায়। এই জন্য মহাভারত শতসাহস্রী সংহিতা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমগ্র মহাভারত গ্রন্থ অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। এক একটি পর্ব পুনরায় কতকগুলি অধ্যায়ের সমষ্টি। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী কয়েকটি পর্বে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

মহাভারতের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের কথা প্রথমেই বলিতে হয়। এই যুদ্ধকাহিনী সর্বজন-বিদিত। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ভ্রাতৃবিরোধের জ্বলন্ত নিদর্শন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যে সংগ্রাম তাহাতে ন্যায় যে পরিণামে জয়লাভ করে করে, তাহা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া। ভগবন্নির্ভর, সত্যসন্ধিৎসা, ন্যায়-নিষ্ঠা ভক্তকে অবশ্যই পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভের পথে সহায়তা করে।

ভারতীয় সমাজ তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল। রাজ্য-শাসন, উৎপীড়িতের রক্ষণ, শত্রুজয়, দুর্বৃত্তদমন—এই ছিল ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। এই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়ধর্মই বিশেষভাবে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সহিত বিযুক্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম-পরিজ্ঞাপক কয়েকটি গল্পের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান সকলেরই জানা আছে। এই কাহিনী-অবলম্বনে মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ রচিত হইয়াছে।

যযাতির কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বার্ধক্য-হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক রাজা যযাতি পুত্র-গণের নিকট নিজের জরাগ্রহণের অনুরোধ করেন। পিতৃভক্ত পুরু আপন জীবনের সুখভোগ সম্পূর্ণ-রূপে জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃবাসনা-পূরণে অভিলাষী হইয়া যৌবনে পিতার বার্ধক্য গ্রহণ করেন। ভোগলালসায় উদ্‌গ্রীব রাজার চরম অভিজ্ঞতা সকলের নিকট মূল্যবান উপদেশ হইয়া আছে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

—কামনার উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃত পড়িলে তাহা যেমন বর্ধিত হয় সেইরূপ কামনাও বর্ধিত হইতে থাকে।

রাজা নহুষের আখ্যান মহাভারতে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। যযাতির পিতা নহুষ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কিছুকাল স্বর্গরাজ্য পরিচালনা করেন। ইন্দ্রপদবী লাভ করিয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ তিনি মহামুনি অগস্ত্যকে অপমানিত করেন; ফলে অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে সর্পরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হয়। শনির কোপ-দৃষ্টিতে রাজ্যচ্যুত বিপর্যস্ত রাজা নল ও তৎপত্নী দময়ন্তীর দুর্দশাপূর্ণ জীবনকাহিনীও এখানে বর্ণিত হইয়াছে। বীররমণী বিদুলার পুত্রের প্রতি উপদেশে ক্ষাত্রধর্মের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। শত্রুভয়ে ভীত রণবিমুখ সন্তানকে অগ্নিবর্ষী ভাষায় জননী বিদুলা যে সারগর্ভ উপদেশ দান করেন তাহা অতুলনীয়। ক্ষত্রিয়-মাহাত্ম্যসূচক বহু কাহিনী এই ভাবে মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য মহাভারতের মধ্য দিয়া যখন সমধিক প্রচারিত হইতে থাকিল তখন ব্রাহ্মণগণ

—যাঁহারা সমাজে উচ্চবর্ণ—নিজেদের অবস্থার কথা মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন। জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহারা ভাবিলেন—মহাভারতের মধ্যে এমন কাহিনী সংযোজিত করিতে হইবে যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণের অতুলনীয় শক্তিমাহাত্ম্য, বেদ-বত্তা, পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার কথা কীর্তিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নূতন নূতন গল্প রচিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে ব্রহ্মশাপে কিরূপে অন্যান্য বর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে, ব্রাহ্মণের পরিতুষ্টির দ্বারা নীচবর্ণ আশীর্বাদ লাভ করিয়া কি প্রকারে উন্নতিলাভ করে, যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ যে উন্নতিলাভের সহায়ক —ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গল্পগুলি মহাভারতের এই দিকটিকে সুস্পষ্ট করিয়াছে : —

পরীক্ষিৎ-পুত্র রাজা জনমেজয় যে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেখানে যজ্ঞের বাহ্যিক আড়ম্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। ভৃগুপুত্র চ্যবন রাজা শর্যাতির অল্পবয়স্কা কন্যার প্রগল্‌ভতায় অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার সৈন্যদের শাপ দেন। রাজা বৃদ্ধ মুনির সহিত কন্যার বিবাহে সম্মত হওয়ায় তিনি তাহাদের শাপমুক্ত করেন। এই কাহিনীতে ব্রাহ্মণের শক্তিমত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণের অসন্তোষজনক কোন কর্ম করিলে ইন্দ্রও ইন্দ্রত্বপদবী হইতে ভ্রষ্ট হইতেন। স্বর্গচ্যুত শ্রীভ্রষ্ট ইন্দ্রকে নিজের পদবী পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত হইতে হইত। রাজনন্দিনী সাবিত্রীর পাতিব্রত্য হিন্দু-রমণীর আদর্শস্বরূপ। মৃতস্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ধর্মরাজ যমকে তিনি যে কাতর অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা আজও যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়। ধর্মরাজের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ কথোপকথনে সত্যের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনের তপোবনের মাধুর্য্যময় পরিবেশটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহর্ষি আয়োদধৌম্যের তিন জন শিষ্য উদ্দালক, আরুণি ও বেদ অশেষ গুরুভক্তির জন্য জীবনে বিশেষ উন্নতিলাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ আচার্য শিষ্যের অধ্যয়নানুরাগ ও ভক্তিদর্শনে প্রীত হইলে শিষ্যের কল্যাণকামনায় অসাধ্যসাধনেও প্রবৃত্ত হইতেন। মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় নৃপতি বিশ্বামিত্রের বিরোধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের জয়গানে পর্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাহাত্ম্যদর্শনে বিস্মিত বিশ্বামিত্র নিজেকে অসহায় মনে করেন। বিশেষ শক্তি-অর্জনের নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন এবং শেষে বশিষ্ঠের অনুগ্রহে ব্রহ্মর্ষি-পদবী লাভ করেন। মহামুনি অগস্ত্যের সমুদ্রের জল-শোষণ ও অত্যাচারী অসুরবধের দ্বারা ব্রাহ্মণের শক্তিমত্তা সূচিত হয়।

তৎকালীন সমাজহিতৈষী উন্নতহৃদয় কয়েক জন ব্যক্তি মহাভারতের অব্যর্থ প্রভাব চিন্তা করিয়া কিছু নূতন ধরনের গল্পরচনাতেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বহুস্থলে পশুদের কথোপকথনের মধ্য দিয়া উপদেশমূলক গল্প রচনা করিয়া মহাভারতের সহিত যোগ করা হইয়াছে। কোন দলগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। নীতিশিক্ষার দ্বারা সমাজের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়নই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মহামতি বিদুর বহুস্থলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নীতি-উপদেশ দিয়াছেন। নীতিমূলক কয়েকটি গল্পের কথা এখানে বলা হইতেছে : —

পূর্বজন্মকৃত কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; কৃতকর্মের প্রভাব হইতে পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নিষ্কামভাবে ভগবৎ-সাধনায় নিরত হইতে হইবে; এ জগতে মানবের জীবন ক্ষণস্থায়ী; মহাকালের অমোঘ শাসন

অমান্য করিবার শক্তি কাহারও নাই; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবনের কাজ শেষ করিয়া সর্ব-বিধ্বংসী মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিতে মানব বাধ্য—এই সমস্ত তত্ত্বকথা চিত্তাকর্ষক সরস গল্পের মধ্য দিয়া বহুস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। অহিংসা পরমো ধর্মঃ—বৌদ্ধধর্মের এই মূলকথাটি কোন কোন গল্পে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি গল্পে কূপপতিত মানবের যন্ত্রণার সহিত সংসারাসক্ত মানুষের দুর্দশার তুলনা করা হইয়াছে। রাজা শিবির গল্পের মধ্য দিয়া আশ্রিতবৎসলতা ও দানধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ধর্মপরায়ণ মুদ্গলকে স্বর্গবাসের কথা জ্ঞাপন করা হইলে তিনি স্বর্গসুখের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হন। স্বর্গস্থিতি ক্ষণিক এবং স্বর্গসুখও অস্থায়ী ইহা জানিয়া মুদ্গল পুনর্জন্মনিবৃত্তিকারী নির্বাণ-লাভের জন্য গভীর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। একস্থলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে কথোপকথন দেওয়া হইয়াছে সেখানে পিতা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক, কিন্তু পুত্র জাগতিক সুখদুঃখের অসারতা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সমর্থন করিয়াছেন। পিতা পুত্রকে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে গভীর জ্ঞান উপার্জন করিয়া সংসারী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। সংসার না করিলে পুত্রজন্ম হয় না এবং পুত্র-অভাবে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু পুত্র অল্প-বয়সেই সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা দর্শনে অভিভূত হইয়াছেন। আসক্তি-পরিহারই সুখলাভের প্রকৃত উপায়। জন্মমৃত্যুর করাল কবল হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছায় তিনি পিতার যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং নিষ্কামভাবে কর্মসাধন বা গভীর ধ্যানের দ্বারা "আত্মানং বিদ্ধি" এই উপনিষদ্-বাক্যের যথার্থতা প্রমাণিত করেন। পিতার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সংসারে বীতস্পৃহ পুত্র কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত হন। বৌদ্ধজাতক-সমূহের মধ্যেও এই প্রকারের গল্প দেখা যায়। এই সমস্ত গল্প মহাভারতে যাঁহারা সন্নিবেশিত করেন, তাঁহারা বৌদ্ধজাতকের দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত কাহিনী ভিন্ন মহাভারতে অন্যান্য ব্যাপারও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শান্তিপর্বে রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্মের কথা বলা হইয়াছে। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম সংসারে বীতস্পৃহ যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দিবার জন্য রাজধর্ম-সম্বন্ধে বহু উপদেশ দেন। এই সমস্ত আলোচনা স্থানে স্থানে অতি জটিল ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে। কত নীতিকথা পূর্বে বলা হইলেও পুনরায় এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। অনুশাসন-পর্বে দণ্ডনীতির প্রাধান্য। এই পর্বে দানধর্মের উপযোগিতা সমর্থিত হইয়াছে; অবশ্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফললাভ হয় সেই কথাই প্রধানভাবে বলা হইয়াছে। ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মোক্ষধর্মশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে অন্যতম রত্ন। বেদান্তদর্শনের কঠিন সূত্রগুলি সরস ও সহজবোধ্য করিবার জন্য যেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবির্ভাব।

মহাভারতের বিরাট কলেবর-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী Winternitz-এর মন্তব্য এস্থলে প্রণিধানযোগ্য। মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী-অধ্যয়নে স্তম্ভিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন—"It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an epic and a poem. Indeed in a certain sense the Mahabharata is not one poetic production at all but rather a whole literature." রামায়ণ-মহাভারতের রচনাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বিস্ময়বিমথিত চিত্তে বলিয়াছেন—"রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্যমাত্র।... ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যধর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" কবির এই হৃদয়গ্রাহী সমালোচনার পর আর কিছু বলা শোভা পায় না। মুগ্ধ হৃদয়ে আমরা সেই মহামনীষীর পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি—

নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে।

বিবেকানন্দ-স্মরণে

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিস্তীর্ণ জলধিকূলে সময়ের বেলাভূমি জুড়ে
মাঝে মাঝে নামে অন্ধকার। দূর দিগন্তসিন্ধুরে
তখন নিঃশব্দ মৃত শতাব্দীর প্রেতভূমি বলে
শঙ্কা জাগে মনে। মনে হয়—জীবনমৃত্যুর তলে
যে চির নিত্যের স্পর্শ প্রাণে প্রাণে ছন্দ রেখে যায়,
যে সূর্য মাটির চিত্তে মৃত্যুহীন জীবন জাগায়,
দাহ তার নিভে গেলো; মরে গেলো স্বর্ণময় ধরা,
মনে হয়—অন্ধকারে বাজে শুধু মৃত্যুর প্রহরা।

তারপর অকস্মাৎ শতাব্দীর মৃত্তিকাশীতল
হৃদয়ে উত্তাপ জাগে, জলে ওঠে সমুদ্রের জল;
শুনি, দূর দিগঙ্গন মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি লেগে
গর্জে ওঠে বজ্রাগ্নি লেখায়; অকস্মাৎ ওঠে জেগে
অরণ্যের বুকে দাবানল। পর্বত বিদীর্ণ করি'
জ্বলে অগ্নি; রক্তরাগে ঝরে পড়ে তমিস্রশর্বরী;
দেখা দেয় পুনর্বার জীবনের অমেয় আশ্বাস,
ভালো লাগে মাটি আর মানুষের প্রাণের নিঃশ্বাস।

তাই আজ মানুষের অন্তহীন বিষণ্ণ জীবনে
হতাশা বেদনা ক্লান্তি আমরা উত্তীর্ণ হ'য়ে যাই
তাই যত দীপ্তি নেভে দু'চোখের বিবর্ণ তারায়
আমরা বিশ্বস্ত শুধু প্রাত্যহিক গ্লানিকে ছাড়াই।
আমরা চাহিয়া থাকি,—রাত্রি যত স্তব্ধ হয় হোক,
এ'রাত্রি বিদীর্ণ করি' জ্বলিবেই অমৃত আলোক।

আবার আসিও তুমি

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

জাগ্রত বেদান্ত তুমি, বিবেক-আনন্দ-নিকেতন
মিথ্যা-মোহ-তমিস্রায় সত্যবর্তি মেলিলে নয়ন।
অজস্র সঙ্কটাঘাতে প্রাণ যবে হল মুহ্যমান
ক্ষয়িষ্ণু জাতির তরে নিয়ে এলে অমৃত-সন্ধান।
জীবন-গোধূলি-লগ্নে ফুটাইলে মধ্যাহ্নের ভাতি,
পতনের অবরোধে উত্থানের দিলে মুক্তিস্বাতী।
রাষ্ট্রদূত ছিলে নাকো, তুমি ছিলে আর্যকৃষ্টি-দূত,
প্রতীচ্যের মর্মদ্বারে প্রাচ্যবাণী দিলে, অবধূত।
আছে কিনা আছে কোথা মানুষের দরদী ঈশ্বর
দেখিবারে চেয়েছিলে ভয়হীন হে জ্ঞান-ভাস্কর!
অদেখার সাধনারে ক্লৈব্যসম করি' পরিহার
চেয়েছিলে অনিবার্য মূর্তিমান সাক্ষাৎ সাকার।
তাই, পার্থ, পেয়েছিলে নর-রামকৃষ্ণ-নারায়ণে,
সাধনার সেই ফল বিলাইলে অয়নে অয়নে।
ভারতের দুঃখ-দিনে, হে বিবেকানন্দ, থাক যেথা
তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরি' আবার আসিও তুমি হেথা।

পুরাতন স্মৃতি

[শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের প্রসঙ্গ পুরাতন হইলেও চির-সজীব। পূজ্যপাদ শিবানন্দ (মহাপুরুষজী) মহারাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন এমন তিন জনের এই স্মৃতি-কথাগুলি তাঁহার জন্ম-তিথি-অবসরে ভক্তগণের নিকট উপাদেয় লাগিবে, সন্দেহ নাই।—উঃ সঃ]

(এক)

শ্রী—

১৯১১ খৃঃ অক্টোবর মাসে (পূজার ছুটিতে) টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বল্লারতনগঞ্জ হইতে বেলুড়-মঠসন্দর্শনে গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পূর্বে পরম পূজনীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ভক্তরাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অল্পদিন পর ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণলীলায় আপন আপন অংশ অভিনয়ান্তে পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। মঠযাত্রার অনেক পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান করিতাম। করুণাময় ভগবান অল্প কয়েক শত বৎসর আগে এই বঙ্গদেশে জীবের মুক্তির জন্য, প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য ভক্তবেশে নর্তন, কীর্তন করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গিয়াছেন; অধম আমি তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার ভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই; তখন কুকুর, বিড়াল হইয়াও মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারি নাই। না হয় গদাধর শ্রীবাসাদির দর্শন ও পদরেণু ধারণ করিতে পারিলেও জন্ম সার্থক হইত। এই সব ভাবিয়া অহোরাত্র রোদন করিতাম। অসীম মনোদুঃখের মধ্যে বল্লা গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের নিকট উদ্বোধন পত্রিকা পাইলাম। উহাতে তখন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ এবং শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিত 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ' প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে বাহির হইতেছিল। এই সব পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার আসিয়াছেন জানিয়া খুবই আশ্বস্ত বোধ করিলাম এবং বেলুড় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। বয়স তখন ১৯ বৎসর। কলিকাতা কখনও যাই নাই; তবুও মনের টানে সাহস করিয়া একাকী যাত্রা করিলাম। বেলুড় পৌছিয়া গঙ্গার ধার দিয়া মঠবাড়ীর পূর্ব বারান্দায় ঢুকিয়াছি। বারান্দার পশ্চিম দেওয়ালে হাতে আঁকা একখানা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জলাশয়ে হংস সন্তরণ করিতেছে। পূর্বাকাশে সূর্যদেব উঠিতেছেন। ছবির নীচে "সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমার দুয়ারে"—রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি লিখিত রহিয়াছে। আর উত্তরের প্রকোষ্ঠে অতিথিদের গৃহের উত্তরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় একখানা ছবি। তিনি সমাধিমগ্ন অবস্থায় ভূগোলকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ বাহু ঊর্ধ্ব-প্রসারিত করিয়া অমৃতরাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে নব-গৌরাঙ্গের সংঘ-ভবনে পৌছিয়া এবং এই দুই ছবি দেখিয়া মনে হইল আমি তাঁহার দুয়ারে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের* সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল।

* স্বামী বিবেকানন্দের এক জন সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী ধীরানন্দ।

কোথা হইতে আসিয়াছি এই সব জিজ্ঞাসান্তে বিশ্রামের স্থান করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গঙ্গাস্নান করিয়া দর্শন ও প্রণামাদি করিবার জন্য ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরঘর হইতে আসিলে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট আমাকে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি এই সন্ন্যাসিপ্রবরকে যুগাবতারের লীলাসঙ্গী ভাবিয়া গঙ্গা সাক্ষী করিয়া গুরুপদে বরণ করিলাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া জন্মের মত দাস হইলাম। আর ভাবিলাম, এই শক্তিমান মহাপুরুষ কি ভাবে আমার জপ-তপস্যা-ভক্তি-বিশ্বাসবিহীন জীবনে প্রবেশ করিয়া আমাকে কৃপা করেন, খুব সতর্কভাবে তাহা আমি বুঝিয়া লইব। আমার কি নাম, কোথা হইতে কেন আসিয়াছি, আমার কে আছে না আছে, মহাপুরুষজী সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমার প্রায় কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিয়াছিল, বুদ্ধি বিকল হইয়াছিল। আমি অবশের ন্যায় কোন প্রকারে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং সার কথা ইহাই বলিলাম—"মহারাজ, আমি ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি। আর আমি গৃহে ফিরিব না। আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার দাসরূপে আশ্রয়দান করুন। আমি এখানে আপনার সেবক হইয়া থাকিব, অথবা আপনি অনুমতি করিলে আপনার কৃপালাভ করিয়া হিমালয়ের গভীর বনে প্রবেশ এবং তথায় তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া জীবনপাত করিব।" তিনি বলিলেন, —"তুমি ছেলেমানুষ, কোথায় বনে যাবে?" এই মঠেও এখন থাকিও না। তুমি কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া মায়ের সেবা কর। তুমি ঘর ছাড়িলে তোমার মায়ের অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইবে। ঘরে থাকিয়াই জপ-তপ ও মাতৃসেবা কর। সর্বদা চিঠিপত্র লিখিবে এবং আমাদের কাছে যাওয়া-আসা করিবে।" এই কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া তিনি আমাকে মঠে থাকিতে এবং হিমালয়ে যাইতে না দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিলেন। আমি গৃহত্যাগের প্রবল উদ্যমে দারুণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একান্ত অনিচ্ছায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

(দুই)

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৪ই নভেম্বর ১৯২৫ সাল। বিকাল ৪টায় বেলুড় মঠে পৌঁছুলাম। ঠাকুরদর্শন করে পূজনীয় মহাপুরুষজীর কাছে গিয়ে বসেছি।

জনৈক ভক্ত।—মহারাজ, আপনি আমাকে কৃপা করুন।

মহাপুরুষজী।—তোমরা যেখানেই থাক তাঁকে সর্বদা স্মরণমনন করবে, কাতরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করবে; তিনি বড় কৃপালু। তোমাদের কৃপা করবার জন্যই শ্রীভগবান এবার নরশরীর ধারণ করে জগতে এসেছিলেন। কত কঠোর সাধনা করে তার ফল তোমাদের জন্য রেখে গেলেন, যাতে তোমরা ঠিক ঠিক মানুষ হয়ে ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসলাভ কর।

জনৈক ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে ব্যবসার কথায় বল্লেন, আজকাল মিথ্যা না কইলে ব্যবসা চলে না।

মহাপুরুষজী।—মিথ্যা কথা বলবে কেন? ঠিক ঠিক দর বলবে, যদি খরিদ্দারের ইচ্ছা হয় নেবে, না হয় না নেবে; মিথ্যা কেন বলবে? সত্য, নিশ্চয়ই বলবে। আজকাল অনেকে দরাদরি পছন্দও করেন না।

ম-বাবু।—আমার আত্মীয়া শ্রীমতী—আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে।

মহাপুরুষজী।—হাঁ, মেয়েটি খুব সৎ ও উদার, খুব ভক্তি-বিশ্বাস। দেখুন ম-বাবু, ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস হলে মানুষের কখনও গোঁড়ামি থাকে না। সে তার ইষ্টকে সর্বভূতে দেখে। ঐ দেখুন এই মেয়েটি অন্য সম্প্রদায়ের, তবুও ঠাকুরের উপর কেমন নিষ্ঠা-ভক্তি!

জনৈক ভক্তকে মহাপুরুষজী বলছেন,—দেখ, জগতে সব জিনিসেই ভয় আছে, তাই শঙ্করাচার্য বলছেন, কেবল বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে লোক ধন্য হয়। সাধু ও গৃহস্থ উভয়েরই সংযমী হতে হয়। সংযম ভিন্ন কিছু হবার যো নেই। তোমাদের অত লাখ লাখ জপ করতে হবে না। যা পার ভাবের সহিত করে যাবে, সর্বদা প্রার্থনা করবে। তোমাদের এই জন্মেই মুক্তি হয়ে যাবে।

হ-বাবু।—মহারাজ, ধ্যান কেন হয় না?

মহাপুরুষজী।—ধ্যান করবার সময় ভাববে যে, তোমার ইষ্ট একটি ফুটন্ত পদ্মের উপর বসে আছেন, আর তাঁর শরীর থেকে একটি জ্যোতি বেরুচ্ছে, তুমি তাই দেখছ আর প্রার্থনা করছ। এই ভাবে ধ্যান করে নিও; ঠিক হবে, অবশ্যই ভগবানের দর্শন পাবে।

১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী। ঠাকুরের আরতি দর্শন করে মহাপুরুষজীর ঘরে এলাম। জনৈক স্ত্রীভক্তকে মহাপুরুষজী বলছেন,—দেখ মা, এই তো সংসার দুদিন আছে তো তিন দিন নেই। তিনিই সত্য, তাঁকে ডাকাই লাভ।

অ-বাবু নামক জনৈক ভক্তের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

অ-বাবু।—মহারাজ, যখন রাস্তায় গরীবদের দেখি কারো হাত, কারো বা পা নেই, অন্ধ—তখন প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। তখন ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, প্রভু, তুমি জগতের দুঃখ-কষ্ট দূর করতেই এসেছিলে, এদের দুঃখ দূর কর।

মহাপুরুষজী।—তুমি ঠিক প্রার্থনা করছ। হাঁ, এইরূপ প্রার্থনা বড়ই ভাল, এতে ভগবান বড়ই খুশী হন। নিজের জন্য ত লোকে সব সময়েই প্রার্থনা করে কিন্তু পরের জন্য কে প্রার্থনা করে? এই ভাব বড়ই সুন্দর, তুমি নিশ্চয়ই এইরূপ প্রার্থনা করবে, এতে জগতের বড়ই কল্যাণ হয়।

জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন,—দেখ, তোমাদের ঠিক বলছি, এখন আমাদের কোন plan নেই; তিনি যেখানে নিয়ে যান সেই ঠিক। একটুকুও plan করি না। ঝড়ের এঁটো পাতার কথা ঠাকুর বলতেন, আমাদেরও এখন সেই অবস্থা। জানি, তিনি আমাদের মন্দ যায়গায় নিয়ে যাবেন না। এই বিশ্বাস আছে।

জনৈক সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কার কাছে দীক্ষা নিয়েছ?

সাধু।—শ্রীশ্রীমার কৃপা পেয়েছিলুম।

মহাপুরুষজী।—তা বেশ, তুমি খুব প্রার্থনা করবে, মা, আমি বড় দুর্বল, আমাকে বল দাও, বুদ্ধি দাও, ভক্তি-বিশ্বাস দাও। তিনি তোমার প্রার্থনায় সব দিয়ে দেবেন, তুমি আপ্তকাম হয়ে শ্রীশ্রীমার কাছে চলে যাবে।

কথাপ্রসঙ্গে কু-বাবুকে বল্লেন,—টাকা লোকে কী ভাবেই ভালবাসে! এ এক মস্ত মায়া, লোকে টাকা টাকা করে পাগল। এবার শ্রীশ্রীঠাকুর এই কামিনীকাঞ্চন কিভাবে ত্যাগ করতে হয় দেখিয়ে গেলেন। তোমরা টাকার জন্য বেশী ভেবো না; তিনি তোমাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড় দেবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই এই কথা বলে গেছেন।

(তিন)

শ্রী—

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। কয়েক বার বেলুড় মঠে, মধুপুরে এবং আরও কয়েক স্থানে গান শুনিয়ে তাঁকে খুসী করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু বেলুড় মঠে অবস্থানকালে যে আনন্দ এক-দিন পেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়। একদিন ইচ্ছা হোল কোন সভা-সমিতিতে নয়, তাঁর ঘরে বসে তাঁকে ভজন শোনাব। তাঁর এক জন সেবকের মারফত মহাপুরুষজীকে অনুরোধ জানাতে তিনি হাসিমুখে বললেন, বেশত, কাল সকালে এসো, এই ঘরেই তোমার গান শুনবো। আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলাম। পরদিন সকাল ৮টার সময় আমি ও আমার একটি বন্ধু ঠাকুর-ঘরে প্রণাম ক'রে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলাম। প্রণাম করে একটু বসবার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে মঠের হারমোনিয়াম আনা হোল। মহাপুরুষজী বস্‌লেন তাঁর খাটের উপর, আমরা বস্‌লাম ঘরের মেঝেতে একখানি সতরঞ্চে—উপরোক্ত সেবক মহারাজ খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। গান আরম্ভ করবার সময় একটু ভয় হ'তে লাগল—কোন্ গানটি গাইলে তিনি খুসী হবেন এই ভাবনাও বড় কম ছিল না। আমি ঠাকুরস্মরণ করে মীরাবাই-এর বিখ্যাত ভজনটি গাইলাম, 'মহনে চাকর রাখো জী'। আমার অভ্যাস চোখ বুজে গান গাওয়া। গানের মধ্যেই একবার চোখ খুলে দেখলাম মহাপুরুষ মহারাজ চোখ বুজে স্থিরভাবে গান শুনছেন। বড় আনন্দ পেলাম। গানের মধ্যে ডুবে গেলাম। প্রথম গান শেষ হ'লে সেবক মহারাজ আবার একখানি গাইতে ইঙ্গিত করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের একখানি ভজন খুব প্রাণ ঢেলে গাইলাম। গান গেয়ে এত আনন্দ আমার জীবনে খুব কম পেয়েছি। ঘরের মধ্যে আমরা ৪ জন; দরজার সামনে ২।৩ জন সাধু-ব্রহ্মচারীও দাঁড়িয়েছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে দেখলাম নিশ্চল ভাবে বসে আছেন, মনে হোল কোন্ গভীরে যেন ডুবে গেছেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই যেন নেই। দুই চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মতি মহারাজ ইসারায় জানালেন, আর গান না গাইতে। অল্পক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে রইলাম। পরে নিঃশব্দে ধ্যানস্থ মহারাজকে প্রণাম করে চ'লে এলাম। ৩।৪ দিন পরে মঠে গেছি। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে যেতেই ছোট ছেলের মত হাততালি দিয়ে বল্‌লেন, মৃ—তোমার গান এখন আমি সব সময় গাইছি; ঠাকুরকে জানাচ্ছি 'প্রভু, আর অন্য কোন বাসনা নেই; তোমার দাস ক'রে রাখো।' এই কথা বলেই সুর করে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলেন 'চাকর রাখোজী'। আমি অবাক! এ ছবি দেখবার সৌভাগ্য হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলাম—বিশ্ববিশ্রুত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী শিবানন্দের দিকে। গান গেয়ে তাঁকে এতটা আনন্দ দিতে পেরেছি ভেবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম। কয়েক বার গেয়ে তিনি চুপ করলেন। ৩।৪ দিন পরে আবার মঠে গিয়ে দেখি মহারাজের সেই এক ভাব···সেই রকম হাত-তালি, গান ও প্রার্থনা।

একদিন মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে জানালাম, —মহারাজ, আমি যাঁর কাছে গান শিখি তাঁর বড় ইচ্ছা একদিন আপনি তাঁর গান শোনেন। মহারাজ হেসে বল্লেন, ও, তোমার ওস্তাদ

কোথায় থাকেন? হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে থাকেন শুনে খুসী হ'লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি গান করবেন? আমি বললাম,—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতি সবই তিনি ভাল জানেন —আপনি যা শুনবেন তিনি তাই গাইবেন। মহারাজ বল্লেন,—তাহলে ঠাকুরদের ভজনই শোনা যাবে, কি বল? একদিন সন্ধ্যার পর এসো তাঁকে নিয়ে। সেই মত একদিন আমরা সদলবলে মঠে যাই। সবেমাত্র আরাত্রিক শেষ হ'য়েছে—আমরা সংবাদ দিতেই মহাপুরুষজী আগ্রহ করে বল্লেন, ছাদের উপরই গান হোক, আমরাও শুনবো, ঠাকুরও শুনবেন। পুরাতন ঠাকুরঘরের সামনে ছাদের উপর মাদুর পাতা হল। তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা প্রভৃতি সহযোগে গান সুরু হোল। প্রায় ৩০।৪০জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত দেড়ঘণ্টাকাল নানারকম ভাল ভাল হিন্দী ও বাংলা ভজনগান শুনলেন। মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর প্রভৃতির ভজন শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন গায়ককে। বললেন, বাঃ, কি সুন্দর গান হোল; গান একটা কত বড় সাধনা! ভগবানকে পাওয়া সহজ হয় গান গেয়ে। ঠাকুর স্বামিজীকে কাছে পেলেই গান শুনতে চাইতেন, আর স্বামিজীর গান কি অপূর্বই ছিল! ধ্রুপদ, খেয়াল ওস্তাদের কাছে শেখা ছিল। মহাপুরুষজী এই প্রসঙ্গে আরও কত কথা বললেন। সেবককে বললেন, এদের সকলকে ভাল করে প্রসাদ খাইয়ে দাও। ৯টা বেজে ছিল রাত। নীচে নেমে এসে দেখলাম খাবার আয়োজন হয়েছে। সকলে তৃপ্তি-সহকারে প্রসাদ পেয়ে চলে এলাম।

সমালোচনা

বেদান্তদর্শন : ব্রহ্মসূত্র (জীবনভাষ্য)—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত; ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রবর্তক পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত; ১৸৶০+৫৯৩ পৃষ্ঠা; মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

ইহা এই সময়ের সুলক্ষণ যে, বঙ্গভাষায় বহু বেদান্তগ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ব্রহ্মসূত্রের এই নূতন ভাষ্য (জীবনভাষ্য) প্রচার করিয়া সেই শুভ প্রচেষ্টারই পুর্তিবিধান করিয়াছেন এবং অপরকেও অনুরূপ কার্যে উৎসাহ দিয়াছেন; সুতরাং তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী 'প্রকাশকের নিবেদনে' লিখিয়াছেন—"দ্বৈতবাদী আচার্যগণের সহিত জৈব সত্তার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের সহিত নিত্য ভেদ বিষয়ে সঙ্ঘগুরুর (অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার) ঐকমত্য থাকিলেও তিনি যেন আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া জীব, জৈবপ্রকৃতি এবং বস্তুগত দিব্য-রূপান্তর-সম্ভাব্যতা শ্রুতিপ্রমাণযোগে প্রতিষ্ঠা দিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাগবত উদ্বর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানসিক, প্রাণকৌষিক, এমন কি কায়িক দিব্যকরণের ইঙ্গিত ভারতশাস্ত্রে আছে, ইহাও তিনি তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির আলোতে উপস্থাপন করিয়াছেন।… তাঁর এই তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার মূল

মিলিবে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনবাদে। শ্রীঅরবিন্দ-মতিলালের এই অভিনব জীবনবাদের দার্শনিক ভিত্তি হইতেছে নিত্য ব্রহ্মযুক্তির উপর জীবন্মুক্তি তথা জগতের নিত্যত্ব এবং জীবের দিব্যত্ব।" জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই নবীন মতবাদটি প্রায়শঃ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেরই অনুরূপ। জীবনভাষ্যের অভিনবত্ব তাহার "ভাগবত উদ্বর্তন।" এই নব্য বা নব্যপ্রাচীন মতবাদ সম্বন্ধে আজকাল অনেক মনীষী আলোচনা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"যত মত, তত পথ;" সুতরাং জীবনভাষ্যের মত অবলম্বনে যে সকল সাধক অধ্যাত্মমার্গে উন্নতিলাভ করিবেন, তাঁহারা আমাদের অভিনন্দনীয়।

ইহা গ্রন্থের একটা দিক। ইহার অপর দিক আচার্য শঙ্করের মতখণ্ডন। জীবনভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"জীবে ও ব্রহ্মে যে যুক্তি, তাহা একে অন্যের লয় নহে। মোক্ষ ও মায়াবাদের কুহকে, সাধন-পথে এই মারাত্মক ভুল করিয়া একটা জাতি উৎসন্ন হওয়ার পথে" (৪১ পৃঃ)। "আচার্য (অর্থাৎ শঙ্কর) মায়াবাদী" (৪৯ পৃঃ)। ফল কথা, আচার্য শঙ্করই জীবনভাষ্যের মুখ্য প্রতিপক্ষ—তাঁহার দার্শনিক চিন্তা জাতির ধ্বংসের কারণ! বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ বহুতর প্রবল আক্রমণের ফলেও যে আচার্যের প্রভাব ভারতবর্ষে প্রতিহত হয় নাই (উহার অন্তর্নিহিত একটি স্বাভাবিক বলিষ্ঠতার জন্যই নিশ্চিত) তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলে গ্রন্থে যেরূপ সদ্‌যুক্তি, ভাষার সুস্পষ্টতা, সুনির্ধারিত অর্থে শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি থাকা আবশ্যক তাহা কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের সর্বত্র আমরা পাই নাই, ইহা না বলিয়া পারিলাম না।

দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট স্থলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম—"মনুষ্যশরীরে হৃদ্‌যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। অন্য প্রাণীর এরূপ নহে" (৭৪ পৃঃ)। "চক্ষে কাহারও যখন প্রতিবিম্ব পড়ে, সে সর্বদা সম্মুখে থাকে না" (৪৬ পৃঃ)। "শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-বোধক শব্দগুলি সবই ব্রহ্মবাদী" (২৯ পৃঃ)। "সূত্রের অর্থ সিদ্ধান্তপূর্ণ হইলে, উহার পারম্পর্য দেখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে" (৩ পৃঃ)। "ভূত-সকল অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদির আধার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা" (৩৬ পৃঃ)। "শ্রুতি সর্বত্র বলিয়াছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (৩৮ পৃঃ)। "ঐ উপনিষদের ব্রাহ্মণভাগে পরমাত্মবোধক উপদেশই অধিক দেখা যায়" (৫৪ পৃঃ)। "শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—"একৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাম্‌" (৭৬ পৃঃ)—শ্রুতি না শঙ্কর? "ঐ আদিত্যদের মধুদেবগণের আস্বাদ" (৭৯ পৃঃ)।

জীবনভাষ্যে সূত্রস্থ পদগুলির প্রাতিস্বিক অর্থ বা ব্যাবৃত্তি সর্বক্ষেত্রে দেওয়া হয় নাই; সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থও অনেকস্থলে দুর্বোধ্য। যথা—প্রথম সূত্রের (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) অতঃ শব্দের ব্যাখ্যা নাই, জিজ্ঞাসা পদেরও শব্দার্থ নাই। ১।২।২৬ সূত্রস্থ অসম্ভবাৎ শব্দের ব্যাবৃত্তি নাই। ১।৩।১৪ হইতে কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যায় 'দহর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু স্পষ্টতঃ কোথাও উহার শব্দার্থ নাই। অথচ শব্দটি এই-রূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, পাঠক উহা আকাশ অর্থে গ্রহণ করিতে পারেন। 'সেতু' শব্দটি ৫৫ পৃষ্ঠায় পুল অর্থে এবং ৬৭ পৃষ্ঠায় বাঁধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শঙ্করাচার্য কিন্তু দুই স্থলেই বাঁধ অর্থ করিয়াছেন এবং উহাই সমীচীন। ১।৩।২১ সূত্রের অর্থে আছে—"শ্রুতিতে 'অল্প'-শব্দ আছে।" কোথায় আছে বলা হইল না তো? আচার্য শঙ্কর এই 'অল্প' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া অল্পার্থক 'দহর' এর উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রের অর্থও সব জায়গায় সহজবোধ্য নহে। যথা—

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

"অন্তঃ (মধ্যে) তৎ-ধর্মোপদেশাৎ (তৎপ্রতি ধর্মোপদেশ হেতু)। ২০।

"অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী পরমাত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।" আচার্য শঙ্করও অন্তঃপদে আদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্তী অন্তর্যামীকে ধরিয়াছেন। কিন্তু এই তৎ-ধর্ম অর্থে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার অর্থাৎ অন্তর্যামীর ধর্ম। জীবনভাষ্যে "তৎপ্রতি" বলিয়া কাহার প্রতি দেখানো হইল না। অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রতি নিশ্চয়ই নয়।

শঙ্করের মত খণ্ডনের একটি মাত্র স্থল ধরা যাক। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতি বিচারিত হইয়াছে। ইহাই আচার্যের মত। জীবন-ভাষ্যকারও কার্যতঃ উহা স্বীকার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তত্তৎস্থলে ব্রহ্মলিঙ্গ অস্পষ্ট হইলেও ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তবে অকস্মাৎ বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তিনি কেন ১।৩।৪২ সূত্রের তাৎপর্য বলিলেন —"অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যপদিষ্ট হইল"? ইহা তো ভেদের প্রকরণ নহে, ব্রহ্মের প্রকরণ। অথচ এই গ্রন্থকারই প্রকরণভঙ্গ হয় বলিয়া ১।৩।৩৪ হইতে ১।৩।৩৮ পর্যন্ত সূত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই সূত্রগুলি কর্মঠব্রতী আর্য মনীষীরা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।" সর্বশেষ সূত্রে অকস্মাৎ আকাশের কথা উঠিল কি করিয়া? ইহাও কি প্রকরণভঙ্গ নহে?

তাহার পর পুরুষোত্তমবাদ স্থাপন করা হইল বাদরায়ণের কোন সূত্রানুসারে এবং আচার্যোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের স্বপক্ষে যে সব শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে তাহা খণ্ডিত হইল কি প্রকারে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

'ভাগবত উদ্বর্তন' বাদরায়ণ-সম্মত—এই মতও জানিতে পারিলাম না।

মোট কথা সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের মতবাদ ও তাঁহার নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও আমরা বলিতে চাহি যে, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা অথবা শঙ্করের খণ্ডন হিসাবে আমরা এই গ্রন্থে তেমন আলোক পাই নাই।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার; পোঃ পিপলন্, (বর্দ্ধমান)। পৃষ্ঠা—১৶৴+৩৪৭। সেবার্থে ভিক্ষা ৬৷০ মাত্র।

এই বইটি বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের এবং বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ-প্রণেতা ভক্তগণের রসমধুর লেখার একখানা আলোচনা-গ্রন্থ। ভক্ত পাঠকগণের নিকট নিবন্ধগুলি সমাদৃত হবে মনে হয়। লেখকের চিন্তাশীলতাও প্রশংসনীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীজয়দেব এবং মীরা-বাঈয়ের মত বিশ্বজনবিশ্রুত ভক্তসাধকগণের সুপরিচিত মধুর বাক্যাবলীতে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক একদেশিতার গন্ধ পাওয়া গেল। উহা বর্জিত হলে গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো সন্দেহ নেই।

বইয়ের ভাষা সুন্দর, সাবলীল ও বলিষ্ঠ ছাপা বহুলাংশে নির্দোষ। গ্রন্থকার ভিক্ষাপ্রার্থী হলেও দরিদ্র মধ্যবিত্ত জ্ঞানান্বেষী ক্রেতার পক্ষে গ্রন্থমূল্য অগ্নিমূল্যই বলতে হবে।

ভিন্ন জাতের মেয়ে—আবদুল রউফ প্রণীত প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—।০+৯৭; মূল্য—১৷০

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের চিরবিরোধের অবসান এবং উভয় ধর্মাবলম্বীর ভেতরে সামাজিক মিলন ঘটানোর শুভেচ্ছা নিয়েই গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র গল্পের বই রচনা। তিনটি গল্প আছে।

বর্তমানের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করলে মানব-হিতৈষি-মাত্রের কাছেই এ রকম বিবদমান দুই সমাজের মিলনসাধন-চেষ্টা প্রশংসনীয়। বইখানির ভাষা, ছাপা ও বাঁধাই প্রভৃতি বেশ ভাল বলা চলে। বহু পাঠক গল্পগুলি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন সন্দেহ নেই।

The Danes in Bengal—শ্রীললিতমোহন মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-:২। পৃষ্ঠা—১২২; মূল্য—২৲।

একখানা ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ১৯২০ সালে 'Simla Times' এ ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আজ বাংলার বা ভারতের যে রূপ আমরা দেখ্ছি, তিনশ' বছর আগে বাংলার ও ভারতের এই রূপ ছিল না। তখন প্রবলপ্রতাপ মোগলের বাদ্‌শাহী প্রস্তরসৌধের প্রাচীর ও স্তম্ভ প্রভৃতি শিথিলমূল। একে একে ভূপতিত হয়ে বাদশাহী শক্তিসৌধ ক্রমে দিল্লীর চারদিকেই সীমা-রেখা টেনে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করছে। আর বাংলার শাসক নবাব ও ভুঁইয়ার দল সুযোগ হলেই স্ব স্ব প্রাধান্য-বিস্তারের চেষ্টায় বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। সমগ্র দেশে আইন, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার একান্ত অভাব। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তখনকার ভারতের অশেষ ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের দুরাশা নিয়ে একে একে দেখা দিয়েছিল ইয়োরোপীয় বিভিন্ন দেশের বণিগ্‌বেশধারী পরদেশ-লুণ্ঠনকারীর দল। সর্বাপেক্ষা সুবিধা ও সৌভাগ্য-দায়ক দেশ বলে এই সব ডাকাত—নাবিকের দল—বেছে নিয়েছিল নদীমাতৃক ও সমুদ্রতীরবর্তী বাংলাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সেদিনের সেই দুর্গত বাংলার বুকে ধনলোলুপ পর্তুগীজ, ডেন্, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের হৃদয়হীন লুণ্ঠন, অত্যাচার ও পরস্পর দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ-সংগ্রহ। ঐতিহাসিক প্রাচীন দলিলাদিই এর নির্ভুল ভিত্তি। সুতরাং বাংলার প্রাচীন ইতিহাস-লেখকদের কাছে এখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। আশা করি, ইতিহাস-আমোদী যুবক বাংলা এর সমাদর করবেন।

Society and Education—শ্রীশ্রীনিবাস ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-টি, এম্-এড্ প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৩০; মূল্য—আড়াই টাকা।

মানুষের সমাজ ও শিক্ষা-বিষয়ে একখানা আলোচনা-গ্রন্থ। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সুখপাঠ্য। মনুষ্য-সমাজের আদিপত্তন থেকে আরম্ভ করে ইহার মনস্তাত্ত্বিক প্রথম বিকাশ, শিক্ষার প্রয়োজন-বোধ, বাংলার সামাজিক গঠন, বাংলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বাংলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং সামাজিক, আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাপূর্ণ বাংলার উপযোগী শিক্ষাদান-সম্পর্কে গ্রন্থকার যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বাংলার জন্য লিখিত এই গ্রন্থ বাংলাভাষায় লিখিত হলে বাংলার বিদ্বৎসমাজে অধিকতর সমাদৃত হোতো, সন্দেহ নেই। এই আলোচনা-গ্রন্থের সকল যুক্তি সর্বজন-গ্রাহ্য হবে মনে হয় না। তবুও এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ শিক্ষা-সম্পর্কিত গ্রন্থ বর্তমানে যতবেশী প্রচারিত হয় ততই ভাল।

স্বামী পূর্ণানন্দ

মণি-মঞ্জুষা—শ্রীমতী পারুল মুখার্জি, বি-এ, বি-টি ও শ্রীমতী শেফালিকা ঘোষ, বি-এ, বি-টি কর্তৃক সম্পাদিত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ॥৵০ আনা।

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার মধ্যে এমন একটি সর্বজনীন উদার প্রাণপদ শিক্ষা আছে, যাহা হইতে আমাদের সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে বঞ্চিত করিলে ভারতের যথার্থ কল্যাণ হইবে না। এই বিশ্বাসে সম্রদ্ধা সম্পাদিকাদ্বয় বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে চির-অনুধ্যেয় সূক্তিসমূহ ছেলে-মেয়েদের আবৃত্তির জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেকগুলির সহজ সরল ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। আরও বহু সদ্ভাব-সমুজ্জ্বল আলোচনা পুস্তিকাখানিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

Of God, the Devil and the Jews—by Dagobert D. Runes. Published by the Philosophical Library, New York. Pp. 181 + 5. Price: $ 3.00.

মানবেতিহাসের প্রথম চক্ষুরুন্মীলন হইতে আজ পর্যন্ত যে সব ঘটনা-পরম্পরা নানা সমস্যার সৃজন ও সমাধান করিয়া মনুষ্য-সমাজকে বর্তমান অবস্থায় আনিয়াছে, সেগুলির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা এই বইখানিতে করা হইয়াছে। এই মূল্য-নির্ধারণের কষ্টিপাথর হইতেছে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর প্রগতি নহে, সমগ্র মানব-জাতির উন্নতি। কিন্তু ইহা দেখিতে যাইয়া গ্রন্থকার এই জগতে ছিন্নমস্তার উৎকট অর্থহীন খেলা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান নাই। সারা জগতে নিরীহ দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চক্ষুতে পড়ে নাই। যাহাকে প্রগতি বলা হয় তাহার প্রতি পদক্ষেপে অসংখ্য জীব—মানব বাদ যায় নাই—নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, হইতেছে। যে জগতের এই ধারা তাহাকে ঈশসৃষ্ট ও ঈশরক্ষিত কেমন করিয়া বলা যায়? এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার ঈশ্বরবাদের যাবতীয় যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে তিনি এক "তত্ত্বমসি"তে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। (পৃঃ ২৮) কিন্তু এই 'তৎ' *শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্ম নন, রামানুজাদির* অনন্তগুণাধার ব্রহ্মও নন; মনে হইল ইনি হেগেলের সিসৃক্ষু ভাবের রূপায়ণ-মাত্র। এক স্থলে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

God is in man; God is man, the innermost of man, the atom of man's ultimate thought, the consciousness of man's unity with the All, which brings with it man's liberations from traditional confusion and prejudice.

শুনিলে মনে হয় বেদান্তের আত্মার ধারণার প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই ধারণা কোথাও গ্রন্থকার সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন নাই।

জগতে সয়তানের নৃত্য অবাধে চলিতেছে তির্যক্ জগৎ ছাড়িয়া দিয়া আমরা মানব-সমাজে অনুসরণ করিতে করিতে শ্বেতকায়-অধ্যুষিত ইউরোপে আসিয়া উপস্থিত হই। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা হইতে শুরু করিয়া বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা পর্যন্ত সবটুকুই এই ইউরোপই গঠন করিয়াছে। এইখানেই সয়তানের নৃত্য উদ্দাম, এবং জার্মাণীতে একেবারে তাণ্ডবের পরাকাষ্ঠা। এসিয়া-আফ্রিকাও একদম বাদ যায় নাই। কিন্তু বাদ গিয়াছে একটি অতিক্ষুদ্র

ভূখণ্ড—জেরুজালেম। জার্মানীকে সয়তানের বাসস্থান বলা হইয়াছে। (পৃঃ ৫৫) কেন? এই দেশের অধিবাসীরা নানা অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছে—এই সেদিনও; কিন্তু তাহাই সবটা নয়, ইহুদীদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন করা হইয়াছে তাহাই আসল বা শ্রেষ্ঠ কারণ। ভগবানের কোন নামকরণ করিবে না—কেন? হিব্রু-টোরা বলিয়াছে। ভগবানের কোন মূর্তি তৈয়ার করিবে না—কেন? হিব্রু-ঈশদূত বলিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? মুশার দশ ঈশাদেশ। এইরূপ সর্বত্র। কেবল বর্তমান ভাবধারা অনুসরণ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার ভগবানকে ছিন্নমস্তায় পরিণত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে হিব্রুগন্ধের তীব্রতা আমাদের নাকে অসহ্য বোধ হয়; তবে "ভিন্নরুচিহি লোকঃ।"

সে যাহা হউক, গ্রন্থকার যে সব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সেগুলিই তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অবশ্য নূতন কিছুই বলেন নাই; যাহা নূতন বলিয়া মনে হয় তাহা কমিউনিষ্ট দৃষ্টিতে আগেই ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু ইঁহার বলিবার ভঙ্গী এমন হৃদয়গ্রাহী যে পাঠকের বুদ্ধি অসাড় হইয়া যায় এবং তিনি গ্রন্থকারের মত গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া পড়েন।

অনেক ভাল ভাল চিন্তাকণা এরূপ পরাণ-নিঙাড়ী ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে অকুণ্ঠ চিত্তে ইহা সকলকে পাঠ করিতে আহ্বান করিতে হয়। তাই ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বড় কষ্টদায়ক। কিন্তু ইহা সাবধানে পাঠ না করিলে তরুণ মন উদ্ভ্রান্ত হইতে পারে।

স্বামী সংস্বরূপানন্দ

(১) শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—(১৬৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৸০ আনা); **(২) সুধার ধারা** (কবিতার বই—৪১ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আনা); **(৩) শ্রীশ্রীমহামন্ত্র-সংকীর্তন**—(৭২ পৃষ্ঠা; মূল্য দশ আনা)। —শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী।

প্রথম বইখানিতে নানাশাস্ত্র হইতে শ্রীগুরুর মহিমাজ্ঞাপক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সরল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তিকাদ্বয়ে নামমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বহুল প্রেরণাপূর্ণ বিবৃতি আছে। বইগুলি ভাল লাগিল। ধর্মপিপাসুরা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

জীবনায়ন—শান্তশীল দাশ প্রণীত; প্রকাশক—বেলেভিউ পাবলিশার্স, পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা-৫।

একখানি কবিতার বই। জীবন একটি তীর্থ—ইহার বহুশাখায়িত কর্ম, বিচিত্র আবেগসম্ভার, মরমীর সামগ্রিক দৃষ্টিতে পায় পূজার শ্রদ্ধা। 'জীবনায়নের' কবিতাগুলির ভিতর এই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ, ছন্দে জড়তা নাই, শব্দবিন্যাস মিষ্ট। কাব্যামোদীরা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

(১) **মর্মবীণা** (২০ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৶০ আনা) (২) **পারের খেয়া** (১৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ৶০ আনা) —শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বুক হাউস, ২৯, রসা রোড, কলিকাতা-২৬।

দুখানিই গানের বই, রচয়িতার 'পূজার ফুল' সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড। গীতি-কবিতাগুলির স্বচ্ছ ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করে। কতকগুলি গানের পদ ও ছন্দ অতুলপ্রসাদের গানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

জীবনসঙ্গিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্তক

পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; ৫৮২ পৃষ্ঠা; মূল্য—৫৲ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব ইহার প্রথম সংস্করণ-রূপে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত এবং সুধীবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে দ্বিতীয় পর্বও সংযোজিত হইয়াছে। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়ের সাধ্বী দেবী-প্রতিমা সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর পুণ্যচরিত্র পড়িতে পড়িতে হৃদয় শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। মতি বাবুর কর্ম এবং সাধনাময় জীবনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত যাহা গ্রন্থের অন্যতম দিক—যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। শ্রীঅরবিন্দের সহিত গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের কাহিনীগুলিতে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে—যদিও উহাদের বিয়োগান্ত অংশ-বিশেষ চিত্তকে বেদনাতুর করে।

(১) **নচিকেতা** (দ্বিতীয় সংস্করণ)—৫০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৲ টাকা; **(২) হৈমবতী উমা বা দর্পহরণ**—৩৭ পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা।—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, থার, বোম্বাই-২১।

দুখানিই স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী নাটিকা – যথাক্রমে কঠোপনিষৎ ও কেনোপনিষদের আখ্যান-অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় বইখানিতে গানগুলির স্বরলিপিও সংযোজিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক বলপ্রদ উপনিষদের শিক্ষা দেশে যত প্রচারিত ও সমাদৃত হয় ততই মঙ্গল।

Cosmic Ray & Colour—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক: Institute of Cosmic Ray, Colour and Free Treatment, ৫২, গড়পাড় রোড, কলিকাতা-৯। ১২৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ৩৲ টাকা

মানুষের শরীরে ও মনে সূর্যরশ্মির ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিবিধ ক্রিয়া-সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা ও গবেষণা-গ্রন্থ। যাঁহাদের এই বিষয়ে ঝোঁক আছে তাঁহারা লেখকের সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। জ্যোতিষের অনেক কথা বইখানিতে আলোচিত হইয়াছে।

নির্মলবাণী—স্বামী নির্মলানন্দ প্রণীত প্রকাশক: দেবত্রয় ট্রাষ্ট, কর্ণবাস (বুলন্দ্ শহর)। ৩৫৭ পৃষ্ঠা; মূল্যের উল্লেখ নাই

হিন্দী বই। উপনিষদ্, গীতা, স্মৃত্যাদি শাস্ত্র হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহ সনাতন হিন্দুধর্মের শাশ্বত শিক্ষাগুলি অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। গায়ত্রীমন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা খুব ভাল লাগিল। হিন্দী-জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মানুরাগী পাঠকগণ বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

মাতাজী শ্রীসারদামণি দেবী— স্বামী জপানন্দ প্রণীত; প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, বিকানীর (রাজস্থান); ৪২ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত হিন্দী জীবনকথা ও ৫০টি উপদেশের সঙ্কলন। বইখানির শেষে ভগিনী নিবেদিতার শ্রীশ্রীমাকে লিখিত একখানি পত্রের হিন্দী অনুবাদ সংযুক্ত হইয়াছে। হিন্দী-ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট এই সুলিখিত পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি-উৎসব—২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর, সোমবার) বেলুড় মঠে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। (আগামী বৎসর তাঁহার পুণ্যাবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হইলে 'শতবার্ষিকী জয়ন্তী' উৎসবের সমারম্ভ হইবে) ঐ দিন বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রায় ৪ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকালে একটি জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী সংস্বরূপানন্দ জননী সারদাদেবীর জীবন ও উপদেশ-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেও (উদ্বোধন কার্যালয়—যেখানে মা স্থূলদেহে ১৩১৬ সাল হইতে ১১ বৎসর বাস এবং ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মহাসমাধিলাভ করিয়াছিলেন) বিশেষ পূজা-ভোগরাগ-হোম-ভজন ও প্রসাদবিতরণাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচনা করেন।

পাথুরিয়াঘাটা (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—১৯৪৩ খৃঃ স্থাপিত এই ছাত্রাবাসটির (ঠিকানা : ১৮, যদুমল্লিক রোড) ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ৫৯জন ছাত্র (৪৫জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক ; ৫ জন আংশিক এবং ৯ জন পুরা খরচ দিয়া থাকিয়াছে) এখানে থাকিয়া কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে পড়াশোনা করিয়াছে। কলেজ-শিক্ষার পরিধির বাহিরে বিদ্যার্থিগণের শারীরিক মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতির জন্য আশ্রমে নানা সুচিন্তিত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমিক যুবকগণ কৃতবিদ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত, স্বাবলম্বী, সৎ, দৃঢ়চরিত্র, যথার্থ মানুষ ও দেশসেবী হইয়া উঠিতে পারে সর্বদা সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। আশ্রমের আর্থিক সঙ্গতি খুবই সীমাবদ্ধ। এতগুলি দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

শ্যামলাতাল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান গত ৩৭ বৎসর যাবৎ হিমালয়ের পার্বত্য অধিবাসীদের সেবা করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়াও বহু রোগী এখানকার চিকিৎসালাভার্থ আসিয়া থাকেন। আশ্রমটি তিব্বতের বাণিজ্যপথের নিকটবর্তী বলিয়া পথে রোগাক্রান্ত বহু অসহায় ভুটিয়া এই সেবাশ্রমে চিকিৎসার জন্য আসে। সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে ১২টি রোগশয্যা আছে। সেবাশ্রমের পশুচিকিৎসা-বিভাগও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫১ সালে সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে চিকিৎসিত রোগি-সংখ্যা, নূতন—৩৫৭০, পুরাতন—০০৪ ; অন্তর্বিভাগের রোগিসংখ্যা ছিল ৯৫। পশুচিকিৎসালয়ে ১৫২৭টি পীড়িত গৃহপালিত পশুর আরোগ্যবিধান করা হইয়াছে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি বি. স্যানাটোরিয়াম্—আমরা এই যক্ষ্মা-আরোগ্যনিবাসটির ১৯৩৭-৫১ সালের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ইহা রাঁচি-শহর হইতে ১০ মাইল দূরে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্জন, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে ইহার কাজ পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫১ সালে এই আরোগ্য-নিবাসে

৪০টি রোগি-শয্যা ছিল। ১০টি রোগশয্যাযুক্ত আর একটি ওয়ার্ড ১৯৫২ সালের জুলাই মাস হইতে খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০জন রোগী এই আরোগ্য-নিবাসে ছিলেন। সমস্ত বৎসরে ৫৭ জন রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছে। রোগের তীব্রতার তারতম্যানুসারে রোগিগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই বৎসর কয়েকটি অস্ত্রোপচার সাধিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটিতে একটি রঞ্জনরশ্মি-যন্ত্র (X' Ray Plant) ব্যবহৃত হইতেছে। আরোগ্যনিবাসের অস্ত্রোপচার-বিভাগ নির্মিত হইলে সর্বপ্রকার অস্ত্রোপচার তাহাতে সম্ভবপর হইবে। বহিরাগত বহু যক্ষ্মারোগী এখানে আসিয়া চিকিৎসকগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই সকল রোগীদের জন্য একটি আউট্‌ডোর ক্লিনিক্ খোলার চেষ্টা চলিতেছে। প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি উপনিবেশ-স্থাপনেরও পরিকল্পনা করিতেছেন। এই উপনিবেশে তাঁহাদের জীবিকার্জনেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

যক্ষ্মাচিকিৎসা ছাড়াও স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিগণের (অধিকাংশই আদিবাসী) চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ও এই আরোগ্যনিবাসে পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪৮-১৯৫১ সালের মধ্যে ১৪,৬৬৬জন রোগী এই ঔষধালয় হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। আশা করি সহৃদয় দেশবাসী সমুচিত অর্থানুকূল্য দ্বারা ইহার প্রসার-সাধনে সহায়তা করিবেন।

কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন—এই জনকল্যাণ-ব্রতী প্রতিষ্ঠানটির ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের কার্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মিশন ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন। তাহাতে ৬,৫০০ বালক-বালিকা পড়াশোনা করিয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে ২৩৬ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। মিশন বালকদের জন্য একটি ছাত্রাবাস এবং বালিকাদের জন্য দুইটি ছাত্রী-নিবাস পরিচালন করিতেছেন। ছাত্রছাত্রীগণের ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বালক-বালিকাগণকে কৃষি ও শিল্পশিক্ষা-দানের চেষ্টা করা হইতেছে। মিশন-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি সিংহলের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত। বাটিক্যালোয়া জেলায় একটি আবাসিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ১৪টি তামিল-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই জেলার মধ্যে শিবানন্দ বিদ্যালয় একটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ত্রিঙ্কোমেলি-জেলাস্থিত মিশন-পরিচালিত হিন্দু কলেজ একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন। জাফনা-স্থিত বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয় অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে বর্তমান স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ইহার ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে ৮০০; ৩২ জন শিক্ষক ইহাতে নিযুক্ত আছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিবর্তিত করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। বাটিক্যালোয়া শিবানন্দ বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি অনাথাশ্রম যুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে ৮৫টি বালক শিক্ষালাভ করে। মিশনের বিভিন্ন পরিকল্পনা এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। তজ্জন্য অর্থসাহায্যের জন্য মিশন-কর্তৃপক্ষ সনির্বন্ধ আবেদন জানাইয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত-কেন্দ্র—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫২ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী প্রতি রবিবার প্রার্থনা-সভার পরিচালন ও প্রতি শুক্রবার শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। প্রতিষ্ঠানে ইষ্টার, দুর্গাপূজা এবং ভগবান্ যীশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। পাঠাগার ও লাইব্রেরী বেদান্তকেন্দ্রের

সভ্যবৃন্দ ব্যবহার করিতে পারেন। সভ্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭ সালে এই বেদান্তকেন্দ্র সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি-জড়িত বাড়ীটি ক্রয় করেন। উহার বিশদ সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহা 'বিবেকানন্দ কুটির' নামে অভিহিত।

প্রতিষ্ঠানের উপাসনা-গৃহে ১৯৫০ সালে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্রোঞ্জ্ প্রতিমূর্তি এবং ১৯৫২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি আবক্ষ আলাবাষ্টার মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ম্যালভিনা হফমান কর্তৃক নির্মিত এই মনোরম মূর্তিদ্বয় উপাসনাগৃহের গাম্ভীর্য বর্ধন করিয়াছে। প্রথমটির আবরণ-উন্মোচন করেন তৎকালীন ভারত-রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তদুপলক্ষে বেদান্ত-কেন্দ্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির আবরণ-উন্মোচনানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন সেণ্ট্ লুই বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী।

আলোচ্য বর্ষত্রয়ে স্বামী নিখিলানন্দজী যুক্ত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৫১ সালে তিনি দেড় মাসের জন্য সুইডেনে গিয়াছিলেন। ষ্টক-হল্‌ম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুলোকের সহিত তাঁহাকে বেদান্ত-বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

এই বৎসর এপ্রিল মাসে নিউ ইয়র্কের হার্পার ব্রাদার্স স্বামী নিখিলানন্দজীর উপনিষদ্ দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে। আরও দুই খণ্ড বাহির হইলে পরিকল্পিত এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইবে।

সেণ্টলুই বেদান্ত সোসাইটি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রস্থিত এই বেদান্ত-কেন্দ্রের ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী ইহার বহুবিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার পরিচয় দান করে। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী প্রতি রবিবারে (গ্রীষ্মকাল ভিন্ন) ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি মুণ্ডকোপনিষৎ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতা আলোচনা এবং ধ্যানশিক্ষাও দিয়াছেন। সোসাইটিতে গুড্ ফ্রাইডে, দুর্গাপূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রীষ্মকালে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী পশ্চিমাঞ্চলের বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং বেদান্তানুরাগী ভক্তগণের সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি আমন্ত্রিত হইয়া ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের World Affairs Group-এ ভাষণ দেন। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও আহূত হইয়া সৎপ্রকাশানন্দজী বক্তৃতা করেন। আলোচ্য বর্ষে মিঃ জেরাল্ড হার্ড, স্বামী অখিলানন্দ ও স্বামী পবিত্রানন্দ সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক—

(১) শ্রীশ্রীমা সারদা : স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত ; মূল্য ১৲ টাকা।

(২) A Glimpse of the Holy Mother : By Chandra Kumari Handoo ; মূল্য ।৶০ আনা। উপরোক্ত দুখানি বইই শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-প্রকাশন।

(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ : শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী প্রণীত ; মূল্য ১৲ টাকা।

(৪) সারদা-সঙ্গীত (শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধীয় গানের বই) : স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত ; মূল্য ৸০ আনা, বাঁধাই ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়

বিবিধ সংবাদ

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ—'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের লেখক যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৫১ সালের) 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা' দিতে আহূত হইয়াছিলেন। গত ২১, ২২ ও ২৩শে কার্তিক দ্বারভাঙ্গা হলে (শেষের দিন আশুতোষ হলে) এই বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। অচিন্ত্য বাবু বিষয়-নির্বাচন করিয়াছিলেন—'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। তিন দিনই তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য বিপুল ভীড় হইয়াছিল। বক্তা বলেন,—"শুধু ভূমিকে আশ্রয় করলে চলবে না, ভূমাকেও পেতে হবে। তিনিই সত্যিকারের সাহিত্যিক ও কবি যিনি সেই ভাবধারা পরিবেশন করেন।·········কবির মন স্বয়ম্ভু, কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী—তিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন। কবি থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম, সমস্ত কিছুর যাত্রা, চারি দিকে নক্ষত্রখচিত আকাশে তাঁকেই দেখি। সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন।······শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলা সাহিত্যে তীক্ষ্ণ স্বচ্ছতা ও প্রাণশক্তি এনেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার উপমার জুড়ি নেই।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-সমূহ হইতে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দ্বারা বক্তা উহাদের ভিতরকার শাশ্বত কাব্যধর্ম প্রদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্মেলন—সাঁচীর নবনির্মিত বিহারে ভগবান তথাগতের প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লানের পূতাস্থি-সংরক্ষণ উপলক্ষে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সমাগম হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) আহূত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সমবেত প্রখ্যাত মনীষিগণ যে সকল শান্তি ও মৈত্রীর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনীয়। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম পুনরায় গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতেছে। ··বিশ্ববাসীর অন্তরে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা গাঁথা হইয়া আছে।··· পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজ বুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতেছেন। বুদ্ধ শুধু অতীতেই একটি মহতী শক্তি ছিলেন না, বর্তমান এবং ভাবী কালেও তিনি সমগ্র বিশ্বে বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিভাত হইবেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আনাতোল ফ্রান্সকে এক দিন অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ব্যক্তিগত এবং বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণের প্রয়োজন।

জার্মাণ দার্শনিক সোপেনহাওয়ার তাঁহার সম্মুখে সর্বদা বুদ্ধের একটি স্বর্ণমূর্তি রাখিতেন।

পরলোকে ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ—গত ১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর, ১৯৫২) অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের দমদমস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্মজীবনে তিনি কলিকাতার একজন যশস্বী অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন।

দুর্গাপদ বাবু তরুণবয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ঘনিষ্ঠ পূত সংস্পর্শ এবং অজস্র স্নেহ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। দুর্গাপদ বাবুর গভীর ভক্তি-বিশ্বাসদীপ্ত অমায়িক চরিত্র এবং অকুণ্ঠ সেবা-পরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর প্রধানতঃ কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে থাকিয়া সাধনভজন, শাস্ত্রানুশীলন ও পীড়িত নরনারায়ণের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা এই উন্নতচরিত্র ভক্ত-প্রবরের আত্মার আত্যন্তিক শান্তির জন্য শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

বর্ষসূচী

৫৪ম বর্ষ

(১৩৫৮, মাঘ হইতে ১৩৫৯, পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (বৈশাখ—পৌষ)

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

বার্ষিক মূল্য ৪, প্রতি সংখ্যা ।৹

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

(মাঘ, ১৩৫৮ হইতে পৌষ, ১৩৫৯)

উদ্বোধন—বর্ষসূচী